জ্বলিছে ধ্রুবতারা

২য় খণ্ড

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

লুক ইস্ট

Jwaliche Dhrubotara
by Rantidev Sengupta

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক ● আশিস পণ্ডিত
লুক ইস্ট পাবলিকেশনস
সি ই-১৭, সল্টলেক, সেক্টর-১
কলকাতা-৭০০০৬৪
দূরভাষ ঃ ০৩৩-২৩২১০৭৩৮
ই-মেল ঃ lookeastpublication@gmail.com

পরিবেশক ● দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

অক্ষরবিন্যাস ● বাংলা স্ক্রিপ্ট

প্রচ্ছদ-চিত্র ● মার্টি কালিন

প্রচ্ছদ ● জগন্নাথ মণ্ডল

মুদ্রক ● অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৮১, সিমলা স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৬

৪০০ টাকা

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন
দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ, রাজ সমারোহে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো।।

লেখকের কথা

ভগিনী নিবেদিতার জীবনীমূলক গ্রন্থ 'জ্বলিছে ধ্রুবতারা'-র দ্বিতীয় খণ্ডটি এবার প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে নিবেদিতার শৈশবকাল থেকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ— এই সময়কালটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ধরা হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর থেকে দার্জিলিংয়ে নিবেদিতার দেহাবসান — এই সময়কালটিকে। দ্বিতীয় খণ্ডে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকার ওপর। পরিতাপ এবং লজ্জার বিষয় যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিতার যে মহান ভূমিকা, তা নিয়ে এ দেশের বিশিষ্ট ঐতিহাসিকেরা প্রায় কেউই বিস্তারিত আলোচনা করেননি। বলতে গেলে, নিবেদিতা তাঁদের কাছে একপ্রকার উপেক্ষিতাই থেকে গিয়েছেন। কেন নিবেদিতার ভূমিকা নিয়ে তাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করেননি — সে বিষয়টি বোধগম্য নয়। অথচ, বাংলায় বিপ্লববাদ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে নিবেদিতার প্রসঙ্গটি আসা অবশ্যম্ভাবী। এক্ষেত্রে বলতেই হবে, বিশিষ্ট ঐতিহাসিকেরা কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই যেন নিবেদিতার প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গিয়েছেন। দেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে নিবেদিতার ভূমিকা এভাবে উপেক্ষিত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুও। এভাবে নিবেদিতাকে উপেক্ষা করে যে তাঁকে যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি — তা বলতেই হবে।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেও বলেছিলাম, আবারও বলছি — এই গ্রন্থটি নিছক নিবেদিতার জীবনীগ্রন্থ নয়; চেষ্টা করেছি একটি গবেষণামূলক কাজের মাধ্যমে নিবেদিতা, তাঁর সময়, তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত অসংখ্য ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি

নিবেদিতার কাজের একটি বিশ্লেষণ করতে। তা করতে পেরেছি কিনা তা অবশ্য পাঠক বলবেন। এই কাজটি করতে গিয়ে নানাবিধ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। তার একটি তালিকা গ্রন্থের শেষে দেওয়া হল। এই কাজটি করতে গিয়ে বেশ কয়েকজনের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং উৎসাহ পেয়েছি। তাঁদের সহযোগিতা এবং উৎসাহ ব্যতীত এই কাজটি সম্পূর্ণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। প্রথমেই বলতে হবে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী, শ্রদ্ধেয় স্বামী ত্যাগিবরানন্দ মহারাজের নাম। বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তিনি আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। বলতে হবে, আমার একান্ত সুহৃদ বিশিষ্ট গবেষক এবং লেখক পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের কথাও। তিনিও নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমাকে। আর বলতেই হবে আমার লন্ডন প্রবাসী বন্ধু সারদা সরকারের কথা। প্রথম খণ্ডটির মতো দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ করার সময়েও সারদা আমার গবেষণা কর্মে নিঃস্বার্থ সাহায্য করেছেন। এ কাজটির অধিকাংশ কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। এছাড়াও আমার বহু ঘনিষ্ঠজন আমাকে এই কাজের বিষয়ে উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাঁদের ভিতর কয়েকজনের নাম না বললেই নয়। যেমন— বিশিষ্ট চিত্রগ্রাহক সুনীল দত্ত, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়, গুঞ্জন ঘোষ, সুনীল পাইন, অলকেশ মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত লোহ চৌধুরী, কৌশিক গুপ্ত প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন আয়ারল্যান্ডের সেনেটর মরিস হেইস। মরিস সে দেশের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক এবং সাংবাদিক। আয়ারল্যান্ডবাসীর কাছে নিবেদিতার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা তুলে ধরতে মরিসই প্রথম প্রয়াসী হন। অপর ভূমিকাটি লিখেছেন আয়ারল্যান্ডেরই বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণানন্দ। স্বামী পূর্ণানন্দ ডনগ্যাননে নিবেদিতার বাসস্থান সংরক্ষণ করা এবং নিবেদিতার অবদানকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয়। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখে দিয়ে এঁরা দুজনেই আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন।

সবশেষে বলতেই হবে লুক ইস্ট পাবলিকেশন্সের কর্ণধার আশিস পণ্ডিতের কথা। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশের বিষয়েও তিনি আন্তরিক উৎসাহ দেখিয়েছেন। তিনি সহায়তার হাত বাড়িয়ে না দিলে এই কাজ শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ। প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডেরও পাণ্ডুলিপি তৈরি, প্রুফ সংশোধন সব কাজেই আমাকে সাহায্য করেছেন পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়। অশেষ ধন্যবাদ তাঁকেও।

বইটি যদি পাঠকদের ভালো লাগে, মহীয়সী নিবেদিতার প্রতি তাঁরা যদি শ্রদ্ধাবনত হন — সেটিই হবে আমার পরমপ্রাপ্তি।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

ডিসেম্বর, ২০১৪

Preface

It is my privilege to support Sri Rantidev Sengupta's noble efforts in honouring Sister Nivedita through this second volume of her remarkable life. Not only does volume one and two segment Nivedita's life into easily identified chapters, but Rantidev's research has had to be wide and varied in order for the reader to be present to the time, places, era and impact of her life. Without this setting, appreciation cannot follow and the importance of her life and her life's work is lost.

Based in Ireland, as I am, for as long as the Lord chooses, I am acutely aware that neither the name of Margaret Elizabeth Noble, nor that of Sister Nivedita are widely known in her native country, let alone her adopted one and not to mention globally. Only recently have the seeds of awareness been sown in Ireland itself, that I have no doubt will flower and blossom over time and I hope that these books, both part one and two, will assist in the overall endeavour. All these efforts are valuable when they contribute towards a greater understanding of inner truth, a deeper sense of thankfulness for natural facilitating events and an

appreciation for the significance of a national personality; so this is more than just a literary "commemorative plaque" or a historical note to be lost among the endless libraries of academia. For when an exemplary life shows how adoration for God comes from a penetrative insight into He dressed in the garb of the poor, uneducated etc.[i] When "God comes to you in the blind, in the halt, in the poor, in the weak, in the diabolical", the attitude leads to a practical upliftment where inner and outer transformations occur that fulfil a certain destiny, make a positive social impact and remove elements of misery.

Journeying with an inspiring soul through the vicissitudes and elevating highlights of a determined and dedicated life gives us comfort that we are not alone, establishes faith in ourselves and allows us to emulate their outlook. Even now, a careful study of Nivedita's life will reveal modern educational attitudes and methods, peaceful solutions to religious/political disputes in Ireland, India and elsewhere, the presence of a linear plan that some may see as divine and character traits worth adopting. Discerning readers may well see elements of impeccable timing among the crests and hollows of a dedicated life.

This sequel covers the years from 1902 to her premature demise in 1911, a period that marks her out as someone moulded by her master in the furnace of enduring spiritual values on the one side and fiery world moving passion on the other. 1902 was a significant year for Sister Nivedita. It was the year of the demise of her lifelong guru and inspiration and the opening of her school for local girls; it opened a new chapter where cumulative milestones were necessary to allow the individual to unfold and blossom and fulfil what many will regard as a divine destiny. Here Sri Rantidev emphasises Sister Nivedita's courageous educative and people centred work and her committed efforts for and contribution to pan nationalist Indian freedom with the companions

of human dignity and justice; what began as a spark, grew to a flame. There is no doubt, she was a formidable and indispensible influence, not only on the freedom movement but in drawing out faith in the individual, be it artist or scientist; and in the midst of this, her ability to evoke respect and easily make friends seemed a part of her "magic". This, it seems, would have been difficult under the shade of the great banyan tree of Vivekananda, who, like Buddha's silence seemed to leave the door open for her, neither endorsing a new direction, nor otherwise.

Sri Krishna's message in the Bhagavatam is clear, if one takes this world as a play of the Lord on Himself[ii] a message emphasised as the other half of the Nitya "coin" by Sri Ramakrishna,[iii] it is easy to see this play unfolding; from Margaret Noble's family background, her religious and political environment, her family convictions, her inherited and inherent values, how Vivekananda sat near her on their first encounter in 1895, just to take a few episodes. Her guru never initiated her into sannyasa. Was this to allow her the freedom to fulfil her svadharma in a more politically orientated life that still carried the flame of his national passion, his vision of BharataVarshya's role in the establishment of Vedanta as the world religion of the future? Was the key value of Strength, not her Master's message after all? Was she not a fitting Divine vessel to help unchain the sacred land of Bharata so that she could fulfil her global role on the stage of life? I venture to suggest the sure, guiding hand of a Divine Helmsman. This would be no surprise since her life training, her cumulative skills, her willingness to embrace the new, her sense of justice, her clear sense of mission and purpose, her alignment to a "foreign" culture, her love of the people and their needs and much more prepared her well; but more than this, the influence of a giant of a teacher in Swami Vivekananda, and the profound blessings poured on her from Sri Sarada Devi (Holy Mother)[iv], ensured that she was attuned to the highest; her obvious spirituality shines through her writings

and is worthy of “Nivedita of Ramakrishna” as she used to sign herself. Someone who “gave her all to India” (from epitaph).

May this sequel book position the significance of a historical patriot, a daughter of truth, a devotee, a legacy of Swami Vivekananda; may it inspire others in their faith in ancient Vedic culture, so globally necessary today and inspire a spirit of dedicated service in others.

Swami Purnananda

On Dhanteras 2014

i. The Complete Works of Swami Vivekananda *by Swami Vivekananda* Volume 1, Lectures And Discourses

ii. 11th Chapt. Bhagavatam as Last Message of Krishna - “a play on myself by myself” also 24.13,19

iii. Gospel of Ramakrishna, Chapt. 41

iv. Gospel of Holy Mother, page 10

In search of Sister Nivedita

I had not heard of Margaret Noble, much less Nivedita, until a friend of mine, Bryan MacMahon, a noted Irish short-story writer and dramatist, returned from Iowa in the American Mid-West, where he had been teaching in a writers' workshop organised by the American poet Paul Engels. There he had met an Indian poet, Gangpadha, who, in between vigorously rendered verses of the revolutionary Irish ballad *Kevin Barry,* reproached him for not having heard the name of an Irish lady who was remembered, respected and revered in India as a teacher, revolutionary, social worker, and as a friend of the Indian people and their culture.

Bryan, who was very proud of his encyclopaedic knowledge of modern Irish history and personalities, particularly those involved in education or rebellion, was rather taken aback by this — as was I who shared many of his interests, when he told me of the legendary Nivedita on his return to Ireland.

Together, over the years, we started to piece together the story and to trace her connections in Ireland, and to find what traces she had left. It was not so easy in those pre-Google days — no button to press for instant information, no data bank in the clouds to be tapped for enlightenment. Soon the shameful truth emerged, that Margaret Noble had been all but totally forgotten in her native land — even by those who claimed ownership of the republican tradition. At least we could not find those who might have done so, despite constant enquiry and consultation.

We were able to put together, bit by bit. The issue of a commemorative postage stamp in India to mark the centenary of her birth in 1867 was a starting point. There was, too, a biography in French which told of her birth in Dungannon, and described her as having been raised in the revolutionary tradition of the Ulster manse — an overstatement of political attitudes if ever there was one. We were also able, from time to time, to pick up tattered second-hand copies of her books: *Cradle Tales of Hinduism, My* India My *People.*

A great opportunity arose when Bryan was commissioned in the late 1960s to write a travel book for the publishers, Batsford. I joined him at times on his journey round Ireland, and as part of his research we visited the town of Dungannon, the ancient seat of the O Neills, the dominant Gaelic clan in Ulster before the 17th century plantations. There surely, we thought, fortified by the information in the French biography, we would find out all about Margaret Noble (if not about her Indian incarnation as Nivedita). She had been entirely forgotten (although the surname Noble was not uncommon in the area) written out of the narrative, especially by those of her own religious and cultural background who were now universally unionist, conservative and imperialist. Not that we fared any better in the Irish republican community locally, where the name of Margaret Noble was unheard of and uncelebrated.

We were helpfully referred to a local mill owner, Major Dickson, whose family had, in the 19th century, produced a succession of Liberal members of Parliament representing the area, and while he had much to tell us about Gladstone and the Irish problem, of Margaret Noble he had no knowledge at all, no family or race memory.

He helpfully in turn referred us to a local historian who had recently published a history of the town, the headmaster of the local grammar school, Dr Hutchinson. Again, despite his great erudition, no luck: the name meant nothing to him either. Ironically, as we approached the school we had to pass the bronze statue of their

most famous former pupil, General John Nicholson, who was being celebrated for the excessive brutality with which he had put down what the British text books taught as the Incian Mutiny in 1857 — ten years before the birth of Margaret Noble. It struck both of us as more than a little bizarre that her native place should honour a brutal oppressor of the Indian people while totally obliterating the memory of a gentle and dedicated lady who had brought them education, understanding and encouragement.

Bryan has published an account of our visit to Dungannon in his book Here's *Ireland,* in 1971. Coming away empty-handed from Dungannon, we kept up the search. I was able, after persistent digging (for many of the Irish public records of the period had been lost in the destruction of the Four Courts in Dublin in the Irish Civil War of the 1920s) to get hold of a copy of her birth certificate. And there it was.

Birth registered in the District of Dungannon, No 452, born on 28 October 1867 at 23 Scotch Street, Dungannon, Margaret Elizabeth Noble. Father Samuel Richmond Noble of 23 Scotch Street, Woollen Draper; mother, Mary Isabella *Noble, formerly Hamilton.*

A learned and amiable Indian lawyer, a fellow student on a MA course on Human Rights in Queen's University Belfast in the early 1990s enriched my knowledge of Nivedita and kindly supplied me with a wider set of her books. In the interim, too, I had learned that her name had a magical effect on Indians of a certain age when I dropped it into conversations in many parts of the world. I was also helped by the Gupta family, publishers of *Dainik Jagran,* with which Irish Independent newspapers, of which I was a director, had an association for some years.

When the Royal Irish Academy set about establishing an Irish Dictionary of National Biography, I submitted the name of Margaret Noble as a distinguished educationalist who had played an important role in the emergence of the modern Indian democracy, and who deserved to be listed among the great and good of Irish life over

the ages. The editors readily agreed, and I, with considerable daring, prepared the citation, which stands in the Dictionary and is accessible on line.

Then, to redress local amnesia in Dungannon, and to revive her memory in Dungannon, I asked the Ulster History Circle to consider erecting one of their distinctive blue plaques on or near the site of her birthplace in Scotch Street, Dungannon. The Ulster History Circle is a voluntary body dedicated to remembering distinguished people of Ulster origin, by marking their birthplace, or some place associated with them — such as poets, philanthropists, US Presidents,inventors, educationalists, revolutionaries and visionaries. Margaret Noble easily filled several of these categories, and the plaque was unveiled in 2007 by the Indian High Commissioner Shri Karamesh Sharma, in the presence of the Mayor and local public representatives of all parties, and an interested band of townspeople, who were hearing of their famous townswoman for the first time.

Happily the event did arouse interest locally and in the local newspapers. It is also recorded on the Ulster History Circle website. Perhaps most significantly, Jean McGuinness, a retired university lecturer in history, who had never heard of Nivedita, was inspired to pursue her own researches which enabled her to make contact with collateral descendants of Margaret Noble in England, and to greatly expand our knowledge of her educational and other activities in India, and her pre-history in England, where she had encountered Swami Vivekananda. Jean has embodied all of this in a dramatic presentation which has been widely acclaimed and which celebrates the life and achievements of a great Irish lady and a native of Dungannon.

For my part I regarded this as mission accomplished — a debt I owed to the memory of Margaret Noble, and of my friend, Bryan MacMahon, who first lit the flame.

Senator Maurice Hayes
Member, Royal Irish Academy

ভগিনী নিবেদিতা

বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সঙ্গে নিবেদিতা

মায়াবতীতে নিবেদিতা, মিসেস সেভিয়ার, সিস্টার ক্রিস্টিন এবং লেডি অবলা বসু

অশ্বিনীকুমার দত্ত

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

◘ ভাইসরয় লর্ড মিন্টো

◻ কাউন্টেস অফ মিন্টো

□ ভাইসরয় লর্ড কার্জন

অরবিন্দ ঘোষ

□ কৃষ্ণকুমার মিত্র

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

হেমচন্দ্র কানুনগো

□ পুলিশ প্রহরায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

লালা লাজপত রাই, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল

◘ *সিস্টার ক্রিস্টিন এবং নিবেদিতা*

সিস্টার সুধীরা
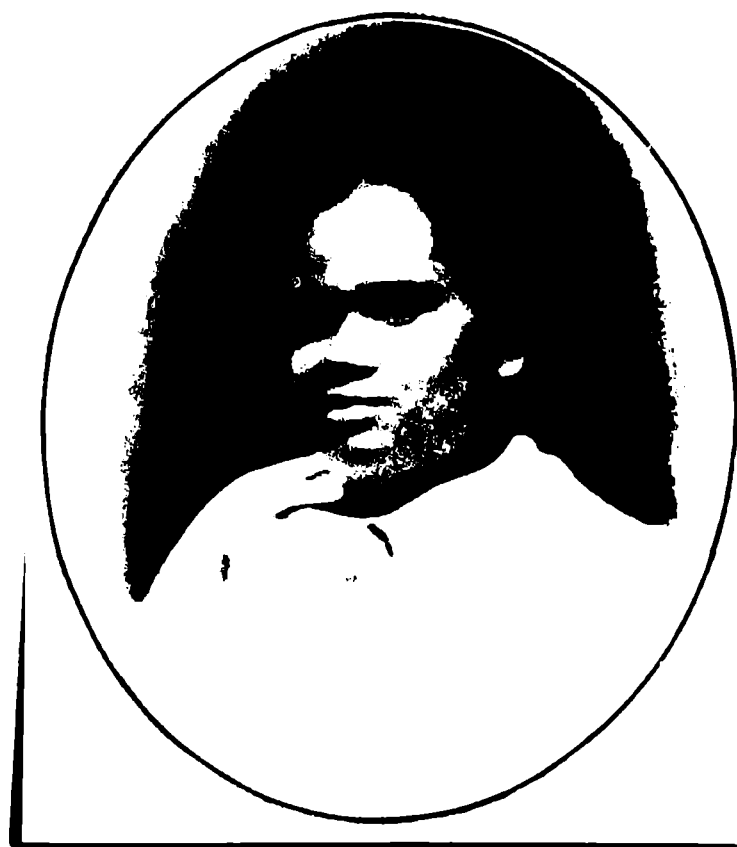
বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবেশ পথে নিবেদিতার রিলিফ মূর্তি 'লেডি অফ দ্য ল্যাম্প'

নিবেদিতার আঁকা বজ্রচিহ্ন

এক

১৯০২ সালের ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ প্রয়াত হলেন। ১৮ জুলাই নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সঙ্গে সরকারিভাবে সংশ্রব ছিন্ন করলেন। তবে, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্কচ্ছেদ কতটা রাজনৈতিক কৌশল, আর কতটাই বা আদর্শগত বিরোধ—তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেই বলা হয়েছে—রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদের পরবর্তী সময়ের কিছু ঘটনাপ্রবাহ বিচার করলে কিন্তু এরকমই ধারণা হবে যে, নিবেদিতা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভিতর এই বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ কৌশলগত ছিল। দুপক্ষই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই কৌশল অবলম্বন করেছিল। সরকারিভাবে বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করলেও রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজির গুরুভ্রাতারা নিবেদিতাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতেন। নিবেদিতাও তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এমনকী, নানা বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে সাহায্যও নিতেন। এপ্রসঙ্গে কয়েকটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতেই পারে। বিবেকানন্দের প্রয়াণের পর ১৯০২ সালের আগস্ট মাসে নিবেদিতা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময়ে তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ, বকলমে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'আগস্ট মাসের প্রথমেই তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ মঠ হইতে আসিয়া চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন। নিবেদিতা পুরা নিরামিষাশী ছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য বোধে তাঁহারা অন্যবিধ পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন। এই ঘটনায় নিবেদিতা উপলব্ধি করিলেন যে, মঠের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বাহ্যত বিচ্ছিন্ন হইলেও স্বামীজির গুরুভ্রাতারা, বিশেষতঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই; সংঘকে নিরাপদ রাখিয়া স্বামীজির

নির্দেশানুসারে কাজ করিবার জন্য একটি অত্যাবশ্যক পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন মাত্র। সর্বপ্রকার বিপদে তাঁহাদের সাহায্য লাভ করিবেন, এই পরম আশ্বাস নিবেদিতার মনোবেদনা অনেকাংশে লাঘব করিল। বাকীটুকু স্বাধীন জীবনযাত্রার জন্য স্বীকার্য।' প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার একটি বাক্য এ প্রসঙ্গে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য–' সংঘকে নিরাপদ রাখিয়া স্বামীজির নির্দেশানুসারে কাজ করিবার জন্য একটি আবশ্যক পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন মাত্র।'

আর একটি ঘটনার কথাও সবিশেষ উল্লেখ্য। বুদ্ধগয়ার অধিকার হিন্দু মহন্তদের হাতে রেখে দেওয়ার দাবিতে যখন জোরদার প্রচার-আন্দোলন চালাচ্ছেন নিবেদিতা, ১৯০৪ সালে, সেইসময়ই স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে বুদ্ধগয়ায় একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দেন। ১৯০৪ সালের ৩ মার্চ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে সে কথা জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। লিখেছিলেন, 'Swami Brahmananda is now empowering me to start a History School at Bodh-Gaya—with a group of young men. This I hope to make into a sort of College—Post University Extension. Here I hope to work out my thought. Elsewhere, I look forward to carrying out schemes. But it remains to be seen where the money will come from.'

স্বামী ব্রহ্মানন্দের এইরকম প্রস্তাব দেওয়া থেকেই বোঝা যায়, বুদ্ধগয়ার অধিকার শৈব মহন্তদের দেওয়ার যে দাবি তুলেছিলেন নিবেদিতা—তার পিছনে প্রচ্ছন্ন সমর্থন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ছিল। বুদ্ধগয়ায় একটি ব্রহ্ম বিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতার দাবিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের এই বিচ্ছেদ কেন কৌশলগত –তার কয়েকটি কারণ এই গ্রন্থের প্রথম পর্বেই দেখানো হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবিতাবস্থাতেই এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন বা এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত কেউ যদি প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে–তাহলে ব্রিটিশ পুলিশের রোষদৃষ্টি পড়বে এই সংগঠনের ওপর। সেক্ষেত্রে মঠ-মিশনের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। আর তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের পত্তন করেছিলেন তিনি – তার পুরোটাই বিফলে যাবে। যে কারণেই, স্বামীজি পরোক্ষে স্বাধীনতার আন্দোলনকে যেভাবেই সমর্থন করুন না কেন–প্রকাশ্যে এ নিয়ে কখনোই কোনো কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত রাখেননি। নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়ায় স্বামীজির আপত্তির বহুবিধ

কারণের ভিতর এটিও অন্যতম একটি কারণ ছিল। স্বামীজির এই মনোভাবের কথা নিবেদিতা জানতেন, জানতেন স্বামীজির গুরুভ্রাতারাও। নিবেদিতা এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি যতই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি করে জড়িয়ে পড়বেন, ততই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ওপর ব্রিটিশ পুলিশের দৃষ্টি পড়বে। ব্রিটিশ পুলিশ যে স্বামীজি সম্পর্কে বরাবরই সন্দিগ্ধ ছিল–তা নিবেদিতার অজানা ছিল না। স্বামীজির সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণকালে, ১৮৯৮ সালের ২২ মে, বান্ধবী নেল হ্যামন্ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'One of the monks has had a warning this morning that the police are watching Swami, thro' spies—of course we know this—in a general way—but this brings—it pretty close, and I can not help attaching some inportance to it, tho' the Swami laughs. The Government must be mad—or at least will prove so if he is interfered with, that would be the torch to carry fire through the country—and I the most loyal English woman that even breathed in this country (I could not have suspected the depth of my own loyality till I got here), will be the first to light up.'

মনে রাখতে হবে, এই চিঠিটি যখন নিবেদিতা লিখেছিলেন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা, ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কেই নিবেদিতার কোনো ধারণা ছিল না। বরং তখন নিজেকে 'Loyal English woman' বলেই পরিচিতি দিয়েছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতার চিঠিটি পড়ে আরও বুঝতে পারা যায় যে, ব্রিটিশ পুলিশের এই নজরদারি সম্পর্কে স্বামীজি সচেতন ছিলেন।

স্বামীজির প্রয়াণের পর নিবেদিতাও কখনোই চাননি, তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দরুণ মঠ ও মিশনকে কোনোরকম সংকটের ভিতর পড়তে হোক। মঠ-মিশনের কাজকর্ম মসৃণভাবে চলুক এবং স্বামীজির উদ্দেশ্য সফল হোক এটি নিবেদিতারও কাঙ্ক্ষিত ছিল। কাজেই, স্বামীজির প্রয়াণের পর রাজনৈতিক পথটি যখন বেছে নেন নিবেদিতা, তখন রামকৃষ্ণ মিশনকে আড়াল করার জন্য একটিই উপায় ছিল তাঁর সামনে। তা হল, প্রকাশ্যে ঘোষণা করা যে, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে কেউ অভিযুক্ত করতে পারবে না। মঠ-মিশনের ওপরও ব্রিটিশ পুলিশের নজরদারি থাকবে না। স্বামীজির প্রয়াণের পর ১৯০২ সালের ১০ জুলাই বেলুড় মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে একান্তে দীর্ঘক্ষণ কথা হয় নিবেদিতার। নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজির এই দুই গুরুভ্রাতার কী আলোচনা

হয়েছিল—তার বিস্তারিত কোনো বিবরণই কোথাও পাওয়া যায় না। নিবেদিতার সব জীবনীকারেরাই জানিয়েছেন, ওই বৈঠকে ব্রহ্মানন্দ এবং সারদানন্দ দুজনকেই নিবেদিতা জানিয়ে এসেছিলেন, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন। এরপরই ১৮ জুলাই ব্রহ্মানন্দকে চিঠি লিখে রামকৃষ্ণ সংঘের সঙ্গে সরকারিভাবে সম্পর্কচ্ছেদের কথা জানান নিবেদিতা। কিন্তু এরপরও রামকৃষ্ণ সংঘের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি; বরং তাঁর অনেক কর্মকাণ্ডেই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের পরোক্ষ সহযোগিতা ছিল। কাজেই, এরকম অনুমান করা যেতেই পারে যে, ব্রহ্মানন্দ এবং সারদানন্দের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে এই কৌশলগত পদক্ষেপের কথাই জানান নিবেদিতা। এবং দুপক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে কৌশলগত কারণেই নিবেদিতা প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেন, রামকৃষ্ণ সংঘের সঙ্গে তিনি আর জড়িত নন।

আর এরপরই শুরু হয় তাঁর জীবনের তৃতীয় এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি। বটবৃক্ষের মতো মাথার ওপর স্বামী বিবেকানন্দ তখন নেই। সম্পূর্ণ অজানা, বিপদসঙ্কুল একটি পথে তখন একা একাই যাত্রা করলেন নিবেদিতা। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'স্বামীজির অন্তর্ধানে নিবেদিতা দমে গেলেন না। যে বিরাট কাজের ভার নিয়েছিলেন, একটুও ইতস্তত না করে নির্ভয়ে সে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গুরু যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, এইবার তার সত্যকার মূল্য বোঝা গেল। নিবেদিতাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিলেন তিনি, তাঁকে গড়ে তুলেছিলেন কর্মযোগিনী করে। অটল বিশ্বাসের বর্মে আবৃত হয়ে তিনি যেন মুক্তিবাহিনীর একজন হতে পারেন, এই ছিল তাঁর আশা। যে অখণ্ডদৃষ্টিতে কর্তা কর্তৃত্ব আর কর্মে কোনো বিভেদ নাই, সেই দৃষ্টির অধিকার গুরু তাঁকে দিয়েছেন। যে মহাশক্তি একাধারে ইচ্ছা, ক্রিয়া আর জ্ঞানরূপিণী তাঁকে চিনতে শিখিয়ে গেছেন।...

'গুরুর মতবাদ আর আদর্শ বুকে নিয়ে নিবেদিতা কাজে নামলেন। কিন্তু তার পরিণাম সম্বন্ধে গুরুকে দায়ী করতে চাইলেন না। স্বামী বিবেকানন্দের নিজের দায় ছিল জনসেবা ও অধ্যাত্মসাধনার সমন্বয়ে একটা মঠ প্রতিষ্ঠা করা। নিবেদিতার দায় আলাদা ধরনের, তার আবার নানান দিক আছে। ভারতবর্ষের মেয়েদের জন্য কাজ করতে হবে, এই সঙ্কল্পকে সে-দায় বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। গুরু যে মহাভবিষ্যের স্বপ্ন দেখতেন, নিবেদিতাকে তা জীবনে মূর্ত করে তুলতে হবে। এমন এক ভারতবর্ষ গড়তে হবে, যে ভারতে মেয়েরা তো বটেই, অন্ত্যজ-মূর্খ-গরীব-অজ্ঞ-মুচি-মেথর সকলেই দেশ-মাতৃকার সন্তান বলে তাঁর বুকের রক্ত বলে গণ্য হবে।'

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'অন্তর্দ্বন্দ্ব সমানেই চলিতেছিল। স্বামীজির অভিপ্রেত কর্ম নারীজাতির শিক্ষাব্যবস্থা; কেবল সেই কর্মে পূর্বের মতো উৎসাহ

নাই, আবার সে কর্ম একেবারে ত্যাগ করিতেও মন চায় না। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সম্পর্ক রহিত হওয়ায় অন্য পরিকল্পনা বিধবা আশ্রম বা অনাথ আশ্রম স্থাপনের— আর সম্ভাবনা রহিল না। তাঁহার মনে হইত, প্রাচ্য নারীর জীবনের গতি যে পথে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার কোনোপ্রকার পরিবর্তন করিবার কি অধিকার তাঁহার আছে? দশ-বারোটি মেয়ের মধ্যে শিক্ষা এবং আদর্শ প্রচারে লাভ কী? বরং পুরুষদের মতো মেয়েদের মধ্যেও যদি জাতীয় চেতনা সঞ্চার করিয়া তাহাদের বৃহত্তর সমস্যা ও দায়িত্বের প্রতি তাহাদিগকে অবহিত করা যায়, তবে বহুগুণ বেশি কার্য হইবে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিলে তাহার নিজেরাই বুঝিতে পারিবে কী তাহাদের প্রয়োজন।'

স্বামীজির প্রয়াণের পর, ১৯০২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখলেন, 'Everyday that passes shows me more plainly that I have indeed undertaken my Father's own work. Pray that I be true to it.

এর আগে আগস্ট মাসের ২৮ তারিখ নেল আর এরিক হ্যামন্ডকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'Pray that I may have strength and faithfulness and knowledge, to do this and ask no other blessing for me. I want no other. He is NOT dead— dear Nell. He is with us always. I can not even grieve. I only want to work.'

আর স্বামীজির প্রয়াণের কিছুদিন পরই, ১৯০২-এর ৭ জুলাই সিস্টার ক্রিস্টিনকে লিখেছিলেন, 'Let us be one soul. Do you gather the strength so, for us all. I want every moment to be the realization of his will. Regardless of Mukti, regardless of karma, regardless of anything, to carry out his will, flawless, entire, as he would have loved to carry it, had he been here. I came to India for that 4 years ago—that he might feel free to die. Only that—and the moment is here.'

নিবেদিতার এই চিঠিগুলি পড়লে একটি কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অজানা পথে পা বাড়িয়েছিলেন নিবেদিতা। কিন্তু সে পথেও স্বামীজিই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। নিবেদিতা মনে করতেন, যে অজানা, বিপদসঙ্কুল পথটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন সেটি স্বামীজি নির্দেশিত পথ। অর্থাৎ ভারতের মুক্তি আন্দোলনে নিজেকে জড়িত করার ভিতর কোনো অন্যায় বা স্বামীজির লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি

মনে করতেন না নিবেদিতা। বরং, এই মুক্তি আন্দোলনের ভিতর দিয়েই ভারতবাসীকে সেবা করার পথটি খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি।

বিশিষ্ট গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু অভিযোগ করেছেন, নিবেদিতার জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বের, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ণ এদেশের ঐতিহাসিকরা করেননি। শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, 'জাতীয় আন্দোলনে, বিশেষতঃ তার বৈপ্লবিক অংশে নিবেদিতার ভূমিকার প্রসঙ্গটাই সর্বাধিক বিতর্কের বিষয়। আমরা এক্ষেত্রে যেমন সহজ বিশ্বাসের সমর্থন দেখি, যা নিবেদিতার এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অবিতর্কে মেনে নিয়েছে। তেমনি অপরপক্ষে ত্রস্ত চমকের সঙ্গে লক্ষ্য করি, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মনে নিবেদিতার সম্বন্ধে যেটুকু আগ্রহ ছিল তার বড় অংশ ব্যয়িত হয়েছে তাঁর গুরুত্ব স্বীকারে নয়— গুরুত্বদানে ইচ্ছুক লেখকদের বক্তব্য খণ্ডনে!! নিবেদিতার দুর্ভাগ্য, এক্ষেত্রে তিনি 'সুবিবেচক' ঐতিহাসিকদের কাছ থেকেও সুবিচার পাননি। সুবিবেচক ঐতিহাসিক বলতে আমরা তাঁদের বুঝি যাঁরা বাংলার স্বদেশী আন্দোলন এবং ভারতের উনিশ শতকীয় ব্যাপারাদির মধ্যে গৌরবজনক বস্তুর সন্ধান পেলে তাকে বিশ্বাস করেছেন; যেমন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রী নিশীথরঞ্জন রায়, ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী, ডঃ নিমাইসাধন বসু প্রমুখেরা। অন্যদিকে আছেন কিছু ইতিহাস লেখক যাঁরা ঐসব আন্দোলন বা জাগরণাদি নিতান্ত হিন্দু ব্যাপার, সুতরাং তুচ্ছ— এই থিয়োরীর পক্ষে তথ্যসংগ্রহে উৎসাহ দেখিয়েছেন।' শঙ্করীপ্রসাদবাবুর এই অভিযোগ একেবারে অমূলক বা ভ্রান্ত বলা যাবে না। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে নিবেদিতার যে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল— তা তিনি পাননি, একথা স্বীকার করতেই হবে। আর এক্ষেত্রে এদেশের ঐতিহাসিকদের একটি দায় রয়ে গিয়েছে। সে দায় তাঁরা এড়াতে পারেন না। আবার এরই পাশাপাশি নিবেদিতার দুই জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা এবং প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণাও জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকার ওপর যথোচিত আলোকপাত করেননি। এক্ষেত্রে এই দুই জীবনীকার এবং ইতিহাস রচয়িতারা হয়তো প্রামাণিক তথ্য না পাওয়ার যুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটি বিষয় সবিশেষ মনে রাখতে হবে, তা হল— ব্রিটিশ পুলিশের নজর যে তাঁর ওপর রয়েছে, এবং যে কোনো সময় তিনি যে গ্রেপ্তার হতে পারেন— সে সম্পর্কে নিবেদিতা বরাবরই সতর্ক ছিলেন। তদুপরি, এদেশে আসার আগে আইরিশ বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে নিবেদিতা জানতেন অনেক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই গোপন রাখতে হয়। এটুকু অনুমান করাই যায় যে, নিবেদিতা তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত অনেক নথিপত্র ইচ্ছে করেই নষ্ট করে ফেলেছিলেন।

কঠোর মন্ত্রগুপ্তির শপথ রক্ষা করে চলতে জানতেন নিবেদিতা। তদুপরি, তিনি তাঁর গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বাগাড়ম্বর পছন্দ করতেন না। এবং একজন বিদেশিনী হিসাবে তিনি কখনোই এদেশের মুক্তি আন্দোলনে নিজেকে শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেননি। নিবেদিতার জীবনের এই পর্বটি ভালোভাবে পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে। ইতিহাস রচয়িতারা এই পর্যালোচনাটি করতে চাননি বলেই হয়তো জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকার মূল্যায়ণটিও তাঁরা যথাযথভাবে করে উঠতে পারেননি।

নিবেদিতার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য নথিপত্র অনেক কিছু পাওয়া না গেলেও, এক্ষেত্রে নিবেদিতার ফরাসি জীবনীকার লিজেল রেমঁর একটি চিঠি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেমঁ এই চিঠিটি লিখেছিলেন শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, রেমঁ নিবেদিতার এই জীবনীটি লিখেছিলেন নিবেদিতারই ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ড নিবেদিতার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের খুঁটিনাটি জানতেন। রেমঁর এই চিঠির অংশবিশেষ তুলে দেওয়া যাক। রেমঁ লিখেছেন, '১৯৩৭ সালে আমি মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে ইংলন্ডে তাঁর স্টাটফোর্ড অন অ্যাভনের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। জ্যা এ্বরঁও সঙ্গে ছিলেন। মিস ম্যাকলাউড ডেস্ক খুলে তাঁর ড্রয়ার ভর্তি নিবেদিতার চিঠি আমাদের দেখালেন। তাদের মধ্যে কতগুলি দারুণ আগ্নেয়—বিপ্লবীদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের যোগের সংবাদ সেগুলিতে ছিল। মিস ম্যাকলাউড সেগুলিকে নষ্ট করে ফেলেছিলেন। তিনি বললেন ঃ নিবেদিতা এইসব কাজ স্বামীজির নির্দেশে গ্রহণ করেছিলেন—ভারতে নিবেদিতার সঙ্গে অন্যান্যদের এই বিষয়ক যোগাযোগ স্বয়ং স্বামীজিই করে দিয়েছিলেন। তিনি নিবেদিতাকে নিজের রাজনৈতিক কর্ম সমাধা করার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, নিবেদিতা এই কাজ করতে সমর্থ। লন্ডনে যে সব বস্তিতে নিবেদিতার কর্মক্ষেত্র ছিল, সেসব জায়গায় স্বামীজি নিবেদিতার সঙ্গে গিয়েছিলেন। (শেষোক্ত সংবাদ মিসেস উইলসন ও মিঃ স্টার্ডির সূত্রে প্রাপ্ত)।

'আমাদের কাছে নিবেদিতার বাল্য ও যৌবনের কথা, পরিবারের কথা, বিস্তারিত বলবার জন্য নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মিস ম্যাকলাউড। মিসেস উইলসন সাউথ আফ্রিকায় থাকতেন, ঘটনাক্রমে তখন তিনি ইংলন্ডে এসেছিলেন। আমি শুনেছিলাম— মিসেস উইলসনের কাছে নিবেদিতার ডায়েরির কপি আছে যাতে ভারতে নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যাবলীর খুঁটিনাটি বিবরণ রয়েছে। অন্য একটি কপি আছে বসু পরিবারের কাছে। তৃতীয়

কপিটি পুলিশ তাঁর বাড়ি তল্লাশি করার আগে (সম্ভবতঃ আলিপুর বোমার মামলার কালে) নষ্ট করে ফেলা হয়। আমি কিন্তু কখনোই নিবেদিতার ডায়েরি হাতে পাইনি। জানি না এখনো তাদের অস্তিত্ব আছে কিনা।'

ওই চিঠিতেই রেমঁ লিখছেন, 'ফরাসিতে আমার বই (নিবেদিতা জীবনী) প্রকাশিত হলে মিস ম্যাকলাউড এবং র‍্যাটক্লিফরা খুঁটিয়ে পড়েছিলেন। মিস ম্যাকলাউড বলেছিলেন, আরও অনেক কিছু বলা যেত—বিশেষতঃ ওকাকুরা যখন ভারতে রাজনৈতিক কার্যাবলীতে লিপ্ত ছিলেন, এবং নিবেদিতা যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও সাদারল্যাণ্ড ভ্রমণ করে, বিদেশে রাজদ্রোহকর কাগজপত্র ছাপিয়ে, ভারতে তাদের বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে মিস ম্যাকলাউড তাঁকে দিয়ে কয়েকস্থানে সভা করিয়েছিলেন। তাছাড়া নিবেদিতা রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনায়, এবং যুক্তরাষ্ট্রে ছাপা বৈপ্লবিক কাগজপত্র ভারতে প্রেরণে ব্যাপৃত ছিলেন। একাজে তিনি ভারতবর্ষ থেকে পলায়িত এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কিছু লোকের সাহায্য পেয়েছিলেন। মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে তিনি অর্থ সাহায্য পেয়েছেন (এ সংবাদ মিস ম্যাকলাউড দিয়েছেন)। একটি বিষয়ে মিস ম্যাকলাউড প্রতারিত হন। ঐসব তরুণদের কেউ কেউ, যারা সব সাহায্যই তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিল, যাতে তারা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরবর্তী নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে—যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসাপত্র করার কাজে লেগে পড়েছিল, পাশ্চাত্যের ভোগ সুখে ডুব দিয়েছিল—আর ভারতে ফেরেনি।

'র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার বিদ্যালয়টিকে সংবাদ চলাচলের কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করেছিলেন। সেখানে সিস্টার ক্রিস্টিন শিক্ষকের কাজ করছিলেন। মিস ম্যাকলাউড প্রচুর অর্থ পাঠাতেন।

'মিস ম্যাকলাউড বৈপ্লবিক কাজের জন্য নিবেদিতাকে অনেক অর্থ দিয়েছেন— এ ব্যাপারে ওকাকুরার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হত। এইকালে মিস ম্যাকলাউড যে কয়েকবার জাপানে গেছেন— তা অকারণে নয়।...

'১৯৩৮ সালে আমি জেনিভায় বন্দেমাতরম অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে ছদ্মনামা কয়েকজন ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। নিবেদিতা ওখানে গিয়েছিলেন। জেনিভা থেকে তাঁর লেখা একটি চিঠি আছে। ১৯৪৭ সালে অফিসটি বন্ধ হয়ে যায়।...

'মিস ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দের কিছু চিঠি দেখিয়ে আমাদের বলেছিলেন, 'এগুলি একেবারে আগুনে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কালে লেখা। স্বামীজি

অনেককিছুই করেছিলেন। চন্দননগরের মধ্য দিয়ে ভারতে অস্ত্র চালান হয়েছে। আমি সেগুলি কিনেছি। অস্ত্রসহ একটি নৌকা ধরা পড়ে, কিন্তু তার সূত্রে কাউকে ধরা যায়নি।'

'আমরা মিস ম্যাকলাউডকে ঐসব চিঠি নষ্ট করতে দেখেছি। তিনি বললেন, এসব অতীত ইতিহাস। সে যাই হোক, একদিন ভারত স্বাধীন হবে-- স্বামীজি খুশি হবেন।'

লিজেল রের্মঁ-এর এই চিঠিটিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতেই হবে। কেননা, এই চিঠিতে রের্মঁ যেসব তথ্য দিয়েছিলেন, তার সবটুকুই তিনি পেয়েছেন নিবেদিতার দুই ঘনিষ্ঠ সুহৃদ জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ ও নিবেদিতার বোন মেরি উইলসনের কাছ থেকে। এঁদের তিনজনের দেওয়া তথ্যকে গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করতে হবে। আর বিবেচনা করলেই এটাও অস্বীকার করা যাবে না, স্বামীজির প্রয়াণের পর ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার একটি বড় ভূমিকা ছিল। নিবেদিতার মতো গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত একজন ব্যক্তিত্ব তাঁর সব কর্মকাণ্ডের তথ্যপ্রমাণ হাট করে খুলে রাখবেন—এ আশা করা বাতুলতা– এটা যে কেন ইতিহাস রচয়িতারা বোঝেননি কে জানে? নাকি, নিবেদিতার গুরুত্ব হ্রাস করাটা একটা ইচ্ছাকৃত প্রয়াস ছিল, কে বলবে? গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, ' তবু যদি ঐতিহাসিকরা একটু মনোযোগী হয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতেন, অন্ততঃ তাঁরা স্যার রাসবিহারী ঘোষ, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, শ্রী অরবিন্দ, লালা লাজপত রাই, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সমকালীন তথ্যাভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উক্তি থেকে সূত্র গ্রহণ করে সন্ধান কাজ চালাতেন, তাহলে সত্য ইতিহাস কিছুটা উদ্ধার করতে পারতেন, যা অল্পবিস্তর করে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সৎ ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন।' রের্মঁ-র চিঠিটি গুরুত্ব-সহকারে বিবেচনা করলে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হবে যে, নিবেদিতার এই বিপ্লব প্রচেষ্টায় পরোক্ষভাবে আরো একজন জড়িয়ে পড়েছিলেন— তিনি জোসেফিন ম্যাকলিয়ড।

নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য তথ্য একেবারেই পাওয়া যায় না এ বক্তব্যও বোধহয় ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসুই ঠিক বলেছেন। সমসাময়িক বিপ্লবীদের নানা লেখা, চিঠিপত্রাদি এবং স্মৃতিকথা হাতড়ালেই এ প্রসঙ্গে প্রামাণ্য তথ্য মিলবে। এক্ষেত্রে ১৯২৯ সনে মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় হেমচন্দ্র কানুনগোর একটি লেখা উদ্ধৃত করছি। হেমচন্দ্র লিখেছেন, '১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে, বোধহয় জুন মাসে, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ভগিনী নিবেদিতা অ–বাবুর চেষ্টায়

মেদিনীপুরে এসেছিলেন। ...তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য মেদিনীপুর স্টেশনে সমিতির সভ্যগণ প্রায় সকলে ও অন্যান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। গাড়ি স্টেশনে থামলে তাঁকে দেখে অনেকে হিপ্-হিপ্-হুররে বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। এই না শুনে তিনি আঁতকে উঠলেন এবং হাত নেড়ে চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন। আমরা নিশ্চয় অবাক হয়েছিলাম। তখন তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, হিপ্-হিপ্-হুররে ইংরাজ জাতির জাতীয় উল্লাসধ্বনি, ভারতবাসীর উল্লাসধ্বনি ইহা হওয়া উচিত নহে। তখনো 'বন্দেমাতরম্' ব্যবহার হয়নি। যখন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, আমাদের তেমন কিছুই নাই, তখন তিনি নিজের হাত তুলে উচ্চস্বরে তিনবার বলেছিলেন—'ওয়া গুরুজী কি ফতে, বোল্ বাবুজী কা খালসা।' আমরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। ...একজন ও হেন ইংরাজ মহিলাকে, আমরা এই ইংরাজ তাড়াবার ব্যাপারে সহায় পেলাম মনে করে, অন্ততঃ আমাদের মিইয়ে যাওয়া উদ্যম ও আগ্রহ আবার তাজা হয়ে উঠল।...

'তিনি এখানে পাঁচদিন ছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ধর্মের মধ্য দিয়ে রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন; সকালে সে সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রথম দিনের বক্তৃতায় অনেক লোক এসেছিল, বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্বে অনেকে সরে পড়েছিল। সেজন্য স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত একজন উচ্চকর্মচারী তাঁকে বলেছিলেন—'আপনার বক্তৃতায় রাজনীতির তীব্রতা বেশি ছিল বলে অনেকে সরে পড়েছিলেন। পরের বক্তৃতায় হয়তো লোক হবে না।' ইহার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ' আপনি আমায় ভয় দেখাবেন না। আমার শিরাতে স্বাধীন জাতির রক্ত এখনো প্রবাহিত। যারা ভয় পায়, আমার বক্তৃতা তাদের জন্য নহে।'...তাঁকে দিয়েই আমাদের আখড়ার উদ্বোধন কার্য সমাধা হয়েছিল। তাতে তিনি যেরূপ আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিলেন, তা মনে হলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় প্রাণ উথলে ওঠে।... আমাদের গুপ্ত সমিতির সভ্য ছাড়া আখড়ার পৃষ্ঠপোষক ও অন্য লোক এই উদ্বোধনের ব্যাপারের গূঢ় রহস্য জানতেন না। তাঁরা ভগিনীর ভাব দেখে নিশ্চয় অবাক হয়েছিলেন।...ভগিনী নিজে তলোয়ার খেলে, মুগুর ভেঁজে, লাঠি ঘুরিয়ে ও অন্যান্য কসরত করে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে দিয়েছিলেন।

'আর একদিন তিনি স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রমহিলাদের সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দু'একজন স্ত্রীলোককে বন্দুক ছুঁড়তেও শিখিয়েছিলেন।'

নিবেদিতার জেলায় জেলায় এই ঘুরে বেড়ানো এবং তরুণদের সামনে বক্তৃতা দেওয়ারও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। জেলায় জেলায় ঘুরে তরুণদের সংগঠিত করে বিপ্লবী সমিতিতে যোগ দেওয়ানোর একটি প্রচেষ্টা করেছিলেন নিবেদিতা।

নিবেদিতার একটি চিঠিতেই তার আভাস পাওয়া যায়। ১৯০৬ সালের ২ মে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন নিবেদিতা, 'I had a telegram of 15 words from S. Sara yesterday, commanding me to leave for Europe at once. But I cannot, dear yum. Nor do I need it. I am here these 3 weeks recruiting and in a few days I hope to begin work. That ought to last 6 or 7 weeks on end to be renewed again, either immediately or on reaching Calculta.'

১৯০৩ সালে নিবেদিতার মেদিনীপুর সফরের যে কথা হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছিলেন, তার সমর্থন পাওয়া যায় নিবেদিতার চিঠিতেও। ১৯০৩ সালের ২০ মে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'I think my work in Midnapore was of some use. I spoke 12 or 13 times in 5 days. When one can do this sort of thing, it is generally of some value, I think, however little. But oh Yum dear, from having so much confidence in myself— you do not know how little I have now! I am told that the boys find it so difficult to understand my lectures. They pass over their heads. I try to use all instruments, but I see very plainly that I cannot come directly in contact with the people. I have to find channels— to speak through other — and the ideas become modified. I thought to turn the world upside down, so strong was the life that I felt within me, and I am crying to the winds, and only the winds take up and echo my cry— ah Swamiji!—and you had such a trust in me!'

নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়ে জানা যাচ্ছে, যে কাজের জন্য তিনি মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন তা 'আংশিক সফল' হয়েছে বলেই তিনি মনে করেছিলেন। হেমচন্দ্র কানুনগোর লেখা এবং নিবেদিতার চিঠি পাশাপাশি রাখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়েই নিবেদিতা মেদিনীপুর গিয়েছিলেন, এবং সেই কর্মসূচি কিছুটা হলেও সফল করে তুলতে পেরেছিলেন।

নিবেদিতার সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগ এবং তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আরো কিছু প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় অরবিন্দ ঘোষ এবং সমসাময়িক কয়েকজন বিপ্লবীর লেখাপত্রে। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ হয় বরোদায়। ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে বরোদায় অরবিন্দ-নিবেদিতার সাক্ষাৎকার হয়।

অরবিন্দ লিখেছেন, 'ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় বরোদায়, যখন তিনি সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে, ও তারপর তাঁর বাসস্থানরূপে নির্ধারিত বাড়িতে তাঁকে পৌঁছে দেবার জন্য স্টেশনে গিয়েছিলাম। বরোদার মহারাজার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চেয়েছিলেন।...

'... ঐ কালে আমি তাঁর 'কালী দি মাদার' গ্রন্থ পড়ে মোহিত। আমার মনে হয় বইটির বিষয়ে আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম। তিনি বলেন, তিনি শুনেছেন যে আমি শক্তি-উপাসক। তার দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছিলেন, আমি তাঁরই মতো গুপ্ত বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত। বরোদার মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি তাকে গুপ্ত বিপ্লবে সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন— সেই সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি মহারাজাকে বলেন, তিনি আমার মারফত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। সয়াজীরাও যথেষ্টই চতুর ছিলেন, এইরকম মারাত্মক কাজে ঝাঁপ দেবার পাত্র ছিলেন না, তিনি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কোনো কথাই বলেননি।'

অরবিন্দ ঘোষের লেখা পড়লেই বোঝা যায়, বরোদায় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে নিবেদিতা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও ছিল। (ওকাকুরা কাকুজো এবং নিবেদিতার বৈপ্লবিক প্রয়াস নিয়ে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে)। তবে বরোদায় মহারাজার সঙ্গে নিবেদিতার যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা চালাচালি হয়েছিল, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার লেখায়। নিবেদিতার ডায়েরির উল্লেখ করে আত্মপ্রাণা লিখেছেন, বরোদার রাজার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর ১৯০২-এর ২৩ অক্টোবর বরোদার মহারাজা একটি চিঠি পাঠান নিবেদিতাকে। এই চিঠিটি পড়ে নিবেদিতা হতাশ হন। পরদিন তিনি আবার দেখা করেন বরোদার মহারাজের সঙ্গে। বরোদার মহারাজা চিঠিতে কী লিখেছিলেন, বা এ সম্পর্কে নিবেদিতার ডায়েরিতে আর বিশদ কিছু লেখা ছিল কিনা– তা অবশ্য প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা উল্লেখ করেননি। তবে, অরবিন্দের লেখা এবং নিবেদিতার ডায়েরির প্রসঙ্গটি আলোচনা করলে এমনটি মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বরোদার মহারাজাকে নিবেদিতা গুপ্ত বিপ্লবে সহায়তা করার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন—তা মিথ্যা নয়। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'অরবিন্দ যে ইতিপূর্বে বাংলাদেশে আসিয়া গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বের উদ্বোধন করিয়াছেন, সে কথা নিশ্চয়ই তিনি নিবেদিতাকে বলিয়াছেন। কেননা, কলিকাতায় ফিরিয়া নিবেদিতা অরবিন্দ প্রবর্তিত গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বারীন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন,—"বরোদায় অরবিন্দর সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর হইতেই নিবেদিতা আমাদের কলিকাতার গুপ্ত সমিতির দলে আসিয়া

যোগ দিয়াছিলেন"।' ঘটনা পরম্পরা বিচার করলে কিন্তু গিরিজাশঙ্করের এই ব্যাখ্যাকেও ভুল মনে হবে না।

নিবেদিতা সম্পর্কে অরবিন্দ আরো লিখেছেন— 'বিপ্লবী নেতাদের তিনি ছিলেন অন্যতম। লোকের সংস্পর্শে আসবার জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। খোলাখুলি সরল প্রকৃতির মানুষ; বিপ্লবের কথা সকলকে বলতেন, কোনো ঢাকাঢুকি ছিল না তার মাঝে। যখন বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মাই–তাঁর খাঁটি স্বরূপ–বেরিয়ে আসত। তাঁর পুরো মন ও প্রাণ ভাষায় ব্যক্ত হত। যোগ করতেন বটে, কিন্তু তার আসল কাজ যেন এটা। একেই বলে আগুন। তাঁর বই, 'কালী দি মাদার' উদ্দীপনাপূর্ণ বই, তেমনি বিদ্রোহমূলক, অহিংস নয়। রাজপুতানায় ঠাকুরদের কাছে গিয়ে বিদ্রোহ প্রচার করতেন।'

অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ নিবেদিতা সম্পর্কে বলেছেন, 'ভগিনী নিবেদিতা চরমপন্থী নেতারূপে শ্রীঅরবিন্দের অগ্রগামী।' বারীন্দ্রকুমার ঘোষের স্মৃতিচারণায়, '১৯০১ সালে (এটি ১৯০২ সাল হবে) আমরা যখন বাংলায় বিপ্লব কর্মের প্রথম পর্বের সূচনার জন্য বরোদায় প্রস্তুত হচ্ছি–তখন নিবেদিতা মহারাজার দ্বারা নিমন্ত্রিতা হয়ে সেখানে যান। বিপ্লবী অরবিন্দর সঙ্গে এই তেজস্বিনী অগ্নিমুখী নারীর যোগাযোগ হল ১৯০১ (১৯০২ হবে) থেকে; তাঁর [নিবেদিতার] মৃত্যু অবধি তা অবিচ্ছিন্ন ছিল। তাঁর অনুরোধেই ধর্ম ও কর্মযোগিনের কাজ অসমাপ্ত রেখে অরবিন্দ গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য চন্দননগরের পথে পণ্ডিচেরী গিয়েছিলেন। নিবেদিতা বাংলার গুপ্তচক্রের সঙ্গে ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একাধিকবার তাঁর কাছে গুপ্তচক্রের কাজে গিয়ে বাগবাজারের স্কুল বাড়িতে দেখা করেছি।'

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন, 'নিবেদিতার প্রদত্ত লাইব্রেরিই ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডের চক্রের ছিল প্রাণ ও প্রেরণার উৎসমূল। তাঁর সঙ্গে যতীনদার (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) কথাই ছিল, এই বইগুলি অবলম্বনে সেখানে রাজনীতি শেখাবার ও কর্মী গড়বার স্কুল করতে হবে। সেই স্কুলে বা স্টাডি সার্কেলে বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস, জীবনী, অর্থনীতি, ধর্ম, সমাজ ও জাতির উত্থান-পতনের নিগূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ও শিক্ষা দেওয়া হবে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রচারক হয়ে ভারতের নবজাগরণের চারণ হয়ে নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে বিপ্লবের বীজ বপন করে দেশকে অসংখ্য বিপ্লবী কেন্দ্রে ছেয়ে ফেলবে।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আরো লিখেছেন, 'নিবেদিতা আমার বাংলায় আসার আগেই ১০৮ সার্কুলার রোডের গুপ্ত কেন্দ্রকে তাঁর পুস্তকাগার দিয়ে ফেলেছিলেন। আমিই হলাম সার্কুলার রোডের এই রাজনীতির স্কুলের প্রথম ছাত্র। তারপর ক্রমে

জুটল এসে দেবব্রত বসু, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ইন্দ্রনাথ নন্দী— এই ধরনের অনেক ভাবোন্মাদ মানুষ। ...আমাদের দলে বহু শিক্ষিত লোক ছিলেন বলে— অরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি চিন্তাশীল দেশব্রতীর নির্দেশ ও গভীর চিন্তা আমাদের পিছনে থাকায় — আমাদেরই মধ্যে বাংলায় প্রথম একটি সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী পরিকল্পনা ধরে চলবার অনুপ্রেরণা জেগেছিল।'

গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বারীন্দ্রকুমার ঘোষের লেখা একটি নোটের উল্লেখ করেছেন। ওই নোটে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন, '১৯০২-এর আগস্ট থেকে ১৯০৬ আগস্ট–এই পুরো চার বৎসর ভগিনী নিবেদিতা বাংলা ও ভারতে কাজ করেছেন— বক্তৃতা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, রচনা এবং নানাবিধ কার্যাবলীর দ্বারা তরুণদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করেছেন। বৈপ্লবিক ভারতের যথার্থ নেতা শ্রীঅরবিন্দ চিত্রে আবির্ভূত হবার পূর্বে এই সকল ঘটেছে। এমনকি ১৯০২-এর আগেই তিনি তরুণ ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদারের মারফৎ পি মিত্র ও সি.আর.দাশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এই সময়ে ওকাকুরা ভারতে আসেন— তিনি ভারতীয় বিপ্লবের তরুণ প্রবর্তকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সিস্টার নিবেদিতা এই দলেরই ছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে —যিনি পরে বারীন্দ্রের দলের অন্যতম নেতা হয়ে ওঠেন— বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের দ্বারা সম্পাদিত 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকা ১৯০১-এর ডিসেম্বরের কিছু আগে বেরোয়, ১৯০৭ পর্যন্ত চলে– নিবেদিতা সে পত্রিকায় প্রায়ই লিখেছেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবর্তিত ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা জাতীয় শিক্ষা, বিপ্লব ও অনুরূপ বিষয়ে বক্তৃতাদি করেছেন।' অর্থাৎ, এদেশের মুক্তিসংগ্রামে, বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে নিবেদিতার সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার প্রমাণের যে কোনো অভাব নেই— তা এইসব লেখাগুলি থেকে বোঝাই যাচ্ছে। তবু কেন যে ইতিহাস রচয়িতারা নিবেদিতার ভূমিকাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে পারলেন না, বা চাইলেন না— তা কিন্তু রহস্যই থেকে গিয়েছে।

ইউরোপ এবং আমেরিকা পরিভ্রমণ সেরে ১৯০২ সালে নিবেদিতা কলকাতায় এসে পৌঁছনোর পর তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পূর্ণোদ্যমে শুরু হয় ওকাকুরার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকে। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে ওকাকুরা কলকাতা এসে পৌঁছন ১৯০২-এর ৬ জানুয়ারি। নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে আসেন ওই বছরই ৩ ফেব্রুয়ারি। ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয় ১৯০২-এর এপ্রিল মাসে। ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা বজায় ছিল ওই বছরের অক্টোবর অবধি। তারপর ওকাকুরা জাপানে ফিরে যান। নিবেদিতারও ওকাকুরা সম্পর্কে

মোহভঙ্গ হয়। ওকাকুরার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কেই নিবেদিতা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন। ওকাকুরা সম্পর্কে এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তিনি যে, ওকাকুরার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতেই তিনি নারাজ ছিলেন। নিবেদিতা-ওকাকুরার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বিচ্ছেদ নিয়ে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

তবে, নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা বলতে গেলে একথাও সংক্ষেপে হলেও উল্লেখ করতে হবে যে, ওকাকুরা সম্পর্কে তাঁর মোহমুক্তি ঘটার পর এদেশে ওকাকুরার অনুগামী গোষ্ঠীর প্রতিও বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতার সেই সময়কার চিঠিপত্র পড়লে এমন একটি ধারণা হয় যে, ওকাকুরার বিপ্লব প্রচেষ্টাটি শেষ পর্যন্ত নিবেদিতার কাছে ভ্রান্ত এবং অসার মনে হয়েছিল। ১৯০২ সালের ১৯ নভেম্বর ওকাকুরা জাপানে ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পরেই জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'My share of India is so vast. I do not believe that I am to be crowded into a few months at all, as the spell of dear Nigu (Okakura) awhile ago almost made me fancy. And I do not feel any real necessity to go outside this country. Let that come as it may, whatever calls. I shall hope to be ready, with my 'Here am I! Send me!'

ওকাকুরার কর্মকাণ্ডকে ভ্রান্ত এবং অসার বলে মনে হওয়ার পাশাপাশি স্বামীজির প্রয়াণের পর সেই আচার্যের প্রভাবই যে আরো ব্যাপকভাবে নিবেদিতার জীবনে ফিরে এসেছিল, তারও প্রমাণ আছে এই চিঠিতে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'I find myself so often so often, sitting by the fire in your hall, as the shadows fall and fall—while he talks on and on, and afternoon grows to evening.

'Everything seems a failure— save that great Life and its completeness of Victory.'

ওকাকুরার কর্মকাণ্ডের অসারত্ব অরবিন্দ ঘোষও উপলব্ধি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দের কিছু কথাবার্তার উল্লেখ করা যায়। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুও অরবিন্দের এই কথাগুলির উল্লেখ করেছেন। 'শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা' গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে অরবিন্দ বলেছেন, 'আমি সে দলের (গুপ্ত সমিতি) প্রতিষ্ঠাতাও নই, নেতাও নই। পি. মিত্র এবং মিস ঘোষাল (সরলা ঘোষাল) ব্যারণ ওকাকুরার মন্ত্রণায় ও প্রেরণায় তা আরম্ভ করে। আমি বাংলায় গিয়ে তাদের এই কাজ সম্বন্ধে জানতে

পাই। তখন থেকে আমি শুধু খবর রাখতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, সমস্ত ভারতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা। আর এরা যা করত তা নিতান্ত ছেলেমানুষি, যেমন ম্যাজিস্ট্রেটকে মারধর করা। পরে ব্যাপারটা ডাকাতি, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদির দিকে মোড় নেয়। ওগুলো মোটেই আমার মতানুযায়ী নয়, উদ্দেশ্যও ছিল না।' দেখা যাচ্ছে, ওকাকুরা এবং তাঁর গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডকে অরবিন্দও বৈপ্লবিক বলতে রাজি ছিলেন না। তাঁদের কর্মকাণ্ড অরবিন্দর কাছেও নিতান্তই 'ছেলেমানুষি' বলে মনে হয়েছিল।

স্বামীজির প্রয়াণের পর নিবেদিতা ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। বক্তৃতা দেন, জনসংযোগ গড়ে তোলেন। এটা করতে গিয়ে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে ভারতীয় জনগণের মনোভাব, ভারতীয়দের আবেগ— এগুলি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এই উপলব্ধি থেকেই নিবেদিতা ওকাকুরা এবং ওকাকুরার অনুগামীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অপরিণতমনস্কতা বুঝতে পারেন। ওকাকুরার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠার পাশাপাশি তিনি ওকাকুরার অনুগত বালিগঞ্জের ঠাকুর পরিবারের গোষ্ঠী (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা ঘোষাল প্রমুখ) সম্পর্কেও বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁদের সম্পর্কে তাঁর আশাভঙ্গ হয়। নিবেদিতার মনে হয়, এঁরা মুখে বড় বড় কথা বলেন বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পিছু হটেন। ১৯০৩-এর ২৮ জানুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে এই বালিগঞ্জ গোষ্ঠী সম্পর্কে তিনি লেখেন, 'At the some time— do nothing that could again renew for me any possible link with Ballygunge. That connection is hopeless—hopeless and useless.'

বালিগঞ্জ গোষ্ঠী সম্পর্কে নিবেদিতার যে কতখানি মোহভঙ্গ হয়েছিল–তা এই কটি পংক্তি পড়লেই বোঝা যায়। এর আগে, ১৯০২ সালের ২১ ডিসেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'To tell you the truth, I am disillusioned about the whole Ballygunge connection. Sarola is not installed as Vicegerent of the Mother. She writes to me and calls on Dr. Bose, to organise us, in her army. Her paper is said to be doing great service, preaching Kali-worship and the rest. Meanwhile I find not one soul amongst them to risk his own valuable neck. And the more the talkee-talkee proceeds at a scream, the more quiet do I find myself becoming. I fear Nigu's (Okakura) time has been wasted. On the other hand, this has a certain usefulness, if it is possible to glean strength from words and

emotions behind which there is no power to do. But it is odd to see how my anxiety to keep my boys from touch sight or taste of the group explain to me all Swamiji's irritability about my own connection.'

বোঝাই যাচ্ছে, নিবেদিতা তাঁর গোষ্ঠীর ছেলেদের বালিগঞ্জ গোষ্ঠী থেকে দূরে রাখতেও চেয়েছিলেন।

একসময়ে অতি পছন্দের পাত্রী সরলা ঘোষাল সম্পর্কেও নিবেদিতার বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ার কারণ ছিল। প্রথমত, সরলা ঘোষালের কাজকর্মকে নিতান্তই 'বাগাড়ম্বর' বলে মনে হয়েছিল নিবেদিতার। ওকাকুরা ভারত থেকে জাপানে ফিরে যাওয়ার পরে সরলা তথাকথিত বিপ্লবী গোষ্ঠী থেকে পিঠটান দেন। সরলার এই আচরণ মোটেই ভালোভাবে নেননি নিবেদিতা। সরলা সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা ২৮ জানুয়ারির চিঠিতে নিবেদিতা ব্যক্ত করেছিলেন। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, 'বরোদা থেকে আগত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরীরচর্চা, ড্রিল, অশ্বারোহণ ইত্যাদিতে উৎসাহ দেবার ব্যাপারে মতৈক্য থাকলেও যুবকদের শরীরচর্চার উৎসাহ যখন রাজশক্তির অঙ্গস্পর্শ করতে অগ্রসর হল, তখন তিনি মনে 'পিছু হটো' ধ্বনি শুনলেন। এবং সন্ত্রাসবাদী অপকর্মগুলির জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে নিবেদিতাকেও দায়ী করলেন।'

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী সরলা ঘোষালের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তাঁর লেখায় লিখেছেন, 'নিবেদিতা যে সময় (১৯০২ অক্টোবর) বরোদায় গিয়া অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং গুপ্ত সমিতিতে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন, ঠিক সেই সময় সরলা দেবী পুণা শহরে গিয়া লোকমান্য তিলকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিলক বলিলেন যে, এরকম ডাকাতিতে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত বা সফল হইবে না। সুতরাং ইহা নিরর্থক। তবে প্রকাশ্যে তিনি ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন না বা লিখিবেন না।' তবে, গিরিজাশঙ্করকে বলা সরলা ঘোষালের এই কথার যৌক্তিকতা নিয়ে অবশ্য সংশয় থেকে যায়। অরবিন্দ ঘোষ স্বদেশি ডাকাতি এবং রাজকর্মচারীদের মারধরের পরিকল্পনা শুরু করার দায় পি. মিত্র, ওকাকুরা এবং সরলা ঘোষালের মতো ওকাকুরা ঘনিষ্ঠদের ওপর চাপিয়েছিলেন। হতে পারে তাতে নিবেদিতারও সমর্থন ছিল। কিন্তু সরলা যেভাবে এর দায় অস্বীকার করতে চেয়েছেন তা হয়তো ঠিক নয়। কারণ, গিরিজাশঙ্করকে বলা কথা অনুযায়ী ১৯০২-এর অক্টোবরে সরলা যখন পুণে যান এবং লোকমান্য তিলকের সঙ্গে দেখা করেন, তখন ওকাকুরা ভারতে অবস্থান করছিলেন। এবং তখন সরলা ওকাকুরার গোষ্ঠীতে

যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। সরলা ঘোষালের এই পশ্চাদ্‌পদ মানসিকতা গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীও লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি লিখেছেন—'যতীন্দ্র ব্যানার্জী অরবিন্দের গুপ্ত সমিতিও পরিচালনা করিতেছেন, আবার সরলা দেবীর লাঠি খেলার দলেও কাজ করিতেছেন। অথচ সরলা দেবী গুপ্ত সমিতির বিরোধী। 'ইংরেজ ঘুষি দিলে আমরা দেশী কিল দিব'– 'ভারতী' পত্রিকায় ইহা লিখিলেন। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলেরা ডাকাতি করিবে, ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার মতে ডাকাতেরাই শুধু ডাকাতি করিবে।

'নিবেদিতা সরলাদেবীর লাঠি খেলার দলে যোগ দেন নাই। সরলা দেবী বিপ্লবী নহেন, নিবেদিতা বিপ্লবী। উভয়ের চরিত্রে এখানেই তফাৎ।'

মোট কথা, সরলা নিবেদিতার কাছে অবিশ্বাসের পাত্রী হিসাবে শেষপর্যন্ত প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। ওকাকুরার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়া এবং বরোদায় অরবিন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে নিবেদিতা ক্রমশ অরবিন্দের অনুগামী গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। অরবিন্দ-অনুগামী এই গোষ্ঠীর কাছেও কিন্তু সরলা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন না। বরং, এই গোষ্ঠী সরলাকে সন্দেহের চোখেই দেখত। তার কিছু কারণও ছিল। সরলা ঘোষাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, নিবেদিতার গোষ্ঠীতে যা কিছু পরামর্শ হত, তা যতীন্দ্র ব্যানার্জি সরলাকে জানিয়ে দিতেন। যতীন্দ্রনাথ প্রাথমিক পর্বে বাংলায় অরবিন্দ গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় থাকলেও পরে তাঁকে এই গোষ্ঠী থেকে বিতাড়ণ করা হয়েছিল বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে। যতীন্দ্রনাথকে বিতাড়ণ করা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, অরবিন্দ ঘোষ এবং তাঁর ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার কিছুটা অন্যায়ভাবেই যতীন্দ্রমোহনকে দল থেকে বিতাড়ণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বারীন্দ্রের অন্তর্দলীয় রাজনীতিকেই দায়ী করেন অনেকে। এ প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ ভিন্ন; এ প্রসঙ্গে এখানে ঢুকছিই না। এখানে এটুকুই শুধু বলার যে, হয়তো অরবিন্দ এবং বারীন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিবেদিতাও যতীন্দ্রমোহনকে 'চরবৃত্তি'র জন্য দায়ী করেছিলেন। ১৯০৮ সালের ১৫ অক্টোবর এস কে র‍্যাটক্লিফকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'The man Yotindra Mohan Banerjee who was captured at Burdwan and is now acquitted, has clearly in my opinion turned informer. Only Govt. will not again expose a man to the popular stigma of this port. The worst of it is that what Banerjee tells will probably be sheer invention —as he was regarded with a certain confidence some years ago, but not, so for as I should imagine, since 1904.'

এই যতীন্দ্রমোহন সরলা ঘোষালকে সংবাদ চালাচালি করেন এটি নিবেদিতা হয় জানতে বা অনুমান করতে পেরেছিলেন—এরকম আন্দাজ করাই যায়। আর নিবেদিতা তা যদি জানতে বা অনুমান করতে পেরে থাকেন—তাহলে সরলার ওপর তাঁর সমস্ত বিশ্বাসই যে নষ্ট হবে, তা বলাই বাহুল্য।

স্বামীজির প্রয়াণের পর নিবেদিতা বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিবেদিতার এই কাজের পেছনে কতগুলি উদ্দেশ্য ছিল। নিবেদিতা স্বামীজির ভাবধারা প্রচারের ভিতর দিয়ে দেশবাসীকে দেখাতে চাইছিলেন—স্বামীজির ভাবধারায় দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবোধ একাত্ম হয়ে রয়েছে। নিবেদিতা এটাও প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন—যে রাজনীতির পথ তিনি বেছে নিয়েছেন, তা আসলে স্বামীজি নির্দেশিত পথ। স্বামীজি ভারতের জনজাগরণের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকেই বাস্তবরূপ দিতে তিনি নেমেছেন। স্বামীজিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ হিসাবেই নিবেদিতা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আরও একটি উদ্দেশ্যও নিবেদিতার ছিল। তা হল, দেশব্যাপী এই বক্তৃতা সফর করে, তরুণ সম্প্রদায়কে স্বামীজির নামে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তি সংগ্রামে যুক্ত এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের সংগঠিত করে তোলা।

স্বামীজির মৃত্যুর পর ১৯০২-এর ১৯ জুলাই নিবেদিতা যশোর যান স্বামীজির স্মরণে ডাকা একটি সভায় ভাষণ দিতে। ২১ জুলাই তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়। ২৯ জুলাই ক্লাসিক থিয়েটারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বার্ষিক স্মৃতিসভায় বক্তৃতা দেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রমেশচন্দ্র দত্ত। এই বছরই আগস্ট মাসে নিবেদিতা বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ এই সময়ে তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নেন। নিবেদিতার অন্যতম জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'অসুস্থ অবস্থায় নিবেদিতা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিলেন, কী কঠোর জীবন তাঁহার সম্মুখে। বাড়িভাড়া, লোকজন রাখিবার খরচ, নিজের আহার এবং একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহ–সমস্তই আছে; নাই কেবল অর্থাগমের কোনো উপায়। তথাপি স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন মুহূর্তের জন্য তাঁহার মনে উদিত হইত না। এই কঠোর জীবনই তো তিনি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। 'The web of Indian life' পুস্তকখানি শীঘ্র শেষ করিয়া ছাপাইবার কথা বার বার মনে উঠিত, যদি উহা দ্বারা কিছু অর্থাগম হয়।

'সুস্থ হইয়া উঠিবামাত্র তিনি কার্য আরম্ভ করিলেন। 'আমার কাজ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা', দিবারাত্র ইহাই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র। এ কাজ স্বামীজির, সে সম্বন্ধে

তাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। স্বামীজির একটি কথা কেবল তাঁহার মনে জাগিত, 'আমার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্তও নয়, আমার উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনা।'

ওই বছর ২২ সেপ্টেম্বর থেকে নিবেদিতার ভ্রমণ এবং বক্তৃতাপর্ব শুরু হল। শুরু করলেন মুম্বই থেকে। নাগপুর হয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর মুম্বই পৌঁছলেন নিবেদিতা। সঙ্গে স্বামী সদানন্দ। মুম্বইয়ে তাঁর বক্তৃতার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন মি. পাদশাহ। কলকাতায় থাকতে, স্বামীজির জীবৎকালেই মি. পাদশাহের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন নিবেদিতা। ২৬,২৯ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ের গেটি থিয়েটারে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন নিবেদিতা। বক্তৃতার বিষয়বস্তুগুলি ছিল যথাক্রমে— 'স্বামী বিবেকানন্দ', 'এশিয়ার জীবন', 'আধুনিক বিজ্ঞানে হিন্দু মন'। বিবেকানন্দ সম্পর্কে নিবেদিতার বক্তব্য শ্রোতাদের ভিতর বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। বিবেকানন্দের স্বদেশ চেতনা সম্পর্কেও শ্রোতাদের ভিতর একটি সম্যক ধারণা সৃষ্টি করে দিতে পেরেছিলেন নিবেদিতা। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা লিখেছেন, নিবেদিতার তৃতীয় বক্তৃতাটি যুব এবং ছাত্রদের ভিতর উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। তৃতীয় সভাটির অধিকাংশ শ্রোতাই ছিল ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের। তারা নিবেদিতার বক্তৃতা বিপুল আগ্রহ নিয়ে শুনেছিল। নিবেদিতার এই বক্তৃতাগুলিতে দর্শন এবং অধ্যাত্মবাদ যেমন থাকত, তেমনি জাতীয়তাবাদ, সমাজচিন্তা–এইগুলিও স্থান পেয়েছিল। বলতে গেলে, এই বক্তৃতাগুলির ভিতর দিয়েই নিবেদিতা স্বামীজির স্বদেশচিন্তাকে যেমন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তেমনই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে সচেতন করে গড়ে তোলার প্রয়াস করেছিলেন। ছাত্র-যুবদের সংগঠিত করার একটি প্রচেষ্টাও ছিল। 'দ্য বম্বে গেজেট' এবং 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র মতো কাগজে নিবেদিতার এই বক্তৃতাগুলির সংবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। এরই ভিতর নিবেদিতা আরো একটি কাজও করেছিলেন। 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় স্বামীজি সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ তিনি লেখেন। এই প্রবন্ধে স্বামীজির জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে তুলে ধরেন তিনি। এই প্রবন্ধটি দারুণ উন্মাদনার সৃষ্টি করে যুবকদের ভিতর। বেশ কয়েকটি পত্রিকায় তার পুনর্মুদ্রণ হয়। এরই ফলস্বরূপ মুম্বইয়ে নিবেদিতার বক্তৃতাগুলি শুনতে শ্রোতাদের ভিড় হয়েছিল।

স্বামীজির জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ছড়িয়ে দেওয়া এবং স্বামীজির আদর্শকে সামনে রেখে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ছাত্র-যুব সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার যে উদ্দেশ্য নিয়ে নিবেদিতা এই বক্তৃতা সফর শুরু করেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হয়েছিল। নিবেদিতার সেই সময়ের চিঠিপত্র পড়লেই এই সাফল্যের ইঙ্গিত

পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে এও বোঝা যায়, নিবেদিতা সবটাই তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশিত কাজ বলে মনে করতেন। ১৯০৩ সালের ২৮ জুন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'Indeed, I am glad to work, as Swamiji worked, alone. He cried for men, dear Yum. But He did not know that untill the curtain had fallen, it would not be clear what was the idea for which he had lived. When that idea should stand revealed, men would flock round Him in millions. As Ramakrishna was unconscious— even so was He, who never dreamt that He was or could be unconscious.

'Men come of themselves, now. No one is necessary. He is the magnet— and that draws the steel dust of itself.'

১৯০৩ সালের ২০ মে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে তিনি লিখলেন, 'I would like to do a great service— or at best to make an utter sacrifice— to be a quite sure that one had given all. But how much sweeter death than failure.'

১৯০৬ সালের ১৬ জুলাই তিনি সারা বুলকে লিখলেন, '...I would like to feel that I had been His (Swamiji) right hand, so that He need have no anxiety— if He know all-about Christine or the Holy mother— or the work. I would like Him just to think: 'I left all that to Margot. She'll work it out someway'— and to be justified in the thought!'

স্বামীজির ভাবধারা, জাতীয়তাবাদী চিন্তা যে পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের ওপর প্রভাব ফেলেছিল এবং স্বামীজিকে যে তাঁরা অনেকেই পুরোধা পুরুষ হিসাবে স্বীকার করেছিলেন— তা বিপ্লবীদের জবানবন্দি, স্মৃতিচারণ, চিঠিপত্র থেকেই জানা যায়। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ নিয়ে কিছুটা আলোচনাও হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এটি স্বীকার করতেই হবে যে, মুক্তি সংগ্রামে স্বামীজির প্রভাব ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে নিবেদিতার অবদান অবশ্যই ছিল। বিপ্লবীদের উপর স্বামীজির প্রভাব যে বাড়ছে, তা নিবেদিতাও প্রত্যক্ষ করে গিয়েছিলেন। ১৯০৯ সালের ৫ আগস্ট জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন,'... All the great nationalists do it now— all recognise that the call came through Swamiji— and when I said the other day— 'Mother, the day foretold by S.R.K

[Sri Ramakrishna] when you would have too many children, is almost here—for the whole country us yours!' She said "I am seeing it—"

১৯০৯-এর ১ সেপ্টেম্বর সারা বুলকে লিখছেন, 'And everyone says now that the Swamiji was the source of the new idea and they came to touch the feet of the Holy Mother and Saradananda will not consent for any reason to turn one away! Isn't this wonderful?'

সারা বুলকে লেখা নিবেদিতার এই চিঠিতে একটি বিষয় সবিশেষ লক্ষণীয়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতো বিপ্লবীদের স্মৃতিচারণায় জানা যায়— বিপ্লবীদের অনেকেই সারদা মায়ের চরণস্পর্শ করতে আসতেন। নিবেদিতার চিঠিতে তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, এমন অনুমান করা কঠিন নয়। যেটা আশ্চর্যের তা হল, সারদা দেবীর বাড়িতে এই বিপ্লবীদের আনাগোনা রামকৃষ্ণ সংঘের পক্ষে ঝুঁকির কারণ হওয়া সত্ত্বেও, স্বামী সারদানন্দ কিন্তু তাঁদের বাধা দেবার চেষ্টা করেননি।

মুম্বইতে নিবেদিতার বক্তৃতাগুলি হিন্দু সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। ওই সময়ই, ১৯০২-এর ২ অক্টোবর, মুম্বইয়ের হিন্দু ইউনিয়ন ক্লাবের সদস্যরা নিবেদিতাকে একটি চায়ের আসরে আমন্ত্রণ করেন। এই চায়ের আসরের উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু মহিলারা যাতে নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে পান। নিবেদিতা মহিলাদের সামনে বক্তব্য রাখার এই সুযোগ নষ্ট করেননি। তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ২ অক্টোবরই হিন্দু লেডিজ সোশ্যাল ক্লাবের উদ্যোগেও তিনি একটি বক্তৃতা দেন। ৪ অক্টোবর গিরগাঁও অঞ্চলে বক্তৃতা দিতে যান। ৬ অক্টোবর মুম্বইয়ের গেটি থিয়েটারে 'ভারতীয় নারী' বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দেন। ওইদিন হিন্দু লেডিজ ক্লাব তাঁকে সংবর্ধিত করে। লেডিজ ক্লাবের পক্ষ থেকে নিবেদিতাকে ঋগ্বেদ এবং ১০৮টি রুদ্রাক্ষের মালা উপহার দেওয়া হয়। ৭ অক্টোবর নিবেদিতা মুম্বই থেকে কানপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মুম্বই থেকে ১ অক্টোবর তিনি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখছেন, 'I was precipitated upon the task somewhat more suddenly than we expected, as you see. Oh! it is good to hear the words you tell from Him! "India shall ring with her!" Is that the plan He is now beginning to fulfil? I begin now to understand a little of the development of His own mind regarding it.'

ওই চিঠিতে তাঁর বক্তৃতার সাফল্য বর্ণনা করতে গিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন, 'There has been an audience of 1000 at least, each time. Last night the lecture (to students) was packed — and they clapped every mention of His (Swamiji) name.'

ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা নিবেদিতার হৃদয়ে কী তীব্র হয়ে উঠেছিল, এই সময়ের চিঠিপত্রগুলি সে প্রমাণও দেয়। চিঠিপত্রগুলিই প্রমাণ দেয় ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে নিবেদিতার পূর্ণ সমর্থন এবং বিশ্বাস ছিল। ১৯০৩ সালের ২৮ জানুয়ারি অ্যালবার্টা এবং হোলিস্টারকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, 'When will the Motherland rise again— the Gita in one hand, and the sword in the other?'

১৯০৪ সালের ৪ আগস্ট জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখছেন, 'How long O Lord— how long? Oh if the Mother would give me "strength like Thunderbolt" and words with unspoken menace in them— and weight of utterance!'

আর ১৯০৩ সালের ২৬ মার্চ জোসেফিনকে লিখেছেন, 'Poor country! Bread-Bread-Bread-and via Gunpowder! But is not our Lord Shiva, the very Destroyer?'

আন্দাজ করাই যায়, এই ধরনের আগুন ঝরানো কথাবার্তা নিবেদিতা তাঁর বক্তৃতাতেও বলতেন। আর এইসব কথাবার্তাই তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করেছিল। শুধু এই বক্তৃতা সফর বা চিঠিপত্রেই নয়, নিবেদিতা তরুণ যুবকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময়েও তাঁদের মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে তোলার চেষ্টা করতেন। তার পরিচয় পাওয়া যায় বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসের অন্যতম আবাসিক ছাত্র প্রমথরঞ্জন নাগের স্মৃতিচারণায়। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর গ্রন্থে এই স্মৃতিচারণাটি তুলে ধরেছেন। ওই স্মৃতিচারণায় প্রমথরঞ্জন জানিয়েছেন, ১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক রবিবার বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসের আবাসিক ছাত্রদের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপচারিতার সময় ধর্ম নিয়ে কথা বলছিলেন নিবেদিতা। তখনই নিবেদিতা ওই আবাসিক ছাত্রদের বলেন, 'But my dear young boys, besides all your conception or knowledge of DHARMA I shall now tell you something of a higher, nobler and more sacred factor in your lives which I would urge most honestly and emphatically

to you all to follow or act as your sublimest and greatest DUTY, the first and foremost obligation.

'You all are required first to know your Motherland— your great MOTHER!

MOTHER BHARAT BARSHA!

I would advise you to see Her, go round Her, to know Her people, their religion, culture, literature, language, customs and traditions, in one word their history thoroughly to meet them and mix with them intimately often whenever such an opportunity occurs to love them. Just as a son or a daughter behaves or mixes with his or her mother freely and intimately, so you should love her, respect Her, serve Her, worship Her with most reverential salutations!

BANDE MATARAM'

প্রমথরঞ্জন জানিয়েছেন, বন্দেমাতরম্ কথাটি নিবেদিতা সুস্পষ্টভাবে সংস্কৃতে উচ্চারণ করেছিলেন। প্রমথরঞ্জন তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, '১৯০৩ সালে একটি ছাত্রাবাসের কক্ষে যে পূত শব্দটি উচ্চারিত হয়েছিল তা অল্পদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের মতো। নিবেদিতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে মাতৃমন্ত্র তুলে এনে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠান করে দিয়েছিলেন।'

মুম্বই সফর শেষ করে নিবেদিতা নাগপুরে এসে বিচারপতি কোহ্লটকরের বাড়িতে অবস্থান করেন। ৮ থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলি থেকে জানা যায়, নিবেদিতার এই সভাগুলিতে যথেষ্ট জনসমাগম হয়েছিল। নাগপুরেও তাঁকে কেন্দ্র করে ছাত্র-যুবদের ভিতর যথেষ্টই উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। ১১ অক্টোবর নাগপুরের মরিস কলেজে ছাত্রদের একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করেন। ওই সভার এক প্রত্যক্ষদর্শী জি. ভি. দেশমুখ পরে এ সম্পর্কে একটি স্মৃতিচারণা করেছিলেন ১৯৫৩ সালে, 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায়। সেই স্মৃতিচারণাটি উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে নিবেদিতা কীভাবে সেখানেও ছাত্র-যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। দেশমুখ লিখেছেন, 'It was a day on which arms were worshipped. And Goddess Durga was the presiding deity to be worshipped during the Dasserah days. So, Sister Nivedita was surprised how we could

have forgotten the Goddess Durga and Her sword and also Her Message; She had expected, she said, in this capital of Bhonsla Rajas, to see on that day something of the bravery of the Marathas... She went on castigating the audience, consisting of college students and professors. All this might have been swallowed— and was swallowed— by most of the hearers, with a worry face, but what caused them to worry was the immediate expression by Nivedita of her desire to see sword-play, wrestling and such other activities of a martial character the next day, i.e. on the Dasserah day.'

ওইদিন ছাত্রদের সামনে নিবেদিতা কী বলেছিলেন, তারও উল্লেখ পাওয়া যায় দেশমুখের লেখায়। নিবেদিতা ছাত্রদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, 'We are having too much of higher education and too many graduates are turned out of the universities, who are completely physical wrecks, unfit to protect themselves, their mothers, or their sisters in times of difficulties. Such weaklings can be of no use to society. The country needs robust and patriotic men instead of persons who serve a foreign government and dominate over their countrymen. They alone can uplift the country. You should feel disgusted to perpetuate the authoritarian rule of a foreign government by serving it.'

ছাত্রদের সামনে নিবেদিতার এই ধরনের বক্তব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল—তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

নাগপুর থেকে ১৪ অক্টোবর ওয়ার্ধা পৌঁছন নিবেদিতা। ওয়ার্ধায় স্বামীজির ওপর একটি বক্তৃতা দেন। ওয়ার্ধা থেকে ১৬ তারিখে এসে পৌঁছন অমরাবতী। সেখানে পরপর দুদিন বক্তৃতা দেন। অমরাবতী থেকে সুরাট হয়ে বরোদা পৌঁছন।

বরোদাতেই অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় নিবেদিতার। কর্মোপলক্ষে অরবিন্দ তখন বরোদায় বসবাস করছিলেন। তবে, অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম আলাপ কীভাবে হয়েছিল, তা নিয়ে নানারকম বক্তব্য শোনা যায়। অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপের কোনো বিবরণ নিবেদিতা অবশ্য কোথাও লিপিবদ্ধ করে যাননি। অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

লিখেছেন, 'ভগিনী নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বড় বড় রাজকর্মচারীর সঙ্গে অরবিন্দও স্টেশনে গিয়াছিলেন। নিবেদিতার সহিত অরবিন্দের স্টেশনেই প্রথম সাক্ষাৎ। স্টেশন হইতে গাড়ি নিবেদিতাকে লইয়া শহরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে রাজঅমাত্যেরা আছেন, অরবিন্দও আছেন। পথে নিবেদিতা কলেজের মিনার গম্বুজওয়ালা বাড়ি দেখিয়া বলিলেন, 'What an ugly pile!' ভারতীয় স্টাইলে গৃহস্থের ছোট বাড়ি দেখিয়া বলিলেন, 'Oh! how beautiful!' একজন রাজঅমাত্য অরবিন্দের কানে কানে বলিলেন,'I say, she is mad!' (পাগল নাকি?)—বারীন ঘোষ লিখিয়াছেন রাজঅমাত্যেরা আর্ট সম্বন্ধে ক অক্ষর গোমাংস। সুতরাং নিবেদিতার দৃষ্টি তাঁহারা পাইবেন কোথা হইতে! কিন্তু নিবেদিতার এই উক্তির মধ্যে দিয়া অরবিন্দ নিশ্চয়ই তাঁহার (নিবেদিতার) মনের পরিচয় প্রথম পাইয়াছিলেন।'

নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের যখন প্রথম আলাপ হয় সেই প্রেক্ষাপটটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, 'অরবিন্দের সহিত নিবেদিতার সাক্ষাতের পূর্বে তাঁহার (অরবিন্দের) তৎকালীন ক্রিয়াকলাপের কিছুটা পরিচয় দেওয়া দরকার। গুজরাটে সন্ত্রাসবাদীদের (terrorists) একটি গুপ্তচক্র আছে। ঠাকুর সাহেব তাহার প্রেসিডেন্ট। তিনি তখন দেশে নাই; বৈপ্লবিক কাজের শলাপরামর্শের জন্য জাপান গিয়াছেন। তাঁহার পদে অরবিন্দ গুপ্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট হইয়া কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে গাইকোয়াড়ের বাঙ্গালী দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে অরবিন্দ সরলা দেবীর নিকট চিঠি দিয়া বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতা পাঠাইয়াছেন। অরবিন্দের নির্দেশে যতীন ব্যানার্জী সার্কুলার রোডে প্রথম গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তারপর অরবিন্দ নিজেও এই গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গোপনে কলিকাতা আসিয়াছেন এবং মেদিনীপুর গিয়া হেমচন্দ্র কানুনগোকে একহাতে গীতা ও একহাতে তলোয়ার দিয়া গুপ্ত সমিতির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। মেদিনীপুরে কাঁকরপূর্ণ মাঠের গর্তে ঢুকিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়া চাঁদমারি শিক্ষা দিয়াছেন।... এই পটভূমিকার ওপর যখন অরবিন্দ দাঁড়াইয়া আছেন, ঠিক তখনই নিবেদিতার সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, এবং নিরালায় কথাবার্তা হয়।'

গিরিজাশঙ্কর আরো লিখেছেন, 'প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। উভয়ে একত্রে কাজ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সে কাজটি হইল ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত করা।

'অরবিন্দ যে ইতিপূর্বে বাংলাদেশে আসিয়া গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বের উদ্বোধন করিয়াছেন, সে কথা নিশ্চয়ই তিনি নিবেদিতাকে বলিয়াছেন। কেননা, কলকাতায়

ফিরিয়া নিবেদিতা অরবিন্দ প্রবর্তিত গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।'

লিজেল রেমঁ অরবিন্দ-নিবেদিতার প্রাথমিক পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'নিবেদিতা আর অরবিন্দ ঘোষ পরস্পরের অপরিচিত ছিলেন না। অরবিন্দের কাছে নিবেদিতা হলেন 'কালী দি মাদারে'র রচয়িত্রী। অসংখ্য দেশনেতার হাতে হাতে ঘুরেছে ঐ নিবন্ধটি। আর নিবেদিতার কাছে অরবিন্দ হলেন ভাবী-যুগের দেশনায়ক। চারবছর আগে বম্বের প্রখ্যাত সংবাদপত্র 'ইন্দুপ্রকাশ'-এ জ্বালাময় প্রবন্ধ লিখে একটা সংগ্রামের সূত্রপাত করেছেন তিনি। বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তার প্রতিটি সভ্যকে নিজের হাতে নানা বিষয়ে চৌকশ করে তুলেছিলেন। দেশের বৈপ্লবিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত কর্মের খাতে বইয়ে দিয়ে এই সমিতি যথাসময়ে জনসমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ভারতপ্রীতি আর মুক্তি পিপাসায় নিবেদিতা ও অরবিন্দের মাঝে মিল ছিল। তার চেয়েও গভীরতর মিল ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি দুজনের ঐকান্তিক শ্রদ্ধায়।

'অরবিন্দের পরিকল্পনার পরিধি ছিল ব্যাপক এবং দিন দিন তা সক্রিয় হয়ে উঠছিল। বরোদা থেকে বাংলা পর্যন্ত একটা কর্মচক্র বিস্তার করবার জন্য বেছে বেছে লোক নিচ্ছিলেন তিনি বিপ্লবী দলে। উদ্দেশ্য, মাকড়শার জালের মতো এ দল শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ুক।

'কিন্তু নিবেদিতার ধৈর্য থাকে না। বলেন, 'কলকাতায় তোমাকে দরকার। তোমার স্থান বাংলায়।'

'এখনও সময় হয়নি। আমি আড়াল থেকে কাজ করছি। আমার সামনে থেকে প্রকাশ্যে কাজ করবার লোক চাই।'

'হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে নিবেদিতা বলেন, 'আমায় ভার দিতে পার, আমি তোমার দলে।'

'তাঁর আইরিশ-শোণিতের তেজসুদ্ধ নিবেদিতা নিজস্ব যা কিছু সব অরবিন্দের প্রস্তুত-প্রায় পরিকল্পনায় ঢেলে দিলেন।'

যেহেতু নিবেদিতা এ সম্পর্কে কিছু লেখেননি— তাই সকলেরই কিছু না কিছু কল্পনার অবকাশ থেকে গেছে। অরবিন্দও এ সম্পর্কে বিশদ কিছু বলেননি। 'শ্রী অরবিন্দ অন হিমসেলফ'-এ এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ বলেছেন—'নিবেদিতা বরোদায় গাইকোয়াড় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বলে আমার জানা নেই। তবে তিনি রাজ অতিথিরূপে বরোদায় বাস করছিলেন। আমি কাশীরাও-এর সঙ্গে তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে যাই। স্টেশন থেকে শহর আসবার পথে নিবেদিতা যখন কলেজের

বাড়ি এবং তার সুউচ্চ গম্বুজগুলির সৌন্দর্যহীনতার তীব্র নিন্দা ও নিকটস্থ ধর্মশালার প্রশংসা করেন, তখন কাশীরাও অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর মনে হয়েছিল, এই মহিলা সম্ভবত কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ।'

অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা বারীন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন, 'নিবেদিতা তাঁর বরোদা ভ্রমণের সময় থেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত।' কিন্তু এক্ষেত্রে অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের কিছু তফাৎ রয়ে গিয়েছে। বরোদায় নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয়ের বিষয়টি যদিও অরবিন্দ স্বীকার করেছেন, পাশাপাশি তিনি আবার এও বলেছেন, 'তাঁর সঙ্গে আমার সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে গোপন বৈপ্লবিক ক্ষেত্রেই। আমি আমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, তিনি তাঁর কাজ নিয়ে, এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার বা একত্রে সিদ্ধান্ত করার কোনো ঘটনা ঘটেনি।' অরবিন্দের লেখার এই অংশটি পড়লে মনে হয় বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে মত বিনিময় হত। কিন্তু তাঁরা কাজ করতেন আলাদা আলাদাভাবে। অরবিন্দের এই লেখাটি পড়লে মনে হয়, নিবেদিতারও একটি পৃথক গোষ্ঠী ছিল। আবার বারীন্দ্র ঘোষের লেখা পড়লে মনে হবে— অরবিন্দের গোষ্ঠীর প্রতিটি কাজেই নিবেদিতারও অংশগ্রহণ ছিল। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়টি নিয়ে একটু ধোঁয়াশা রয়েছে। অরবিন্দের গোষ্ঠীর কার্যকলাপে নিবেদিতা ঠিক কতখানি জড়িত ছিলেন, কীভাবে জড়িত ছিলেন— তা নিয়ে এইরকম একাধিক বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। এই বরোদায় অবস্থানকালেই সেখানকার মহারাজা সয়াজি রাওকে গুপ্ত বিপ্লবে সাহায্য করার আবেদন জানিয়েছেন নিবেদিতা। সয়াজি রাও-এর সঙ্গে নিবেদিতার এই সাক্ষাৎকারের সময় অরবিন্দও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 'শ্রীঅরবিন্দ অন হিমসেলফ' গ্রন্থে অরবিন্দ নিজেই এ ঘটনা জানিয়েছেন। পূর্বেই অরবিন্দের সেই স্মৃতিচারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, সয়াজি রাও নিবেদিতার এই প্রস্তাবে সাড়া দেননি। নিবেদিতার ডায়েরি থেকে জানা যায়, ২৩ অক্টোবর সয়াজি রাও তাঁকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিটি পড়ে নিবেদিতা বিমর্ষ হয়ে পড়েন। পরদিন আবার তিনি সয়াজি রাও-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরকম অনুমান করা যায় যে, সয়াজি রাও ওই চিঠিতে এই প্রস্তাবে তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন, এবং তা জেনে নিবেদিতা হতাশ হয়ে পড়েন। পরদিন তিনি আবার সয়াজি রাও-এর সঙ্গে হয়তো এই বিষয়েই কথাবার্তা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি বলেই মনে হয়। তবে, এই ঘটনাটির বিশদ উল্লেখ কিন্তু নিবেদিতার ডায়েরি বা চিঠিপত্র–কোনো জায়গাতেই নেই। মনে হয়, গোপনীয়তা রক্ষার জন্য নিবেদিতা এই ঘটনাটির কোনো লিখিত প্রমাণ রাখেননি।

এই ১৯০২ খিস্টাব্দেই নিবেদিতার সঙ্গে গোপালকৃষ্ণ গোখলের পরিচয় হয় বলে অনুমান করা যায়। গোখলে ছিলেন মডারেট, যে কোনোরকম গুপ্ত সমিতি বা গুপ্ত কার্যকলাপের বিরোধী। গোখলের সঙ্গে নিবেদিতার কীভাবে এবং কোথায় পরিচয় হয়েছিল, তা সঠিক জানা যায় না। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, '১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে নিবেদিতা খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে দার্জিলিং যাইবেন স্থির করিলেন। কেননা, তাঁহার রাজনৈতিক বন্ধুরা তখন দার্জিলিংয়েই অবস্থান করিতেছিলেন। বিশেষত, গোখলে তখনও দার্জিলিং-এই ছিলেন। তিনি দার্জিলিং গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।' নিবেদিতার চিঠিপত্র থেকে আন্দাজ করা যায় ১৯০৩-এর গোড়ার দিকে অথবা ১৯০২-এর শেষভাগে কোনো সময় গোখলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং দুজনের ভিতর নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ১৯০৩ সালের ২০ মার্চ একটি চিঠিতে গোখলের স্বাস্থ্যের খবর নিয়েছিলেন নিবেদিতা, 'Will you let me say how much I hope that you will recognise at this moment your need of rest and good food? I am much afraid that your health is less firmly established than you know, and I can not help wishing that you were in better hands than your own, for nursing and care.'

১৯০৩ সালের ২৯ মার্চ গোখলেকে লিখেছেন, 'It is an infinite joy to me to know that a Maharatta is loved in Bengal as you have caused yourself to be, by our first men here and when that love is joined with such respect for your intellect, and such implicit confidence in your courage and disinterestedness, it is beyond all price.'

১৯০২-'০৩ খ্রিস্টাব্দে গোখলে ছিলেন ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য। কাউন্সিলে গোখলের বক্তব্যের প্রশংসা করে নিবেদিতা ১৯০৩ সালে (চিঠির তারিখ পাওয়া যায় না) আর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'But now I want to write also to congratulate you on your manly speech to the Viceroy the other day. We are more and more dependent on your strength as we send weaker and weaker into the council ourselves.'

কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত রাজনৈতিক মেরুর দুই ব্যক্তিত্ব নিবেদিতা এবং গোখলের এই ঘনিষ্ঠতা হল কী করে? গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'মিঃ গোখলে অর্থনীতিবিদ্, কিন্তু মডারেটস্য মডারেট এবং গুপ্ত সমিতির অত্যন্ত মারাত্মক রকমের বিরোধী। অরবিন্দ লোকমান্য তিলকের গুণমুগ্ধ, এমনকি অনুগামী। কিন্তু মিঃ

গোখলেকে তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। এমনকি গভর্ণমেন্টের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অবস্থায় নিবেদিতার সহিত গোখলের একটা ঘনিষ্ঠতা হইল কী করিয়া। গোখলে কী নিবেদিতার বৈপ্লবিক কর্মপন্থার কার্য্যাদির বিষয়ে অবগত ছিলেন না?'

নিবেদিতার সঙ্গে গোখলের এই হৃদ্যতার কয়েকটি কারণ ছিল। রাজনৈতিকভাবে দুজন দুই মেরুর বাসিন্দা হলেও গোখলের ব্যক্তিত্ব, সততা, বিচক্ষণতা, আন্তরিকতা এবং দেশপ্রেম নিবেদিতাকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। যে কারণে রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও নিবেদিতা আজীবন গোখলেকে শ্রদ্ধা করে গিয়েছেন। রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে নিবেদিতা কখনও দুজনের ভিতর প্রাচীর তুলতে দেননি। এক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে নিবেদিতার পার্থক্য ছিল। অরবিন্দ রাজনৈতিকভাবে সংকীর্ণ মানসিকতায় ভুগতেন। এছাড়াও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দিয়ে নিবেদিতা বুঝেছিলেন গোখলের মতো একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিকে যদি কিছুটা হলেও নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলা যায়— তাহলে ভবিষ্যতে অনেক কাজে গোখলের সহায়তা লাভ করা হয়তো সম্ভব হবে। যে কারণে, গোখলেকে কিছুটা প্রভাবিত করার চেষ্টাও নিবেদিতার ছিল। কিছুটা প্রভাবিত নিবেদিতা অবশ্যই করতে পেরেছিলেন। নিবেদিতার সংস্পর্শে এসে গোখলে পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর বেনারস কংগ্রেসে গোখলেকে যতটা সম্ভবত নিজেদের রাজনৈতিক মতের কাছাকাছি টানতেও সক্ষম হয়েছিলেন নিবেদিতা। এই বিষয়টি পরে উল্লেখিত হবে। নিবেদিতার সঙ্গে গোখলের ঘনিষ্ঠতা এতটাই হয়েছিল যে, ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে নিবেদিতা যখন গুরুতর অসুস্থ হন, তখন গোখলে সারারাত নিবেদিতার শুশ্রূষা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। বোন মেরি উইলসনকে ১৯০৫-এর ১ নভেম্বর নিবেদিতার লেখা চিঠি থেকে এই ঘটনাটি জানা যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Did I tell you how he (Gokhale) came when I was ill, and begged to be allowed to stay up all night— and sit on a verandah and crack ice? It was just at a time too when he was hard at work, preparing a great council speech, with which to meet Lord Curzon. He is a great admirer of Christine. But you have no idea of his kindness.'

এই চিঠিটি পড়ে এ-ও আন্দাজ করা যায় যে, সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গেও গোখলের ভালোই পরিচয় ছিল। নিবেদিতার সঙ্গে গোখলের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কথাবার্তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯০৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর লেখা চিঠিতে। ওই

চিঠিতে নিবেদিতা গোখলেকে লিখেছেন, 'If you were asked to name the men whom you would choose as Viceroy and Secretary of State under a liberal Government, whom would you choose— Lord Reay and Sir Antony McDonnell, or vice versa? Or failing the latter, whom would you put in his place?

'Sometime, when you have a few minutes leisure, I should be grateful for your nomination— and your reasons. I do not forsee the new ministry— alas! But I was asked this question, and would be thankful for your opinion. The matter is confidential.'

দেখা যাচ্ছে, এরকম একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় যে একান্তে গোখলের সঙ্গে শুধু আলোচনাই করেছেন নিবেদিতা তা নয়— এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গোখলের মতামত জানতে চেয়েছেন। বিষয়টি গোপনীয়ও রাখতে অনুরোধ জানিয়েছেন গোখলেকে।

গোখলেকে নিবেদিতা কীভাবে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন, তার প্রমাণও রয়েছে নিবেদিতার কিছু চিঠিতে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পরে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে গোখলে ইংলন্ডে যান। নিবেদিতা চেয়েছিলেন মডারেট গোখলে ইংল্যান্ডে পজিটিভিস্ট রাজনীতিবিদদের সঙ্গে মিলিত হোন। এই উদ্দেশ্যে শ্রীমতী হেস্টিকে ১৯০৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন,'This letter is to introduce to you Mr. G. K. Gokhale of Poone— the leading Indian member of the Viceroy's Council. Mr. Gokhale is only in England for a few weeks, and I do want him meet all the leading Positivists and especially your friend Mr. Wilson.'

মডারেট গোখলে ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে বিশিষ্ট ব্রিটিশ সাংবাদিক উইলিয়াম স্টেডের সঙ্গে কথা বলে লর্ড কার্জনের কার্যকলাপ খুলে বলুন এবং কার্জনের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক মহলে একটি ধারণা গড়ে তুলুন এটাও চেয়েছিলেন নিবেদিতা। ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ উইলিয়াম স্টেডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'Mr. Gokhale is the forth-coming leader of the Congress. He is also the leading Indian member of the Viceroy's council, and has fought a duel 3 winters long with Lord Curzon over the educational question. Mr. Gokhale's own achievements as a University

Graduate are such as to make him an authority of this question, apart from the fact that he voiced the opinion of an India that was united to a man.

'I take up this letter, a day later than I begin it, and provided with Lord Curzon's full speech at Simla yesterday on Education. There is no man so qualified as Mr. Gokhale to expose to you and to world the pefect tissue of lies of which that speech consists. I need say no more. I do hope that you and Mr. Gokhale will like each other, for it is my great desire that you should be on terms of confidential intimacy with all the most trusted of our Indian representative.'

মডারেট গোখলে তাঁর ইংরেজ ভক্তিবশত ইংল্যান্ডে গিয়ে কঠোর প্রতিবাদ না করে চলে আসতে পারেন, এরকম একটা আশঙ্কাও হয়তো নিবেদিতার ছিল। যে কারণে গোখলের মডারেটপন্থী মানসিকতার উপরও কিছুটা আঘাত সে সময় করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। যে কারণে, উইলিয়াম স্টেডকে যেদিন এই চিঠিটি লিখেছিলেন নিবেদিতা, সেদিনই গোখলেকেও একটি চিঠি লিখে স্টেডের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। আর বলেছিলেন, 'I hope you will not be shut up, while you are in England, amongst a few saintly and exquisite persons, but that you will have the chance of judging my people as they really are— often blood-thirsty— always money-thirsty— degraded by injust wars and rapidly loosing hold of the things that were of old the glory of the English home.'

রাজনৈতিক মতপার্থক্য যতই থাকুক না কেন, নিবেদিতার কাছে গোখলের যে একটি উচ্চ আসন ছিল, গোখলের দেশপ্রেম যে নিবেদিতার কাছে ছিল সন্দেহাতীত, ১৯০৩ সালের একটি চিঠি পড়লে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। এই চিঠিতে নিবেদিতা গোখলেকে লিখেছেন, 'How I trust that you will have the power to fight many a battle yet— never letting the colours fall, while they are in your keeping ! And I know that you will feel as I do that no other wish could equal this.'

নিবেদিতার রাজনৈতিক প্রয়াস নিয়ে আলোচনা পরে আবার করা হচ্ছে। তার আগে তাঁর বক্তৃতা সফরগুলি একটু দেখে নেওয়া যাক।

বরোদা থেকে নিবেদিতা গেলেন আহমেদাবাদে। ২৬, ২৮ এবং ২৯ অক্টোবর ১৯০২ আহমেদাবাদে তিনটি বক্তৃতা দিলেন নিবেদিতা। আহমেদাবাদ থেকে মুম্বই ফেরার পথে ইলোরা দেখে এলেন। ইলোরার গুহাচিত্র তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এই বিষয়ে নিবেদিতা পরে লিখেছেন, 'To all eternity, while the earth remains what she is, Ellora will be one of the spots where the mystery of god is borne in, in overwhelming measure, upon the souls of men, whatever their associations, whatever their creed.'

এতগুলি বক্তৃতা সফর করে নিবেদিতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া, তখন তাঁর কলকাতা ফেরার ব্যস্ততাও ছিল। ৭ নভেম্বর নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে এলেন।

দুই

নিবেদিতার বক্তৃতা অভিযান শুধুমাত্র পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণের ভিতর দিয়েই শেষ হল না। কলকাতা ফিরে আসার পর বারবার তাঁর কাছে মাদ্রাজ থেকে আমন্ত্রণ আসছিল। স্বামীজির গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণানন্দ তখন মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ সংঘ গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯০২-এর ৮ ডিসেম্বর স্বামী সদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মাদ্রাজ রওনা হলেন। মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অতিথিরূপে স্বামীজির স্মৃতিধন্য ক্যাসল কর্নান নামে একটি বাড়িতে এসে উঠলেন নিবেদিতা। মাদ্রাজে থাকাকালীনই স্বামী সদানন্দ নিবেদিতাকে প্রস্তাব করেন ভুবনেশ্বরের কাছে খণ্ডগিরিতে খ্রিস্টমাস ইভ পালন করার জন্য। সদানন্দের এই প্রস্তাবে রাজিও হন নিবেদিতা। ১৯০২-এর ১৩ ডিসেম্বর নিবেদিতার লেখা একটি চিঠিতে এ কথা জানা যায়। তবে, যেহেতু নিবেদিতার বক্তৃতা কর্মসূচি আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, তাই সিদ্ধান্ত হয় ১৩ ডিসেম্বর রাতে খণ্ডগিরিতে তাঁরা এই খ্রিস্টমাস ইভ পালন করবেন। সেই মতো নিবেদিতা, স্বামী সদানন্দ এবং স্বামী শঙ্করানন্দ (পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ) খণ্ডগিরি গিয়ে পৌছন। ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময়, খণ্ডগিরিতে, একটি জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়িকে ঘিরে গোল হয়ে তাঁরা বসলেন। চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ধারেকাছে কোনো জনমানব নেই। ডিসেম্বর মাসের প্রবল ঠান্ডা। নিবেদিতা তাঁর 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আমরা একখানা জ্বলন্ত মোটা কাঠের গুঁড়ির চারিধারে ঘাসের উপর বসিয়াছিলাম। আমাদের একপার্শ্বে পাহাড়গুলি উঠিয়াছে; পাহাড়ের গায়ে গুহা এবং খোদাই করা পাথরের মূর্তি, চারিদিকে বায়ুবিকম্পিত সুপ্ত অরণ্যানীর অস্পষ্ট শব্দ। অতীতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'ক্রিসমাস ইভ' (খ্রিস্ট জন্মদিনের পূর্ব নিশা) যেরূপভাবে উদ্‌যাপিত হইত, স্থির করিয়াছিলাম, আমরাও সেইভাবে যাপন করিব। সাধুদের মধ্যে একজনের হাতে

ছিল মেষ তাড়াইবার মতো একগোছা লম্বা বাঁকানো ছড়ি, এবং আমাদের সঙ্গে ছিল সেন্ট লুক প্রণীত ঈশার জীবনী ও বাণী— যাহা হইতে দেবদূতগণের আবির্ভাব এবং জগতে প্রথম 'গ্লোরিয়া' (গৌরব গাথা) নামক স্তুতি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সেই দিব্য রজনীর কল্পনা করিতে হইবে।

'কিন্তু গল্পটি পড়িতে পড়িতে আমরা তন্ময় হইয়া গেলাম; খ্রিস্টজন্মের পূর্বরজনীর বর্ণনা পাঠেই শেষ হইল না; একের পর এক ঘটনা পড়া চলিতে লাগিল। এইরূপে সেই অদ্ভুত জীবনের সমগ্র অংশ আলোচিত হইবার পর অবশেষে মৃত্যু এবং সর্বশেষে পুনরুত্থান।...

'... আমরাও কি ঐরূপ পুনরাগমনের কিছু কিছু আভাস পাই নাই— —পূর্বোক্ত ইতিহাসের সহিত যাহা মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে? গুরুদেব স্বয়ং স্পষ্টভাবে এবং বিশেষ চিন্তাপূর্বক যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা সহসা মনে পড়িয়া গেল এবং উহার অর্থও বোধগম্য হইল—"জীবনে বহুবার আমি পরলোকগত আত্মাদের প্রত্যাবর্তন করতে দেখেছি; এবং একবার শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পরবর্তী সপ্তাহে যে মূর্তি দর্শন করি, তা ছিল জ্যোতির্ময়।" যিনি তাঁহাদের নিকট হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন, সেই প্রভুকে (ঈশাকে) আর একবার দর্শন করিবার জন্য শিষ্যগণের যে আকুল আকাঙ্ক্ষা আমরা কেবল তাহাই প্রত্যক্ষ অনুভব করিলাম না, পরন্তু বিরহ-কাতর শিষ্যগণকে সান্ত্বনাপ্রদান ও আশীর্বাদ করিবার উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে পুনরাগমনের জন্য সেই অবতার পুরুষের যে গভীরতর আকাঙ্ক্ষা—তাহারও প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলাম।

'..."পথপার্শ্বে যতক্ষণ তিনি আমাদের সহিত কথা বলিতেছিলেন, ততক্ষণ আমাদের হৃদয় কী তীব্র আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল।"—আমাদের গুরুদেবের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে আমরাও কি কত মুহূর্তে বাইবেলে উক্ত ঐরূপ অপূর্ব অনুভূতির অজস্র প্রমাণ পাই নাই। সেইসব মুহূর্তে আমাদের প্রায় দৃঢ় ধারণা জন্মিত, তিনি সত্যই আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন।'

ঐ ১৩ ডিসেম্বর একটি চিঠিতে (কাকে লেখা জানা যায় না, সম্ভবত জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে) নিবেদিতা লিখেছেন, 'Do I not remember that Swamiji saw 'a luminous ghost' in the week of Sri Ramakrishna's death? Do I not know how my own sleeve was plucked, and a message sent through me, beside His burning pyre? Are these not moments to be recalled in those first days— the hour when the severance with

the Math was complete for instance? Do I not know the truth of this Resurrection? Do I not feel the difficulty of the Writer, trying to tell of a gleam here and there, and seeing the suggestions shape themselves into rigidity under his very hand?

'The story of Mary Magdalene again. 'This man if he were a Prophet would have known who and what manner of woman this is." It is not exact? Have we not heard the cavilling criticism a thousand times?'

বোঝাই যাচ্ছে, না থেকেও বিবেকানন্দ তখন কতখানি আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন তাঁর শিষ্যার হৃদয় এবং মনকে।

খণ্ডগিরিতে খ্রিস্টমাস ইভ পালন করে নিবেদিতা মাদ্রাজে ফিরে এলেন ১৯ ডিসেম্বর। পথে ওয়ালটেয়ার, বিজয়ওয়াদা প্রভৃতি জায়গাগুলি ঘুরে এলেন। মাদ্রাজ নিবেদিতার কাছে খুব একটা অপরিচিত জায়গা ছিল না। ওই বছরই পাশ্চাত্য থেকে ফেরার পথে মাদ্রাজে নিবেদিতাকে অভূতপূর্ব সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তারও আগে স্বামীজি চিকাগো বক্তৃতার পর যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন মাদ্রাজে তাঁকে বীরের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত মাদ্রাজে, স্বামীজির এক বিশাল ভক্তমণ্ডলী ছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজে এলেন, তখন বিলিগিরি আয়েঙ্গার নামে স্বামীজির এক অনুরাগী ক্যাসেল কর্নানের একটি অংশ তাঁকে ছেড়ে দেন রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনের জন্য। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই মাদ্রাজ শহরে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রভাবও বিস্তৃত হয়েছিল। মাদ্রাজে যে কদিন নিবেদিতা ছিলেন এই ক্যাসল কর্নানে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অতিথি হয়েই ছিলেন।

২০ ডিসেম্বর মাদ্রাজের ইয়ং মেনস হিন্দু অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে মৈলাপুর পাচায়াপ্পা হলে নিবেদিতা একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারতের ঐক্য'। এই বক্তৃতায় নিবেদিতা জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান যুব সম্প্রদায়কে। অনেকেই বলে থাকেন, এমনকী প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার মতো নিবেদিতার জীবনীকাররাও বলেছেন, নিবেদিতার শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাগুলির ভিতর এটি অন্যতম। 'দ্য হিন্দু' কাগজে নিবেদিতার সেই বক্তৃতা প্রকাশিতও হয়েছিল। সেই বক্তৃতার অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হল। নিবেদিতা বলেছিলেন, 'I see actually face to face as I see the sun in the sky at midday that we in India have a great synthesis, an unparalleled synthesis,

full of strength, majesty and potentiality and hope that the day would come when we should understand and know that and act on the strength of it.'

আরো বলেন, 'If India had no unity herself, no unity could be given to her. The unity which undoubtedly belonged to India was self born and had its own destiny, its own functions and its own vast powers; but it was the gift of no one.'

জাতীয়তাবোধে যুব সমাজকে উদ্দীপ্ত করতে গিয়ে স্বামীজির চিন্তাধারা এবং আদর্শকে প্রচার করে বললেন, 'And so let me in all reverence and in all grateful memory and love repeat to you again these words that were spoken here in our midst a few years ago by a voice so dear, so well remembered by you all— those words that were the text of his message to his land for ever more—. "Arise, awake, struggle on and rest not till the goal is reached."

মাদ্রাজে অবস্থানকালে নিবেদিতা বিভিন্ন বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রশ্নোত্তর এবং মতামত বিনিময়মূলক আলোচনাচক্রেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতার ডায়েরি এবং সমসাময়িক কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এগুলির উল্লেখ করেছেন প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা। যেমন— ২১ ডিসেম্বর মুদালিয়র ফ্রি রিডিং রুমে কোমলেশ্বরমপেট প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়নের আলোচনাচক্র, ২৩ ডিসেম্বর ভিজিয়ানাগ্রাম গার্লস হাইস্কুলে পারস্পরিক মতামত আদানপ্রদানের সভা, ২৬ ডিসেম্বর— 'দ্য নিউ মেসেজ' শীর্ষক বক্তৃতা, ২৭ এবং ২৮ ডিসেম্বর মতামত আদানপ্রদানকারী সভা। এইসব আলোচনাচক্র এবং প্রশ্নোত্তরসভায় নিবেদিতাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। অনেক সভায় তিনি নিজে উপস্থিতও থাকতেন। রামকৃষ্ণানন্দের এই সহায়তা সবিশেষ আনন্দিত করেছিল নিবেদিতাকে। ১৯০২-এর ২৯ ডিসেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Swami Ramakrishnananda has been more than good. He has given his strong quite presence and support to every lecture and every conversation. And the boys and people understand me well. Swamiji with us.'

নিবেদিতার চিঠিটি পড়ে বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁর মাদ্রাজ সফর ফলপ্রসূ হয়েছিল।

নিবেদিতা মাদ্রাজে অবস্থান করাকালীনই স্বামীজির স্মৃতিধন্য এই ক্যাসল কার্নান বাড়িটি বিক্রির কথা উঠেছিল। তা জেনে দুঃখিতও হয়েছিলেন নিবেদিতা। তাঁর অনেক টাকা থাকলে এই বাড়িটি তিনি রক্ষা করতে পারবেন— এরকমও ভেবেছিলেন। ২১ ডিসেম্বর, ১৯০২ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখছেন, 'Poor Castle Kernan is going to be sold. How I wish it would be saved! But I do not know how much it would cost. It could be made so beautiful, and so marvellously useful!'

ওই বছরই ২১ জানুয়ারি ক্যাসল কর্নানে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজির জন্মতিথি উৎসব পালন করলেন। নিবেদিতাও সেখানে সারাদিন পূজাপাঠ করলেন। বন্ধু ও ভক্ত সমাগমও হয়েছিল সেদিন। ক্যাসল কর্নানে স্বামীজির ভক্তদের এই সমাগম খুশি করেছিল নিবেদিতাকে। ২১ জানুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে তিনি লিখেছেন, 'I think infinitely more of Sri Ramakrishna's quiet life now than I used to do. I want to see our men standing in groups at all corners of India, not as workers— simply to pray— and witness the lives of Swamiji and Sri Ramakrishna. These two live ARE the unity of India. All that is necessary is that India should keep them in her heart.'

এর পরদিনই নিবেদিতা এবং স্বামী সদানন্দ কলকাতার দিকে রওনা দিলেন।

এসবের পাশাপাশিই ১৯০২ সালে আরো একটি ঘটনার সূত্রপাত হয়, যা নিবেদিতাকে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন এবং এদেশে ব্রিটিশ প্রশাসন সম্পর্কে চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ এবং অসহিষ্ণু করে তোলে। লর্ড কার্জনের কার্যাবলী সম্পর্কে অবশ্য নিবেদিতা যথেষ্টই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এদেশে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতায় লর্ড কার্জন এক নম্বর নিশানা হয়ে ওঠেন নিবেদিতার। নিবেদিতা মনে করতেন, লর্ড কার্জন ভারতীয়দের প্রাপ্য অধিকার এবং মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করছেন, কার্জনের আমলেই ভারতীয়রা সর্বক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। নিবেদিতার এ ধারণায় বিন্দুমাত্র ভুল ছিল না। কার্জন সত্যই সর্বক্ষেত্রে ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার খর্ব করতে চেয়েছিলেন। তার বড় উদাহরণ ১৯০৪ সালের 'ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট'। এই আইনটি পাশ করানোর লক্ষ্যে কার্জন ১৯০২ সাল থেকে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিলেন। ১৯০২ সালে কার্জন 'ইউনিভার্সিটিজ কমিশন' গঠন করেন। এই বিষয়টি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। তবু সংক্ষেপে এখানেও একবার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯০২–এর জানুয়ারি মাসে কার্জন এই

'ইউনিভার্সিটিজ কমিশন' গঠন করেন। কার্জনের উদ্দেশ্য খুব মহৎ ছিল একথা কখনোই বলা যাবে না। এই কমিশন গঠন এবং পরবর্তীকালে 'ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট' প্রণয়ন করার পিছনে কার্জনের মূলত দুটি উদ্দেশ্য ছিল— (ক) উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা এবং ভারতীয়দের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সংকোচন করে আনা। এমনকী কার্জন একটি হীন মন্তব্যও করেছিলেন। বলেছিলেন— যাদের টাকা নেই তাদের উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশের দরকার কী? বোঝাই যাচ্ছে, সাধারণ ভারতীয়রা উচ্চশিক্ষা পান— এটি কার্জন কখনোই চাননি। চেয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তির অনুকম্পাধন্য দেশিয় রাজন্যবর্গ, সামন্তপ্রভু, ধনী পরিবারগুলি একমাত্র এই সুযোগ লাভ করুক। এককথায় শিক্ষাক্ষেত্রে কার্জন একটি বৈষম্যই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

কার্জনের গঠিত এই 'ইউনিভার্সিটি কমিশন' যে সুপারিশগুলি করে, তা বাংলার বিদ্বজ্জন সমাজকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। বিদ্বজ্জন সমাজ মনে করে, এই কমিশন সাধারণ ভারতীয়ের শিক্ষার অধিকারটাই হরণ করতে চাইছে। এই ইউনিভার্সিটিজ কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেন দুজন। নিবেদিতা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুজনেই কড়া ভাষায় কার্জন এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের সমালোচনা করেন। ১৯০৩ সালের ২৮ জানুয়ারি অ্যালবার্টা এবং হোলিস্টারকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লেখেন, 'Lord Curzon is a dreadful viceroy. What Sir William Wedderburn said to me, is exactly true— 'So able and so self satisfied. AND so ambitious!'

'And yet he has characteristics which remind me of nothing so much as Marshall Field's shop in Chicago. These are his good sides. A liberality in doing business— a power of organising comfort — a strict sense of justice in administering the law that is created on a basis of injustice — and so on.

'Funny— isn't it?

'We have had a Universities Commission lately, Which has done its very best to kill all Education, and especially all Science Education.

'This is THE point in India's wrongs that fires me-

'The right of India to be India.

'The right of India to think for herself.

'The right of India to knowledge.

'Were this not the great grievance, I might be fired by her right to bread— to justice— to other things— but this out weighs all.'

কার্জনের প্রতি নিবেদিতার বিদ্বেষ শেষপর্যন্ত এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, ইংল্যান্ডে বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন সমাজে কার্জনের বিরুদ্ধে মত গড়ে তোলার উদ্যোগও নিয়েছিলেন তিনি। এখানে স্মর্তব্য যে, গোখলে যখন ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন, সেইসময়ও নিবেদিতা উদ্যোগ নিয়েছিলেন কার্জনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গোখলে যেন ব্রিটেনের প্রভাবশালী মহলে মুখ খোলেন। কার্জনের বিরুদ্ধে ব্রিটেনে জনমত গড়ে তোলার কাজে বিশিষ্ট সাংবাদিক উইলিয়ম স্টেডকেও কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা।

কার্জনের এই ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্টের তীব্র সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'ইউনিভার্সিটি বিল' শীর্ষক রচনায় কড়া মন্তব্য করেছিলেন। সেই লেখাটির অংশবিশেষ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিবেদিতার আর এক জীবনীকার বারবারা ফক্স তাঁর লেখা নিবেদিতার জীবনীগ্রন্থ 'লং জার্নি হোম'-এ লিখেছেন, ১৯০২ সাল থেকে নিবেদিতার এইসব উত্তেজক বক্তব্য ব্রিটিশ প্রশাসন এবং পুলিশকে তাঁর সম্বন্ধে সন্দিগ্ধগ্ধএবং সতর্ক করে তোলে। ব্রিটিশ পুলিশও এই সময় থেকে তাঁর ওপর নজরদারি শুরু করে। তাঁর চিঠিপত্রও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হতে থাকে।

১৯০২ সালের শেষলগ্নে জগদীশচন্দ্র বসুও ইংল্যান্ড থেকে কলকাতা ফিরে এলেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার এই পুনর্মিলনের একটি বর্ণনা লিজেল রেমঁ দিয়েছেন। নিবেদিতার আর কোনো জীবনীকারের লেখায় এ প্রসঙ্গে কিছু বলা নেই। রেমঁ লিখেছেন, 'উত্তর ভারতে ঘোরার সময় জগদীশ বসুর কথা ভেবে প্রায়ই নিবেদিতা বড় অস্বস্তি ভোগ করতেন। একবছর হল ইংল্যান্ডে তাঁকে ছেড়ে এসেছেন। মিসেস বুল শুধু মমতাময়ী নয়, শক্তিময়ীও বটে। তাঁর চেষ্টায় যে নিশ্চিন্ত পরিবেশটি সৃষ্টি হয়েছিল, বসু আছেন তারই আশ্রয়ে। এদিকে নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা নিবেদিতাকে পেয়ে বসেছে। ভারতের ডাকে সাড়া দিতেই হবে তাঁকে। কিন্তু বসু তাতে ভয়ানক বিরক্ত। 'আমার সাফল্যের চেয়ে ভারতই তোমার বড় হল।' তারপর থেকে নিবেদিতাকে আর চিঠিপত্র দিতেন না।

'বসু এবার ভারতে ফেরবার উপক্রম করছেন। মিস্ ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা সেপ্টেম্বরে লিখেছিলেন— 'বুঝতে পারছি সামনের কয়েকমাস বোধহয় আমার

প্রথম কর্তব্য হবে খোকার জন্য একটা কিছু করা।' নিজের কর্মজীবনে জগদীশ বসুকে অনেকখানি জায়গা দিতে তাঁর আপত্তি ছিল না।'

লিজেল রেমঁর এই লেখাকে মোটেও কল্পকাহিনি বলা যাবে না। এই লেখার সমর্থন পাওয়া যায় নিবেদিতার চিঠিতেই। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯০২ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'I quite understand that my first duty for the next few months will probably be my Bairn (Jagadish Ch. Bose).'

১০ সেপ্টেম্বর জোসেফিনকে লিখেছেন, 'An invitation has come to me from Bombay to go and talk there about Swamiji, and then begin my lecturing tour, So mother put me elsewhere when the Bairn comes home, and I am not sorry. Only I hope to stand on the Bombay pier and watch his ship come in.'

কিন্তু বম্বেতে নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের সাক্ষাৎ হল না। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'তাঁর জাহাজের অপেক্ষায় বম্বেতে একদিন বেশি রইলেন, কিন্তু সব বৃথা হল। দুর্যোগের জন্য জাহাজ ঠিক সময় পৌঁছল না। নিবেদিতা ভাবলেন, নাগপুরেই তাহলে দেখা করবেন। দুজনের ট্রেনই নাগপুরে এসে বেরিয়ে যাবে। সুতরাং স্টেশনে মিনিট পনেরোর জন্য দেখা হওয়ার সুযোগ মিলবে।

'কিন্তু বসুর মেজাজ চটে ছিল, তিনি নিবেদিতাকে এড়িয়ে গেলেন। ইচ্ছা করে কলকাতা যাবার এমন ট্রেন ধরলেন, যেটা নাগপুর হয়ে যাবে না। আদুরে ছেলের গোপন মনঃকষ্ট বুঝতে পেরে নিবেদিতা কাঁদেন, কেন ওর এ বিদ্রোহ?'

কিন্তু তখন বৃহতের ডাকে সাড়া দিয়েছেন নিবেদিতা। তাঁর গুরুর মতো ব্যক্তিগত আবেগ, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ দূরে সরিয়ে রাখতে শিখে গেছেন। ১৯০২-এর ১ অক্টোবর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'You see my little Bairn is divine, but where the country is concerned— I am the Guru— and with S. S's influence paramount this is forgotten for awhile. Even your viking knows better than the nonsense that my sweet child talks of late — and S.S. repeats it all so solemnly as if each word were to be my law. It is curious that we seem to be divided now, and unless he can make up his mind to go by Nagpur to Calcutta, in wh.case I can see him for 16 minutes, we shall not meet till Nov. 19th or 20th...the Bairn

and I may have only the most fragmentary rencontres throughout our lives! How strange! How strange! Only never think my heart is changed to him because of view of life is larger and truer today. The real thing is there just as it always was. But that is an impersonal thing, not limited by names. Mind, all that has been was necessary in order to save life and brain, and perhaps too in order to exhaust my Karma...I am not to limit myself by it, I AM to pass on— I AM a nun—not anything else.'

ব্যক্তিগত ভালোলাগা, মন্দলাগা, আবেগ ইত্যাদির উর্ধ্বে ওঠা বৃহতের সন্ধানী অন্য এক নিবেদিতার পরিচয় ধরা পড়ে সেই চিঠিতে। নিজের প্রিয় 'খোকা' (জগদীশচন্দ্রের) জন্য সবটুকু ভালোবাসা অটুট রেখেও বৃহতের ডাকে সাড়া দিতে পিছপা না হওয়া এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী তখন নিবেদিতা, প্রকৃত অর্থেই।

অবশেষে নিবেদিতা তাঁর বক্তৃতা সফর শেষে কলকাতা ফিরে আসার পর ১৯০২-এর নভেম্বরে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। নিবেদিতার চিঠি থেকেই জানা যায়, নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে আসার পর জগদীশচন্দ্রই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ১৯০২-এর ৬ নভেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I have had my Bairn with me today for 3 hours, and it is all right again. He came to me yesterday hard and cold and 'fierec' as he calls it, and went away radiant and sweet. But today has been all holy and beautiful. I have talked things out with him even as with others and the responsibility is to be his. He understands the ideal that I represent, but his words of rapt worship half unconscious and involuntary showed me that I had not lowered it to him. And you know I have had no deceit anywhere. So everything is all right. When I asked him if I had been a temptation, he said "you made me natural. Dear, you made me a child of God."

রেমঁ লিখেছেন, 'নিবেদিতা বলেন, খোকা তোমার জন্য আমি খেটেছি সত্য। তোমার জীবনকে তোমার প্রতিভাকে বাঁচাবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, মনে করে দেখ, সবই করেছি। বোধহয়, আমার কর্মক্ষয় করবার জন্যই করেছি। তবে ব্যাপারটা ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণের যীশু বা মহম্মদ ভজনার মতো বা তাঁর নারীপূজার মতো।

অনুষ্ঠানটি যথাযথ একবার পালন করেই তিনি ছেড়ে দিতেন। আমিও কর্মক্ষয় হল বুঝে নিয়েছি, ও নিয়ে আর নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পারি না। আমায় এগিয়ে যেতে হবে। আমি সন্ন্যাসিনী ছাড়া আর কিছুই তো নই। অতীতকে বর্তমানের সারথী করা আমার চলবে না।'

নিবেদিতার চিঠিপত্র পড়লেই বোঝা যায়, জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়েছিল। অনুমান করাই যায়, বৃহতের ডাকে সাড়া দেওয়া এক অন্য নিবেদিতাকে শেষপর্যন্ত বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রও। জগদীশচন্দ্র বুঝেছিলেন— ছেলেমানুষি অভিমানের ঊর্ধ্বে ওঠা এই নিবেদিতা প্রকৃতপক্ষেই এক তপস্বিনী— যাঁর পরিচয় আগে তিনি পাননি। স্বামীজির প্রয়াণের পর এই নিবেদিতাকে দেখে, আশাই করা যায় জগদীশচন্দ্র বিস্মিত হয়েছিলেন এবং নিবেদিতার আত্মত্যাগ, একাগ্রতা ইত্যাদি তাঁকে মুগ্ধও করেছিল। যে কারণেই হয়তো জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, 'You made me natural, Dear, You made me a child of God.'

তবে, জগদীশচন্দ্র এবং নিবেদিতার ভিতর এই সাময়িক ভুল বোঝাবুঝিটি মিটিয়ে নিতে সারা বুলও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন— এমন অনুমান করাই যায়। এর কারণ নিবেদিতার একটি চিঠি। ২১ ডিসেম্বর, ১৯০২, নিবেদিতা লিখেছেন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে, 'My little Bairn is strong and fine. I love hin as I never dreamt that I could love. And we have talked out all our perplexities. He is a free soul. He depends on nothing. And my heart is at rest about it all. I owe infinite things to S. Sara for making our expression possible. And yet, the things itself would have been these anyway, just the same.'

নিবেদিতার প্রতি জগদীশচন্দ্রের সাময়িক অভিমান কেটে যাওয়ার আরো একটি কারণ আছে বলেও মনে হয়। জগদীশচন্দ্র বুঝেছিলেন, নিবেদিতা ভারতের স্বার্থে যে বৃহৎ কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছেন, এখন থেকে সেটাই বেশি প্রাধান্য পাবে তাঁর কাছে। নিবেদিতার আদর্শবাদীতার প্রতি জগদীশচন্দ্র শ্রদ্ধাশীলই হয়েছিলেন মনে হয়। পাশাপাশি জগদীশচন্দ্র এও অনুভব করেছিলেন, তাঁর বিজ্ঞানসাধনার কাজে নিবেদিতার সহায়তা তাঁর বরাবরই দরকার হবে। এই উপলব্ধি থেকেই জগদীশচন্দ্র আবার স্বাভাবিক ব্যবহারে ফিরে এসেছিলেন– এমন অনুমান করাই যায়।

নিবেদিতাও তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিতর জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনায় সাহায্য করার জন্য নতুন নতুন উদ্যোগ নিতে পিছুপা হননি। বলতে গেলে, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম তাঁর কাছে যেমন প্রাধান্য পেয়েছিল, তেমনি প্রাধান্য পেয়েছিল জগদীশচন্দ্রের গবেষণার কাজে সাহায্য করা। এর কারণ, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার কাজে সহায়তা করাটিকেও ভারতের প্রতি কর্তব্য বলেই মনে করতেন নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার বিষয়ে দেশীয় রাজন্যবর্গের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যাবে। দেশীয় রাজন্যবর্গের কাছ থেকে সেই সহায়তা যাতে পাওয়া যায়, সে উদ্যোগও রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন। ১৯০৩ সালের ১৮ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি পড়ে জানা যায়, জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলি সম্পর্কে বিশদে নিবেদিতাকে লিখে পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি। নিবেদিতা ১৮ এপ্রিলের ওই চিঠিটি শুরুই করেছেন এইভাবে, 'You asked me to write you an account of the actual discoveries which Prof. Bose had made, and of the difficulties under which he had laboured in making them.'

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির প্রত্যুত্তরে নিবেদিতা বিস্তৃতভাবেই জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে সব তথ্যাদি জানিয়েছিলেন। মনে হয়, নিবেদিতাও আশা করেছিলেন জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণার কাজে দেশীয় রাজন্যবর্গ সহায়তা করবেন। রবীন্দ্রনাথ এই তথ্যাদি নিবেদিতার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তার কারণ মনে হয়— রাজন্যবর্গের কাছে দরবার করার জন্য এই তথ্যাদি তাঁর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

নিবেদিতার এই চিঠিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ হিসাবেই বিবেচিত হবে। পরাধীন ভারতে নানাবিধ বাধাবিঘ্নের ভিতর একজন বাঙালি বিজ্ঞান সাধকের বিজ্ঞানসাধনার মূল্যায়ণ নিবেদিতার এই চিঠিটি। দীর্ঘ এই চিঠির শেষে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Ah India! India! Can you not give enough freedom to one of the greatest of your sons to enable him— not to sit at ease, but— to go out and fight your battles where the fire is hottest and the labour most intense, and the contest raging thickest? And if you can not do this — if you can not even bless your own child and send him out equipped, then — is it worth while that the doom should be averted, and the hand of ruin stayed, from this unhappy and so-beloved land?'

এই সময় আরো একটি কারণে নিবেদিতা বসু পরিবারের আরো কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের পত্নী অবলা বসু এই সময় সন্তানসম্ভবা ছিলেন। এই সংবাদ নিবেদিতাকে অতীব আনন্দিত করেছিল। এতটাই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, ১৯০৩-এর ৯ এপ্রিল জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন, 'Mrs. Bose is expecting a baby in about a fortnight. Isn't it wonderful? I hope it will be the begining of a new life and hope. You don't know how sweet, radiant she looks.'

এর পরপরই আবার ২৩ এপ্রিল জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন, 'Did I tell you that Mrs. Bose is to have a baby within the next three weeks? Is it not wonderful? I feel too as if the presence of a child would add a great mystic significance to all I love. I can not explain this even to myself. But doubtless it will be a consecrated babe. I think you should write sweet things to him, when it comes.'

নিবেদিতা মনে করছেন, এই শিশুটি ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর প্রিয় 'বেআন্' (খোকা) আর অবলা বসুর জীবনে এক নতুন আশার সঞ্চার হবে। নিবেদিতা যাঁদের ভালোবাসেন তাঁদের কাছেও এই শিশুটি এক ব্যাখ্যার অতীত অনুভূতি নিয়ে আসবে– তাও মনে করছেন। কিন্তু, অবলা বসু একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন। এই সময় শারীরিক এবং মানসিক দুভাবেই অত্যন্ত ভেঙে পড়েন অবলা। প্রকৃত বন্ধুর মতো সেইসময় নিবেদিতা বসু পরিবারের পাশে থেকে অবলা বসুকে সাহচর্য দিয়েছেন, তাঁকে সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। এই সময় ১৮ মে তারিখে অবলাকে সান্ত্বনা জানিয়ে একটি মর্মস্পর্শী চিঠি লেখেন নিবেদিতা। সেই চিঠিটি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিশদভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করা হল না।

দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করে আসার পর নিবেদিতা বাগবাজারে তাঁর মেয়ে স্কুলের প্রতিও নজর দিলেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটানো স্বামীজির বিশেষ লক্ষ্য ছিল। স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত ভারতীয় সমাজে জাগরণ সম্ভব নয় — তা স্বামীজি মনে করতেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে এবং লেখালেখিতে একথা যেমন ব্যক্ত করেছিলেন স্বামীজি তেমনি নিবেদিতাকেও একথা বলেছিলেন বারংবার। স্বামীজি চেয়েছিলেন– নিবেদিতা এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে সর্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করুন। যদিও নিবেদিতা ১৯০২-এর গোড়ায় বিলেত থেকে কলকাতায়

ফেরার পর তাঁর মেয়ে স্কুল চালু হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য নিবেদিতা স্কুলের প্রতি তখনও বিশেষভাবে নজর দিতে পারেননি। ১৯০২-এর সরস্বতী পূজার পরই বাগবাজারে নিবেদিতার স্কুলে মেয়েরা আসতে শুরু করেছিল। এই সময় স্কুল পরিচালনায় নিবেদিতাকে সহায়তা করেছিলেন শ্রীমতী বেট। শ্রীমতী বেটও নিবেদিতার সঙ্গেই বিলেত থেকে এসেছিলেন। স্বামীজির প্রয়াণের পর নিবেদিতা বক্তৃতা সফরে বেরিয়ে পড়ায় স্কুলের দিকে একেবারেই নজর দিতে পারেননি। নিবেদিতার অনুপস্থিতিতে শ্রীমতী বেটই এই সময় স্কুলের হাল ধরেন। দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করে এসে ১৯০৩ সালের গোড়া থেকে নিবেদিতা পুরোপুরি স্কুলের হাল ধরলেন। শ্রীমতী বেট যে তাঁকে স্কুল পরিচালনার কাজে সহায়তা করতেন, সে প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯০৩-এর ২৮ জানুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা একটি চিঠিতে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'On the 25th itself Bet and I went to the Math with 16 children— 'Sister Bet' is now a school mistress— having 20 children for sewing and fun at 4 daily!'

চিঠির এই পংক্তিটিতে আরো একটি বিষয় সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। তা হল, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সঙ্গে সরকারিভাবে নিবেদিতার সম্পর্ক ছিন্ন হলেও, মঠের সঙ্গে তাঁর একটি যোগাযোগ আছে। এবং এ অনুমানও করা যাচ্ছে যে, তাঁর স্কুলটি চালাতে মঠও সাহায্য করছে।

১৯০৩-এর মার্চ মাসে সিস্টার ক্রিস্টিন ফিরে এলেন মায়াবতী থেকে এবং স্কুল পরিচালনার কাজে নিবেদিতার পাশাপাশি সর্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। স্বামীজিও ঠিক এটাই চেয়েছিলেন। স্বামীজিও চেয়েছিলেন নিবেদিতার মতোই সিস্টার ক্রিস্টিনও এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করুন। বলতে গেলে, স্বামীজির সেই ইচ্ছা পূরণ করতেই নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন যেন হাত ধরাধরি করে নামলেন।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯০৩-এর ২৭ জানুয়ারি থেকে নিবেদিতা নিয়মিত স্কুলের কাজকর্ম পরিচালনা শুরু করেন। ওই সময়ে কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল না। ফলে, কিন্ডারগার্টেন প্রথায় নিবেদিতা তাঁর স্কুলের শিক্ষানীতি পরিচালনা করতেন। উইম্বলডনে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর পৃথক পৃথক সত্ত্বা বিকাশের জন্য যে শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, এখানেও তা-ই করলেন নিবেদিতা। উইম্বলডনের সমাপ্ত কাজটি যেন বাগবাজারে শুরু হল। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা লিখেছেন—বাংলা, ইংরাজি, অঙ্ক, ভূগোল এবং ইতিহাস ছিল

পাঠ্যসূচির ভিতর। এছাড়া সেলাই, ছবি আঁকা ইত্যাদিতেও জোর দিতেন নিবেদিতা। তাঁর ছাত্রীদের একটি সার্বিক বিকাশই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সম্পর্কে একটি রিপোর্টও তৈরি করেছিলেন নিবেদিতা। সেই রিপোর্টটি প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার লেখা থেকে বিশদ জানা যায়। সেইসময় নিবেদিতার স্কুলে ৫৪ জন ছাত্রী ছিল। তাদের ভিতর ২৮ জনের সম্পর্কে তিনি পৃথক পৃথক ভাবে রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিলেন। নিবেদিতার এই রিপোর্টটি সেই সময় কলকাতার হিন্দু সমাজ এবং সেই সমাজের কন্যাসন্তানদের সামাজিক এরং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। নিবেদিতার রিপোর্টের কিয়দংশ প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা উল্লেখ করেছেন। সেটুকু এখানে যথাসম্ভব অনুবাদ করে দেওয়া হল ঃ

সন্তোষিণী দত্ত ঃ জাতিতে কায়স্থ। স্কুলে ৬০ দিনের ভিতর ৫১ দিন উপস্থিত। পিতামাতার সঙ্গে স্বভাবের অনেক মিল আছে। পিতামহীর মতো বুদ্ধিমতী, মিশুক, অমায়িক। তবে, সম্পূর্ণ চপল প্রকৃতির। মেয়েটিকে আমার ভালো লাগে। ইংরেজি ভালোই শিখছে। চমৎকার রংয়ের কাজ করে। হাতের কাজের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং হাতের কাজ করতে করতে তন্ময় হয়ে যায়। খুব সহজেই ভদ্র ব্যবহার শিখছে।

কান্ত বসু ঃ জাতিতে কায়স্থ। ৬০ দিনের মধ্যে ৪৮ দিন স্কুলে উপস্থিত। চমৎকার হাসিখুশি স্বভাব। সব সময়ে সন্তুষ্ট। স্কুলে নিয়মিত আসার ইচ্ছা আছে। বাড়িতে কাজের জন্য দেরি হয়ে গেলেও স্কুলে আসে। বইগুলি যত্ন করে গুছিয়ে রাখে। খুব সুন্দর আঁকতে পারে। কিন্তু সেলাই অত্যন্ত খারাপ। বুদ্ধিমতী। শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত।

বিদ্যুৎমালা বসু ঃ জাতিতে কায়স্থ। যতগুলি বলিষ্ঠ চরিত্রের মেয়ে দেখেছি, তাদের মধ্যে অন্যতম। অদ্ভুত রকমের সাহসী এবং দৃঢ়। রুচিবোধ আছে। প্রথমদিকে একটু বেয়াড়া এবং অবাধ্য ছিল। একদিন তার সঙ্গে শান্তভাবে কথাবার্তা বলার পর কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এখন সস্নেহ হাসিই যথেষ্ট। খুব ভালো সেলাই করে। মাঝেমধ্যেই নানারকম উপহার নিয়ে আসে। মেয়েটির ভিতর প্রবল ইচ্ছাশক্তি আছে। তবে, বিয়ের পর হয়তো সব নষ্ট হয়ে যাবে।

জ্ঞানদাবালা ঃ জাতিতে কৈবর্ত। ২২ দিন স্কুলে এসেছে। খুব মজার মেয়ে। পড়াশোনা একদম পছন্দ করে না। ওকে শিক্ষা দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাড়ির কাজকর্ম করার ঝোঁক রয়েছে। ক্লাসরুম পরিষ্কার করতে বা বেটকে কোনো কাজে সাহায্য করতে বললে খুব খুশি হয়। আমি যখন প্লেগের কাজ পরিদর্শন করতে যেতাম, তখন আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। পরে জানলাম, ওর মা-র একটা ছোট

দোকান আছে। দোকানটা ও-ই দেখাশোনা করে। একদিন আমি যখন ওই দোকানে কলা কিনতে গিয়েছিলাম, তখন ও ওর মার থেকে অনেক বেশি উদারতা দেখাতে চেয়েছিল। এবং সে কারণে তিরস্কারও হয়েছিল মার কাছে। তিরস্কৃত হয়ে কেমন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল, তা আমি ভুলতে পারি না।

এম এন ঃ জাতিতে গোয়ালা। ৬০ দিনের ভিতর ৩৯ দিন স্কুলে এসেছে। খুব শান্ত, নম্র, সুন্দর একটি মেয়ে। আমার দেখা বুদ্ধিমতী এবং সুন্দরী ছাত্রীদের ভিতর একজন। কাজের ভিতর খুব সহজেই ডুবে যায়।

এই রিপোর্টটি পড়ে বোঝা যায়, সব শ্রেণির মেয়েরাই নিবেদিতার স্কুলে পড়তে আসত। শুধু তা-ই নয়, নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর ছাত্রীদের একটি সখ্যতাও যে গড়ে উঠেছিল, যার ফলে ছাত্রীদের সম্পর্কে এত খুঁটিনাটি তিনি জানতেন– তা বুঝতেও অসুবিধা হয় না। এই রিপোর্টটি পড়লে স্বীকার করতেই হবে যে, নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতেন। নিবেদিতার স্কুলের দরজা সারাদিন সবসময়ই অবারিত থাকত তাঁর ছাত্রী এবং প্রতিবেশিনী বালিকাদের জন্য। যখন-তখন বাচ্চা মেয়েরা এসে হাজির হত। রাস্তায় দেখা হলে ছুটে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলত। এই সব বাচ্চা মেয়েদের কাছেই নিবেদিতা বাংলা শিখতেন। বলতে গেলে, নিবেদিতা যেন বন্ধুর মতো হয়ে উঠেছিলেন এদের কাছে। এইরকমই এক বালিকার কথা পাওয়া যায় নিবেদিতার লেখায়। তার নাম ভবরানি চ্যাটার্জি। মেয়েটি বিকেলবেলা নিবেদিতার কাছে আসত। তার কাছে বাংলা পড়তেও শিখতেন নিবেদিতা। নিবেদিতা লিখেছেন, 'A very very clever and very queer girl. Terrible voice, but how good and quick! Very dark and specially non-Aryan looking. No grace of form or manner in any way about her. Yet the soul of kindness. She has a brother with whom she is a great friend and at one time they used to come and call on me in the afternoon and give me Bengali reading lessons.'

নিবেদিতার লেখা থেকে জানা যায় মূলত দুটি কারণে এই মেয়েদের লেখাপড়ার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছিল। প্রথমত, অনিয়মিত স্কুলে আসা এবং দ্বিতীয়ত, বাল্যবিবাহ। ছাত্রীরা এবং তাদের অভিভাবকেরা— কেউই নিয়মিত স্কুলে আসাটাকে প্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক মনে করত না। কারণ, তখনও তাদের ভিতর স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে চেতনারই জন্ম হয়নি। ছাত্রীদের এই অনিয়মিত স্কুলে আসার ঘটনায় নিবেদিতা অত্যন্ত হতাশ হতেন। নিয়মিত স্কুলে আসে না এরকম দুজন ছাত্রী সম্পর্কে নিবেদিতা যে রিপোর্ট লিখেছিলেন, তা তুলে ধরেছেন প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা।

আত্মপ্রাণার গ্রন্থ থেকেই জানা যায় নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'These girls were nice and good and won my regard from the first by having no ornaments on their faces. They were capricious however about coming. There was evidently no one to insist. Hence, clever as they were one could do nothing with them.'

বাল্যবিবাহ রোধ করার কোনো উপায় নিবেদিতার ছিল না। তবে তাঁর কোনো ছাত্রী যখন লেখাপড়ায় খুব আগ্রহ দেখাত, নিবেদিতা মনে মনে প্রার্থনা করতেন—ঈশ্বর যেন তাকে বাল্যবিবাহের হাত থেকে রক্ষা করেন। এইরকম এক ছাত্রী সম্পর্কে নিবেদিতা কী লিখেছিলেন, তা উদ্ধৃত করেছেন আত্মাপ্রাণা। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Now she is a great deal more dexterous than I. Her brush-work is good. She spontaneously drew Shiva temple one day. She is determined not to marry and has told someone she trusts that, if forced, she will commit suicide. She has tremendous conscience and most refined feelings and plenty of strong common-sense. She takes quickly to great ideas and must be saved from marriage.'

নিবেদিতার এই লেখা পড়লে এ-ও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, লেখাপড়া করার ইচ্ছা থাকলেও বহু মেয়েকেই বাধ্য হয়ে পরিবারের চাপে বিয়ে করে লেখাপড়া ছাড়তে হয়েছিল। অনুমান করাই যায়, নিবেদিতার স্কুলের বহু ছাত্রীও এভাবেই মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

তবে, শুধু যে মেয়েদের স্কুল করার মধ্যেই নিবেদিতা তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন তা নয়। স্কুল করার পাশাপাশি এলাকায় হিন্দু পরিবারের মেয়েদের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস শুরু করেন তিনি। নিবেদিতার সব জীবনীকারই, বিশেষ করে প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা এবং প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা এ সম্পর্কে বিশদ তথ্য দিয়েছেন। অন্তঃপুরবাসিনী এই মহিলাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার আরও একটি কারণও ছিল। নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন—স্ত্রীশিক্ষার প্রসার যদি ঘটাতেই হয়, তবে শুধু শিশু ও বালিকাদের ধরে ধরে স্কুলে আনলে হবে না, সংযোগ গড়ে তুলতে হবে অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সঙ্গেও। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হলে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজটাও অনেক সহজ হয়ে যাবে। নারী সমাজের সঙ্গে এই সংযোগ গড়ে তোলার উপদেশটিও তিনি তাঁর আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের থেকেই পেয়েছিলেন। যে কারণে, যেখানে যখনই নিবেদিতা বক্তৃতা সফরে গেছেন, মহিলাদের সভায় তিনি নিয়ম করে বক্তৃতা দিয়েছেন। ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে

তুলতে চেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে। এই সংযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও নিবেদিতা চিরাচরিত হিন্দু ভাবধারার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কখনোই শুরু থেকে তাঁদের ওপর পাশ্চাত্যের কোনো পাশ্চাত্য দেশীয় ভাবনা চাপিয়ে দিতে চাননি। বরং হিন্দু রীতিনীতি আচার পালনের ভেতর দিয়ে তিনি তাঁদের কাছে এই বার্তাই দিতে চেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁদেরই একজন। এই উদ্দেশ্যে এর আগেই ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে বাগবাজারে নিজের বাড়িতে একটি চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে অন্তঃপুরবাসিনীদের নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'উঠানের মাঝখানে একটি ছোট বেদীর উপর কথক ঠাকুরের বসিবার ব্যবস্থা হইল। মহিলারা বারান্দায় চিকের আড়ালে বসিলেন। ধূপধুনা দ্বারা একটি সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হইল। নিবেদিতাকে সকলেই ভালোবাসিতেন; কথকতা উপলক্ষ্যে মহিলারা আরো নিকটে আসিলেন। পূর্বে তাঁহারা গঙ্গাস্নানের পথে নিবেদিতার বাড়ির দিকে একবার তাকাইয়া যাইতেন। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, চোখাচোখি হইলে মৃদু হাস্যে অভ্যর্থনা করিতেন। পাড়ার মধ্যে একজন খাঁটি মেমসাহেব তাহাদেরই একজন হইয়া হিন্দু জীবনযাত্রা অনুসরণ করিতেছেন, ইহা সত্যই বিস্ময়কর। এখন হইতে সন্ধ্যার পর অবসর হইলে মহিলারা দুই-একজন করিয়া তাঁহার বাড়ি বেড়াইতে আসিতেন। নিবেদিতা তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার জন্য মোড়া দিতেন, এবং বহু সময় তিনি ও কৃস্টীন মেঝের উপর বিনীতভাবে বসিয়া থাকিতেন। ঘরকন্নার নানারকম কথা হইত। এদেশের পারিবারিক জীবন নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল; তিনি সাগ্রহে নানারকম প্রশ্ন করিতেন। নিবেদিতা ও কৃস্টীনকে সঙ্গে লইয়া প্রতিবেশিনীদের বাড়ি যাইতেন। এই পাড়ায় প্রথম বাসের সময়েই নিবেদিতা তাঁহাদের প্রিয় পাত্রী ছিলেন। এখন এইভাবে যাতায়াতের ফলে সকলের সহিত একটা সহজ সৌহার্দ্য স্থাপিত হওয়ায় নিবেদিতার আশা হইল, ইহাদের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করিতে পারিলে ফল পাওয়া যাইবে।' প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখাটি পড়লেই বোঝা যায়—যে পন্থায় অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সঙ্গে নিবেদিতা সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, তা শেষপর্যন্ত সুফলদায়কই হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

স্বামীজি চেয়েছিলেন মহিলাদের জন্য একটি বিধবাশ্রম বা অনাথাশ্রম স্থাপন করবেন। তাঁর এই ইচ্ছার কথা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন নিবেদিতাকেও। স্বামীজির প্রয়াণের পর নিবেদিতাও চেয়েছিলেন— স্বামীজির এই স্বপ্ন পূরণ করতে। তা অবশ্য পারেননি নিবেদিতা। কিন্তু বাগবাজার পল্লীর অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সঙ্গে যখন

তাঁর একটি নিবিড় সংযোগ স্থাপন হয়ে গেল, তখন নিবেদিতা মনে করলেন, শুধু শিশু বা বালিকা নয়, এবার এই অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাবে। সেইমতো নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন একটি পরিকল্পনাও করলেন। এই পরিকল্পনার কথা তাঁরা ব্যক্ত করলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দের কাছে। ব্রহ্মানন্দ এবং সারদানন্দ এই পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন, আর একাজে নিবেদিতাকে সহায়তা করতে এগিয়ে এল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। মহিলাদের জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনাটি পাকা হলে ১৯০৩ সালের ২৬ অক্টোবর নিবেদিতার বাড়িতে একটি মহিলা সভার আয়োজন করা হয়। ওই সভায় স্বামী সারদানন্দ গীতার ওপর ভাষণ দিলেন। সারা বুল তখন সদ্য জাপান ঘুরে এসেছিলেন। নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতেই ছিলেন তিনি তখন। সারা বুল সেদিনের মহিলা সভায় পিয়ানো বাজিয়ে শোনালেন। অবশেষে, ওই বছর ২ নভেম্বর বয়স্কা মহিলাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্কুল খোলা হল।

পরে, নিবেদিতার স্কুল সম্পর্কে 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক এস.কে.র‍্যাটক্লিফ লিখেছিলেন, 'Beginning as a tiny kindergarten, the school grew steadily until it had a large attendance of little Hindu girls up to the marriageable age, and a still larger number of married women and widows. As conducted by Sister Nivedita and her colleague, the school involved no uprooting from familier surroundings. Neither child nor woman was taken from her home into a foreign world; her schooling demanded only a dily migration from one home to another in the same lane or ward. The principle was, as Sister Nivedita herself expressed it, by means of familier factors of her daily life so to educate the Indian girl as to enable her to realise those ends which are themselves integral aspirations of that life. There was no attempt to convert her to any religions or social system alien from her own; but rather, by means of her own customs and traditions, to develop her in harmony with Indian ideals, the teacher themselves following those ideals as far as they could be made practicable.'

নিবেদিতার স্কুলের প্রতি হিন্দু অন্তঃপুরবাসিনীদের আগ্রহ এবং নিবেদিতার প্রতি তাঁদের আস্থার আরো একটি কারণ খুঁজে পাওয়া যায় র‍্যাটক্লিফের এই লেখাটি

পড়লে। নিবেদিতা যে কখনোই অন্যান্য মিশনারিদের মতো ধর্মান্তরকরণ করতে যাবেন না, বরং, হিন্দু রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী মেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করবেন—এই উপলব্ধি হওয়ার পরই নিবেদিতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে বাগবাজার এবং তৎসলগ্ন এলাকার হিন্দু পরিবারগুলির আগ্রহ বেড়ে যায়।

নিবেদিতা বয়স্ক মহিলাদের স্কুলের সময় করেছিলেন দুপুর বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত। অর্থাৎ, ঘর সংসারের কাজ সামলে তাঁরা যাতে স্কুলে আসতে পারেন— সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্র বসুর বোন লাবণ্যপ্রভা বসু এই স্কুলে মেয়েদের পড়ানোর দায়িত্ব পেলেন। ক্রিস্টিন সেলাই এবং হাতের কাজ শেখানোর দায়িত্ব পেলেন। সারদা দেবীর ঘনিষ্ঠ যোগীন মা ধর্মশিক্ষার দায়িত্বে রইলেন।

বয়স্ক মহিলাদের জন্য স্কুল খোলার সংবাদটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'রামকৃষ্ণ মিশন অন্তঃপুর প্রচার' শিরোনামে উদ্বোধনে (৫ বর্ষ) লেখা হয়েছিল--'বিগত ৯ কার্তিক, সোমবার, ১৭নং বোসপাড়া লেনে রমণীগণের উপকার জন্য স্বামী সারদানন্দ একটি গীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। প্রায় ৫০/৬০ জন অন্তঃপুরচারিণী বক্তৃতা শুনতে সমাগতা হন। মিসেস ওলি বুল (বিখ্যাত বেহালাবাদক ওলি বুলের বিধবা পত্নী—স্বামী বিবেকানন্দের একজন পরম ভক্ত) হারমোনিয়াম বাজাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রতি মঙ্গলবার বেলুড় মঠের স্বামী বোধানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করিতেছেন।

'বিগত ১৬ কার্তিক হইতে ঐ স্থানেই বয়স্কা স্ত্রীলোকদের জন্য স্ত্রী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। প্রতি সোম ও শুক্রবার ইহা খোলা থাকিবে। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিস ক্রিস্টিন গ্রীনষ্টীডেল সেলাই ও অধ্যাপক জগদীশ বসুর ভগিনী লেখাপড়া শিখাইবেন। এতদ্ব্যতীত পরমহংসদেবের স্ত্রীলোক ভক্তগণ আসিয়া ধর্মশিক্ষা দিবেন। শিক্ষার্থীগণকে বিদ্যালয়ের গাড়ী করিয়া আনা ও রাখিয়া আসা হইবে।'

একটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো। নিবেদিতার সঙ্গে সরকারিভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলেও, নিবেদিতার এই স্কুলের কাজকে মিশন নিজেদের কাজ বলেই মনে করছে। যে কারণে এই সংবাদটি প্রকাশিতই হয়েছে 'রামকৃষ্ণ মিশন অন্তঃপুর প্রচার' শিরোনামে। এরপর এরকম অনুমান করা যেতেই পারে যে, নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের বিচ্ছেদটা ছিল সম্পূর্ণ কৌশলগত, যা আগেও বলার চেষ্টা করেছি। পরোক্ষে নিবেদিতার কর্মকাণ্ডে রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তাও ছিল।

বয়স্ক মহিলাদের স্কুলে হিন্দু রমণীদের ভিড় ক্রমাগতই বাড়তে থাকায় বেশ খুশিই হয়েছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৪ সালের ২৬ জুলাই জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠিতে এই সন্তুষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'It is unheard of that married zenana ladies should leave their homes, and came to lessons at the house of a European. But they do it, and there has never been a moment's difficulty.'

তাঁর সঙ্গে হিন্দু অন্তঃপুরবাসিনী রমণীদের যে একটি আন্তরিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল, সে কথা নিবেদিতা চিঠিতেও জানিয়েছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠদের। বয়স্কদের স্কুল চালু করার আগে অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে যখন তিনি সংযোগ গড়ে তুলছেন ধীরে ধীরে সে সময়ই ১৯০৩ সালে ৯ এপ্রিল শ্রীমতী লেগেটকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I wish you could see our little house. I really think you would be charmed with it. Our first courtyard is quite a vision of red brick and green plants, and we keep it exquisitely clean, and have two or three good airy rooms. Sometimes, after dark, ladies come in to see us, and they sit down in basket chair with cushions, while we, often, sit on the floor to talk with them. I know they like it. And they are so fine—they never show the least surprise or shyness about foreign ways, and when we go to them they give us their things — a mat, or a stool, or what not, with such quiet dignity!'

মেয়েদের স্কুলের এই সাফল্যের পিছনে সিস্টার ক্রিস্টিনেরও অবদান কিছু কম ছিল না। নিবেদিতার পাশাপাশি এই স্কুলের জন্য ক্রিস্টিনও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ছোট ছোট মেয়েদের যেমন স্কুলে নিয়ে আসতেন ক্রিস্টিন, তেমনই বয়স্ক মহিলাদেরও যাতে এই স্কুলে আকৃষ্ট করা যায়—তার জন্যও ক্রিস্টিনের চেষ্টার অন্ত ছিল না। নিবেদিতার মতোই, ক্রিস্টিনও এই স্কুলের পিছনে তাঁর সবটুকু পরিশ্রম উজাড় করে দিয়েছিলেন। নিবেদিতা ক্রিস্টিনের এই ভূমিকাকে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। ১৯০৩ সালের ২৫ নভেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I never know how fretted and feverish and ineffective was my life, until I saw Christine's. All the things that Swamiji dreamt for me she is fulfilling. The women's work is a wonderful success. But SHE is more wonderful. Her whole

time is given up to study, work and visiting. She lives here, without fuss, without complexity. I look at her in a vain envy, and feel that I never know my our measureless inadequacy before. She has never been burnt up with the fiery longing to be and do the right things here, as I have. I mean, it does not seem as if she had been so. Yet I, who have been, fail to do it and be it, and she, who has not, is the ideal itsself. I have shed not bitter tears over the revelation, saying 'My whole life in a failure— all a failure'— and then I felt that I must not do this, for it hurt HIM even more than it did me.

'But still the contrast is there — and is complete. She is the Eastern woman and the Nun, without seeming to love it as an ideal, or even to think of it— and all my love of it— is thwarted and baffled, and I am nothing but an impulsive publicity seeking fool. Her nature is all one. She can yield to her our instincts, because they always lead her right. In me, sweetness wars against strength, and strength against sweetness— and I am not sure that my whole life is not indolence and self indulgence.'

ক্রিস্টিন সম্পর্কে নিবেদিতা কতখানি উচ্ছ্বসিত ছিলেন, তা এই চিঠিটি পড়েই বোঝা যাচ্ছে। এতটাই উচ্ছ্বসিত যে, ক্রিস্টিনকে নিজের অনেক ওপরে স্থান দিয়েছিলেন। অবশ্য ক্রিস্টিন সম্পর্কে নিবেদিতা প্রথমাবধিই উচ্ছ্বসিত। ক্রিস্টিন কলকাতায় আসার পর ১৯০২ সালের ৫ মে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I wish I could tell you about Christine. She is just as staunch as a Mcleod, she is gentle and clinging and not so dominant as you— but she is loyal and sympathetic and generous. Perfect in sweetness and perfect in trustworthiness and so large in her views! She cuts herself off from hosts of things— but she never condemns anything or anyone, and she is so quiet!'

ওই বছরই ১৯ এপ্রিল একটি চিঠিতে ক্রিস্টিন সম্পর্কে লিখেছেন, 'Christine is beyond words — soothing, gracious, lovely... Her character in radiantly beautiful.'

কতখানি দক্ষতার সঙ্গে ক্রিস্টিন এই স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করেছিলেন, তার একটি বিবরণও নিবেদিতা লিখে গিয়েছিলেন। নিবেদিতার মৃত্যুর পর ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় এই লেখাটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই লেখাটি একবার উল্লেখ করা হয়েছে। তবু, সুবিধার্থে এখানেও একবার উল্লেখ করা হল। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Yet, strong as was all this backing, there was always the doubt whether anyone could come! Ganges water was provided, in metal goblets, in case of thirst. Fresh rugs and cushions were placed on the yellow mattings as individual seats, the rose tinted wall had been newly colour washed. Men, it goes without saying, would be banished outside a circle of fifty yards. Everything had been done, in short, that could be thought of, to suggest purity and propriety. Still would the carriage return empty? We trembled at the thought of this mortification. If only six should appear, we were determined to put a good face on the matter; if ten or twelve, we should feel ourselves triumphant. The importance of my sister's efforts made itself duly appreciated, however, when sixty or seventy ladies came to us that first day, and showed extreme reluctance to admit that aftenoon need ever end.

'Old women came, accompanied by their daughters in law. Mothers brought their married daughters, who happened to be at home on a visit, Widows of twenty five and thirty were glad to come alone.And wedded wives were only too apt to be there, accompanied by a baby and a couple of childern! Sister Christine's place and success were assursed.'

নিবেদিতার এই লেখাটি পড়লে আরো একটি বিষয়ও পরিষ্কার হয়। তা হল, তাঁর স্কুলে যাঁরা আসতেন, তাঁদের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। নিবেদিতা জানতেন, তাঁর স্কুলে যাঁরা আসছেন, তাঁরা হিন্দু রক্ষণশীল পরিবার থেকেই আসছেন। তাঁদের দীর্ঘকালীন লালিত সংস্কার বা ধর্মবিশ্বাসে নিবেদিতা কোনোদিনই আঘাত দিতে চাননি। যে কারণে, তাঁর স্কুলে যে মহিলারা আসতেন, তৃষ্ণা পেলে তাঁদের কাঁসার গ্লাসে গঙ্গাজল পান করতে দেওয়া হত। মাদুরের ওপর বসবার জন্য

তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা আসন এবং তাকিয়া বিছানো থাকত। বাড়ি থেকে তাঁদের নিয়ে আসার জন্য ব্যবস্থাও যে করা হত (সম্ভবত ঘোড়ায় টানা গাড়ি যেত, নিবেদিতার লেখা পড়লে তাই-ই মনে হয়) তা-ও বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বাচ্চাদের স্কুল এবং বয়স্কা মহিলাদের স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়িতে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। কাজেই পাশে ১৬ নম্বর বাড়িটিও আবার ভাড়া নেওয়া হল। স্কুলের কাজ পুরোপুরি ১৬ নম্বর বাড়িতে হতে শুরু করল এবার। ১৮৯৮ সালে নিবেদিতা যখন প্রথম কলকাতায় এলেন তখন তাঁর থাকার জন্য এই ১৬ নম্বর বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়। পরে নিবেদিতা ১৭ নম্বর বাড়িতে চলে যান্। এবার দ্বিতীয় দফায় এই বাড়িটি ভাড়া নেওয়ার পরে এর একতলায় স্কুলের পড়াশোনা এবং সেলাই শেখানোর ক্লাস চলত। দোতলায় যে ঘরে একসময় নিবেদিতা থাকতেন, এখন থেকে ক্রিস্টিন সেখানে থাকতে শুরু করলেন। নিবেদিতা রয়ে গেলেন ১৭ নম্বর বাড়িতে। নিবেদিতা স্কুলের মেয়েদের সেলাই শেখাতেন। আর বড় ছাত্রীদের ভবিষ্যতে শিক্ষক হিসাবে গড়ে তোলবার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ দিতেন। প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ এবং 'বন্দেমাতরম্' গানটি গাওয়ানোর একটি আলাদা তাৎপর্য ছিল। মনে হয়, নিবেদিতা সচেতনভাবেই এই গানটি বেছেছিলেন। এই গানটি সেইসময় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর স্কুলেও এই গানটি গাওয়ার ভিতর দিয়ে নারীদের ভিতরও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতেই চেয়েছিলেন নিবেদিতা। মনে রাখতে হবে, সেইসময় ব্রিটিশ শাসকদের কাছে এই গানটি বিশেষ পছন্দের ছিল না। ফলে, সেই সময় কোনো বিদ্যালয়েই এই গানটি গীত হত না। তাঁর স্কুলে প্রত্যহ 'বন্দেমাতরম্' গানটি গাওয়া হলে ব্রিটিশ সরকারের রোষ যে বাড়বে বই কমবে না— তা নিবেদিতা বিলক্ষণ জানতেন। এবং জেনেশুনেই তিনি তাঁর স্কুলে এই 'বন্দেমাতরম্' গানটি চালু করেছিলেন।

নিবেদিতার জীবনীকার প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা লিখেছেন— নিবেদিতা শুধুমাত্র একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার ভিতর দিয়েই থেমে যেতে চাননি। নিবেদিতা ছিলেন আদর্শবাদী। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বাগবাজারের শিক্ষাকেন্দ্রটি ক্রমে ক্রমে শিক্ষা আন্দোলনের একটি ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াক। বিশেষ করে, তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন যেভাবে উচ্চশিক্ষায় ভারতীয়দের অধিকার ক্রমশ সংকুচিত করতে চাইছিলেন— সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিবেদিতার মনে হয়েছিল বাগবাজারের স্কুলটি থেকে ধীরে ধীরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি বাছাই করা দেশি-বিদেশি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ

জানিয়ে তাঁদের সাহায্য নেবেন— এমন পরিকল্পনাও করেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতার সে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পায়নি। কেন রূপ পায়নি— সে বিষয়ে অবশ্য নিবেদিতার দুই জীবনীকার প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা বা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা কেউই কিছু বলেননি। তবে মনে হয়, নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই এ নিয়ে আর বেশি এগোনোর বা ভাবনা-চিন্তার অবকাশ তিনি পাননি।

এই বছরই নিবেদিতা আরো একটি কাজ করেন। বিবেকানন্দ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে বিবেকানন্দ হোম চালু করা। বিবেকানন্দ সোসাইটি চালু করেছিলেন নিবেদিতার অনুগত জি. এন. মুখোপাধ্যায়। বিবেকানন্দ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে বিবেকানন্দ হোম চালু করায় নিবেদিতার অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। এই হোম চালু করার পিছনেও নিবেদিতার রাজনৈতিক ইচ্ছা ছিল। যদিও প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা বা বারবারা ফক্সের মতো নিবেদিতার জীবনীকারেরা এর পিছনে কোনো রাজনৈতিক কারণের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু নিবেদিতার সেইসময়ের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে, বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সঙ্গে নিবেদিতা যেমন সেসময় সংযোগ গড়ে তুলেছিলেন, তেমনই কিছু জাতীয়তাবাদী সংগঠনের জন্ম দিতে চেয়েছিলেন। এইসব সংগঠনের মাধ্যমে তরুণদের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করা হবে–এমনটাই চেয়েছিলেন নিবেদিতা। বিবেকানন্দ হোম গঠন করে তোলার পিছনেও নিবেদিতার সেই মানসিকতাই কাজ করেছিল। নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল এমন একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে যুবক এবং তরুণরা স্বামীজির জাতীয়তাবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হবে। নানারকম দুঃসাহসিক কাজের ভিতর দিয়ে ছাত্রদের সাহসী করে তোলা এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের ঘুরিয়ে এনে দেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কাজ ওই মঠের মাধ্যমে করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। এ বিষয়ে তাঁর সহায় হয়েছিলেন স্বামী সদানন্দ। ওই জাতীয় মঠ নিবেদিতা করে উঠতে পারেননি ঠিকই— তবে বিবেকানন্দ হোম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কিছুটা হলেও এইরকম প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। নিবেদিতার এইরকম মনোবাঞ্ছার কথা জানা যাচ্ছে ১৯০৩ সালের ২০ জানুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠিতে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Tomorrow morning I leave for Calcutta, and shall be so very glad to get home. Swami Sadananda is magnificent. "The idea" has grown now into a great new culture. I seem to be realising everyone of Swamijis opinions over again , and myself able to make the 10,000 Vivekanandas of whom He

was always talking. For just as He could understand and make Ramakrishnas, so I can see, in Him The Things He Himself could not. Well Sadananda is just absorbing it all. He talks now of "Principles instead of persons," and talks a lá Geddes far better than Geddes himself. But above all he dose not know what fear means. The Intellegence Department may enquire their own heads off— he is never disturbed— but gives me the signal for "a stirring lecture this time ending with 'the Invincible,'' as serenely as ever!! Is this not splendid?'

নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়ে আরো একটি বিষয়ও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজর ততদিনে নিবেদিতার ওপর পড়ে গিয়েছে।

বিবেকানন্দ হোমের মাধ্যমে যে নিবেদিতা ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন— তা জানা যায় ওই হোমের অন্যতম আবাসিক ছাত্র প্রমথরঞ্জন পালের স্মৃতিচারণে। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রমথরঞ্জনের এই স্মৃতিচারণটি সবিশেষ উল্লেখ করেছেন তাঁর গ্রন্থে। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে সেই স্মৃতিচারণের কিয়দংশ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আর একটি অংশ উল্লেখকরা হল। প্রমথরঞ্জন জানিয়েছেন, নিবেদিতা একদিন হোমের আবাসিক ছাত্রদের সামনে ভারতের একটি মানচিত্র টাঙিয়ে বলেছিলেন, 'My dear boys, you have all read geography in your school days. What you have read, heard or seen was only about the physical feature of India's mountains, hills, rivers, lakes, deserts etc. The map which you see now hung in the wall before you, is not merely a vast sheet of paper in print, but this is the picture of your Mother. From Kashmir to kanyakumarika is a living and throbbing entity. The mountains, the hills are Mother's bones, the rivers and streams are her arteries, and veins. The vacant spaces you see are not mere heaps of clay, mud or sand but her flesh. The trees, plants are her hairs...'

নিবেদিতা সেদিন বিবেকানন্দ হোমের আবাসিক ছাত্রদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'Wherever you go, your Mother's portrait which you see here let occupy the centre of your heart and Her thoughts crowd your memory.'

প্রমথরঞ্জন বলেছেন, '১৯০৩ সালে একটি ছাত্রাবাসের কক্ষে যে পূত শব্দটি উচ্চারিত হয়েছিল তা অল্পদিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের মতো। নিবেদিতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে মাতৃমন্ত্র তুলে এনে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন।' নিবেদিতার জীবনীকারেরা বিশদ ব্যাখ্যা দিতে না চাইলেও, এরপরে, বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিবেকানন্দ হোম প্রতিষ্ঠার পিছনে নিবেদিতার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল।

বিবেকানন্দ হোমের ছাত্রদের দুঃসাহসিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করানোর জন্য নানাবিধ পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন নিবেদিতা। এই পরিকল্পনাগুলির ভিতর অন্যতম ছিল দুর্গম পর্বত অভিযান। স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে ছয়জন ছাত্রকে তিনি পিন্ডারি গ্লেসিয়ার অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, সেইসময়ে এইসব পথ ছিল অসম্ভব বিপদসঙ্কুল এবং দুর্গম। এই ধরনের দুর্গম পথে অভিযান যে ছাত্রদের সত্য সত্যই মানসিক এবং চারিত্রিকভাবে সাহসী ও কঠোর করে তুলবে, তা উপলব্ধি করেছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৩ সালের ২৯ এপ্রিল, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'The latest thing is that Sadananda has taken 6 boys off to the mountain on tramp! They left last night for kathgodam— 5 boys of this quarter with a nephew of Dr. Bose amongst them — and are to attempt the Pindari Glacier— a party of 7.'

নিবেদিতার পরিকল্পনায় এবং উৎসাহে এরকমই আর একটি পবর্ত অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ। এবং রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই তিনি এই পর্বত অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবনীতে উল্লেখ করা সন-তারিখ অনুযায়ী ১৯০৪ সালের মে মাসে কোনো অভিযানে রথীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃস্মৃতিতে লিখেছেন— 'একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে বাবার দেখা হল। নিবেদিতা তখন ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভাবছিলেন। তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ– আমাদের দেশের ছেলেরা যেন দলে দলে হিমালয়ের পাহাড়ে পদব্রজে বেড়াতে যায়, বিশেষত তীর্থগুলি দেখে আসে। নিবেদিতা চুপ করে বসে থাকার পাত্রী ছিলেন না; যখন যা মনে আসত, তখন তা কাজে পরিণত করার চেষ্টা করতেন। বেলুড় মঠের কয়েকজন স্বামীজিকে ধরলেন হিমালয় ভ্রমণের দল জোগাড় করতে। বাবা যেই নিবেদিতার কাছ থেকে শুনলেন কয়েক দিনের মধ্যেই প্রথম দলটাকে নিয়ে সদানন্দস্বামী কেদার-বদরী রওনা হবেন, তখন তাঁর ইচ্ছা হল আমাকেও তাঁদের সঙ্গে পাঠান।' প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনীতে উল্লেখ আছে যে.

রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীনেন্দ্রনাথকেও এই পর্বত অভিযানে পাঠাতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে, রথীন্দ্রনাথের লেখা পড়লে মনে হয়, শেষপর্যন্ত দীনেন্দ্রনাথ যাননি। নিবেদিতার একটি চিঠিতে সদানন্দের নেতৃত্বে এই পর্বতাভিযানের আভাস পাওয়া যায়। ১৯০৪ সালের ৩০ জুন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন যে, 'But dear Sadananda has taken his holiday party of boys on tramp in the mountains, and has come home starved.'

ছাত্র এবং তরুণদের এই ধরনের দুঃসাহসিক অভিযানে পাঠানোর পিছনেও নিবেদিতার অন্যতর একটি চিন্তা কাজ করছিল বোঝাই যায়। জাতীয়তাবাদে এদের উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি, নানাবিধ দুঃসাহসিক কাজের মাধ্যমে এদের চারিত্রিক এবং মানসিক দৃঢ়তা এই কারণেই গঠন করতে চাইছিলেন নিবেদিতা, যাতে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে এরা দ্বিধা না করে। নিবেদিতার এ প্রয়াস কতদূর সফল হয়েছিল সে পরের কথা। কিন্তু এরকম একটি প্রয়াস সেইসময় একমাত্র নিবেদিতাই নিয়েছিলেন– এটাও মনে রাখতে হবে। পরে অবশ্য অর্থাভাবে নিবেদিতা আর এইরকম অভিযানের পরিকল্পনা করতে পারেননি।

জাতীয়তা প্রচার এবং জাতীয়তাবাদে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য যতরকম পন্থা গ্রহণ সম্ভব সবই করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। এদেশে আসার আগে, ইংল্যান্ডে থাকাকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে জনমত গঠনের অভিজ্ঞতা থেকে নিবেদিতা বুঝেছিলেন–একটি সংবাদপত্র হাতে থাকলে জনমত গঠনের কাজে কতখানি সুবিধা হতে পারে। সেই ভাবনা থেকেই এইসময় একটি সংবাদপত্র প্রকাশেও উদ্যোগী হন নিবেদিতা। এই বিষয়ে ব্রিটিশ সাংবাদিক উইলিয়ম স্টেডের সাহায্যপ্রার্থীও হন তিনি। স্টেডেরও ইচ্ছা ছিল ভারত থেকে রিভিউ অব রিভিউজ-এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করার। নিবেদিতার সেই সময়কার চিঠিপত্র পড়লে মনে হয়, এ নিয়ে স্টেডের সঙ্গে তাঁর কিছু কথাবার্তাও হয়েছিল। ১৯০৩ সালের ২৩ এপ্রিল শ্রীমতী লেগেটকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Our work is to create an idea— the idea that was Swamiji— but ideas are brought to birth in the dust of printing offices...'

তিনি এই চিঠিতে আরো লিখছেন, 'I am in consultation with Mr. Stead about something , and should be very very grateful if you or Mr. Leggett or Albert would have a conversation with him about it. I would like to know the things he would say to a third person —the pros and cons that would seem to him important.

'If you would think it proper, and if Albert would not think it troublesome, I know he would be delighted to see her at the office, and talk it out...

'I feel that if we can only carry out the plan— Swamiji would be so pleased.'

তবে এই কাজের পরিকল্পনা করতে গিয়ে অর্থের বিষয়টিও যে নিবেদিতাকে ভাবিয়েছিল–তা-ও এই চিঠিটি পড়েই বোঝা যায়। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'The open question now is money— and the sums involved sound so small that I do not like to tell him lest he think it absurd. We need less than £2000 capital. Our monthly expenses will be less than £70, and our reimbursements of course must be in proportion!!'

এইরকম একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে সেইসময় কতখানি উৎসাহী ছিলেন নিবেদিতা, তা বোঝা যায় ওই দিনই জোসেফিনকে লেখা একটি চিঠিতে। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Oh pray that the magzine may be possible. Swamiji would be overjoyed.'

নিবেদিতার এই পত্রগুলি পড়লে, আর একটি ধারণাও মনে আসে। তা হল— নিবেদিতা কোনো পত্রিকা প্রকাশ করুন— এরকম কোনো ইচ্ছা কি স্বামীজির মনে ছিল? বা এরকম কোনো ইচ্ছা কি স্বামীজি কখনো ব্যক্ত করেছিলেন নিবেদিতাকে? স্বামীজির জীবৎকালেই 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'ব্রহ্মবাদিন' এবং 'উদ্বোধন'— রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের তত্ত্বাবধানেই এই তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ আন্দোলন এবং বেদান্ত ভাবনা প্রচারের উদ্দেশ্যেই স্বামীজি এই তিনটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে নিবেদিতার মাধ্যমে আর একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা কেন চিন্তা করবেন স্বামীজি? যদি করেই থাকেন, তাহলে কি তা এইজন্যই যে, এই তিনটি পত্রিকা থেকে ভিন্নতর কোনো পত্রিকা প্রকাশের কথা স্বামীজিও ভেবেছিলেন? নিবেদিতা যেভাবে তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন যে, এরকম একটি পত্রিকা প্রকাশ হলে স্বামীজির আনন্দের সীমা থাকবে না —তাতে এরকমও মনে হতে পারে যে, স্বামীজিও হয়তো এইরকম একটি পত্রিকার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে পত্রিকা জাতীয়তার কথা বলবে। তবে, এ সবটাই অনুমান সাপেক্ষ। নিবেদিতার চিঠিপত্রে কিছু অস্পষ্ট ইঙ্গিত ছাড়া এর পক্ষে সেরকম কোনো তথ্য-প্রমাণ নেই।

তবে, নিবেদিতার এই পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস সফল হয়নি। ১৯০৩-এর ১৯ জুন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'If you have not yet

seen Mr. Stead, it is of no consequence, as the negotiations are off for the present, but with evident respect on his side for the political side of my brain, which is not a little secretly and subtly flattering.'

ওই বছরই ২৩ সেপ্টেম্বর আবার জোসেফিনকে লিখেছেন, '...I think that I am not coming west this winter. I wrote to Mr. Stead and gave it up . The offer of course was beyond my wildest dreams, but so much is opening up here between Bet's school and Mohameden connections and the possibility of Miss Lockwood's joining us and the scientific work, and a hundred plans for the neighbourhood itself, that I feel that Swamiji wishes me to stay here.'

চিঠিটি পড়েই বোঝা যাচ্ছে, ইংল্যান্ডে গিয়ে স্টেডের সঙ্গে কথাবার্তা বলার একটি পরিকল্পনা নিবেদিতার ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা বাতিল করে দেন তিনি। এরও কারণ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, তাঁর অন্যান্য ব্যস্ততা। এক্ষেত্রেও মনে হয়, তাঁর রাজনৈতিক ব্যস্ততা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, নিবেদিতা শেষপর্যন্ত কাগজ প্রকাশের পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব না হলেও, উইলিয়ম স্টেডের সঙ্গে নিবেদিতার একটি সুসম্পর্ক এবং পারস্পরিক মতামত বিনিময় বরাবরই ছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি স্টেডের বরাবরই সহানুভূতি ছিল। স্টেডের এই মনোভাব নিবেদিতা জানতেন এবং বিভিন্ন সময়ে চিঠিপত্রে বা বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে স্টেডকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, ১৯০৫ সালে যখন গোখলে ইংল্যান্ডে যান, তখন নিবেদিতা চেয়েছিলেন গোখলে স্টেডের সঙ্গে দেখা করুন এবং লর্ড কার্জনের 'ভারতবিদ্বেষী' কাজকর্ম সম্পর্কে স্টেডকে অবহিত করান। এ ব্যাপারে স্টেড এবং গোখলেকে নিবেদিতা সেইসময় যে চিঠি লিখেছিলেন, তা এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০৫ সালে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে স্টেডের ভূমিকাতেও খুশি হয়েছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৬-এর ২৫ মে সারা বুলকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Mr. Stead was good about partition. Wasn't he?'

স্টেডও নিবেদিতা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন— এ অনুমান করাই যায়। কারণ, স্টেড তাঁর পত্রিকা 'রিভিউ অব রিভিউজ'-এ নিবেদিতার বিভিন্ন লেখালেখি

ধারাবাহিক প্রশংসা করে গিয়েছেন। এমনকি, ভারতের মুক্তি আন্দোলন বিষয়ক নিবেদিতার লেখালেখিগুলিরও সারসংক্ষেপ স্টেড তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। বোঝাই যায়, স্টেডের প্রতি পূর্ণ আস্থা যেমন নিবেদিতার ছিল, তেমনই নিবেদিতার কাজকর্মেও স্টেডের সমর্থন ছিলই। এই পারস্পরিক আস্থা এবং বিশ্বাস যে নিবেদিতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অটুট ছিল, তাও বোঝা যায় নিবেদিতার একটি চিঠিতে। নিজের কাজে স্টেডের সহায়তা যে সবসময়ই পাবেন— এ ভরসা নিবেদিতার ছিল। তার প্রমাণ এই চিঠিটি। মৃত্যুর মাত্র কদিন পূর্বে ১৯১১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক এস কে র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Yum (Josephine Macleod) wants me to try to get a character sketch of S.Sara into the Review of Reviews for England and America. What do you say? To me, it seems hardly good euongh. But when I have your answer to my questions about a book and this, it will be time enough to act. I assume that Mr. Stead would be happy to do what under the circumstances might be a very substantial service!'

স্টেড শুধু যে নিবেদিতার কার্যাবলী, জাতীয়তাবাদী লেখাপত্র তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করতেন বা মানসিকভাবে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন তা-ই নয়, কখনো কখনো ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রচন্ড সরবও হতেন। ১৯০৯ সালের ঘটনা এক্ষেত্রে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ওই সময় ইংল্যান্ড থেকে বিপিনচন্দ্র পাল 'The Aetiology of the Bomb' শীর্ষক একটি লেখায় ব্রিটিশ সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র বোমাকে হাতিয়ার করে রাজনীতিকে ওই লেখায় সমর্থন করেননি। তা না করেও, ব্রিটিশ সরকারের নীতিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে বিপিনচন্দ্র লেখেন, ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দমনের ভ্রান্ত নীতির কারণেই এই ধরনের সন্ত্রাসী কাজকর্ম জন্ম নিয়েছে। বিপিনচন্দ্র সম্পাদিত 'স্বরাজ' পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখাটি প্রকাশের পর বোম্বাইয়ের চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ওই পত্রিকার বোম্বাইস্থিত এজেন্টকে একমাসের জন্য কারাগারে আটক করলেন। বিপিনচন্দ্রকে তখন ধরা যায়নি। কারণ, তিনি ইংল্যান্ডে ছিলেন। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে স্টেড তাঁর 'রিভিউ অব রিভিউজ'-এ একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। লেখাটির শিরোনাম ছিল, 'Freedom of the Press in India : A typical Instance of Rerpression.'

এ প্রসঙ্গে ১৯০৯ সালের ২৫ নভেম্বর র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'WTS [William T. Stead] did splendidly regarding India, in his October number— and shops containing R.R. [Review of Reviews] have been raided by the police and the papers seized!'

এর কিছুদিন পরেই ১ ডিসেম্বর নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে চিঠি লিখে অন্য কথা বলেন। নিবেদিতা লেখেন, 'I think I was wrong about the fate that had overtaken the Review of Reviews. I spoke from hearsay, seeing no papers and I hear that the Gazette has publishsd an authorised statement— that the police paid a friendly visit to Bombay booksellers, and persuaded them to ship back to England!'

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, যে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে এই দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছিলেন— সে তথ্য ঠিক ছিল না। বরং, প্রথম পত্রেই ঠিক তথ্য র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। মনে হয়, পরে কেউ তাঁকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছিল। এবং সেই ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই নিবেদিতা দ্বিতীয় চিঠিতে র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে এই মন্তব্য করেছিলেন। প্রকৃত তথ্য হল, ১৯০৯ এর ডিসেম্বর মাসে, ভারতে সংবাদপত্রের ওপর ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির কড়া সমালোচনা করে স্টেড তাঁর পত্রিকায় আরো একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধটির শিরোনাম ঃ 'A plea for a censorship on the English Press circulating in India : An open letter to Lord Morley.' এতেও থেমে থাকেননি স্টেড। পরের বছর, ১৯১০ সালে, পরপর বেশ কয়েকটি লেখায় স্টেড ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির সমালোচনা করেন। আর এটাও সত্য যে, 'রিভিউ অব রিভিউজ'-এর অক্টোবর মাসের সব সংখ্যা বোম্বাইয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, কোনো ভুল তথ্যের ভিত্তিতে নিবেদিতা তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে 'রিভিউ অব রিভিউজ' সম্পর্কে ওই মন্তব্য করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই ডন সোসাইটির সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের বিষয়টিও উল্লেখ করা যেতে পারে। জাতীয়তাবাদের প্রচারে এবং মুক্তি সংগ্রামের কাজে বেশ কিছু সংগঠনকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। তার একটা বড় কারণ, নিবেদিতার নিজস্ব কোনো সংগঠন ছিল না। বা, কিছু কিছু সংগঠন, যাদের প্রতিষ্ঠার পিছনে নিবেদিতার উৎসাহ এবং সাহায্য ছিল— তারা অনেক সময়ই নিবেদিতার অভীষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি। তাদের এই ব্যর্থতার কারণেও

নিবেদিতা নতুন নতুন সংগঠন খুঁজে বের করে তাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই— নিজের রাজনৈতিক লক্ষ্যে এইসব সংগঠনকে ব্যবহার করা। ডন সোসাইটির সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক স্থাপনের পিছনে কারণটিও এই।

ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সতীশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। ১৯০২ সালে, স্বামীজির প্রয়াণের পরই সতীশচন্দ্র ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই নিবেদিতা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯০৪ থেকে ১৯০৬–এই সময়কালের ভিতর ডন সোসাইটিতে অনেকগুলি বক্তৃতাও দিয়েছেন নিবেদিতা। যদিও, ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্রকে কখনোই ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের বিরোধী বলা যাবে না। কেননা, ডন সোসাইটি ম্যাগাজিনে একাধিকবার সতীশচন্দ্র ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের প্রশংসাই করেছিলেন। লিজেল রেমঁ যদিও বলেছেন, নিবেদিতা ' সতীশ গোষ্ঠীর' অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তা কিন্তু ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ব্যাখ্যাই যথার্থ। তিনি লিখেছিলেন– 'নিবেদিতা ডন সোসাইটির সদস্যদের কাছে প্রকাশ্যে উগ্র রাজনৈতিক-জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছেন এবং অপ্রকাশ্যে এখান থেকে নিজ দলের সদস্য জোগাড় করেছেন! যথা, ডন সোসাইটির ইন্দ্রনাথ নন্দী নিবেদিতার দলভুক্ত ছিলেন।' এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না, রাজনৈতিক কৌশলগত কারণেই নিবেদিতা ডন সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। সতীশচন্দ্রের গোষ্ঠীতে নিজের নাম লেখানোর জন্য ডন সোসাইটিতে যাননি।

নিবেদিতা শুধু ডন সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতেন না। 'ডন' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেনও। প্রয়াণের আগে পর্যন্ত, ১৯১১ সাল অবধি নিবেদিতা 'ডন' পত্রিকায় লিখে গিয়েছেন। 'ডন' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় নিবেদিতার বক্তৃতার সারাংশও খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হত। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা প্রধানতঃ জাতীয়তা ও জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। ভারতীয় সংস্কৃতি তাঁর বক্তৃতার মূল ভিত্তি ছিল। রুশ বিপ্লবের মহান নেতা প্রিন্স ক্রপটকিনের শিক্ষাপ্রাপ্ত নিবেদিতা ঐ সকল বক্তৃতায় আধুনিক সমাজবিজ্ঞানসম্মত অনেক নতুন কথাই বলিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

গিরিজাশঙ্করের মতে, 'ডন সোসাইটি যেন একটি শতদল পদ্ম, আর ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যাদায়িনীরূপে ঐ পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। পাপড়িগুলি তাঁহার দুই চরণ বেড়িয়া পড়িয়া আছে। এই কল্পনাকে রূপ দিয়া যদি কোনো চিত্রকর ছবি অঙ্কিত করেন, তবে সেই ছবি মিথ্যা হইবে না।'

বিবেকানন্দ সোসাইটির তুলনায় ডন সোসাইটির সাফল্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গিরিজাশঙ্কর বলেছেন, 'নিবেদিতা যদিও অনেক আশা লইয়া বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা ডন সোসাইটির মতো উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারে নাই। ইহার কারণ, বিবেকানন্দ সোসাইটিতে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের মতো লোক ছিল না। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা ঠাকুরঘরে পূজা-আচ্চা, ধ্যানধারণা, ভোগ-আরতি লইয়া ব্যস্ত, বিবেকানন্দ সোসাইটিতে আসিয়া বক্তৃতা করিবার অবসর তাঁহাদের ছিল না।'

তবে, একসময় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি বীতস্পৃহ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন নিবেদিতা। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সম্পর্কে প্রথমে অতি উচ্চ ধারণা এবং উচ্চাশা নিবেদিতার ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, এই পরিষদ ভারতীয়দের জন্য উচ্চশিক্ষার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে দেশবাসীকে। কিন্তু সত্যি বলতে পরিষদ তেমন কিছুই করে উঠতে পারেনি। এতে নিবেদিতার আশাভঙ্গ হয়েছিল। ১৯০৯ সালের ২৫ নভেম্বর র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'The National College in abandoned to forces of reaction. The thing was founded in a blaze of excitement — and its nationalism was a word, not a thing — not an idea. Apart from P.G., [Patrick Geddes?] it is bound to fall back upon a narrow orthodoxy. Even C. [Coomarswamy?] could not do much— for he is more or less a visionary.'

এই ডন সোসাইটির কাগজেই নিবেদিতা প্রবর্তিত বিবেকানন্দ গোল্ড মেডাল-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৯০৫-এর নভেম্বর সংখ্যায় ডন সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়– প্রতিযোগীরা কোন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ লিখতে পারেন। এই বিবেকানন্দ গোল্ড মেডাল চালু করার পিছনেও নিবেদিতার জাতীয়তাবাদী চিন্তা কাজ করেছিল। এই মেডাল চালু করার পিছনেও নিবেদিতার উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্রদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা। ডন সোসাইটির ম্যাগাজিনে বিবেকানন্দ মেডালের যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি পড়লেই বোঝা যাবে প্রবন্ধ লেখানোর ভিতর দিয়ে নিবেদিতা কীভাবে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ছাত্র-যুব সম্প্রদায়কে।

এইসময়ে নিবেদিতার জীবনযাত্রার একটি ছবি পাওয়া যায়, তাঁর স্কুলের ছাত্রী সরলাবালা দাসী (পরে নিবেদিতার মহিলা স্কুলের অধ্যক্ষা)-র স্মৃতিচারণায়। খুব

ছোট বয়সে সরলাবালা নিবেদিতার স্কুলে ছাত্রী হয়ে আসেন। তিনি স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন— 'সেকালে অন্য ইয়োরোপিয়ান মেমসাহেবদের মতো নিবেদিতার ঘরে কোনো টানা পাখা ছিল না। গরমকালে গরমে ঘামতে ঘামতেই নিবেদিতা ঘরে বসে একমনে তাঁর লেখার কাজ করে যেতেন। যখন মাঝে মাঝে ঘরের বাইরে আসতেন, তখন দেখা যেত, গরমে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। উনি অন্য ঘরগুলিতে ঘুরে ঘুরে দেখতেন স্কুলের মেয়েরা কেমন পড়াশোনা করছেন। কখনো কখনো ওঁর মাথায় খুব যন্ত্রণা হত। মাথাটা টিপে ধরতেন। আবার কিছুক্ষণ পরেই নিজের ঘরে লেখাপড়ার কাজে মগ্ন হয়ে যেতেন।'

এই ছোট্ট স্মৃতিচারণাটুকুই স্পষ্ট করে দিচ্ছে, নিবেদিতার নৈষ্ঠিক জীবনযাপনের ছবি।

তিন

নিবেদিতার জীবনীকারদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯০২ সালে নিবেদিতা ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর, বোসপাড়া লেনে তাঁর এই বাড়িটি কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, দেশনেতা, শিল্পী, বিপ্লবী, ছাত্র সকলের কাছেই একটি মিলন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। বাংলার নবজাগরণ এবং একইসঙ্গে বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে এই বাড়িটি। সব অর্থেই এই বাড়িটি ঐতিহাসিক। এই বাড়িতে বিবেকানন্দ তো আসতেনই, আসতেন সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, নন্দলাল বসু, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক এস. কে. র‍্যাটক্লিফ, দীনেশচন্দ্র সেন— এমন অজস্র বিশিষ্টজনই এই বাড়িতে এসেছেন। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল, নিবেদিতার বাড়িটা সম্পূর্ণভাবেই হিন্দু রমণীর অন্তঃপুর হবে। কিন্তু স্বামীজির এই ইচ্ছাটি নিবেদিতা পূরণ করেননি। তিনি তাঁর বাড়ির দ্বার অবারিত করে দিয়েছিলেন যে কোনো ধর্মের, যে কোনো বর্ণের, যে কোনো ভাষাভাষী মানুষের জন্য। নিবেদিতা জানতেন, হিন্দু রমণীর অন্তঃপুরের মতো বিধিনিষেধ আরোপ করলে, যে কাজে তিনি নেমেছেন সে কাজে অন্তরায় সৃষ্টি হবে। সেজন্যই তাঁর বাড়ির দুয়ারটি অবারিত রেখেছিলেন তিনি। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখায় নিবেদিতার বাড়ির একটি চিত্র পাওয়া যায়। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'পুরাতন ধরনের বাড়ীটির চতুর্দিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়ীর দরজার উপর একটি ছোট ফলকে লেখা 'The house of Sisters' (ভগিনী নিবাস) যাতায়াতের পথে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই ক্ষুদ্র উঠান, লাল রঙের সিমেন্ট দিয়া বাঁধানো। একধারে টবের উপর কতগুলি গাছ। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই নিবেদিতার পাঠকক্ষ।' নিবেদিতার জীবনীকারদের লেখা থেকে আরো জানা যায়, বোসপাড়া লেনের এই বাড়িতে সারাদিনই সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড় লেগে

থাকত। এর সমর্থন পাওয়া যায় স্যার যদুনাথ সরকারের স্মৃতিচারণে। যদুনাথ সরকার লিখেছিলেন, 'অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই যখন তখন তাঁর (নিবেদিতার) বাড়িতে এসে উপস্থিত হতেন। তাঁর কাজকর্মের ব্যাঘাতও ঘটাতেন। নানারকম কথাবার্তার পর কেউ তাঁর কাছে অর্থসাহায্য চাইতেন, কেউ কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য লেখা চাইতেন, কেউবা অন্যতর কোনো সাহায্য চাইতেন। খুব কম লোকই তাঁর কাজে সাহায্য করতে চাইতেন।'

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসেই শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য গোপালের মা এই বাড়িতে এসে নিবেদিতার সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গোপালের মা এই বাড়িতেই নিবেদিতার সঙ্গে ছিলেন। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আছে। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ প্রতি রবিবার সকালে এই বাড়িতে এসে নিবেদিতার সঙ্গে প্রাতঃরাশ সারতেন। নিবেদিতার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে র‍্যাটক্লিফ লিখেছেন, 'প্রতি রবিবার সকালে তাঁর (নিবেদিতার) গৃহে আমরা প্রাতঃরাশে যোগ দিতাম। প্রাতঃরাশের আয়োজন ছিল অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু হাস্যকৌতুক ও পরিশেষে নানারকম আলোচনার ভিতর দিয়ে দীর্ঘসময় কেটে যেত। নিবেদিতার বাড়ি ছিল চমৎকার বৈঠকখানা। যেসব ইংরেজ এবং আমেরিকান স্বল্প সময়ের জন্য কলকাতায় আসতেন, তাঁদের দেখা মিলত নিবেদিতার বাড়িতে। এছাড়াও, বিভিন্ন চরিত্রের ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচিত হবার এমন চমৎকার জায়গা আর কোথাও ছিল না। কাউন্সিলের সদস্যরা, বাংলাদেশ ও কলকাতার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা, যাঁদের কাজ দেশীয় সংবাদপত্রগুলির প্রতিদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল, ভারতীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বক্তা, সাংবাদিক, ছাত্র সকলেই এখানে আসতেন। প্রায়ই রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো সন্ন্যাসীকে দেখা যেত। দেশ পর্যটক কোনো পণ্ডিত, কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা, বা অন্য কোনো প্রদেশের রাজনৈতিক নেতা— যিনি যখনই কলকাতায় আসুন না কেন, একবার নিবেদিতার বাড়ি ঘুরে যেতেন। একজন বাঙালি সম্পাদকের (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়?) কথা মনে পড়ে। তিনি প্রায়ই যাতায়াত করতেন ও নানারকম কথায় উচ্চহাসির রোল তুলতেন। তাঁর সরস মন্তব্যগুলি খুব সূক্ষ্মভাবে মর্মবিদ্ধ করত। আর একদিনের মধুর স্মৃতি মনে পড়ে। সম্ভবত ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের এক শীতের প্রভাতে, মি. উইলিয়ম জেনিংস সপত্নীক নিবেদিতার বাগবাজারস্থ গৃহে প্রাতঃরাশে যোগ দেন। জেনিংস তখন ভূপর্যটনে বেরিয়েছেন। ভারত ভ্রমণকালে তাঁর কলকাতায় আগমন। সেদিনের প্রভাতটি বড় আনন্দের ছিল।

'বাগবাজার পল্লীর শান্ত, গর্বিত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করতে নিবেদিতার কতদিন লেগেছিল—আমার জানা নেই। নিবেদিতা এঁদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করার দুবছর পর আমি যা দেখেছিলাম, তা বলতে পারি। নিবেদিতা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মিশে গিয়েছিলেন। হিন্দু প্রতিবেশীরা তাঁকে একান্ত আত্মীয় মনে করত। বাজারে, পথে, গঙ্গাতীরে—প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, এবং রাস্তাঘাটে সকলে তাঁকে যে শ্রদ্ধা এবং প্রীতির সঙ্গে অভিবাদন করত, তা অতুলনীয়।'

বাগবাজার পল্লির পরিবেশ রক্ষার দিকেও নিবেদিতার সতর্ক নজর ছিল। সে সময় প্রতিবছরই গ্রীষ্মের শুরুতে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা যেত। এ ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে নিবেদিতা সক্রিয় ছিলেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের বোঝাতেন, রাস্তাঘাটে যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলতে। পল্লির রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখতে তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পল্লিবাসী মহিলাদের এক্ষেত্রে কী করণীয় তা শিক্ষা দিতে 'নারীগণের প্রতি নারীর উক্তি' শীর্ষক একটি আবেদনপত্র নিবেদিতা লিখেছিলেন। সে আবেদনপত্রটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নিবেদিতার স্কুলে ছাত্রী সমাগম হতে শুরু করলেও তাঁর অর্থাভাব কিন্তু মেটেনি। স্কুল চালানোর পাশাপাশি আরো যেসব পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, তার জন্য অর্থ প্রয়োজন হয়ে পড়ল। নিবেদিতা স্থির করলেন 'ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ' পুস্তকটি রচনার কাজ শেষ করবেন। কিন্তু কলকাতায় হাজারো কাজের মধ্যে থাকলে লেখা যে সম্পূর্ণ হবে না—তা নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন। অবশেষে, বইয়ের কাজ শেষ করার জন্য ১৯০৩-এর জুলাই মাসে জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুর সঙ্গে দার্জিলিং পাড়ি দিলেন। ক্রিস্টিনকে দিয়ে গেলেন স্কুলের কাজ সামলাতে। বসু দম্পতির সঙ্গে দার্জিলিং যাওয়ার আরো একটি উদ্দেশ্য অবশ্য নিবেদিতার ছিল। তা হল—জগদীশচন্দ্রের পুস্তক লেখার কাজে সহায়তা করা।

১৯০৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে (৭ সেপ্টেম্বর) 'ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ'-এর পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ করেন নিবেদিতা। বইটি প্রকাশিত হয় এর প্রায় একবছর পরে, ১৯০৪-এর জুন মাসে। বইটি নিবেদিতা উৎসর্গ করেন তাঁর আচার্য স্বামী বিবেকানন্দকে। আর আশ্চর্যের কথা, বইটির যে উৎসর্গপত্র লিখে দিয়েছিলেন নিবেদিতা, সেখানে স্বহস্তে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন স্বামীজির প্রিয় একটি বাক্য— 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে।' জগদীশচন্দ্রের এই লেখা সমেতই উৎসর্গপত্রটি ছাপা হয়েছিল। এক্ষেত্রে একটি কৌতূহল স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে। তা হল—যে জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার গুরুভক্তি নিয়ে এত ব্যঙ্গবিদ্রুপ

করতেন, তিনিই কী করে নিবেদিতার বইয়ের উৎসর্গপত্রে স্বামীজির প্রিয় বাক্যটি লিখে দিয়েছিলেন? তাহলে কি এরকমই ধরে নেওয়া উচিত—বিবেকানন্দের প্রতি নিবেদিতার ভালোবাসা এবং সম্পর্ককে জগদীশচন্দ্রও শেষপর্যন্ত শ্রদ্ধা না জানিয়ে থাকতে পারেননি?

১৯০২ থেকে ১৯০৫—ভারতীয় রাজনীতির এই সময়কালটিকে গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'নিবেদিতা যুগ' বলেছেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, '...যদি এমন দেখা যায়, উদ্দিষ্ট সময়টিতে সর্বভারতীয় চেতনাসৃষ্টিতে এবং সক্রিয় কর্মে উদ্দীপিত করার ব্যাপারে বিশেষ একজনের ভূমিকা অপর মানুষদের ভূমিকার তুলনায় অধিক, তখন সংকীর্ণ অর্থে অন্ততঃ তাঁর নামে যুগটির নামকরণ করা সম্ভবপর। আমরা মনে করি, পূর্বোক্ত সময়টিতে নিবেদিতা অন্য সকল জাতীয় নেতা অপেক্ষা ভারতীয় জাতীয়তার ক্ষেত্রে এবং রাজনীতিতে বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।' নিবেদিতাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুবাদে এস. কে. র‍্যাটক্লিফ লিখেছিলেন—'নিবেদিতা যখন ভারতবর্ষে কাজ করতে শুরু করেন তখন সেখানে মননজীবন ও জনজীবনে অদ্ভুতরকম নিষ্প্রাণ স্থবিরত্ব। কিন্তু পরিবর্তনের কম্পনও দেখা যাচ্ছিল। নবচেতনার বিকাশ, নূতন আদর্শের দ্রুত সংগঠন, এবং জাতীয় জীবন ও শক্তির উদ্বোধনের উষালগ্ন দেখার উল্লাস তিনি কিন্তু লাভ করেছিলেন। নবভারত গঠনে যেসব প্রভাব সক্রিয়, তাদের ঠিক চেহারা এখনো অস্পষ্ট; কিন্তু একথা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা চলবে, সক্রিয় প্রভাবগুলির মধ্যে এমন একটিও নেই যা ভগিনী নিবেদিতার জীবন, চরিত্র ও বাক্যের শক্তির প্রভাবকে অতিক্রম করতে পেরেছে, এমনকি তার সমতুল্যও হতে পেরেছে।' আগেই বলা হয়েছে, বাঙালি ঐতিহাসিকদের একটি বড় অংশ অবশ্য নিবেদিতার এই ভূমিকাকে যথাযথ স্বীকৃতি দিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেছেন। শুধু তাঁরাই নয়, এক্ষেত্রে এ-ও বলতে হয়, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বা প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার লেখাতেও এ প্রসঙ্গটি অনেকটাই অবহেলিত রয়ে গিয়েছে। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'নিবেদিতার পত্র প্রমাণ করে, তিনি স্বামীজির প্রবর্তিত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত অভিপ্রায় ছিল, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করুক এবং সেজন্য প্রয়োজন হইলে সশস্ত্র সংগ্রামে অগ্রসর হউক। কিন্তু বিপ্লবকার্যে তিনি যে অন্যতম প্রধান নেত্রী ছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের মতোই উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ইহার কোনো প্রমাণ নাই।' এরকম পংক্তি লেখার সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিপ্রাণা আরো যুক্তি দেখিয়েছেন—'সরকার নিবেদিতার প্রতিও প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার চিঠিপত্র খুলিয়া পড়ার নির্দেশ ছিল। যদি সত্যই তিনি শ্রীঅরবিন্দের মতো বিপ্লবকার্যে লিপ্ত থাকিতেন,

তবে তাঁহাকেও পণ্ডিচেরী গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত; কলিকাতায় বাস করা চলিত না।

'নিবেদিতার মারাত্মক রকমের বিপ্লবী হওয়ার আর একটি বিশেষ বাধা ছিল। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ১৯০২ সালে ভারতে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পর হইতে ১৯১১ পর্যন্ত নিবেদিতা তাঁহার গবেষণাকার্যে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। ... নিবেদিতার বৈপ্লবিক কার্যে সক্রিয় সংশ্লেষ থাকিলে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে শ্রীযুক্ত বসুর উপরেও সরকারি প্রতিক্রিয়া দেখা যাইত। আর শ্রীযুক্ত বসু জানিয়া শুনিয়া কখনোই নিবেদিতাকে এপথে চলিতে দিতেন না; সর্বতোভাবে নিষেধই করিতেন।' মুক্তিপ্রাণা বলতে চেয়েছেন, নিবেদিতা যে বিশেষরকম বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন তার পক্ষে এমন কোনো নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ নেই। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, 'গোয়েন্দাকে এড়ানোও বৈপ্লবিক কৌশলের মধ্যে পড়ে, নিবেদিতা যাতে পারদর্শী ছিলেন। নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে দেখি, তিনি গোপনে কাজ করতে পারতেন, গ্রেপ্তার এড়াবার বুদ্ধি তাঁর ছিল; তাঁর কাছে বক্তৃতাযোগে জনগণকে কিছু সময় মাতাবার কাজ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল না নেতৃগণের এবং সক্রিয় কর্মীগণের কাছে সঠিক পথের নির্দেশ দান করা।'

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে যে সব যুক্তি দিয়েছেন, ঘটনা পরম্পরা এবং তথ্য বিচার করলে তা কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না। একথা ঠিক যে অরবিন্দ ঘোষের মতো নিবেদিতা বোমা মামলায় জড়িয়ে পড়েননি। তাই বলে বাংলার বিপ্লববাদে নিবেদিতা অগ্রগণ্য ছিলেন না– এমন ভাবনাও ঠিক নয়। বলা যায়, নিবেদিতা এবং অরবিন্দের কার্যপদ্ধতি ভিন্ন ছিল। এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ করা ভালো হবে। 'শ্রীঅরবিন্দ অন হিমসেলফ' গ্রন্থ থেকেই জানা যায়– যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য কয়েকজনকে অরবিন্দ প্রথম গোপনে কলকাতা পাঠিয়েছিলেন বৈপ্লবিক কার্যাবলী গড়ে তুলতে। পরে তিনি স্বয়ং কলকাতা আসেন। কলকাতায় এসে সেইসময়ের বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলিকে সংগঠিত করার একটি চেষ্টা করেন অরবিন্দ। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৩ সালে পাঁচজনকে নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ অরবিন্দ গঠন করেন। এই পাঁচজনের ভিতর অন্যতম ছিলেন নিবেদিতা। বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নেতৃস্থানে নিবেদিতা না থাকলে পাঁচজনের পরিষদে নিশ্চয়ই তাঁকে নেওয়ার চিন্তাভাবনা করতেন না অরবিন্দ। বারীন্দ্র ঘোষ একটি লেখায় বলেছেন–- 'আমাদের বিপ্লবী যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন–তিনি সেখানেও প্রেরণার উৎস।... বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখাগুলি পরবর্তী বিরাট

জাগরণ এবং বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করবার ক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রবল প্রভাব।' নিবেদিতার বৈপ্লবিক প্রয়াস সম্পর্কে হেমচন্দ্র কানুনগোর স্মৃতিচারণ এ গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে নিবেদিতার যে ভালোই যোগাযোগ ছিল এবং বিপ্লব প্রচেষ্টায় অগ্রগণ্যদের ভিতর তিনিও যে একজন ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আরও কিছু স্মৃতিচারণায়, আরো কিছু লেখায়। বিপ্লবী বারীন ঘোষ 'বোমার কাহিনী'—তে লিখেছেন, 'সিস্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লব কেন্দ্রটিকে তাঁর লাইব্রেরীর জাতীয়তা বিষয়ের প্রায় এক দেড়শ' বই দিয়েছিলেন। কথা ছিল রাজনীতির স্কুল করে, ইতিহাস, জীবনী, ও ডিগবী, রমেশ দত্ত, নৌরজী আদির অর্থনীতি প্রভৃতি বই পড়িয়ে এখানে প্রথমে কতগুলি পলিটিকাল মিশনারী গড়া হবে। এবং তারপরে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে তাদের পাঠিয়ে সমগ্র দেশ বিপ্লবের ছোট-বড় মৌচাকে ছেয়ে দেওয়া হবে। আমি হলুম প্রথম ছাত্র এই রাজনীতিক ক্লাসের। তারপর এসে জুটল দেবব্রত, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন দত্ত, ইন্দ্র নন্দী, এই ধরনের অনেক মানুষ। আমি এসে সখারাম গণেশ সেউস্কর মশাইকে এই বিপ্লব কেন্দ্রটির সহিত পরিচয় করিয়ে দিলুম। দেশে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেবার এমন একটা দল আছে শুনে শিবাজীভক্ত মহারাষ্ট্র সন্তান তো আনন্দে অধীর। তিনি তখনই এসে যতীনদার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে গেলেন এবং স্কুলের অর্থনীতি ক্লাসটির শিক্ষার ভার নিলেন।'

বারীন্দ্র ঘোষের লেখাটি পড়ে বোঝা যাচ্ছে—বৈপ্লবিক প্রয়াসের সঙ্গে নিবেদিতার কতখানি নিবিড় যোগাযোগ ছিল। 'বিপ্লবের ছোট-বড় মৌচাক' গড়ার পরিকল্পনা নিবেদিতা জানতেন না—এমন মনে করাও ঠিক হবে না। বরং এটা মনে রাখতে হবে—গোপন বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলায় নিবেদিতা কিন্তু অরবিন্দ প্রমুখের অনেক আগেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। আয়ারল্যান্ডে থাকতেই সে দেশের গোপন বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ করেছিলেন নিবেদিতা। আর পলিটিকাল মিশনারি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই যে নিবেদিতা তাঁর জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত পুস্তকগুলি বাংলার প্রথম বিপ্লবী কেন্দ্রটিকে দান করেছিলেন—এটি ব্যাখ্যা না করলেও চলবে। কাজেই 'বিপ্লবকার্যে তিনি (নিবেদিতা) যে অন্যতম প্রধান নেত্রী ছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের মতোই উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ইহার কোনো প্রমাণ নাই' জাতীয় মন্তব্য সঠিক নয়। তদুপরি হেমচন্দ্র কানুনগো বা বারীন ঘোষের মতো বিপ্লবী কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্যকে যথেষ্ট প্রমাণ হিসাবে গণ্য না করারও কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। এঁদের বক্তব্যগুলিকে প্রমাণ

হিসাবে ধরলেই বিপ্লব প্রচেষ্টায় নিবেদিতার অগ্রগণ্য ভূমিকাটি বুঝতে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের একটি লেখাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— 'ভগিনী (নিবেদিতা) জোসেফ মাৎসিনীর আত্মজীবনীর প্রথমভাগ বিপ্লবী দলে দান করেছিলেন। এর মধ্যে গেরিলাযুদ্ধের কৌশল ও পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ ছিল। এই সকল বই আমাদের এক সহকর্মী কেশবচন্দ্র গুপ্তের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম।... কেশব আলিপুর মামলার কালে গা ঢাকা দেবার আগে অন্যদের কাছে বইগুলি রেখে যায়। সারাদেশে পুলিশি তল্লাসের কালে বইগুলি একে একে বেরিয়ে পড়ে। নিবেদিতা প্রায়ই বলতেন, আমার বইগুলি এক এক করে আবির্ভূত হচ্ছে।' ভূপেন দত্তের লেখা প্রমাণ করেছে— নিবেদিতার ঝোঁকটি নরম পন্থার দিকে মোটেই ছিল না। বরং, বিপ্লবী দলে মাৎসিনীর আত্মজীবনী দান করায় বোঝাই যায়, তিনি কোন ধরনের বিপ্লবী দল গঠনে উৎসাহী ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও ছিল তাঁর। যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবী শিষ্য এবং সহকর্মী নলিনীকান্ত কর তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'যতীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন।' নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিবেদিতার সঙ্গে বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠতার পক্ষে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন।

গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু নিবেদিতার বিপ্লবী চরিত্র সম্পর্কে মোট সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

'(১) তিনি কোনো স্বদেশী ডাকাতি বা বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন তার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ এখনো পর্যন্ত মেলেনি।

(২) কিন্তু দেখা গেছে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত কোনো ব্যক্তিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া তিনি দোষের কাজ মনে করতেন না; যে গোয়েন্দা তাঁর পিছনে লেগেছে তাকে যমালয়ে পাঠাতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির নামে বিবেচনাহীন হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করতেন না।

(৩) ভারতে বৈপ্লবিক কার্যের সূচনায় তিনি যে দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারা স্বদেশী ডাকাতি করত। পরবর্তীকালে পুলিশ-মহল তাঁকে স্বদেশী ডাকাতির নেত্রী বলে মনে করেছে।

(৪) নিরীহ দেশীয় মানুষের সম্পত্তি লুণ্ঠন করাকে তিনি কাপুরুষতা মনে করতেন।

(৫) তাঁর গ্রেপ্তারের এবং দীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনা ছিল; সে সম্ভাবনা বারেবারেই দেখা গেছে।

(৬) গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন, ভারত ত্যাগ করেছেন, এমনকি ভারতে ফরাসী উপনিবেশে আশ্রয় নেবার পরিকল্পনাও করেছেন।

৭) তিনি বৈপ্লবিক বক্তব্য ছাপানোর জন্য 'গোপন প্রেসে'র ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন; কণ্ঠরোধের সরকারি ব্যবস্থার ফলে গোপন প্রেসকেই একমাত্র আত্মপ্রকাশের উপায় মনে করতেন।

(৮) ভারতের রাজনীতির গোপন খবর তিনি বিদেশে চালান দিতেন; বিদেশ থেকে বৈপ্লবিক পত্রপত্রিকা ও পুস্তক আনতেন; এইসব আদান-প্রদানের কাজ এজেন্ট মারফৎ ঘটত।

(৯) বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির ব্যাপারে বোধহয় তাঁর হাত ছিল।

(১০) তাঁর নিজস্ব দল ছিল।

(১১) রাজনৈতিক প্রয়োজনে উচ্চমহলে যোগাযোগ রাখতেন; নানা স্থানে তাঁর চর থাকত; বৈপ্লবিক কাজকর্মে কঠোর মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করতেন; বিপ্লব নিয়ে বাগাড়ম্বর পছন্দ করতেন না।

(১২) ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন তিনি, কৌশলগত কারণে নানাজনের কাছে নানারকম ভূমিকা নিতেন, যদিচ তাঁর মূল লক্ষ্য অব্যাহত থাকত।'

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে বড়লাট লর্ড জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক নিয়ে দু-চার কথা বলে নেওয়া যাক। ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০৫— এই সময়কালে লর্ড কার্জন ছিলেন ভারতের ভাইসরয়, চলতি ভাষায় বড়লাট। কার্জন ছিলেন উদ্ধত, অহংকারী এবং ভারতীয়দের সম্পর্কে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার মনোভাব পোষণকারী এক শাসন কর্তা। এককথায় বলতে গেলে, অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক যথার্থ প্রতিভূ। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী কার্জন চরিত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'তিনি নিজেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যান্ডের উচ্চাভিলাষের প্রতিভূ বিবেচনা করেছিলেন; সে মিশন আর কিছু নয়, আইন ছাড়াই নিম্নজাতের শাসন করা।' নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপের শুরুতেই কার্জনের সঙ্গে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়। এবং সেই বিরোধ একসময় তুঙ্গে পৌঁছয়। অথচ, ভারত আগমনের প্রথমলগ্নে কার্জনের প্রতি এরকম দৃষ্টিভঙ্গি নিবেদিতার ছিল না। বরং, তিনি মনে করতেন, ব্রিটিশ শাসনের যদি কিছু দোষত্রুটি থেকে থাকে, তাহলে কার্জন তা শুধরে দিতে পারবেন। এবং ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ শাসন মঙ্গলকরই হবে। ১৮৯৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'The

Government is tremendously popular. Ld. Curzon is felt to be strong, and humane—and strength makes everyone draw a breath of relief...'

মনে রাখতে হবে, এই চিঠিটি যখন নিবেদিতা লিখেছেন, তখনো ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সম্যক রূপটি তাঁর সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তখনো ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে মোহমুগ্ধতা তাঁর দূর হয়নি। তখনো তিনি মনে করছেন ব্রিটেন এবং ভারত পরস্পরের মিত্র হয়েই থাকবে। কিন্তু স্বামীজির সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরার পর এবং সর্বোপরি, ১৯০১-এ লাইসোঁতে অবস্থান করার সময় ভারতীয় রাজনীতি ও ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার পর তাঁর এই মোহ দূর হয়। কার্জন সম্পর্কেও তাঁর ধারণার পরিবর্তন হয় এই সময়ে। কার্জন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব আরো তিক্তই হয় ক্রমশ নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে। কার্জন সম্পর্কে তাঁর তিক্ততার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯০৩ সালের ২৮ জানুয়ারি লেখা একটি চিঠিতে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Lord Curzon is a dreadful Viceroy. What Sir William Wedderburn said to me, is exactly true— "So able and so satisfied. AND so ambitious!"

'And yet he has characteristics which remind me of nothing so much as Marshall Field's shop in Chicago. These are his good side. A liberality in doing business— a power of organising comfort— a strict sense of justice in administering the law that is created on a basis of injustice— and so on.'

কার্জনের সঙ্গে নিবেদিতার বিরোধ প্রথম তীব্র আকার নেয়, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অধিকার সংকোচন করার জন্য কার্জন অপচেষ্টা শুরু করায়। ভারতীয়দের সম্পর্কে কার্জন বরাবরই তাচ্ছিল্য এবং ঘৃণার মনোভাব পোষণ করতেন—আগেই বলেছি। এই কারণেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সকল ভারতীয়কে অধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না কার্জন। উচ্চশিক্ষার মান উন্নত করার অছিলায় ভারতীয়দের উচ্চশিক্ষায় অধিকার সংকোচন করার প্রয়াসে কার্জন ব্রতী হন ১৯০১ সালে। ১৯০১-এর সেপ্টেম্বরে সিমলায় একটি শিক্ষা সম্মেলন ডাকেন কার্জন। কিন্তু এই সম্মেলনে কোনো ভারতীয় শিক্ষাবিদ আমন্ত্রণ পাননি। এরপর ১৯০২ সালে তিনি 'ইউনিভার্সিটিজ কমিশন' গঠন করেন। ১৯০৪ সালে পাশ করেন 'ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট'। এই আইনের ফলে সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারের কুক্ষিগত করা হল এবং উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কাজটিও সহজ হল কার্জনের পক্ষে।

উচ্চশিক্ষায় সরকারের এই হস্তক্ষেপ নিবেদিতাকে প্রবল ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে নিবেদিতা কার্জনের এধরনের কাজ কখনোই মেনে নেননি। নিবেদিতা প্রকাশ্যেই কার্জনের এ কাজের বিরোধিতা করেন। কার্জনের এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে ১৯০৪ সালের ২৭ জানুয়ারি বাঁকিপুরে এক জনসভায় নিবেদিতা বলেন, 'The educational policy which is now being followed gives anything but university education. The Indian Universities Bill attempts to narrow the sphere of education in this country. But I am not going to make a political speech. My object is to make you think and think. I am ceaselessly thinking on the educational problem. Sometimes, I find a wayout and sometimes I do not. I have come here to help you in thinking out for yourself, for I have a belief in the power of right thought...

'The educational problem is one of national life, and so one ignorant of your national life cannot contribute in any way to your wants. A foreigner can do so only when he acts with a correct ideal of national life and adjusts his deeds to the influences of the times. A foreigner cannot help you and you must help yourselves...

'It is for you to do and you should not crouch before the Government like monkeys to get done by the Government what you ought to do for yourself...You must look at the educational policy of the Government in a different attitude. By the Bill before the Legislative Council many of the schools are to be disaffiliated and then will come your turn to sweep out the hypnotism out of the past...You must be grateful to Government for the threatened disaffiliation of the schools as such disaffiliation will allow you much freedom of thought. But you must not sit back and thank the Government. You must work, work and work and remake the meaning of Education.'

১৯০৪ সালের ৪ জুলাই জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন নিবেদিতা, 'I can not tell you how avenues of work are multiplying nor now

the pressure upon the people, to deprive them of Education, is multiplying also. But if only we put our shoulders to the wheel, I have great hope that every attack of Government on thought will only succeed in driving knowledge deeper, and making it sounder and truer. I think this, because I believe that the people already have that minimum from which they connot be dislodged. And if I am right, Lord Curzon will stand in history as the most anti-British influence that India ever saw.'

শিক্ষাক্ষেত্রে কার্জনের এই বৈষম্যমূলক আচরণকে নিবেদিতা বরাবরই ঘৃণার চোখে দেখে এসেছেন। এমনকি কার্জন দেশে ফিরে যাওয়ার পরও নিবেদিতার এ মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং, নিবেদিতা মনে করতেন, কার্জন এ দেশে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। ১৯০৯ সালের ২৫ নভেম্বর এস কে র‍্যাটক্লিফ এবং শ্রীমতী র‍্যাটক্লিফকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Curzon meant to destroy the possibility of Science.'

শুধু এই শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় নয় আরো অনেক বিষয়েই কার্জনের সঙ্গে নিবেদিতার বিরোধ চরমে ওঠে। এর ভিতর ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ এবং বুদ্ধগয়ার দায়িত্ব শৈব মহন্তদের হাত থেকে সরিয়ে নেবার সরকারি প্রয়াস— এই দুটি প্রসঙ্গে বিরোধ চূড়ান্ত আকার নিয়েছিল। এ দুটি প্রসঙ্গ পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তবে, কার্জনের প্রতি নিবেদিতার তিক্ততা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, ব্যক্তি কার্জনকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন তিনি। লেডি কার্জনের মৃত্যুর পর ১৯০৬-এর ২৫ জুলাই জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'What do you think abont Ly. Curzon's death? Has the whisper of suicide been heard in London? That will be the view taken here. But what misery it must be to live with such a man! And posing still! So utterly worthless!'

১৯০৪ সালের গোড়ায় (১৭ জানুয়ারি) কলকাতায় 'বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির'-এ স্বামীজির জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন নিবেদিতা। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সারদানন্দ। অন্য বক্তাদের ভিতর ছিলেন— রায়বাহাদুর চুনীলাল বসু, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রমুখ। এই সভার কয়েকদিন পরেই ২০ জানুয়ারি রাতে নিবেদিতা পাটনা যাত্রা করেন। পাটনায় পৌঁছে নিবেদিতা সম্রাট অশোকের রাজধানীর

ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন করেন। এই ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে কিছু প্রস্তরখণ্ডও তিনি সংগ্রহ করেন। এখানে কয়েকটি সভায় বক্তৃতা দিয়ে ২৫ জানুয়ারি তিনি পাটনা ত্যাগ করলেন। নিবেদিতার এবারের বক্তৃতা সফরের সঙ্গী ছিলেন স্বামী সদানন্দ এবং শঙ্করানন্দ। এর কিছুদিন পূর্বেই সদানন্দ জাপান ঘুরে এসেছেন। পাটনা থেকে নিবেদিতার গন্তব্য ছিল লখনউ। কিন্তু লখনউ যাওয়ার পথে নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল বুদ্ধগয়া হয়ে যাওয়ার। স্বামীজি তাঁর জীবনের প্রান্তবেলায় একবার ওকাকুরা এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করে গিয়েছিলেন। নিবেদিতাও চেয়েছিলেন বুদ্ধগয়া দর্শন না করে তিনি লখনউ যাবেন না। সেইমতো ২৫ জানুয়ারি বাঁকিপুর থেকে তিনি রাজগির আসেন। ২৭ তারিখ রাজগির থেকে বুদ্ধগয়ার অভিমুখে রওনা হন।

বুদ্ধগয়ায় পৌঁছনোর পর তিনি সেখানকার শৈব মহন্তের অতিথিরূপে ডাকবাংলোয় অবস্থান করেন। সেইসময় বুদ্ধগয়ার দায়িত্ব এই শৈব মহন্তদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। ১৯০৪ সালে নিবেদিতার এই বুদ্ধগয়া ভ্রমণ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। কারণ, এরপর এই বুদ্ধগয়াকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে সংঘর্ষে নেমেছিলেন নিবেদিতা। সেইসঙ্গে বুদ্ধগয়া প্রসঙ্গে দেশব্যাপী জনমত গঠন করার কাজেও নেমেছিলেন। ১৯০৪ সালের বুদ্ধগয়া পৌঁছনোর পর তার রাজনৈতিক গুরুত্বটি যে নিবেদিতা সম্যক উপলব্ধি করেন, তা বোঝা যায় তাঁর সেইসময়ের চিঠিতে। বুদ্ধগয়ায় অবস্থানকালেই ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯০৫ তারিখে নিবেদিতা জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে লেখেন, '... I have been to Bodh-Goya, have been the guest of the Mahunt, have seen the temple and the Tree. How was it that you did not tell me? Or can it be that you did not realise that this [is] politically the most important spot in India?'

বোঝাই যাচ্ছে, ওই সফরে বুদ্ধগয়া কতখানি রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়েছিল নিবেদিতার কাছে। কিন্তু কী ঘটেছিল সে সময় বুদ্ধগয়াকে কেন্দ্র করে? লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'বুদ্ধগয়ায় সে সময় একটা অসন্তোষের হাওয়া বইছিল। ধর্মশালায় যাত্রীদের ওপরে যে অন্যায় করা হয়, তা নিয়ে তারা খুঁতখুঁত করছে। শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসী আর পুণ্যার্থী আগন্তুক সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। প্রবাদ, হিন্দু পাণ্ডারা স্বয়ং শঙ্করাচার্যের কাছ থেকে মন্দিরের খবরদারি করবার ভার পেয়েছে। তারা তাদের অধিকার নিয়ে বৌদ্ধ শ্রমণদের সঙ্গে খিটিমিটি বাধিয়েছে। লর্ড কার্জন হিন্দু বৌদ্ধের এই রেষারেষিটিকে করে তুললেন চার্চের সঙ্গে রাজতন্ত্রের ঠোকাঠুকির

সামিল। তবে এক্ষেত্রে চার্চ হল জনসাধারণ আর রাজা বিদেশি। নিবেদিতা সাধারণের মুখপাত্র হয়ে ব্যাপারটাকে জাতীয় ঐক্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণামের রূপ দিতে চাইলেন।

'আকাশ-বাতাস তখন ঝড়ের সূচনায় থমথমে। রুশ-জাপান যুদ্ধ তুমুল হয়ে উঠেছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ বৌদ্ধদের জোর দাবি এড়ানো প্রায় অসম্ভব। ব্যাপারটা ধর্মসংক্রান্ত হলেও বৈদেশিক প্রভাবের প্রশ্ন কিন্তু কিছুতেই ঠেকানো গেল না। লন্ডন আর টোকিও সরকারের পাঠানো উপদেষ্টারা যে যার স্বার্থ বুঝে কাজ করতে লাগলেন, গন্ডগোল তাতে বেড়েই চলল। বুদ্ধগয়ার ব্যাপারের সঙ্গে সব হিন্দুই নিজেদের জড়িত মনে করতে লাগলেন।'

প্রকৃত ঘটনা হল, বুদ্ধগয়ায় মন্দির এবং সংলগ্ন অঞ্চল তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বহুদিন ধরে শৈব মহন্তদের ওপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধরা সে সময় বুদ্ধগয়ায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। অনাগারিক ধর্মপালের নেতৃত্বে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাও শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার, বিশেষত, লর্ড কার্জন প্রকাশ্যে এ নিয়ে নিরপেক্ষ মনোভাব দেখালেও আড়ালে বৌদ্ধদেরই সমর্থন করেছিলেন। নিবেদিতা যখন বুদ্ধগয়ায় অবস্থান করছিলেন, তখন সেখানকার শৈব মহন্ত নিবেদিতাকে জানান, বুদ্ধগয়ার দায়িত্বভার তাঁর হাত থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্য কীরকম টোপ দিচ্ছে ব্রিটিশ সরকার। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪-এ একটি চিঠিতে সারা বুলকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'The Government is stuggling with the Mahunt to make him "accept a title". But he says "What can a Government give to me? Surely there is no title greater than Mahunt!" The fact is, he tells us, those who have accepted their lands etc. from Government have had to sign a declaration that they had no right of their own. This he will not do. It is the old tussle of the church with the State, and at this time the church is the people and the State is foreign, we MUST pray for the clergy and the Faith.'

বুদ্ধগয়ার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব শৈব মহন্তের হাতে থাকা উচিত—নিবেদিতারও একথা মনে হয়েছিল। শৈব মহন্তদের হাত থেকে এই দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া যে ঘোরতর অন্যায় এবং জবরদস্তি এটাই মনে করেছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতার এই ভাবনার পিছনে কারণ কী তা বুঝতে গেলে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে নিবেদিতার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের কী ধারণা ছিল তা একটু বুঝতে হবে। নিবেদিতা

তাঁর 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'স্বামীজির জীবনে বুদ্ধের প্রতি ভক্তি ছিল সর্বপ্রধান বিচারমূলক অনুরাগ। সম্ভবত ভারতের এই মহাপুরুষের জীবনের ঐতিহাসিক প্রামাণ্যই তাঁহাকে ওই বিষয়ে আনন্দ প্রদান করিত। তিনি বলিতেন, "ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদ সম্পর্কেই আমরা প্রকৃত ইতিহাস জানি, কারণ সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের শত্রু-মিত্র দুইই ছিল।" তাঁহার আদর্শ পুরুষের (বুদ্ধের) চরিত্রে যে পূর্ণ বিচারবোধের পরিচয় পাওয়া যায় বারবার তিনি সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেন। তাঁহার নিকট বুদ্ধ কেবল আর্যগণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নহেন, পরন্তু জগতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে তিনি একমাত্র স্থির মস্তিষ্ক ছিলেন। তিনি কেমন পূজা গ্রহণে অস্বীকার করেন? কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে তাঁহাকে পূজা করা হইয়াছিল, সে বিষয়ে স্বামীজি কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই। তিনি বলিতেন, "বুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, এক উচ্চ অবস্থা বিশেষ। এস সকলেই ঐ অবস্থা লাভ কর। এই নাও তার চাবি"।'

ওই গ্রন্থেই নিবেদিতা আরো লিখেছেন যে, 'একদিন স্বামীজি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ বলেন যে, বৌদ্ধধর্মের তিনটি যুগের মধ্যে—পাঁচশত বৎসর বুদ্ধোক্ত বিধিসমূহের যুগ, পাঁচশত বৎসর প্রতিমা পূজার এবং পাঁচশত বৎসর তন্ত্রের যুগ। সহসা ঐ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন, "কখনো ভেবোনা যে, ভারতে কোনোকালে বৌদ্ধধর্ম বলে কোনো পৃথক ধর্ম ছিল, আর তার নিজস্ব মন্দির ও পুরোহিত প্রভৃতি ছিল। একেবারেই নয়। বৌদ্ধধর্ম চিরকাল ছিল হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত। কেবল একসময় বুদ্ধের প্রভাব অত্যধিক হয়ে ওঠে, এবং তার ফলে সমগ্র জাতি সন্ন্যাস পথ অবলম্বন করেন।" আমার বিশ্বাস, বহু সময় ও অধ্যয়নের দ্বারাই কেবল এই মতবাদের সত্যতা পণ্ডিতগণের নিকট ক্রমে ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে।'

এখানে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলা যাক। ১৯০৪ সালে বুদ্ধগয়া দর্শনে গিয়ে নিবেদিতা শৈব মহন্তের পক্ষ অবলম্বন করলেও, অনাগরিক ধর্মপাল এবং তাঁর সঙ্গী সমর্থকরা এর অনেক আগে থেকেই বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৯১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম বুদ্ধগয়া দর্শনের পরই ধর্মপাল সেখানে বৌদ্ধদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে মনস্থ করেন। ১৮৯১ সালের মে মাসে 'দ্য বুদ্ধিস্ট'-এ প্রকাশিত তাঁর ' দ্য বুদ্ধগয়া অ্যান্ড ইটস সারাউন্ডিংস' নিবন্ধে ধর্মপাল অভিযোগ করেন শৈব মহন্তের হাতে বৌদ্ধ ভাস্কর্য ঠিকমতো রক্ষিত হচ্ছে না। ওই নিবন্ধ পড়লেই জানা যায় শৈব মহন্তকে অর্থ দিয়ে রাজি করিয়ে বুদ্ধগয়ার দায়িত্ব সিংহলী বৌদ্ধদের হাতে আনতে সক্রিয় হয়েছেন ধর্মপাল। এবং

এ কাজে তিনি ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কয়েকজন কর্মচারির সমর্থন লাভ করেছেন–তাও জানা যায়।

বুদ্ধগয়ায় শৈব মহন্তদের হাত থেকে দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া যখন সম্ভব হল না, তখন ধর্মপাল এবং তাঁর সহযোগীরা গায়ের জোরে সেখানে বৌদ্ধমূর্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। সে নিয়ে মহন্তর লোকজনের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষও হল। 'দ্য বুদ্ধিস্ট' পত্রিকায় এরপর আরো উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকল। বুদ্ধগয়াকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হল 'দ্য বুদ্ধিস্ট' পত্রিকায়। আর এ আন্দোলনে বৌদ্ধদের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠলেন অনাগরিক ধর্মপাল।

চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়ে ফেরার পর ধর্মপাল বুদ্ধগয়া নিয়ে আবার জোরদার আন্দোলন শুরু করেন। ধর্মপালের আশা ছিল, হিন্দু সমাজের শিক্ষিত একটা অংশেরও তিনি সমর্থন পাবেন। কিন্তু তা পাননি ধর্মপাল। ফলে, ধর্মপাল তখন রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁর এই আন্দোলনের সপক্ষে অন্য বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলির সমর্থন সংগ্রহ করে তিনি ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। আর এর পাশাপাশি ব্রিটিশ প্রশাসনের একটি অংশের সমর্থন তো তাঁর প্রতি ছিলই। এডউইন আরনল্ডের মতো ব্রিটিশ তাত্ত্বিকেরা ধর্মপালের হয়ে প্রকাশ্যেই প্রচারে নেমে পড়েন। বুদ্ধগয়া আদায়ের দাবিতে ধর্মপালের আন্দোলন ক্রমশ অরো আগ্রাসী চেহারা ধারণ করে। শুধু তা-ই নয়, বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাও এর ফলে বিকট চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে। বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িকতার এই রূপটি স্বামীজি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সিংহলে। সিংহলে অনুরাধাপুরে জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি এই বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িকতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। স্বামীজি হিন্দু— তাই তাঁর ওই জনসভায় বৌদ্ধরা হাঙ্গামা করতে এসেছিল। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে স্বামীজি লিখেছেন— 'অনুরাধাপুরে প্রচার করছি একবার, হিঁদুদের মধ্যে –বৌদ্ধদের (মধ্যে) নয়–তাও খোলা মাঠে, কারুর জমিতে নয়। ইতিমধ্যে দুনিয়ার বৌদ্ধ ভিক্ষু, গৃহস্থ, মেয়েমদ্দ ঢাক-ঢোল-কাঁসি নিয়ে এসে যে বিটকেল আওয়াজ আরম্ভ করলে, তাতে আর কি বলব, লেকচার তো 'অলমিতি' হল, রক্তারক্তি হয় আর কি! অনেক করে হিঁদুদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নেওয়া গেল যে, আমরা না হয় একটু অহিংসা করি এসো– তখন শান্ত হয়।'

প্রথমবার পাশ্চাত্য ভ্রমণের শেষে দেশে ফেরার পথে সিংহলে এই ঘটনায় বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িকতার উত্থানটি বুঝতে পেরেছিলেন স্বামীজি। এবং দেশে ফেরার পরে ধর্মপালের কাণ্ডকারখানা দেখে এবং শুনে স্বামীজি যে বিরক্তই হয়েছিলেন,

তা জানা যায় ১৮৯৭ সালের ৫ মে সারা বুলকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে। ওই চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, 'অধ্যাপক জেমসের একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম; তাতে তিনি অবনত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমার মন্তব্যগুলির ওপর বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। আপনিও লিখেছেন যে, ধর্মপাল এতে খুব রেগে গেছেন। ধর্মপাল অতি সজ্জন এবং আমিও তাঁকে ভালবাসি। কিন্তু ভারতীয় কোন ব্যাপারে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অন্যায় হবে।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেটাকে নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ আধুনিক হিন্দুধর্ম বলা হয়, তা হচ্ছে অচল অবস্থায় পতিত বৌদ্ধধর্ম মাত্র। এটা স্পষ্ট বুঝলে হিন্দুদের পক্ষে তা বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করা সহজ হবে। বৌদ্ধধর্মের যেটি প্রাচীন ভাব— যা শ্রীবুদ্ধ নিজে প্রচার করে গেছেন, তার প্রতি এবং শ্রীবুদ্ধের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা। আপনি ভালভাবেই জানেন যে, আমরা হিন্দুরা তাঁকে অবতার বলে পূজা করি। সিংহলের বৌদ্ধধর্মও তত সুবিধার নয়। সিংহল ভ্রমণকালে আমার ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। সিংহলে যদি প্রাণবন্ত কেউ থাকে তো এক হিন্দুরাই। বৌদ্ধেরা অনেকটা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। এমনকি ধর্মপাল ও তাঁর পিতার ইউরোপীয় নাম ছিল, এখন তাঁরা সেটা বদলেছেন। আজকাল বৌদ্ধেরা 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' এই শ্রেষ্ঠ উপদেশের এইমাত্র খাতির করেন যে, যেখানে সেখানে কসাইয়ের দোকান খোলেন। এমনকি পুরোহিতরা পর্যন্ত ওই কার্যে উৎসাহ দেন। আমি এক সময়ে ভাবতাম, আদর্শ বৌদ্ধধর্ম বর্তমানকালেও অনেক উপকার করবে। কিন্তু আমি আমার ওই মত একেবারে ত্যাগ করেছি। এবং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কী কারণে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল...

'থিওসফিস্টদের সম্বন্ধে আপনার প্রথমেই স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষে থিওসফিস্ট ও বৌদ্ধদের সংখ্যা নামমাত্র— নেই বললেই হয়। তারা দু-চারখানা কাগজ বের করে খুব একটা হুজুগ করে দু-চার জন পাশ্চাত্য দেশবাসীকে নিজেদের মতামত শোনাতে পারে; কিন্তু হিন্দুদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, এমন দুজন বৌদ্ধ বা দশজন থিওসফিস্ট আমি তো দেখি না।'

স্বামীজি লিখেছিলেন, 'আমরা খুবই আনন্দিত হব, যদি সিংহলীরা বীভৎস মূর্তি এবং অশ্লীল আচারে পূর্ণ ওই ধর্মের তলানির অংশকে নিজেদের দেশে নিয়ে চলে যায়।'

উল্লেখ্য, বৌদ্ধধর্মে একসময় তন্ত্রাচার প্রাধান্য পেয়েছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের একাংশ এই তন্ত্রাচারে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। বৌদ্ধধর্মগুরুদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে স্বামীজি এতটাই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, ওই চিঠিতে তিনি আরো

লেখেন, 'যা দেখছি তদনুযায়ী আমার সহানুভূতি বরং ভারতের ইংরেজ ক্রিশ্চান মিশনারীদের প্রতি— কিন্তু থিওসফিস্ট বা বৌদ্ধদের বিষয়ে কদাপি নয়। মিঃ ধর্মপাল আমেরিকায় কেউকেটা হয়ে উঠেছেন, এতে আমি খুশি। কিন্তু এই ভারতবর্ষ তাঁর পক্ষে মন্দ ঠাঁই। তিনি আমেরিকাতেই থাকুন সেখানে সমর্থক দল পাবেন—এই আমার সদুপদেশ। ভারতে বৌদ্ধধর্মের কোনোই ভরসা নেই। আর, মহাবোধি পত্রিকা বা মিশনারী পত্রিকার লেখাপত্তর দেখে চমকিত হবেন না। এইসব কাগজের প্রচার কীরকম? ঘরে বসে কোনো চাষী তার বৌয়ের সঙ্গে কথা বললে যতটুকু প্রচার হয়, তার বেশি নয়।'

নিবেদিতার 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থের ওই অংশ এবং সারা বুলকে লেখা স্বামীজির এই পত্রটি পড়লে বোঝা যায়— বুদ্ধ এবং আদি বৌদ্ধধর্মের প্রতি স্বামীজি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের আচরণ, নব্য বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন আচার আচরণ এবং সর্বোপরি অনাগারিক ধর্মপাল প্রমুখদের কার্যকলাপে তিনি বিতৃষ্ণই হয়েছিলেন। স্বামীজি মনে করতেন, এই নব্য বৌদ্ধধর্ম (বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা?) ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কখনোই হবে না। বরং বৌদ্ধধর্মের কিছু 'দ্বিচারিতা' তাঁর নজরে এসেছিল। বৌদ্ধধর্মের এই দ্বিচারিতার একটি চিত্র পাওয়া যায় স্বামীজির লেখায়। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে স্বামীজি বলছেন— 'সিলোনময় নেড়া-মাথা, করোঘাধারী, হলদে চাদরমোড়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ছড়িয়ে পড়ল, জায়গায় জায়গায় বড় বড় মন্দির উঠল— মস্ত মস্ত ধ্যানমূর্তি, জ্ঞানমুদ্রা-করে প্রচারমূর্তি, কাত হয়ে শুয়ে মহানির্বাণমূর্তি—তার মধ্যে। আর দ্যালের গায়ে, সিলোনিরা দুষ্টুমি করলে নরকে তাদের কি হাল হয়, তাই আঁকা। কোনোটাকে ভূতে ঠেঙাচ্ছে, কোনোটাকে করাতে চিরছে, কোনোটাকে পোড়াচ্ছে, কোনোটাকে তপ্ত তেলে ভাজছে, কোনোটার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে— সে মহা বীভৎস কারখানা। এ 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র ভেতরে যে এমন কারখানা, কে জানে বাপু! চীনেও ওই হাল, জাপানেও ওই। এদিকে তো অহিংসা, আর সাজার পরিপাটি দেখতে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র বাড়িতে ঢুকেছে—চোর। কর্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া করে বেদম পিটচ্ছে। তখন কর্তা দোতলার বারান্দায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে মারিসনি, অহিংসা পরমো ধর্মঃ।' বাচ্চা-অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে চোরকে কী করা যায়?' কর্তা আদেশ করলেন, 'ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দাও।' চোর জোর হাত করে আপ্যায়িত হয়ে বললে, 'আচ্ছা, কর্তার কি দয়া'!'

স্বামীজি ব্যাঙ্গাত্মক ঢংয়েই লেখাটি লিখেছিলেন। কিন্তু পড়লেই বোঝা যায়, আদি বৌদ্ধধর্ম থেকে নব্য বৌদ্ধদের যে বিচ্যুতি ঘটেছে তাকে বিদ্ধ করাই স্বামীজির লক্ষ্য ছিল। এছাড়া, নিবেদিতার ওই লেখাটি থেকে জানা যায়, স্বামীজি কখনোই বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক বলে মনে করতেন না। বরং, আলাদা ধর্ম হিসাবে অতীতে বৌদ্ধধর্মের কোনো অস্তিত্ব ছিল—সেটাই স্বামীজি মনে করতেন না। বরং তিনি মনে করতেন, বৌদ্ধধর্ম চিরকালই ছিল হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত। এক সময় বুদ্ধের প্রভাব অতিরিক্ত হয়ে পড়লে, হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত একটি বড় অংশ সন্ন্যাস গ্রহণ করে বুদ্ধঅনুগামী হয়। এবং তখনই বৌদ্ধধর্মের কথা শোনা যায়।

এছাড়া, চিকাগো বক্তৃতার পরে আমেরিকা এবং ইয়োরোপ সফর করে দেশে ফেরার পথে সিংহল ভ্রমণ তাঁর কাছে বিশেষ সুখপ্রদ হয়নি। সিংহলে বৌদ্ধদের সম্পর্কে স্বামীজির অভিজ্ঞতা হয়েছিল তিক্ত। সিংহলের অনুরাধাপুরে বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িকতার চেহারা দেখে নব্য বৌদ্ধদের সম্পর্কে তাঁর পুরোপুরি মোহভঙ্গ ঘটেছিল। শুধু তা-ই নয়, ভারতের পক্ষেও তারা অশুভ শক্তি বলেই মনে করেছিলেন স্বামীজি। দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সিংহলীদের জীবনযাত্রাও স্বামীজিকে হতাশ করেছিল। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে স্বামীজি লিখেছেন, 'ওরা নিজের দেশকে বলে—সিংহল। লঙ্কা বলবে না, বলবে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো। – ঘাঘরা পরা, খোঁপা বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়েমানুষি চেহারা। আবার—রোগা রোগা, বেঁটে বেঁটে, নরম-নরম শরীর। এরা রাবণ, কুম্ভকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি?' সাধারণ সিংহলীদের এই চেহারার ভিতর স্বামীজির 'পৌরুষভাবের' অভাবই চোখে পড়েছিল। পরাধীন ভারতবাসীদের এই চেহারা নিশ্চয়ই দেখতে চাননি স্বামীজি। কাজেই, অহিংসা এবং সন্ন্যাসের বাড়াবাড়িকে জাতীয় জাগরণের পক্ষে অন্তরায় বলেই মনে হয়ে থাকবে তাঁর।

আদি বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও, নব্য বৌদ্ধদের এই বিচ্যুতিকে স্বামীজি কঠোর দৃষ্টিতেই বরাবর দেখেছেন। 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' সম্পর্কিত এক বক্তৃতায় স্বামীজি বলেছিলেন, '...জীবে দয়ার প্রচার, সমুচ্চ নীতিধর্মের উচ্চারণ এবং নিত্য আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে চুলচেরা বিচার সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের সমগ্র প্রাসাদটি ভেঙে গুড়িয়ে গিয়েছিল—আর সেই ধ্বংসস্তূপের চেহারা অতি বীভৎস। বৌদ্ধধর্মের বিদায়ের পরে যা রইল তার জঘন্য রূপের বর্ণনার ইচ্ছা বা সময় আমার এখন নেই। চরম বীভৎস অনুষ্ঠান পদ্ধতি, চরম জঘন্য, অশ্লীল বই—যার চেয়ে নোংরা কিছু মানুষের মাথায় আসতে পারে না বা মানুষের হাত দিয়ে লেখা হতে পারে

না—ধর্মের নামে চালানো চরম পাশবিক রীতিনীতি—এই সকল কিছুই অবনত বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি।' ওই বক্তৃতাতেই স্বামীজি বলেছেন, '...তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের মূল কাজ হল, বৌদ্ধ অবনতির উপরে বেদান্তের পুনর্বিজয় সম্পাদন করা। সে কাজ চলছে, শেষ হয়নি।' স্বামীজির বক্তব্য ছিল, 'আমরা সেই ধর্মের মানুষ– বৌদ্ধধর্ম সকল মহিমা সত্ত্বেও যার বিদ্রোহী সন্তান, আর খ্রীষ্টধর্ম ক্ষীণ অনুকরণ।'

তবে, বৌদ্ধধর্মের এই বিচ্যুতি স্বামীজির নজরে এসেছিল এসব ঘটনার অনেক আগে। চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানেরও আগে, যখন পরিব্রাজকের জীবন কাটাচ্ছেন স্বামীজি, তখন, ১৮৯০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামী অখণ্ডানন্দকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তিব্বতীদের যে তন্ত্রাচারের কথা কহিয়াছ, তাহা বৌদ্ধধর্মের শেষ দশায় ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে আমাদিগের যে সকল তন্ত্র প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাই তাহার আদিম স্রষ্টা। ওই সকল তন্ত্র আমাদিগের বামাচারবাদ হইতে আরো ভয়ঙ্কর (উহাতে ব্যাভিচার অতিমাত্রায় প্রশয় পাইয়াছিল), এবং ঐ প্রকার immorality (চরিত্রহীনতা) দ্বারা যখন (বৌদ্ধগণ) নিবীর্য হইল, তখন (তাহারা) কুমারিল ভট্ট দ্বারা দূরীভূত হইয়াছিল। যে প্রকার সন্ন্যাসীরা শঙ্করকে ও বাউলরা মহাপ্রভুকে secret (গোপনে) স্ত্রী সম্ভোগী, সুরাপায়ী ও নানাপ্রকার জঘন্য আচরণকারী বলে, সেই প্রকার modern (আধুনিক) তান্ত্রিক বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবকে ঘোর বামাচারী বলে এবং 'প্রজ্ঞাপারমিতা'ক্ত তত্ত্বগাথা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বাক্যকে কুৎসিত ব্যাখ্যা করে...'

বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িকতার চেহারা প্রত্যক্ষ করে এবং বৌদ্ধধর্মের বিচ্যুতি লক্ষ্য করে, স্বাভাবিকভাবেই, স্বামীজির পক্ষে কোনোমতেই ধর্মপালের বুদ্ধগয়ার ওপর দাবি সমর্থন করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, স্বামীজি মনে করতেন বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই 'বিদ্রোহী' অংশ। সেই কারণে বুদ্ধগয়ার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব শৈব মহন্তদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার দাবিকে সমর্থন জানানো স্বামীজির পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না। তবে, এই নব্য বৌদ্ধদের সম্পর্কে স্বামীজির এত বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও অনাগারিক ধর্মপালের সঙ্গে স্বামীজির ব্যক্তিগত সম্পর্ক একটুও নষ্ট হয়নি। ধর্মপালের সঙ্গে স্বামীজির পরিচয় চিকাগো ধর্ম সম্মেলনে। বয়সে তরুণ ধর্মপালকে স্বামীজির যথেষ্ট পছন্দ হয়েছিল। স্বামীজির চিঠিপত্রই তাঁর প্রমাণ। ১৮৯৪ সালের ১৯ মার্চ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন স্বামীজি, 'ধর্মপাল ছোকরা বেশ, পড়াশোনা বেশি নেই, তবে ভালো মানুষ। তার এদেশে যথেষ্ট আদর হয়েছিল।' ১৮৯৪–এর ৩১ আগস্ট আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছেন, 'ধর্মপালের ঠিকানা জানিও। মানুষটি উত্তম ও

মহান। আমাদের সঙ্গে চমৎকার মিলেমিশে কাজ করতে পারবে।' ১৮৯৬-এর ৩ ডিসেম্বর মেরি এবং হ্যারিয়েট হেলকে স্বামীজি লিখেছেন, 'ধর্মপালের খবর কী? তিনি কী করছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমার ভালবাসা জানিও।' ১৮৯৭-র ৩ জানুয়ারি মেরি হেলকে আবার লিখেছেন, 'ধর্মপালের গতিবিধি বা কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু লেখনি। গান্ধীর (বীরচাঁদ) চেয়ে তাঁর সম্বন্ধেই আমার অনেক আগ্রহ বেশি।' স্বামীজির এই চিঠিগুলি পড়ে বোঝাই যাচ্ছে, ধর্মপালের প্রতি তাঁর স্নেহদৃষ্টি ছিল এবং ধর্মপালের খোঁজখবর রাখতে তিনি সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

চিকাগো ধর্মমহাসভাতে যোগ দিতে গিয়েও ধর্মপাল স্বামীজির দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন। ধর্মপালের পাণ্ডিত্য খুব উচ্চমানের ছিল না। এমনকি ধর্মপাল খুব ভালো লেখকও ছিলেন না। সে কথা ধর্মপালের জীবনীকার ভিক্ষু সংঘরক্ষিত জানিয়ে গিয়েছেন। সংঘরক্ষিত লিখেছেন, 'Though well versed in his religion, he was not a scholar, though he wrote exhaustively, it is not as a writer that he will be remembered.'

ফলে, চিকাগো ধর্মসভায় ধর্মপাল যে লিখিত ভাষণটি পাঠ করেছিলেন, তা স্বামীজিই তৈরি করে দিয়েছিলেন— এমন মনে করা হয়ে থাকে। মনে করার আরো কারণ নিবেদিতার একটি লেখা। স্বামীজির প্রয়াণের পর 'দ্য হিন্দু' কাগজে 'দ্য ন্যাশনাল সিগনিফিকেন্স অব দ্য লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক অফ স্বামী বিবেকানন্দ' নামক প্রবন্ধে নিবেদিতা এরকমই একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'He (Vivekananda) was himeself the exponent of Hinduism, but finding another Indian religionist struggling with the difficulty of putting his case, he sat down and wrote his speech for him, making a better story for his friend's faith than its own adherent could have done!'

ধর্মপালের সঙ্গে স্বামীজির এই সম্পর্কের ভিতর কখনোই যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছাপ ফেলেনি তার একটি বড় প্রমাণ ১৮৯৪-র ফেব্রুয়ারির মাসের একটি ঘটনা। মনে রাখতে হবে, বুদ্ধগয়ার দায়িত্ব বৌদ্ধদের হাতে অর্পণের দাবিতে ধর্মপাল তখন জোরদার দরবার শুরু করেছেন বিভিন্ন মহলে। বুদ্ধগয়ার শৈব মহন্তদের সঙ্গেও তাঁর তখন বিরোধ শুরু হয়েছে। স্বামীজিও সেইসময় নব্য বৌদ্ধদের বিরোধিতা করছেন এবং বুদ্ধগয়ার দায়িত্ব শৈব মহন্তদের হাতে রাখার পক্ষেই মত দিচ্ছেন। ওই সময় সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং নিবেদিতা বেলুড় মঠের কাছে একটি বাড়িতে স্বামীজির অতিথি হয়ে অবস্থান করছিলেন। তখনই একদিন ধর্মপাল

স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে বেলুড়ে আসেন। স্বামীজি ধর্মপালকে সঙ্গী করে নিবেদিতারা যে গৃহে অবস্থান করেছিলেন সেখানে আসেন। স্বামীজির সঙ্গী সন্ন্যাসীদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, স্বামীজি ধর্মপালকে সঙ্গে নিয়ে যখন তাঁর বিদেশিনী শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ করতে আসেন, তার একটু পরেই তুমুল বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি ক্রমে বেড়েই চলে, থামার লক্ষণ দেখা যায় না। শেষপর্যন্ত স্বামীজি তাঁর সঙ্গী সন্ন্যাসীদের বলেন, জুতো খুলে কাদার মধ্যে নেমে পড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মঠে চলে যেতে। শুধু বলা নয়, নিজেও তাই করেন। বৃষ্টির মধ্যে মাঠে নেমে স্বামীজি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বাচ্চাদের মতো কাদায় গড়াগড়ি করেন। ধর্মপালকে স্বামীজি কাদায় নামতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমার জুতো নষ্ট হয়ে যাবে।' ধর্মপাল অবশ্য স্বামীজির কথা শোনেননি। তিনিও কাদায় নেমে পড়েছিলেন। মঠে পৌঁছনোর পর স্বামীজি একটি জলের পাত্র এনে ধর্মপালের পা ধুইয়ে দিতে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তুমি আমার অতিথি। এটা আমার কর্তব্য।' কিন্তু স্বামীজির হাত থেকে জলের পাত্রটি কেড়ে নেন শিষ্য প্রিয়নাথ সিংহ। প্রিয়নাথ বলেন, 'আমরা আপনার শিষ্য। এই কাজ আমাদের করার কথা।'

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে স্বামীজির এই মনোভাবের কথা জানলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, বুদ্ধগয়ার দায়িত্ব শৈব মহন্তদের হাতে রাখার দাবিতে নিবেদিতা এত সক্রিয় হয়েছিলেন কেন। কেননা এক্ষেত্রেও নিবেদিতা তাঁর গুরুর মতামতকেই সঠিক মনে করতেন; এবং তা করতেন বলেই শৈব মহন্তদের পক্ষ নিয়েছিলেন। বুদ্ধগয়া নিয়ে ধর্মপালের দাবি যে স্বামীজি কখনোই সমর্থন করতেন না— তা নিবেদিতা জানতেন। বস্তুতপক্ষে স্বামীজি বেঁচে থাকতেই, ১৯০১ সালের মে মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ধর্মপালের আন্দোলনের বিরোধিতা করা হয়েছিল। স্বামীজির প্রয়াণের পরে রামকৃষ্ণ মিশন বুদ্ধগয়া প্রশ্নে নিবেদিতাকেই সমর্থন জানিয়েছিল। ভারতের রাজনীতিতে বুদ্ধগয়া যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে পারে, তা উপলব্ধি করার পর আবার দ্বিতীয়বার নিবেদিতা বুদ্ধগয়ায় যান। এবার বুদ্ধগয়ায় তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন শার্লট সেভিয়ার। দ্বিতীয়বার বুদ্ধগয়া ঘুরে এসে ১ এপ্রিল কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে বুদ্ধগয়ার ওপর একটি বক্তৃতা দেন নিবেদিতা। বক্তৃতার শিরোনাম ছিল 'বুদ্ধগয়া ইটস প্লেস ইন হিন্দুইজম'। এই বক্তৃতার বিবরণ ১৯০৪ সালের ৩ এপ্রিল 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে 'ডন' এবং 'ইন্ডিয়ান রিভিউ' পত্রিকাতেও এই বক্তৃতার সংবাদ প্রকাশিত হয়। নিবেদিতা এই বক্তৃতায় ধর্মপালের মতামত খণ্ডন করে স্বামীজির মতকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। বৌদ্ধধর্মকে তিনি হিন্দুধর্মেরই একটি বিদ্রোহী শাখা, যার প্রবক্তা বুদ্ধ—এইভাবেই

ব্যাখ্যা করেন। বলেন, 'Hinduism thus a synthesis, not a sect; a spiritual university, not a spiritual church; and of this synthesis Buddhism is an inalienable part.'

আরও বলেন, 'Buddha Gaya must be held for the great synthesis known as Hinduism. It must never become the play thing of sects.' ক্লাসিক থিয়েটারে এই বক্তৃতা দেওয়ার আগে অবশ্য, প্রথমবার বুদ্ধগয়া ঘুরে কলকাতায় এসে ১৬ ফেব্রুয়ারিও তিনি বুদ্ধগয়া সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন।

দ্বিতীয়বার বুদ্ধগয়া পরিভ্রমণের পর নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন কিছুদিনের জন্য মায়াবতী গিয়েছিলেন, সঙ্গে গিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু এবং লাবণ্যপ্রভা বসু। এইসময়ই, মায়াবতীতে থাকাকালীন জগদীশচন্দ্রের Plant Response পুস্তকটির পাণ্ডুলিপির খসড়া করা শুরু হয়। মায়াবতীতে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করায় নিবেদিতার ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। ২৪ জুন নিবেদিতা এবং তাঁর সঙ্গীরা কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

যাইহোক, দ্বিতীয়বার বুদ্ধগয়া পরিভ্রমণের সময় নিবেদিতার সঙ্গে বুদ্ধগয়ার শৈব মহন্তের দীর্ঘ বৈঠক হয়। এই বৈঠকেই বুদ্ধগয়া নিয়ে নিবেদিতার জনমত সংঠনের রূপরেখা স্থির হয় এ আশা করা যায়। প্রথমবারও নিবেদিতার সঙ্গে শৈব মহন্ত বিশদ আলোচনা করেছিলেন — এ ধারণা করাও অসম্ভব কিছু নয়।

নিবেদিতার বুদ্ধগয়া পরিভ্রমণের আগেই বড়লাট লর্ড কার্জন বুদ্ধগয়া নিয়ে একটি গোপন সরকারি নোট তৈরি করেছিলেন। ওই নোটে কার্জন ধর্মপালের দাবিকেই কার্যত সমর্থন জানান এবং বুদ্ধগয়ার ওপর শৈব মহন্তদের দাবিকে নস্যাৎ করেন। কার্জন তাঁর নোটে লেখেন, 'The Bodh-Gaya is a Buddhist shrine, built by the Buddhists in commemoration of the most sacred incidents of the life of their master, intended for the accomodation of Buddhist images and Buddhist worship and treated as the object of Buddhist pilgrimage from all parts of the eastern world, with only occasional interruptions for a period of two hundred years, dose not admit the dispute. That no question of Hindu worship was even created till 1727 AD, when the grant of the neighbouring village was for the first time made by the Mogul sovereign to the then Mahanth, is also indisputable...'

কার্জন তাঁর নোটে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'The main temple would become an exclusively Buddhist shrine. There would be probably be no objection to Hindu visiting it, but they would not conduct worship there or decorte the image or burn lights or spill ghee before it.The shrine would not be handed over to Buddhists as their property, since the Government had no desire to oust one propritor merely in order to install another, but would be held in trust by the Government, who would issue regulations for the proper conduct of Buddhist worship there. The Bo-tree against the west outer wall of the shrine would similarly be recognised as a place of peculiarly Buddhist sanctity, though there would be no objection to Hindus visiting (but not making offering to) it. On the other hand, the larger Bo-tree in the platfrom would be reserved as an object of Hindu devotion. The remainder of the enclosure would remain as it is now open to all parties. That the Mahanth would continue as ground landlord to draw the fees from all visitors whether Hindu or Buddhist.'

বুদ্ধগয়ায় একটি কমিশন পাঠিয়ে সমগ্র বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে তাঁকে জানাতেও বলেছিলেন কার্জন। লিখেছিলেন, 'I would contemplate asking the local Government to send to Gaya a small commission in order to enter more exhaustively into the case and to advise me as to the procedure to be followed. I would then be in a position to decide what further action was necessary.'

কার্জনের এই গোপন নোটটি কোনোভাবে নিবেদিতার হস্তগত হয়। এই নোটটি তাঁকে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ করে তোলে। নোটটি পড়ে কার্জনের গোপন অভিসন্ধিটি বুঝতে নিবেদিতার অসুবিধা হয়নি। নিবেদিতা বুঝতে পারেন বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধদের অধিকারকে স্বীকৃতি জানিয়ে ভবিষ্যতে শৈব মহন্তদের অপসারণের রাস্তাটি পরিষ্কার করে রাখছেন কার্জন। সেই সময়ের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি মনে রাখলে বোঝা যাবে, বুদ্ধগয়ায় ধর্মপালের দাবিকে স্বীকৃতি দেওয়ার পিছনে কার্জনের কী রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল। সেইসময় রুশ-জাপান যুদ্ধ তুমুল হয়ে উঠেছে। জাপান এশিয়ায় এক প্রধান শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে

চাইছে। এমনই একটি পরিস্থিতিতে ভারতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে ক্ষুব্ধ করে তুলতে চাননি কার্জন।

কার্জনের এই নোটের প্রতিবাদে নিবেদিতা 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক এস. কে. র‍্যাটক্লিফকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। এই চিঠিটির সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে, মনে হয়, দ্বিতীয়বার বুদ্ধগয়া ভ্রমণের আগেই নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। নিবেদিতা চেয়েছিলেন, র‍্যাটক্লিফ যেন কার্জনের নোটের সমালোচনা করে একটি লেখা লেখেন। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'The Bodh-Gaya temple was nor built by Asoka as ignorantly supposed. It's date was fairly well established by Rajendra Lal Mitra, at some time in the 1st century A.D. In Asoka's time only the great rail was placed round the great court which enclosed the Tree.

'... At any rate, on one denies and the order of Bodh-Gaya maintains that to Shankaracharya (788-820 A.D.) passed the charge of the Shrine of Bodh-Gaya, and then he committed its keeping into the hands of Giri order of his spiritual descendants (we of Ramakrishna are Puris).

'...As Buddha is the glory of Hinduism, even so in Bodh-Gaya the glory of India, and there are few things of which the Indian people have such a right to be proud as the history in relation to it, of Sankaracharya and his Giri monks.'

বুদ্ধগয়ার শৈব মহন্তদের পক্ষ নিয়ে নিবেদিতা লেখেন, 'The Mahunts have long rccords of the pilgrims they have received, and traditions echo yet in history of royal Embassies sent in the middle Ages, to make offereings through them of prayers and gifts at the great shrine. Many offerings moreover, attest to this day, the acceptance of their own relation to the Mother church, by the Buddhist king of Burmah, Siam, Cambodia and elsewhere. The Mahunts, meanwhile, have been the protectors of all sections and sects of worshippers equally — receiving the Northern and Southern Schools of Buddhist alike, even as now they welcome to the Shrine— Buddhists Christians and Hindus indifferently.'

আর ধর্মপালের কঠোর সমালোচনা করে লিখলেন, 'All this trouble stirred up by that wretched fanatic Dharmapala out of misguided idea of glorifying Buddha! At bottom, ignorance of history and limitation of religious ideas.'

দ্বিতীয়বার বুদ্ধগয়া সফরের পরই নিবেদিতা স্থির করেন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে আবার বুদ্ধগয়া যাবেন এবং তাঁদের সঙ্গে মহন্তর সরাসরি আলোচনার ব্যবস্থা করবেন। এতে বুদ্ধগয়ায় তাঁর দাবির পক্ষে বিশিষ্ট মহলে একটি মত গড়ে তুলতে পারবেন— এমনটিই মনে করেছিলেন নিবেদিতা। আশা করা যায়, দ্বিতীয়বার বুদ্ধগয়া সফরের সময় এ নিয়ে মহন্তের সঙ্গে তাঁর কথাও হয়েছিল। এবং সেই কথামতোই তিনি এই পরিকল্পনা করেছিলেন। দ্বিতীয়বার বুদ্ধগয়া সফরের সময় থেকেই নিবেদিতা বুদ্ধগয়া সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এবং মনোভাব বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করেছিলেন। নিবেদিতার কৃতিত্ব এটাই যে, বুদ্ধগয়াকে তিনি জাতীয় আন্দোলনের একটি অংশ করে তুলতে পেরেছিলেন; যে কারণে, বুদ্ধগয়া নিয়ে নিবেদিতার আন্দোলন দেশব্যাপী একটি সাড়া ফেলেছিল।

বুদ্ধগয়া প্রশ্নে রামকৃষ্ণ মিশন স্বামীজি জীবিত থাকার সময় থেকেই ধর্মপালের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিল। স্বাভাবিক কারণেই বুদ্ধগয়া নিয়ে নিবেদিতার আন্দোলন মিশনের সমর্থন লাভ করেছিল। কতটা সমর্থন লাভ করেছিল, তা ১৯০৪-এর ৩ মার্চ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠিতে প্রমাণিত। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Swami Brahmananda is now empowering me to start a History school at Bodh-Gaya — with a group of young men. This I hope to make into a sort of college-post University Extension. Here I hope to work out my thought. Elsewhere, I look forward to carrying out schemes. But it remains to be seen where the money will come from.'

চিঠিটি পড়লে বোঝাই যায়, বুদ্ধগয়াকে কেন্দ্র করে নিবেদিতার সব কর্মকাণ্ড সম্পর্কেই ব্রহ্মানন্দ অবহিত ছিলেন। এও আশা করা যায়, নিবেদিতা ব্রহ্মানন্দকে সবকিছু অবহিতও করেছিলেন। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'নিজের কার্যকলাপের কথা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে জানাতে তিনি সস্নেহে হাসলেন একটু। বেশি কথা বলেন না ব্রহ্মানন্দ। আলাপ-আলোচনার ধার দিয়ে না গিয়ে বললেন, 'বেশ করেছ মা, খুব ভাল কাজ করেছ।' নিবেদিতা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। একা একা নিবেদিতা যেভাবে কাজ করে চলেছেন, দেখে সন্ন্যাসীর চমক লাগে। এ রুদ্রবীর্য

কি চিরদিন সমান থাকবে?' যদিও শেষপর্যন্ত এই ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু এই প্রস্তাবটি দেওয়ার পিছনে যে নিবেদিতার আন্দোলন এবং বুদ্ধগয়ায় শৈব মহন্তদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়াই প্রধান লক্ষ্য ছিল—তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

১৯০৪-এর অক্টোবরে প্রায় কুড়িজনের একটি দল নিয়ে নিবেদিতা তৃতীয় দফায় বুদ্ধগয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ১৯০৪-এর ১৫ অক্টোবর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'We have been a party of 20 spending 4 days at Bodh-Gaya in the Guest House— and I think it has been an event in all our lives. The Boses were there —and 2 children, 4 in all. The poet [Rabindranath Tagore] was there with his son and a friend— a prince with his tutor, 3 of my boys, a distinguished scholar and another friend and Swami Sadananda and his nephew, also Christine.' এই বিশিষ্টদের দলে জগদীশ বসু, অবলা বসু এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বোঝাই যাচ্ছে। ছিলেন যদুনাথ সরকারও। তবে, নিবেদিতার ১৫ অক্টোবরের চিঠিতে যদুনাথ সরকারের উল্লেখ নেই। যদুনাথ সরকার পাটনা থেকে এই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের ডায়েরিতে এই বিষয়ে উল্লেখ আছে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'Miss Noble বুদ্ধগয়া যাবার একটা party করেছেন। বাবাকে জগদীশবাবু নিমন্ত্রণ করেছেন। আমাদেরও নিয়ে যেতে বলেছেন।' রথীন্দ্রনাথের ডায়েরি পড়লে মনে হয়, দলবল নিয়ে নিবেদিতার বুদ্ধগয়ার যাবার পরিকল্পনাটি জগদীশচন্দ্রই প্রথম জানান রবীন্দ্রনাথকে। এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এই দলে সামিল হওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এবং এর পরে, হতে পারে জগদীশচন্দ্রের পরামর্শেই, নিবেদিতা বুদ্ধগয়া যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান কবিকে। এঁরা ছাড়াও প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা এবং প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখায় আরও ক'জনের নাম পাওয়া যায়। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা জানিয়েছেন, 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ এবং তাঁর স্ত্রী এই দলে ছিলেন। আত্মপ্রাণা যাঁদের নাম দিয়েছেন, তাঁদের ভিতর মথুরানাথ সিং রয়েছেন। সব মিলিয়ে ১৮-১৯ জনের নাম পাওয়া যায়।

এই বুদ্ধগয়া ভ্রমণের বেশকিছু চিত্র পাওয়া যায় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যদুনাথ সরকারের লেখায়। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতিতে' লিখেছেন, 'অনেক রাত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা ও পিতৃদেব বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধ ইতিহাস নিয়ে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা এক-একটি তর্ক তোলেন আর রবীন্দ্রনাথ

চেষ্টা করেন তার যথাযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে। আমরা অন্যেরা তাঁদের প্রশ্নোত্তর তর্ক বিতর্ক মুগ্ধ হয়ে শুনে যাই। আমার বিশ্বাস এই বুদ্ধগয়া সন্দর্শনের ফলে উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যে পিতৃদেবের অন্তরের আকর্ষণ প্রগাঢ় গভীর হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে আমাকে তিনি ধম্মপদ আগাগোড়া মুখস্থ করতে দিয়েছিলেন। পালি পড়াও শুরু হল। এবং পিতারই আদেশক্রমে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত তর্জমার দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হলুম।

'বুদ্ধদেবের বোধিলাভের পূতস্থান বুদ্ধগয়ায় জগদীশচন্দ্র, নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ তিন মনীষীর একত্র সমাগমে অপূর্ব এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। মাত্র দু-তিনদিনের তীর্থবাস, কিন্তু তারই মধ্যে কত গল্প, কত আলোচনা, কত পরামর্শই না হয়েছিল; বড়ো দুঃখ যে তার আজ কোনো অনুলিপি নেই। সেই অল্প বয়সে বুদ্ধগয়ার মাহাত্ম্য বা বয়স্কদের আলাপ আলোচনা সম্পূর্ণ বুঝবার ক্ষমতা ছিল না। না থাকলেও এই তীর্থস্থানে দুর্লভ সৎসঙ্গে ত্রিরাত্রিবাসের স্মৃতি আমার মানসপটে আজো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।'

রথীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে এই ধারণা করাই যায় যে, বুদ্ধগয়া রবীন্দ্র-মনেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সেইসঙ্গে এ-ও বোঝা যায়, বৌদ্ধধর্ম এবং তার ইতিহাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং নিবেদিতা সহমত হতে পারেননি। তাঁদের ভিতর এ নিয়ে অবিরাম তর্ক চলত।

তবে, বুদ্ধগয়ায় শৈব মহন্তের আতিথ্যে যে নিবেদিতার সঙ্গীরা খুশি হয়েছিলেন, তা-ও জানা যায় রথীন্দ্রনাথের লেখায়। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'তাঁর (মহন্তর) অতিথিশালার বিরাট বাড়ির তেতালার ঘরগুলিতে থাকতে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘরের বিশেষ প্রয়োজন হয়নি, সামনে যে প্রকাণ্ড বারান্দা ছিল, তাতেই আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে আসর জমিয়েছিলুম। আতিথ্যের অভাব হয়নি, উত্তম দুধ, ঘি, ফলমূল বহুবিধ খাদ্য সবসময়ই প্রস্তুত। যখনই ফাঁক পেতুম উঠোনে বৃহৎ ইঁদারা ছিল, তার ভিতর নেমে গিয়ে বসে থাকতুম। এরকম ইঁদারা ইতিপূর্বে দেখিনি। ইঁদারার বাইরের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে সিঁড়ির মতো গ্যালারি নীচে পর্যন্ত নেমে গেছে। তার মাঝে মাঝে জানালা আছে। গরমের দিনে সেখানে বসে বড়ো আরাম।'

যদুনাথ সরকার তাঁর নিবেদিতার স্মৃতিচারণায় লিখেছেন—'সন্ধ্যাকালে আমরা সকলেই বোধিবৃক্ষের নিচে বসিয়া ধ্যান করিতাম। বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষের নিচে বসিয়া আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন, এ বৃক্ষটি তাহারই বংশধর। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ইহার একটি শাখা সিংহলে লইয়া গিয়া সেখানকার রাজা তথায় প্রোথিত করেন। অল্প কিছুদূরে একখানি গোলাকার

প্রস্তরখণ্ড ছিল, তাহার উপরে একটি বজ্র খোদিত ছিল। কথিত আছে, এই বজ্রটি স্বয়ং ইন্দ্র বুদ্ধকে দিয়াছিলেন। এই বজ্রটি দেখিয়া নিবেদিতা বলিলেন, ইহাকে ভারতের জাতীয় চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করা কর্তব্য। আমরা সকলে ইহার অর্থ জানিতে চাহিলে নিবেদিতা বলিলেন, ইহার অর্থ এই যে, যখন কেহ সমগ্র মানব জাতির কল্যাণসাধনের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেন তখন তিনি বজ্রের মতো শক্তিশালী হইয়া দেবতাদের নির্দিষ্ট কার্য করেন। এইজন্যই বোধহয় নিবেদিতা এই বজ্রচিহ্নকে তাঁহার পুস্তকের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই একই কারণে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের শীর্ষদেশে জগদীশচন্দ্র এই বজ্রচিহ্ন স্থাপন করেন।' বলা দরকার, যে বজ্র চিহ্নের কথা যদুনাথ উল্লেখ করেছেন, পরবর্তীকালে ভারতের জন্য একটি জাতীয় পতাকার নক্সা প্রস্তুত করে নিবেদিতা সেই বজ্রচিহ্নটি ব্যবহার করেছিলেন। আর নিবেদিতার মৃত্যুর অনেক পরে, যখন কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জগদীশচন্দ্র, তখন সেখানেও এই বজ্রচিহ্নটি তিনি খোদিত করেছিলেন। না থাকলেও, নিবেদিতার উপস্থিতিকে হয়তো বিস্মৃত হতে পারেননি জগদীশচন্দ্র।

যদুনাথ সরকারের লেখাতেই জানতে পারি, নিবেদিতা এবং তাঁর সঙ্গীরা একদিন উরুবেলা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলেন। যদুনাথ লিখেছেন, 'সন্ধ্যাবেলা নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ এবং আমরা একত্রে বাহির হইতাম। সুজাতা বুদ্ধদেবকে সোনার থালায় করিয়া পায়েস খাইতে দিয়াছিলেন। সুজাতার পায়েস ভক্ষণ করিয়াই বুদ্ধ নির্বাণলাভ করেন। সুজাতার বাড়ি ছিল উরুবেলা গ্রামে। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা একটি গ্রামে গিয়া পৌছিলাম। ওই গ্রামটিকে তখন উর্বিল বলা হয়। নিবেদিতা বলিলেন, ওই গ্রামে সুজাতা বাস করিতেন। উৎসাহ ও আনন্দের আতিশয্যে নিবেদিতা সেই গ্রামের কিছু মৃত্তিকা তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন সুজাতার গ্রামের মৃত্তিকা পবিত্র। নিবেদিতা ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং এই তীর্থগুলির নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন।'

বুদ্ধগয়ায় অবস্থানকালে আর একটি ঘটনার স্মৃতিও পাই যদুনাথ সরকারের লেখায়। যদুনাথ লিখেছেন, 'আমরা যে মহন্তের বাড়ি উঠিয়াছিলাম সেইখানে প্রতিদিন নিবেদিতা আমাদের সকলকে ওয়ারেন-এর বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বই হইতে এবং এডইউন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' হইতে কবিতা পড়িয়া শুনাইতেন। একদিন সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে আমরা সকলে যখন বোধিবৃক্ষতলে গিয়া বসিলাম, তখন লক্ষ্য করিলাম একটি আশ্চর্য চরিত্রের মানুষকে। তাহার নাম ফুজী। একজন দরিদ্র জাপানী সে। দীর্ঘকাল ধরিয়া সে কষ্ট করিয়া পয়সা জমাইয়াছে তাহার জীবনের

একটি স্বপ্ন চরিতার্থ করিবার জন্য। ভগবান তথাগত যে স্থানটিতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, ফুজীর ইচ্ছা সেই পূণ্য তীর্থস্থানটি সে একবার দর্শন করিবে। অবশেষে এইখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং যাত্রীনিবাসের একটি ঘরে অতি সামান্যভাবে সে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফুজী বোধিবৃক্ষতলে বসিয়া এই স্তোত্রটি পাঠ করিতঞ্চ

নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়
নমো নমো গৌতমচন্দ্রিমায়
নমো নমো নন্তগুণন্নবায়
নমো নমো সাকিয়নন্দনায়।

'সন্ধ্যার সেই নিস্তব্ধ ও শান্ত মুহূর্তে জাপানী কণ্ঠে এই সংস্কৃত স্তোত্রটি যেন মন্দিরের সুমধুর ঘণ্টাধ্বনির মতো শুনাইত। নিবেদিতা সযত্নে ফুজীকে প্রতিদিন আহার্য দিতেন। ফুজীর কণ্ঠে উচ্চারিত এই স্তোত্রটি রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল। তাঁহার 'নটির পূজা'য় শ্রীমতীর প্রার্থনায় কবি এই ফুজীর স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন।'

১৯০৪ সালের ১৫ অক্টোবর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তাতে বুদ্ধগয়ায় দিনগুলি কীভাবে তাঁরা কাটাতেন তার ঈষৎ বর্ণনা আছে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'In the morning we had tea by 6 and then reading— Light of Asia-Web of Indian Life etc., and talks. All gathered together in the great verandah. Our Mahant is like a king. Evenings — we went out after tea— to the temple and tree— House of Sujata and so on.We talked History, Nationality, Swamiji, Sri Ramakrishna and the rest.'

যদুনাথ সরকার তাঁর স্মৃতিচারণে এইসব বিষয়ে নিবেদিতার ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ এইসব বিশ্লেষণ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। কবির নিজের প্রকাশভঙ্গীও অবশ্যই অপূর্ব। কিন্তু তিনি বলিতেন, বস্তুর একেবারে মর্মে প্রবেশ করিয়া ব্যাখ্যা করিবার এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে নিবেদিতার।'

এ প্রসঙ্গে লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'এইবার নিবেদিতার স্বভাবের একটা নতুন দিক সবার চোখে পড়ল। স্থাপত্য আর ইতিহাস সম্পর্কে নিবেদিতার একটা দারুণ ঝোঁক আছে। সেইসঙ্গে আছে অতীতকে মূর্ত করে তুলবার অনায়াস একটি ক্ষমতা। তথ্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদের তিনি নিপুণ দিশারী। আবার প্রাণের আবেগ মন খুলে তাঁর কাছে প্রকাশ করা চলে। তিনি দরদী। নিবেদিতার বন্ধুরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনতেন।'

রেমঁ লিখছেন, 'সন্ধ্যায় ধ্বংসস্তূপের ভাঙাচোরা সিঁড়িতে বসে সবাই জোনাকির ঝিকিমিকি দেখেন। চারদিকের গভীর শান্তি যেন তাঁদের ধ্যানস্তব্ধ করে তোলে। নিবেদিতা হয়তো নিজের কোনো অনুভূতির কথা বললেন, রবীন্দ্রনাথ একখানা ভজন গাইলেন। ফাঁকে ফাঁকে মহৎ হৃদয়ের এই যে ভাব বিনিময়, এ অন্তরঙ্গতার তুলনা নাই।' বুদ্ধগয়ায় রবীন্দ্রনাথের শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, পরিশীলিত আচরণ নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯০৪ সালে ১৫ অক্টোবর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা একটি চিঠিতে এই মুগ্ধতা ধরা পড়েছিল। এই চিঠিটির অংশবিশেষ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য আর একবার তুলে দেওয়া হল। নিবেদিতা লিখেছেন, 'The poet, Mr. Tagore, was a perfect guest. He is almost the only Indian man I have ever seen who has nothing of the spoiled child socially about him. He has a naif sort of vanity in speech which is so childlike as to be rather touching. But he thinks of others all the time— as no one but a Western hostess could. He sang and chatted day and night— was always ready — either to entertain or to be entertained— served Dr. Bose as if he were his mother— struggles all the time detween work for the country and the national longing to seek Mukti. In short— never was any man so ridiculously maligned when suspected of things vulgar and immoral. But for all this, Mr. Tagore's is not the type of manhood that appeals to me. He is much more attractive to Christine.'

নিবেদিতা এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যবোধ, শিষ্টাচারের প্রভূত প্রশংসা করলেও, একটু কটাক্ষ কিন্তু চিঠিতে রয়ে গেছে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Mr. Tagore's is not the type of manhood that appeals to me.' এক্ষেত্রে Manhood বলতে নিবেদিতা ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন— তা পরিষ্কার নয়। রবীন্দ্রনাথের আচরণে পৌরুষের ঘাটতি রয়েছে এমনই কি মনে হয়েছিল নিবেদিতার? যাই মনে হোক না কেন, যাবতীয় শিষ্টাচার এবং সৌজন্যবোধ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর কাছে সেই পুরুষ নন যিনি 'appeals to me'। এখানে এই প্রশ্নও উঠতে পারে–রবীন্দ্রনাথের প্রতি হঠাৎ এই কটাক্ষ কেন নিবেদিতার? নিবেদিতা কী তখন বুঝে গিয়েছিলেন বুদ্ধগয়ায় রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গী করে নিয়ে এসে তাঁর কোনো লাভ হয়নি। কারণ, রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়া নিয়ে তাঁর আন্দোলনকে সমর্থন

করতে রাজি নন। এই চিঠিতে আরও একটি পংক্তি লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নিবেদিতা লিখেছেন, 'He is much more attractive to Christine.'

বুদ্ধগয়ার এই সফরে সিস্টার ক্রিস্টিনও নিবেদিতার সঙ্গী হয়েছিলেন। নিবেদিতার সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের শান্ত চরিত্রের ক্রিস্টিনকে রবীন্দ্রনাথ বেশ পছন্দ করতেন। বুদ্ধগয়ায় অবস্থানকালে কি রবীন্দ্রনাথ ক্রিস্টিনের প্রতি বা ক্রিস্টিন রবীন্দ্রনাথের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়ে ফেলেছিলেন? তা না হলে নিবেদিতা এ পংক্তি লিখবেন কেন? তবে, এসব সম্পর্কে জোর করে কিছুই বলা যাবে না। কেননা, নিবেদিতার চিঠির এই লাইন কটি ছাড়া পুরো বিষয়টিই কুয়াশায় ঢাকা।

বুদ্ধগয়া ভ্রমণ সেরে ফেরার পথেও নিবেদিতার তেজস্বনী মূর্তি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সঙ্গীদের। তাঁর বিবরণ পাওয়া যায় রথীন্দ্রনাথের লেখায়। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ফেরবার সময় সকলে মিলে গয়া স্টেশনে যাওয়া হল। সকলের গন্তব্যস্থল এক নয়, তাই বিভিন্ন ট্রেন ধরতে হবে। সপত্নীক জগদীশচন্দ্র বোম্বে মেলে কলকাতায় যাবেন। সেই ট্রেনই প্রথম এল। দৌড়াদৌড়ি করে কোনো কামরাতে জায়গা পেলেন না। প্রথম শ্রেণির একটি কামরায় দেখা গেল দুটি লোক, দুজনেই শ্বেতাঙ্গ। ভারতীয়দের তারা ঢুকতে দেবে না দেখে আমরা দু-একজন স্টেশন মাস্টারের কাছে ছুটে গেলুম। ব্যাপার বুঝতে পেরে তিনি কিন্তু সাহস করে এগিয়ে এলেন না। ফিরে এসে দেখি ভগিনী নিবেদিতা তাঁর স্বজাতি দুটিকে বেশ তিক্ত-মধুর ধমক দিচ্ছেন। ধমক খেয়ে সাহেবরা অবশেষে গাড়ির দরজা খুলে দিল। জগদীশচন্দ্র ও শ্রীমতী বসু শেষমুহূর্তে কোনোমতে উঠে পড়লেন।

'ট্রেন চলে গেলে দেখলুম নিবেদিতার প্রজ্জ্বলিত মূর্তি। কিছুতেই আত্মসংবরণ করতে পারছেন না; সেই মুহূর্তে ইংরেজকে ভারতবর্ষ থেকে বিতারিত করতে পারলে তবে যেন স্বস্তি পান। তাঁর সেই রাগ পড়তে না পড়তে আর একটা ট্রেন এসে পড়ল। নিবেদিতাকে এই ট্রেনে যেতে হবে পশ্চিমের দিকে। দুটি মাত্র কামরা—একটিতে একজন শ্বেতাঙ্গিনী, অন্যটিতে একটিমাত্র ভারতীয় পুরুষ। যে কামরায় ইংরেজ ভদ্রমহিলা ছিলেন, আমরা সেই কামরায় নিবেদিতার মালপত্র তুলে দিতে গেলে তিনি বললেন— 'I am not going in there.' অগত্যা অন্য কামরায় নিয়ে গেলুম। আমরা দরজা খুলে ঢুকতেই ভদ্রলোকটি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর গড়গড়া সরিয়ে নিয়ে নিবেদিতার জন্য তাঁর নিজের জায়গা ছেড়ে দিলেন। ট্রেন ছাড়ার সময় নিবেদিতা আমাদের সকলকে ডেকে বললেন, 'Wow, you see the difference between the barbarous Englishmen and the civilized Indians.'

এখানে একটু বলে নেওয়া দরকার যে, ধর্মপাল বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধদের দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে কিন্তু একচুলও সরে আসেননি। ১৮৯৮ সালে স্বামীজি শেষবারের মতো বিদেশযাত্রা করার পর পরই ধর্মপাল দক্ষিণ ভারত সফরে যান। ১৮৯৮-এর ২৭ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজে বুদ্ধিস্ট সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন ধর্মপাল। বিস্তৃতভাবে না বললেও এটুকু বলা চলে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মপালের লাগাতার আক্রমণ অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে শঙ্করাচার্যের প্রতি বিদ্বেষমূলক বক্তব্য তাঁর হাতিয়ার হয়ে উঠল। বিভিন্ন বক্তব্যে এবং সংবাদপত্রের লেখায় ধর্মপাল এটি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন, হিন্দুধর্ম অনুদার এবং আগ্রাসী। ভারতে বৌদ্ধযুগই ছিল গৌরবময়যুগ। এমনকি, এসব কথা বলতে গিয়ে ধর্মপাল ইতিহাসকেও বিকৃত করতে শুরু করেন। ধর্মপালের এই ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টার প্রতিবাদ করেছিল 'মাদ্রাজ টাইমস'-এর মতো কাগজ। নিবেদিতা যখন বুদ্ধগয়া নিয়ে জনমত গড়ে তুলতে চাইছেন, তখনো কিন্তু হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মপালের এই প্রচার অব্যাহত ছিল। অব্যাহত ছিল শুধু তা-ই নয়, সেই প্রচার ততদিনে আরো চড়া আকার ধারণ করেছিল। ধর্মপালের আর একটি সুবিধা হয়েছিল যে, ইংরেজ সরকারের পরোক্ষ সমর্থন তাঁর দিকেই ছিল। আর দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মসমাজের এলিটদের সমর্থনও ধর্মপাল লাভ করেছিলেন।

তবে, নিবেদিতা যে উদ্দেশ্যে বুদ্ধগয়ায় তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তার কারণ, নিবেদিতার সঙ্গী বাছাটাই ভুল হয়েছিল। নিবেদিতার দলে ছিলেন জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ। জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মমতে বিশ্বাস করতেন না। বরং, দুজনেই তাঁর চরম বিরোধী ছিলেন। নিবেদিতার বোঝা উচিত ছিল বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী অংশ—স্বামীজির এই ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র হয়তো মেনে নেবেন না। সেই কারণে বুদ্ধগয়ার দায়িত্ব শৈব মহন্তর হাতে রাখার দাবির বিরোধিতাই করবেন এই দুজন। দ্বিতীয়ত, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এবং ব্রাহ্মসমাজের কাছে বুদ্ধের একটি শ্রদ্ধার আসন বরাবরই ছিল। ১৮৫৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিংহল ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র সেন। ধর্মপালের সঙ্গেও ঠাকুর পরিবারের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। ধর্মপাল জোড়াসাঁকোয় গিয়ে বেশ কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছেন। ধারণা করাই যায়, বুদ্ধগয়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর ব্রাহ্মধর্মভাবনার ফলে বৌদ্ধপ্রভাবে কিছুটা প্রভাবান্বিত ছিলেন। তদুপরি ধর্মপালের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল। নিবেদিতার সঙ্গে

বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার অনেক আগেই সেখানে বৌদ্ধকেন্দ্র গড়তে মহন্তের হাত থেকে জমির অধিকার নেওয়ার পক্ষেই মত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০২ সালে ওকাকুরা কাকুজো বুদ্ধগয়ায় একটি বৌদ্ধকুঞ্জ গড়তে চাইলে রবীন্দ্রনাথ পালামৌ জেলার তদানীন্তন জমি অধিগ্রহণ আধিকারিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন, 'ইতিমধ্যে মহন্ত বেঁকে দাঁড়িয়েছে। সে বলে গভর্মেন্টের অনুমতি ব্যতীত সে জমি দিতে পারে না। তুমি তাকে একটু বিশেষরকম তাগিদ দিতে পার না?' (১৯০২-এর ২৭ সেপ্টেম্বর লেখা চিঠি)

বুদ্ধগয়া নিয়ে যে নিবেদিতার সঙ্গে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ এবং জগদীশচন্দ্রের মতের এবং মনের মিল কখনোই সম্ভব ছিল না—তা বোঝা যায় রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মন্দির দেখা হলে আমরা মন্দিরের পিছনের দিকে বোধিদ্রুমের নিকট গিয়ে বসলুম। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, মন্দিরের গায়ে গবাক্ষগুলিতে প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। চারিদিক নিঃস্তব্ধ; তার মধ্যে কানে এল 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'—বৌদ্ধধর্মের মৃদু গম্ভীর ধ্বনির আবর্তন। কয়েকটি জাপানী তীর্থযাত্রী এই মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন, আর প্রতি পদক্ষেপে একটি করে ধূপ জ্বেলে রেখে দিয়ে যাচ্ছেন। কি শান্ত তাঁদের মূর্তি। কি গভীর তাঁদের ভক্তি। ইষ্টপূজার কি অনাড়ম্বর প্রণালী। অনতিপূর্বে মন্দিরের ভিতরে বৌদ্ধমূর্তির সামনে মহন্তের পুরোহিতদের কর্কশ ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আরতি দেখে এসেছিলুম। আমাদের মনে এই কথাটাই জাগল, ভগবান এদের মধ্যে কার পূজা খুশি হয়ে গ্রহণ করলেন?'

রথীন্দ্রনাথের এই স্মৃতিচারণা যে রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্রের মানসিকতারই প্রতিফলন, তা বলে না দিলেও চলে। এইরকমই মানসিকতা যাঁদের তাঁদের সমর্থন নিবেদিতা পাবেন না—এটাই স্বাভাবিক। কাজেই, স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন মনে জাগে—নিবেদিতা বুদ্ধগয়া সফরে এরকম সঙ্গীদের বাছলেন কেন? বুদ্ধগয়া সম্পর্কে এঁরা কী মনোভাব পোষণ করতে পারেন— তা কি নিবেদিতা আঁচ করতে পারেননি? এক্ষেত্রে একটি কথা বলা যায়, নিবেদিতার বুদ্ধগয়া সফরের তালিকায় রবীন্দ্রনাথকে ঢোকান জগদীশচন্দ্র। তা জানা যায় রথীন্দ্রনাথের লেখায়। এ লেখায় তার উল্লেখও রয়েছে পূর্বে। রবীন্দ্রনাথকে এ তালিকায় জগদীশচন্দ্র কি ইচ্ছাকৃতভাবে ঢুকিয়েছিলেন, নাকি নিতান্ত সৌজন্যবশতই রবীন্দ্রনাথের নাম তিনি বলেছিলেন—তা নিয়েও সন্দেহ হতেই পারে। কাজেই এ সংশয় হওয়া স্বাভাবিক যে, বুদ্ধগয়ার সফরসঙ্গীদের তালিকা তৈরিতে হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই নিবেদিতাকে উপরোধেই ঢেঁকি গিলতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বলা যায়–বুদ্ধগয়ার সফরসঙ্গী বাছতে গিয়ে

নিবেদিতা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্রের মতো ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা তাঁর ভুলই হয়েছিল।

বুদ্ধগয়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে নিবেদিতার বিরোধিতাই করেছিলেন 'রবিজীবনী'তে তার উল্লেখ করেছেন প্রশান্তকুমার পালও। তিনি লিখেছেন, 'অনাগরিক ধর্মপালের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ধর্মপাল একাধিকবার মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অনুমান করা যায়, বুদ্ধগয়ায় মন্দির নিয়ে বৌদ্ধ-হিন্দু বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল বৌদ্ধদের প্রতি।' বুদ্ধগয়া নিয়ে মতের মিল তো হলই না। বরং, যা হল, তা এই যে—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার এক অনভিপ্রেত দূরত্ব।

তাঁর বুদ্ধগয়া সফরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় নিবেদিতা হতাশই হয়েছিলেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'বুদ্ধগয়া পরিত্যাগকালে তিনি দুঃখে অভিভূত হইয়া সারারাত্রি অশ্রুবিসর্জন করেন। গভীর আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন, 'আমরা ব্যর্থ হয়েছি। দেশের গভীর নিদ্রা এখনো ভাঙেনি। জীবনের সঞ্চার দেখা যায় না। জনসাধারণ আমার কথা শুনতে আসে, কিন্তু পরক্ষণে সব ভুলে গিয়ে গতানুগতিক পথে চলে। আমরা কিছুই করতে পারিনি। যে মহাজাগরণ একদিন ভারতকে বিশ্বের গর্ব ও এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিল, তার অন্তরাত্মার সেই পুনর্জাগরণ ঘটেছে। কবে আবার এই জাতি তার মহান উত্তরাধিকার, মানবজাতির চিন্তা ও সভ্যতার সংগঠনে একদিন সে যে বিশেষ স্থান লাভ করেছিল সে সম্বন্ধে অবহিত হবে? কবে আবার সেই শক্তি, সেই উৎসাহ ফিরে আসবে?'

বুদ্ধগয়ায় অবস্থানের সময় শেষ হলে নিবেদিতা গেলেন রাজগির। ১৫ অক্টোবর, ১৯০৪ রাজগির থেকে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখলেন, 'I trust that for many of those there, the experiencc may prove what Swamiji always said — "Only when they go away, will they know how much they have received."

বুদ্ধগয়ায় তাঁর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু নিবেদিতা বিশ্বাস হারাতে চাননি। জোসেফিনকে লেখা এই চিঠিটি তার প্রমাণ।

চার

১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয় নিবেদিতার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ।' বইটি রচনার কাজে নিবেদিতা হাত দেন ১৯০০ সালে। এই সময়ে লন্ডনে থাকাকালীন বইটি লিখতে শুরু করেন তিনি। এই বইটি রচনার বিষয়ে নিবেদিতাকে প্রভূত উৎসাহ এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র। ১৯০৩ সালে নিবেদিতা বইটি রচনার কাজ শেষ করেন। ১৯০৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Your child has finished her book, and S. Sara brings it to London when she comes. It was finished at 4 o'clock in the aftetnoon of the 7th, the day before yesterday, and the last chapter on which I was engaged was about Siva!

'You will realise dear Yum, as no one else can, that it is not my book at all, but Swamiji's, and that my one hope about it is that I may have said the things that He would have liked said. As to whether this is so or no, you shall be judge, when you are well euohgh to read it.'

বইটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় ১৯০৪-এর জুন মাসে। উইলিয়াম হেইনমেন প্রকাশনা সংস্থা বইটি প্রকাশ করে। এই বইটির পিছনে যে অহরহ স্বামীজির অনুপ্রেরণাই কাজ করেছে, তা সর্বদা স্বীকার করেছেন নিবেদিতা। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠিতে তো তিনি একথাও বলেছেন, বইটি আসলে তাঁর নয়, স্বামীজির। বইটি প্রকাশের পরে বিশিষ্ট মহলের অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। ১৯০৪-এর ২৬ জুলাই জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'When

you deep into it, you recognise Swamiji at all, dear Yum, you will give me great happiness. I have worked for others as a hand or a tool, but He alone demanded the whole of my heart and head being, and left it to me to use them for Him. Both kinds of service, all kinds of service, are great and good, but this alone is all absorbring— because this alone implies perfect faith.'

বিবেকানন্দের প্রতি যে তিনি সম্পূর্ণ সমর্পিত ছিলেন, এমনকী প্রয়াণের পরও স্বামীজিই যে ছিলেন তাঁর অন্তরের সবটুকু জুড়ে— জোসেফিনকে লেখা এই চিঠিতেই নিবেদিতার সে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। নিবেদিতার এই চিঠিতে আর একটি বিষয়ও বেশ লক্ষ্যণীয়। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'I have worked for others as a hand or tool... ; মনে রাখতে হবে, নিবেদিতা তাঁর পুস্তক রচনার অনেক আগে থেকেই জগদীশচন্দ্রের রচনার কাজে নিয়মিত সহায়তা করে গেছেন। এমনকী, নিজের পুস্তক রচনার পাশাপাশি জগদীশচন্দ্রের পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রচনাতেও সাহায্য করেছেন। চিঠির এই পংক্তিতে কি নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের সেই কাজের কথাই বলেছেন? পরিষ্কার করে কিছু বলেননি বটে, তবে এরকম ধারণা করাই যায়। এবং তারপরই কিন্তু তিনি বলেছেন, এসবের পরেও তাঁর সম্পূর্ণ হৃদয়ের দাবিদার একমাত্র স্বামীজিই এবং স্বামীজিই তাঁর হৃদয় এবং মস্তিষ্ককে নিজের কাজে ব্যবহার করেছেন। বোঝাই যায়, প্রয়াণের পরও বিবেকানন্দ কতখানি আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন নিবেদিতাকে।

নিবেদিতার এই পুস্তকটি প্রকাশের পর বেশ কিছু সংবাদপত্র তার প্রশংসা করে। ১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে 'কুইন' পত্রিকা লেখে, 'It is seldom that a western-born author succeeds as absolutely as Miss Noble in her 'The Web of Indian Life' in penetrating the Eastern mind and heart... If love is the first qualification towords understanding the character of a people, Miss Noble was thoroughly qualified, for she writes of the East as a lover might write of his beloved; each intimacy, each familiarity adds to the mystery and fascination exercised by this wonderful alluring East over his spirit....It would be well if those who gather their impressions of our Indian Empire solely from missionaries of preconceived ideas and little sympathy, or from the abstruse works of scholars, or the chatter of the Anglo-

Indians, were to revise the impressions they gathered from these sources by the light of this poetically written and scholarly work.'

১৯০৪ সালের ২৪ জুলাই 'দ্য ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস' লিখল, 'The western world, speaking generally, knows the Indian woman only through the testimony of missionaries. For this reason a book published in London a few days ago, 'The web of Indian Life' by the Sister Nivedita comes as a revelation; it is attracting immediate attention; it is being regarded as an epoch-making book. For in it the inner life of the Indian woman, the life below the surface, the ideals, the mainsprings of action, the aspirations, hopes and all the mysticism of the East, and the reality of the unseen, are set forth, as has never been done before, by a Western woman imbued with a spirit of reverent sympathy.'

কিন্তু, প্রশংসা যেমন জুটল, তেমনই আক্রমণও নিবেদিতার দিকে কিছু কম ছুটে এল না। নিবেদিতার এই বইটি প্রকাশের পর খ্রিস্টান মিশনারিরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তাদের ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠার কারণটি সহজেই অনুমেয়। কারণ, তারা ভারতীয় সমাজ এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছিল পাশ্চাত্যে, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে যে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছিল তারা—নিবেদিতার এই পুস্তকটি সেই মিথ্যাচারকে উন্মুক্ত করে দিল। নিজেদের মিথ্যাচারগুলি প্রকাশ হয়ে যেতেই মিশনারিরা নিবেদিতাকে আক্রমণ করতে দল বেঁধে ময়দানে নেমে পড়ল। নিবেদিতার পুস্তকের বিরোধিতা করতে মিশনারি অ্যানি উইলসন কারমাইকেল একটি পুস্তক লিখলেন। সেটির নাম 'থিংস অ্যাজ দে আর'। মিশনারিদের সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলিও নেমে পড়ল নিবেদিতার বইয়ের সমালোচনায়। ১৯০৪ সালের ১৯ আগস্ট 'দ্য চার্চ টাইমস' লিখল, 'In 'The Web of Indian Life' the authoress lets herself go, so to say, with entire abandon, to give us a couleur de rose picture of Indian life and thought... It is all pure undiluted optimism...It is the supression of the other side of the picture that we deprecate in the interest, not only of the truth, but of the cause of Indian woman themselves, whose lot will never be improved if this sort of sentimental idealism about them is allowed to obtain credence. Potentially, we are fully

prepared to believe the Indian woman is what she is here described as being. Actually, the ideas, the sanctions, the customs of the men of India must undergo radical transformation before the ideal can be realised. And only Christianity can effect the transformation.'

১৯০৪ সালে 'দ্য অ্যাথেনিয়াম' পত্রিকা লিখল, 'If Sister Nivedita is an unsafe guide in social Questions, she is still less to be trusted when she undertakes to deal with matters of Indian History or literature, and it is much to be regretted that no scholarly friend was at hand to prevent the publication of such chapters as those on 'The Indian Sagas' and 'The Synthesis of Indian thought.' It would be as easy as it would be distasteful to multiply instances of misunderstanding and misstatement.'

এককথায় বলতে গেলে বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৫-এর ৪ ফেব্রুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'We are beginning to have counter-blasts from the Missionaries now to the book. Sometimes they are very funny, and always they express more than the poor author suspects. It is for India to understand my book and make the world admit that it is not half the truth.'

'দ্য ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ'-এর ১৯১৮ সালে যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয়, তাতে একটি দীর্ঘ মুখবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'And this was the reason which made us deeply grateful to Sister Nivedita, that great hearted Western woman, when she gave utterance to her criticism of Indian Life. She had won her access to the inmost heart of our society by her supreme gift of sympathy. She did not come to us with the impertinent curiosity of a visitor, nor did she elevate herself on a special high perch with the idea that a bird's eye view is truer than the human view because of its superior aloofness. She live our Life and came to know us by becoming one of ourselves. She became so intimately

familier with our people that she had the rare opportunity of observing us unawares. As a race we have our special limitations and imperfections, and for a foreigner it does not require a high degree of keen-sightedness to detect them. We know for certain that these defects did not escape Niveditas observation, but she did not stop there to generalize, as most other foreigners do. And because she had a comprehensive mind and extraordinary insight of love she could see the creative ideals at work behind our social forms and discover our soul that has living connexion with its past and is marching towards its fulfilment.'

নিবেদিতার গ্রন্থের সমালোচকদের যাবতীয় সমালোচনার জবাব রবীন্দ্রনাথ এই মুখবন্ধেই দিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯০৪-এর শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানালেন শিলাইদহে তাঁর সঙ্গে কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে যেতে। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের অতিথ্যে ছুটি কাটানোর ইচ্ছা ছিল নিবেদিতার বহুদিন। এর আগে স্বামীজির জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথ একবার নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শিলাইদহে আসার। সেটি ছিল ১৮৯৯ সাল। তবে সেবার রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে শিলাইদহে যাওয়া সম্ভব হয়নি নিবেদিতার। সে জন্য দুঃখপ্রকাশ করে কবিকে একটি চিঠি (১৬ জুন, ১৮৯৯) লিখেছিলেন নিবেদিতা। ওই চিঠিটির কথা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০৪ সালের কোন সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে শিলাইদহে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বা নিবেদিতা ঠিক কোন তারিখে শিলাইদহে পৌঁছেছিলেন তার নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে, বিভিন্ন জনের স্মৃতিচারণার সূত্র ধরে জানা যায় ১৯০৪-এর ডিসেম্বরের শেষ এবং ১৯০৫-এর জানুয়ারির গোড়ার সময়টুকু নিবেদিতা শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে ছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে ছিলেন ক্রিস্টিন। এছাড়া, জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুও সেই সময়ে শিলাইদহে ছুটি কাটিয়েছিলেন। ১৯০৫-এর জানুয়ারির ৫ তারিখে সারা বুলকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা শিলাইদহে ছুটি কাটানোর কথা লিখেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তার আগে ডিসেম্বর মাসের কোনো চিঠিতেই জোসেফিন ম্যাকলিয়ড, সারা বুল বা তাঁর অন্য কোনো ঘনিষ্ঠজনকে তিনি শিলাইদহ যাত্রার সামান্য ইঙ্গিতটুকুও দেননি। ১৯০৫-এর জানুয়ারিতে সারা বুলকে শিলাইদহে ছুটি কাটানোর বিষয় তিনি জানান, সেখান থেকে কলকাতা ফেরার পর। এক্ষেত্রে একটি খটকা জাগেই। যে নিবেদিতা

দৈনন্দিন প্রায় প্রতিটি খুঁটিনাটিই জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে জানাতেন, তিনি কবির আমন্ত্রণে শিলাইদহে যাওয়ার ঘটনাটি জোসেফিনকে কেন আগাম জানালেন না? এই নীরবতা কেন অবলম্বন করেছিলেন নিবেদিতা? তিনি কি চাননি তাঁর এবং ক্রিস্টিনের শিলাইদহ যাত্রার বিষয়টি অন্যেরা জানুক? এটা নিতান্তই সংশয়। এর কোনো উত্তর কোথাও নেই।

প্রতি বছরই শীতকালের ওই সময়টিতে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাবক্ষে বোটে ছুটি কাটাতেন। কবির কাছে খুব প্রিয় ছিল এই সময়টায় পদ্মাবক্ষে ছুটি কাটানো। ঠিক এই সময়টিতেই কবি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনকে। কেন আমন্ত্রণ করেছিলেন? এর আগে তাঁর প্রথম আমন্ত্রণে ইচ্ছে থাকলেও নিবেদিতা আসতে পারেননি। সেই বিষয়টি কবির স্মরণে ছিল। তাই দ্বিতীয়বার নিবেদিতাকে কবির এই আমন্ত্রণ। আর একটি কারণও এর পিছনে থাকার সম্ভাবনা আছে। তা হল, এর কিছুদিন আগেই বুদ্ধগয়ার প্রসঙ্গটি নিয়ে কবির সঙ্গে মতান্তর হয়েছে নিবেদিতার। নিবেদিতাকে সমর্থন জানাতে পারেননি কবি। সেই কারণে নিবেদিতা হতাশ এবং কিছুটা মনক্ষুণ্ণও হয়েছিলেন। শিলাইদহে নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কবি নিবেদিতার মনে জমে থাকা মেঘটি হয়তো কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দুজনের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতর ভুল বোঝাবুঝিটুকু দূর করার জন্যই হয়তো শিলাইদহে নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কবি। আবার ১৯০৫-এর ৫ জানুয়ারি নিবেদিতা সারা বুলকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, সেটি পড়লে মনে হয় — রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যে শিলাইদহে অবস্থান করার সময় জগদীশচন্দ্রই নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানান। নিবেদিতা সারা বুলকে লিখেছেন, 'We went to them (Jagadishchandra and Abala Basu) while they were thc guests of the Poet, on the River, and returned on Monday evening, all together.'

'রবিজীবনী'তে প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন, সম্ভবত ১৯০৪-এর ৩০ ডিসেম্বর নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হন। রবীন্দ্রনাথ এবং সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র সেই সময় শিলাইদহে পদ্মাবক্ষে বাস করছিলেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ তখন অধিকাংশ সময় শিলাইদহে অবস্থান করিতেন। নিবেদিতা কয়েকবার সেখানে গিয়াছিলেন। ১৯০৪-এর ডিসেম্বর মাসে তিনি যখন ডক্টর বসুর সহিত প্রথম শিলাইদহে গমন করেন, তখন পদ্মার তীরের এই গ্রামটিতে পদার্পণ করিয়া তাঁহার কী আনন্দ।' মুক্তিপ্রাণার এই লেখায় তথ্যের কিছু ত্রুটি আছে। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন নিবেদিতা কয়েকবার শিলাইদহে

গিয়েছিলেন। কিন্তু তথ্য সেকথা প্রমাণ করে না। আর কোন সময়ে নিবেদিতা শিলাইদহে গিয়েছিলেন তা-ও মুক্তিপ্রাণা উল্লেখ করেননি। নিবেদিতার চিঠিপত্র বা অন্যান্য ব্যক্তিদের লেখাও মুক্তিপ্রাণার বক্তব্যের সমর্থন করে না। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতা শিলাইদহে উপস্থিত হন। এ তথ্যও ঠিক নয়। নিবেদিতার পত্রই প্রমাণ করে, জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসু রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন পরে এসে পৌঁছোন।

রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যে শিলাইদহে কেমন কেটেছিল নিবেদিতার দিনগুলি? এক্ষেত্রে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ১৩৫৯ সনের কার্তিক মাসে প্রকাশিত 'উদ্বোধন' পত্রিকায় লীলা সরকারের লেখা একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'পদ্মার চড়ার মধ্য হতে সূর্যোদয় দেখতে যাওয়া হচ্ছে। চাষিরা ভোরের সময় লাঙল কাঁধে মাঠে আসছে। গেরুয়া-বসন পরিহিতা গৌরাঙ্গী এক মেমসাহেবকে আমার সাথে দেখে তারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নিবেদিতার সঙ্গে আরেকটি মেয়ে ছিল তার সহচরী। কোথায় গেল সূর্যোদয় দেখা। নিবেদিতা দৌড়ে চাষিদের কাছে চলে গেলেন। বললেন, ভাই তোমরা এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তারা বলল, আমরা মেমসাহেবকে দেখছি। তিনি বললেন, মেমসাহেবকে দেখবার কিছু নেই, চল তোমাদের বাড়ি যাই, তোমাদের দেখব আমি। চাষিরা শশব্যস্তে, তাঁকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিবেদিতা যেন আমাকেও চিনতে পারেন না। আমার জমীদারীর যতগুলি গ্রাম ছিল সমস্ত গ্রামে তিনি গিয়েছেন এবং ঐ দরিদ্র নরনারীর সঙ্গে প্রাণ মিলিয়ে, মন মিলিয়ে তাদের দুঃখের সমভাগিনী হয়েছেন।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছন, 'তাদের (চাষিদের) সঙ্গে চিঁড়ে কুটেছেন, ধান ভেনেছেন — তাদের নাড়ু, মোয়া খেয়েছেন — তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাদের জন্য কত সাহায্য করেছেন। আমি দেখে অবাক হয়ে গেছি যে, তিনি তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে ঢেঁকিতে পা দিয়ে ধান কুটছেন।' শিলাইদহের পল্লীজীবন যে নিবেদিতা চুটিয়ে উপভোগ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যই তাঁর প্রমাণ।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর লেখায় ১৩৫৬ সনের 'বসুমতী' পত্রিকার আষাঢ় মাসের সংখ্যার একটি রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। ওই লেখায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বলে বলা হয়েছে, 'শিলাইদহের গৃহস্থ বাড়ির রান্নাঘর, শয়নঘর, ঢেঁকি, গরুবাছুর সব দেখিয়া তাঁহার কি আনন্দ! পল্লীর নরনারীর স্বহস্তকৃত সেকেলে কাঁথা, ছেলেদের

দোলাই, কুলো, ডালা, মাটির পুতুল, বেতের কাজ করা, বাঁশের কাজ করা, পাখা লাঠি— তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। মুসলমান জোলার তাঁতের রকমারি কাপড় বোনাও তিনি সাগ্রহে দেখিয়া লইলেন। বুনোপাড়ার ছেলেদের 'অষ্টসখী'র নাচগানও শুনিতে ছাড়েন নাই।'

তবে, নিবেদিতার শিলাইদহে অবস্থানকালীন দিনগুলি সম্পর্কে একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায় শিলাইদহ এস্টেটের কর্মচারী দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরীর স্মৃতিচারণে। নিবেদিতাকে শিলাইদহ ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য এই দক্ষিণারঞ্জনকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে দক্ষিণারঞ্জনের এই স্মৃতিচারণটি পাওয়া যায়। এই স্মৃতিচারণ থেকেই জানা যায়, নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিনকে গ্রাম ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিয়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জনকে। পল্লীবাসীরা কীভাবে থাকেন, কীভাবে জীবনযাপন করেন, কী খান, কী পেশা তাঁদের এইসব ভালো করে দেখিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন প্রথম গিয়েছিলেন শিলাইদহের বুনো আর বিন্দি পাড়ায়। সেখান থেকে তাঁরা যান গ্রামের জনৈক নবীন প্রামাণিকের বাড়ি। নবীন প্রামাণিকের বাড়িটি ছিল গ্রামের একেবারে সীমানায়। এইখানেই নিবেদিতা গ্রামের মেয়েদের চিঁড়ে কোটা, ধান ভানা — এসব দেখেছিলেন। চিঁড়ের মোয়া আর ডাবের জল খেয়েছিলেন এই বাড়িতে। আশপাশের বাড়ির মেয়েরা তাঁদের দেখতে এসেছিলেন। প্রণাম করেছিলেন। এখান থেকে তাঁরা গিয়েছিলেন মুসলমান পাড়ায়। মুসলমান তাঁতিদের জীবনযাত্রাও খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন নিবেদিতা।

সন্ধেবেলা তাঁরা গিয়েছিলেন 'ষষ্ঠী ঘোষের বটগাছ' দেখতে। এই গাছটির সঙ্গে স্থানীয় একটি লৌকিক কাহিনি জড়িত ছিল। একদিন (সম্ভবত পরদিন) সকালে তাঁরা গোপীনাথ মন্দির দর্শন করলেন। খালিপায়ে বিগ্রহকে প্রণাম করলেন, চরণামৃত পান করলেন, প্রাচীন মন্দিরের স্থাপত্য দেখলেন। নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন ছিলেন 'নাগর' নামে একটি বোটে। এই বোটটি যে ঘাটে বাঁধা থাকত, তার পাশেই ছিল বুনো পাড়া। এই পাড়ার মানুষজনের সঙ্গেই নিবেদিতা আর ক্রিস্টিনের ভাবসাব জমেছিল বেশি। ওঁরা হয়েছিলেন বুনো পাড়ার মানুষদের 'সাধু মা।' রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাদের বোটে মাঝেমাঝেই পাঠিয়ে দিতেন খেজুরের রস, আখের গুড়, টাটকা দুধ প্রভৃতি।

দক্ষিণারঞ্জনের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিনকে গান গেয়ে শোনাতেন। একদিন শুনিয়েছিলেন 'প্রতিদিন আমি, হে

জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।' যতক্ষণ গান গেয়েছিলেন কবি, নিবেদিতা চোখ বুজে দুহাত জোড় করে বসেছিলেন।

তবে, এসব নয়; নিবেদিতার শিলাইদহ ভ্রমণের গুরুত্ব অনত্র। রবীন্দ্রনাথ-নিবেদিতার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিলাইদহের এই দিনগুলির অন্য তাৎপর্য আছে। কারণ, শিলাইদহে অবস্থানকালেই কবি এমন একটি ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের বন্ধনটি এর পরে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। উইলিয়াম পিয়ারসনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে জানা যায়, শিলাইদহে অবস্থানকালে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন একটি মৌলিক সাহিত্য কীর্তি শোনাতে। নিবেদিতার সেই অনুরোধে সম্মত হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসের খসড়া শোনান নিবেদিতাকে। এই 'গোরা' উপন্যাসকে কেন্দ্র করেই নিবেদিতা ক্ষুণ্ণ হন কবির প্রতি। নিবেদিতার মনে হয়, কবি তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শিলাইদহে নিয়ে এসে, ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর আবেগে আঘাত দিয়েছেন। এবং শিলাইদহ থেকে ফিরে আসার পর সেভাবে কবির সঙ্গে আর যোগাযোগও রাখেননি নিবেদিতা। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ প্রসঙ্গটির কিছুটা উল্লেখ আছে। এখানে আবার সবিস্তারে তা উল্লেখ করা হল।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট 'গোরা' চরিত্রটির সঙ্গে নিবেদিতার আদলের কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' জন্মসূত্রে আইরিশ। কিন্তু গোরা ভারতকেই আপনার ভূমি মনে করত। ভারতীয় রীতি-নীতিতে নিজেকে সমৃদ্ধ করে ভারতের উন্নতিতেই নিজেকে সমর্পণ করতে চায়। কিন্তু তার আইরিশ শিকড়ের জন্য শেষ পর্যন্ত গোরার একান্ত প্রিয়জন সুচরিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। 'গোরা' উপন্যাসের খসড়াটি ছিল এরকম। যদিও পরে উপন্যাসের শেষাংশটি রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তন করেন, তবু, গোরা চরিত্রটি নিবেদিতার অনুকরণে লেখা হয়েছিল—এরকম অনেকেই মনে করেন। মনে করাটা খুব অসঙ্গতও নয়। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'নিবেদিতা জানতেন না, অজানতে কবিমানসে একটা উপন্যাসের নায়কে ছায়া ফেলেছিলেন তিনি। রবিবাবুর মনে দানা বাঁধছিল তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি 'গোরা'র চরিত্র। গোরা নম্রস্বভাব হিন্দু, অথচ সে সংকল্পে কঠিন। সব কাজে নেতৃত্ব করা তার পক্ষে সহজ। আচারে অত্যন্ত গোঁড়া সে, অথচ মুক্তির উপাসক, স্বাধীনতার পূজারী। শেষ পর্যন্ত গোরা জানতে পারল, আসলে সে এক আইরিশ সৈনিকের ছেলে! এ-চরিত্র ফোটাবেন কেমন করে, রবি ঠাকুর নিজেও তা জানেন না। শুধু জানেন একটি পুরুষের চরিত্র আঁকবেন— নিবেদিতার মতোই কথা বলতে বলতে যার চোখে আগুন ঝল্‌সে ওঠে, যার ব্যক্তিত্বে আছে একটা দুরন্ত আবেগ। আর গোরাকে

আইরিশ তো করবেনই। বাকিটার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। আত্মার পূর্ণ মহিমা আর অদম্য তেজ নিয়ে কেমন করে নিবেদিতা দিনে দিনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেন, সেইটি বইয়ের পাতায় জীবন্ত করে তোলাই কবির কাজ।

'...নিবেদিতার জীবনের নানা ঘটনায় বইখানি ভরা। বইয়ের কাহিনীটা তিনি জানতেন, এ নিয়ে কবি আর নিবেদিতার বহুদিন আলোচনাও করেছেন।

'গোরাকে কবি বলেছেন 'রজত-গিরি'। কথাটায় নিবেদিতার গৌরবর্ণের আভাস আছে।'

'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে নন্দলাল বসুর বক্তব্যও আছে। নন্দলাল বলেছেন, 'কিন্তু তাঁহাদের আলোচনার বিষয় আমি কিছু জানি না। তবে শুনেছি, 'গোরা' উপন্যাসের hero গোরা সিস্টারকে মনে করে করেছিলেন।' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশে লিখেছেন, '...গোরার চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাই বলিলে আশা করি কেহ আঘাত পাইবেন না। নিবেদিতার পক্ষে হিন্দু হওয়ার অসম্ভবত্ব কল্পনা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ যেন আইরিশম্যানের পুত্র গোরাকে উপন্যাসের নায়করূপে সৃষ্টি করিলেন। মিস্ নোবেলও জাতিতে আইরিশ।'

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে 'গোরা' উপন্যাসের খসড়াটি পড়ে শোনান। এখানে প্রশ্ন, 'গোরা' উপন্যাসের খসড়াটি নিবেদিতাকে পড়ে শোনানোর পিছনে কবির কি কোনো উদ্দেশ্য ছিল? বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই কবি কি এই কাজটি করেছিলেন? এ-প্রসঙ্গে উইলিয়ম পিয়ারসনকে লেখা কবির চিঠিটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কবি লিখেছিলেন, 'You ask me what connection had the writing of Gora with Sister Nivedita. She was our guest in Shilaida and in trying to improvise a story according to her request I gave her something which came very near to the plot of Gora. She was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita owing to his foreign origin. You won't find it in Gora as it stands now —but I introduced it in my story which I told her in order to drive the point deep into her mind.'

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি থেকেই জানা যাচ্ছে 'গোরা' উপন্যাসের খসড়াটি তিনি কিছুটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই নিবেদিতাকে শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, নিবেদিতার মতো একজন আইরিশের পক্ষে সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে ওঠা

বা ভারতবাসীর কাছে একান্ত আপন হয়ে ওঠা অসম্ভব। এই ধারণাটিই তিনি 'গোরা' উপন্যাসের খসড়ার ভিতর দিয়ে নিবেদিতার মনে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। শিলাইদহে নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসে এরকম একটি অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করা, আর যাই হোক, কবির পক্ষে কিন্তু সৌজন্যসূচক হয়নি। এই খসড়াটি যদি কবি কলকাতায় নিবেদিতাকে শোনাতেন— তাহলেও হয়তো সৌজন্যের প্রশ্নটি আসত না। হয়তো, এটি শোনাবেন—এই উদ্দেশ্য কবির আগে থেকে ছিল বলেই সৌজন্যবোধ বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি। এরকম একটি প্রসঙ্গ নিবেদিতার আবেগে আঘাত দিতে পারে, সে কি কবি বুঝতে পারেনি? যদি বুঝে থাকেন এবং তারপরও এ কাজ করে থাকেন, তাহলে বলতেই হবে কবি অত্যন্ত অন্যায় করেছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই এই খসড়াটি শোনার পর নিবেদিতা আঘাত পান। এই নিয়ে কবির সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ হলেও হতে পারে। নিবেদিতা কবিকে অনুরোধ করেছিলেন উপন্যাসের শেষাংশটি পরিবর্তন করতে। সেই অনুরোধ অবশ্য কবি যে রেখেছিলেন তা জানা যায় বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনে। 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে বলাইচাঁদ সেই কথোপকথনের বিবরণ দিয়েছেন। তার প্রয়োজনীয় অংশটি এখানে তুলে দিচ্ছি,

'...শেষটা (গোরা উপন্যাসের) বদলে দিয়েছিলেন?

'হ্যাঁ। নিবেদিতা নাছোড় হয়ে ধরে বসল। আবার ঢেলে সাজালাম সব।

'গোরার শেষটা অন্যরকম ছিল?

'হ্যাঁ। আমি গল্পটা বিয়োগান্ত করেছিলাম।...গল্পটা ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে বেরুচ্ছিল। কিন্তু ওটা আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল আমার। নিবেদিতা তখন বলল— গোরার শেষটা কি রকম করেছেন দেখি। দেখালাম। পড়েই সে বলে উঠল, না না, এরকম হতে পারে না। ওদের মিলন না হলে বড়ই নিদারুণ ব্যাপার হবে যে। বাস্তব জগতে যা ঘটে না কাব্যের জগতেও কবি সেটা ঘটিয়ে দেবেন না? কাব্যের ও জগৎ তো আপনার সৃষ্টি, ওখানে আপনি অত নিষ্ঠুর হবেন না। ওদের মিলন ঘটিয়ে দিন। দিতেই হবে। এমন জেদ করতে লাগল যে রাজি হতে হল! সবটা আবার ঢেলে সাজালাম।'

শুধুমাত্র কি নিবেদিতার জেদের জন্য কবি 'গোরা' উপন্যাসের শেষাংশটুকু বদল করেছিলেন? নাকি তাঁর মনের গভীরে কোনো অপরাধবোধ কাজ করেছিল? এর উত্তর জানা যাবে না; তবে এটা ঠিক, নিবেদিতার অনুরোধে 'গোরা'র শেষাংশ পরিবর্তন করেছিলেন কবি। কিন্তু যে অন্যায় কবি করেছিলেন, এতে অবশ্য তা লাঘব হয় না।

এই ঘটনার পর শিলাইদহ থেকে নিবেদিতা কলকাতা ফিরেছিলেন কবির প্রতি তীব্র ক্ষোভ এবং তিক্ত স্মৃতি নিয়ে। কলকাতায় ফেরার পর ১৯০৫-এর ৫ জানুয়ারি সারা বুলকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতার এই ক্ষোভ জানা যায়। চিঠিটি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে। পাঠকের সুবিধার জন্য আর-একবার চিঠিটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'You do not know how completely Christine and I agree about things, nor how often it happens that we see the selfsame thing, each in our own distinctive way. With all our trust and regard for the Poet— and I am grateful to him for having been born! — So tenderly does he love the Bairn, and so absolutely does he serve him! —we are learning now to understand what it was that Swamiji fell about them all. Gradually as we exhausted what we had taken with us on Friday, we both felt the pressure of an atmosphere in which we could not draw breath —in which all had become commonplace, an atnnosphere in which both Bo and the Poet were absolutely happy and in place— but in which the Bairn seemed distorted somehow. By Monday noon, I had nothing left in me to say, either to him or to GOD.

'And no sooner did we get within the walls, than everything began to change. Force seemed to pour back into one, and on Tuesday one....'

নিবেদিতার পত্রে আর-একটি বিষয়ও পরিষ্কার। শুধু 'গোরা' উপন্যাসের খসড়া নিয়ে ক্ষোভ নয়, কবির কিছু আচরণও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করেছিল নিবেদিতার মনে। কবি এবং অবলা বসুকে উৎফুল্ল মনে হলেও, বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে কিছুটা বিষণ্ণ এবং নিঃসঙ্গই মনে হয়েছিল নিবেদিতার। কেন? তা অবশ্য খোলসা করে লেখেননি নিবেদিতা। তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না কবির কোনো আচরণকেই এর নেপথ্য কারণ বলে মনে করেছেন নিবেদিতা।

এই ঘটনার পর আরো ছ-বছর জীবিত ছিলেন নিবেদিতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সেই উষ্ণতা আর ফিরে আসেনি। এর পরে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোনোরকম প্রচেষ্টা বা আগ্রহও নিবেদিতার ভিতর দেখা যায়নি। দুজনের ভিতর দেখাসাক্ষাৎও অনেক কমে গিয়েছিল। মাঝে-সাঝে কখনো কোথাও দেখা হলে, তার ভিতর উষ্ণতার কোনো চিহ্ন ছিল না। নিবেদিতার জীবনের শিলাইদহ

পর্বটি কিন্তু তাঁর কোনো জীবনীকারই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেননি। কেন করেননি সে কারণ অজ্ঞাত। তবে, এটি আলোচনা না করলে রবীন্দ্রনাথ-নিবেদিতা সম্পর্কটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ডন সোসাইটির সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগের কথা আগেই বলা হয়েছে; কিন্তু ১৯০৪ সাল নাগাদ নিবেদিতা অনুশীলন সমিতি, ইয়ং মেনস হিন্দু ইউনিয়ন কমিটি, গীতা সোসাইটি প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন। যদিও, কংগ্রেস তখন ভারতীয়দের রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে পরিচিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমাজের নেতৃস্থানীয় একটি অংশ বিকল্প মঞ্চের কথাও চিন্তাভাবনা করছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করছিলেন, তরুণ এবং যুবশক্তিকে সংগঠিত করে জাতীয় আবেগকে জাগিয়ে তুলতে। আসলে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্বের প্রতি এঁদের ভরসা বড় একটা ছিল না। অনুশীলন সমিতির মতো সংগঠনের জন্ম কিন্তু স্বদেশি যুগে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃত্বের ওপর আস্থাহীনতা থেকেই। অনুশীলন সমিতির প্রথম দিকের সংগঠকদের ভিতর ছিলেন সতীশভূষণ রায়চৌধুরী এবং প্রখ্যাত আইনজীবী পি মিত্র। এছাড়া নানাভাবে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন হালদার, রাসবিহারী ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ। এই ধরনের সংগঠনগুলির সঙ্গে নিবেদিতার জড়িয়ে পড়ার বিষয়টিও আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এই সংগঠনগুলির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ প্রচার এবং তরুণ যুবাদের ভিতর থেকে বিপ্লবী কর্মী বেছে নেওয়া — এই উদ্দেশ্য নিবেদিতার ছিল। অনুশীলন সমিতি, গীতা সোসাইটি ইত্যাদি সংগঠনগুলিতেও একই কারণে নিবেদিতা যোগ দেন। ডন সোসাইটি, বিবেকানন্দ সোসাইটির কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, নিবেদিতা জাতীয়তাবাদ প্রচারে নামলেও বা বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য ছাত্রযুবদের সংগঠিত করতে চাইলেও নিজে নেত্রী পদে কখনো অধিষ্ঠিত হতে চাননি। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর বিপ্লব প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা দিয়ে নিবেদিতা হয়তো বুঝেছিলেন , ভারতের মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব ভারতীয়দের হাতেই থাকা উচিত। স্বামীজিও এইরকম ভাবতেন। স্বামীজি না থাকলেও, তাঁর এইসব বক্তব্যগুলি তখন নিবেদিতার কাছে অনেক বেশি সঠিক এবং গ্রহণীয় মনে হয়েছিল।

১৯০৫ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের ব্যস্ততম সময়। ১৯০৫ সালটি অবশ্য ভারত তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেও প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরেই এমন সব ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে নিবেদিতার পক্ষেও সম্ভব ছিল না সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা। নিবেদিতার অন্যতম জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা অবশ্য মনে করেন,

'নিবেদিতা বিপ্লবকার্যে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত ছিলেন একথা বলা চলে না। বিপ্লবী আদর্শের সমর্থন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহ প্রদান এক কথা, আর উহাতে সক্রিয়ভাবে যোগদান অন্য কথা।' নিবেদিতার কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে — মুক্তিপ্রাণার এই যুক্তি মানা যায় না। বাংলাদেশে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে নিবেদিতার অনেকখানিই সক্রিয় অংশ ছিল। মুক্তিপ্রাণা এ-ও মনে করেন, স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে কোনোরকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিবেদিতা জড়িত ছিলেন না। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'স্বামিজীর সহিত সাক্ষাতের পূর্বে দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া তিনি এক প্রচণ্ড ধর্মসংশয়ের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। স্বামীজি-প্রচারিত বেদান্ত তাঁহার ধর্মসংশয় ও পিপাসা দূর করে। তাঁহার দিনলিপিতে তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন, তিনি শৈশব হইতেই সত্যের উপাসিকা। বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ সত্যের এক চিরানুসৃত ধারণা তাঁহার মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল বটে, তথাপি সত্য লাভের জন্য পূর্বের সেই তীব্র ব্যাকুলতার অভাব ছিল না। স্বামীজির সহিত সাক্ষাতের পর ধীরে ধীরে এক বৃহত্তর তত্ত্বের আভাস তিনি পাইলেন।'

একথা বলাই চলে যে, মুক্তিপ্রাণা ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করেননি। ঐতিহাসিক তথ্য বলছে, স্বামীজি প্রথমবার ইংল্যান্ড যাওয়ার আগেই নিবেদিতা রাশিয়ান বিপ্লবী পিটার ক্রপটকিনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিকভাবে ক্রপটকিনের দ্বারা তিনি প্রভাবিতও হয়েছিলেন। এবং আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে বেশ সক্রিয়ভাবেই জড়িত ছিলেন নিবেদিতা।` শুধু তা-ই নয়, আইরিশ বিপ্লবীদের জন্য গোপন কেন্দ্র স্থাপনেও নিবেদিতার একটি ভূমিকা ছিল। স্বামীজি যখন প্রথমবার ইংল্যান্ডে যান, সেই সময়ে সেখানে একটি বড়সড় শ্রমিক আন্দোলন চলছিল। সেই আন্দোলনেরও নেতৃস্থানে ছিলেন নিবেদিতা। এই ঐতিহাসিক তথ্যগুলি যাচাই করলেই আর মুক্তিপ্রাণার বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না।

মুক্তিপ্রাণা বলেছেন, 'এক ব্যক্তির পক্ষে এক সঙ্গে মারাত্মক বিপ্লবী এবং প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী হওয়া কি সম্ভব?' কেন তা সম্ভব নয় তার ব্যাখ্যা তিনি করেননি। আসলে এটি মুক্তিপ্রাণার ধারণা। মুক্তিপ্রাণা যুক্তি দিয়েছেন, 'নিবেদিতার মারাত্মক রকম বিপ্লবী হওয়ার আর একটি বিশেষ বাধা ছিল। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর ১৯০২ সালের অক্টোবরে ভারত প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পর হইতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত নিবেদিতা তাঁহার গবেষণাকার্যে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।...শ্রীযুক্ত বসুর ন্যায় উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের সহিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইতেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি সক্রিয় বিপ্লবকার্যে নিযুক্ত ছিলেন না।' মুক্তিপ্রাণার এই

বক্তব্যও সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, নিবেদিতার চিঠিপত্র এবং অন্যান্য লোকজনের বক্তব্যই প্রমাণ করে, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার কাজে সাহায্য করার পাশাপাশি নিবেদিতা আরো অনেক কাজ করে গিয়েছেন। তার ভিতর সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপও আছে। আর নিবেদিতার এই কাজকর্মের কোনোটাই জগদীশচন্দ্রের অজানা ছিল না। তাসত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখেছিলেন। জগদীশচন্দ্র এবং নিবেদিতার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দুজনের ভিতর মতাদর্শগত বিরোধ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছিল, কিন্তু নিবেদিতার রাজনৈতিক কার্যকলাপের কারণে জগদীশচন্দ্র তাঁর থেকে দূরত্ব রচনা করবেন—সম্পর্কের বাঁধনটা এতটা ঠুনকো ছিল না তাঁদের। জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতার সম্পর্কের এই দিকটি মুক্তিপ্রাণা বিচার করেননি।

তবে, নিবেদিতাকে নিছক বিপ্লবী মনে করলে ছোট করা হয়—মুক্তিপ্রাণার এ বক্তব্যও সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজজীবনকে উন্নত করায় নিবেদিতার যে প্রয়াস, তার গুরুত্বকেও কখনোই ছোট করে দেখা উচিত নয়। আবার এটাও ঠিক— নিবেদিতার বৈপ্লবিক ভূমিকাকেও যথাযথ গুরুত্ব না দিলে বা তাকে খাটো করে দেখালে, ভারতের মুক্তিসংগ্রামে এই মহিয়সী নারীর ভূমিকাকে অবহেলা করা হয়। সেটি কিন্তু কখনোই উচিত নয়। ১৯১১ সালে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'She (Nivedita) was a pronounced nationalist...though her political opinions were quite radical and definite. She could never forgive partisanship or faction fights in Indian politics or journalism, she believed in the great need and efficacy of our presenting a united front. ....The promotion of the cause of nationality was with her a mission and a passion, as was women's education.'

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ হয় বরোদায়, ১৯০২ সালে। ওই সময়েই অরবিন্দের প্রতিনিধি হিসাবে যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় এসে পৌছোন। এবং ওই সময় থেকেই বাংলার রাজনীতিতে ধীরে ধীরে অরবিন্দের প্রবেশ ঘটতে থাকে। কংগ্রেসের পাশাপাশি অন্য কয়েকটি অরাজনৈতিক সংগঠন তখন বাংলায় গড়ে উঠেছে— একটু আগেই বলেছি। যদিও ওই সংগঠনগুলি তখনো কোনো রকম প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেনি— তবুও কংগ্রেসের নরমপন্থী মতামতের বিকল্প চিন্তাভাবনা ওই সংগঠনগুলির ভিতর দিয়েই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এইরকম একটি সময়ে বাংলার রাজনীতিতে অরবিন্দ ঘোষের আবির্ভাব একদম স্বতন্ত্র

একটি চিন্তাভাবনার জন্ম দিল। বলা যায়, কংগ্রেসের নরমপন্থী ভাবনাচিন্তার ঠিক বিপরীতে ঝোড়ো হাওয়ার মতো অরবিন্দ সক্রিয় এবং সহিংস প্রতিরোধের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। বাংলার মাটি থেকে বৈপ্লবিক কাজকর্ম শুরু করার লক্ষ্যে অরবিন্দ আগেই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। অরবিন্দের তাঁকে কলকাতা পাঠানোর মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল, তরুণ এবং ছাত্রযুব সমাজের ভিতর একটি যোদ্ধৃভাব জাগিয়ে তোলা। যে কারণে যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে ছাত্রযুবদের ভিতর শরীরচর্চা, কুচকাওয়াজ, নানারকম দৈহিক কসরৎ রপ্ত করানোর প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। কখনো কখনো সৈনিকের বেশে ঘোড়ায় চেপে যতীন্দ্রনাথ রাস্তা দিয়ে যেতেন, ছাত্রযুবদের বলতেন তাঁকে অনুসরণ করতে।

কংগ্রেসের নরমপন্থী, আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি অরবিন্দের বরাবরই অপছন্দের ছিল। বাংলায় এসে সক্রিয় রাজনীতি শুরু করার আগে অরবিন্দ 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লেখালেখি করতেন। তখনই তিনি কংগ্রেসের নরমপন্থী নীতির সমালোচনা করেছিলেন। অরবিন্দের এই লেখার জন্য নরমপন্থী রাজনৈতিক নেতারা 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজের সম্পাদককে সতর্ক করে দেন।

বিদেশ থেকে ভারতে আসার পর প্রথম ক-বছর কিন্তু অরবিন্দের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সংস্পর্শ ছিল না। বরং এই সময়টা তিনি ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। এই পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে হয়তো অরবিন্দের ধারণা হয়, বৈপ্লবিক কাজকর্ম শুরু করার পক্ষে বাংলার মাটিই উপযুক্ত স্থান। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'তাঁহার (অরবিন্দ) রাজনৈতিক মতবাদ এবং কর্মপ্রণালী প্রধানত, ত্রিধারায় পরিচালিত ছিল।

'প্রথমতঃ, গুপ্ত বিপ্লব প্রচার ও সংগঠন, যাহার প্রধান উদ্দেশ্য রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য জাতিকে প্রস্তুত করা।

'দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্য প্রচারের দ্বারা সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। অরবিন্দ যখন রাজনীতিতে যোগদান করেন, তখন অধিকাংশ ভারতবাসীর নিকট এই স্বাধীনতার আদর্শ অবাস্তব এবং অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইত।

'তৃতীয়তঃ, সংঘবদ্ধ জনসাধারণ কর্তৃক অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা প্রকাশ্যে ঐক্যবদ্ধরূপে সরকারের বিরোধিতা এবং বৈদেশিক শাসনের ভিত্তি শিথিল করিবার প্রচেষ্টা।'

অরবিন্দ ভেবেছিলেন, বাইরে থেকে অস্ত্র আমদানি করে, সশস্ত্র বিপ্লবের পাশাপাশি দেশে জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলেই দিকে দিকে বিদ্রোহ-বিক্ষোভের জন্ম

দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের মূলে আঘাত হানা যাবে। 'শ্রীঅরবিন্দ অন হিমসেলফ' গ্রন্থে অরবিন্দ নিজেই জানিয়েছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভিতরও বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর এই কর্মপরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য বাংলায় সর্বত্র বিপ্লববাদ প্রচার এবং বিপ্লবী কর্মী জোগাড়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন অরবিন্দ। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় যে, অরবিন্দের বাংলায় আগমনের ভিতর দিয়ে এখানে বিপ্লববাদ এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের শুরু। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'তাঁহার (অরবিন্দের) ধারণা ছিল, সমগ্র দেশকে প্রস্তুত করিতে ত্রিশ বৎসর লাগিবে। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, যতদূর সম্ভব প্রকাশ্যে বা গোপনে নানাভাবে বাংলার সর্বত্র বিপ্লব প্রচার ও বিপ্লবী কর্মী সংগ্রহ। বিপ্লবী কর্মী সংগৃহীত হইবে দেশের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে। আর ওই কার্যে সহানুভূতি, সমর্থন এবং আর্থিক ও অন্য বিষয়ে সাহায্যের জন্য দেশের উদারমতাবলম্বী প্রবীণ ব্যক্তিগণকে প্রভাবিত করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা ছিল, এই উদ্দেশ্যে প্রতি শহরে ও গ্রামে কেন্দ্র স্থাপন পূর্বক প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিয়া বাহ্যতঃ সাংস্কৃতিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানার্থে বহু সমিতি গঠন এবং পূর্ব হইতেই বর্তমান সমিতিগুলিকে বিপ্লববাদর্শে প্রভাবিত করা। ভবিষ্যত সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য যুবকগণকে অশ্বারোহন, ব্যায়াম, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।' অর্থাৎ, বাংলার মাটি থেকে সর্বাত্মক বিপ্লব শুরু করার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই অরবিন্দ পা রেখেছিলেন কলকাতায়।

অরবিন্দের বিপ্লব-ইচ্ছা যে কতদূর প্রগাঢ় ছিল, তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় স্ত্রী মৃণালিনীকে লেখা তাঁরই একটি পত্রে। অরবিন্দ স্ত্রীকে লিখেছিলেন, 'অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা-র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কী করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সহিত আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?' এই যে দেশকে 'মা' হিসাবে কল্পনা করা, এটি কিন্তু পরবর্তীকালে চরমপন্থী বিপ্লবীদের ভিতরও ছিল। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'যে ব্যক্তি স্বদেশকে জড় পদার্থরূপে দেখার পরিবর্তে সাক্ষাৎ জননীর ন্যায় ভক্তি করে, পূজা করে, তাহার সহিত নিবেদিতার মতের এবং মনের মিলন ঘটা বিচিত্র নহে। দেশের প্রতি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিবেদিতা পূর্বেই স্বামী বিবেকানন্দের নিকট লাভ করিয়াছিলেন। অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনই কথাপ্রসঙ্গে বাহির হইতে দেখিতে শান্তশিষ্ট, নিরীহ ব্যক্তির এই মনোভাব নিশ্চিত তিনি উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। তাঁহার লোক চিনিব্যর ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। সুতরাং বৈদেশিক

শাসন হইতে দেশমাতৃকার মুক্তিলাভের জন্য অরবিন্দের কর্মপ্রণালীর প্রতি নিবেদিতার সহানুভূতি এবং সমর্থন খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।'

নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের আদর্শগত ঐক্য যে সম্ভব হয়েছিল এবং অরবিন্দের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নিবেদিতা যে আস্থাশীল হয়েছিলেন তারও প্রমাণ অরবিন্দের লেখাতেই আছে... '...অন হিমসেলফ' গ্রন্থে অরবিন্দ জানিয়েছেন, তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের কাজের ভিতর বাংলার সব বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করার একটি প্রয়াস তিনি নিয়েছিলেন। তারই অঙ্গ হিসাবে একটি বিপ্লবী পরিষদও গঠন করেন অরবিন্দ। তাঁর সঙ্গে মানসিক সংযোগ স্থাপিত না হলে বা অরবিন্দের কার্যকলাপে সম্মত না হলে—নিবেদিতা এই পরিষদে থাকতেন না। তেমনি, নিবেদিতার ওপর অরবিন্দের যদি আস্থা না থাকত, বা, নিবেদিতার বৈপ্লবিক সত্তা সম্পর্কে অরবিন্দ যদি সচেতন না হতেন তাহলে তিনিও নিবেদিতাকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করতেন না। এটা ভাবা খুব অন্যায় হবে না যে, এই পরিষদের সদস্য হিসাবে, বা পরেও, অরবিন্দের বৈপ্লবিক কাজকর্মে নিবেদিতার পরামর্শ এবং সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। আবেগপ্রবণ নিবেদিতা যে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকাবার পাত্রী ছিলেন না তা যে-কেউই বুঝতে পারবেন।

নিবেদিতার বৈপ্লবিক চরিত্র সম্পর্কে অরবিন্দের একটি বক্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অরবিন্দ বলেছেন, 'বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম ছিলেন নিবেদিতা। লোকের সংস্পর্শে আসার জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। খোলাখুলি সরল প্রকৃতির মানুষ; বিপ্লবের কথা সকলকে বলতেন, কোনো ঢাকাঢুকি ছিল না তাঁর মাঝে। যখন বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মাই— তাঁর খাঁটি স্বরূপ—বেরিয়ে আসত, তাঁর পুরো মন ও প্রাণ ভাষায় ব্যক্ত হত। যোগ করতেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল কাজ যেন এটা। একেই বলে আগুন। তাঁর বই 'কালী দি মাদার' উদ্দীপনাপূর্ণ বই, তেমনি বিদ্রোহমূলক, অহিংসে নয়। রাজপুতানায় ঠাকুরদের কাছে গিয়ে বিদ্রোহ প্রচার করতেন।' অরবিন্দ কিন্তু স্বীকার করেছেন, 'বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম ছিলেন নিবেদিতা।' এই স্বীকারোক্তিতেই বোঝা যায়, বাংলার বিপ্লবের প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে নিবেদিতা যুক্ত ছিলেন। সক্রিয় না হলে তিনি কখনোই 'বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম' হতে পারতেন না। নিবেদিতার বৈপ্লবিক প্রয়াস সম্পর্কে এর আগে হেমচন্দ্র কানুনগো, বারীন্দ্র ঘোষ প্রমুখের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। সেগুলিও প্রমাণ করে নিবেদিতার সক্রিয় ভূমিকার।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী অরবিন্দ সংক্রান্ত তাঁর গ্রন্থে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। প্রথমত তিনি লিখেছেন, 'অরবিন্দ তাঁহার গুপ্ত সমিতির দলকে এই রূপ

সংগঠন এবং কর্মের কৌশল কোনোদিন শিক্ষা দেন নাই, কেননা উহা তিনি জানিতেন না। ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দের গুপ্ত সমিতিকে এই শিক্ষা দিয়াছেন।'

দ্বিতীয়ত লিখেছেন, 'অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির দলকে ভগিনী নিবেদিতার গুপ্ত সমিতির দল বলিলে কিছু মিথ্যা বলা হয় না।' তৃতীয়ত বলেছেন, 'অরবিন্দের হাতে গুপ্ত সমিতির যে দলটি ছিল, নিবেদিতা হাতে কলমে সেই দলটিকে আগাগোড়া পরিচালিত করিয়াছেন। অরবিন্দ অপেক্ষা গুপ্ত সমিতির টেকনিক (technique) ভগিনী নিবেদিতার বেশি জানা ছিল।'

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর এই বক্তব্য অবশ্য প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা মেনে নেননি। কিন্তু গিরিজাশঙ্করের বক্তব্যও একেবারে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। মনে রাখতে হবে, এদেশে আসার আগে আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন নিবেদিতা। সেখানকার গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং সেই সব সংগঠনের কাজকর্ম সম্পর্কেও তাঁর হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা ছিল। অরবিন্দ এদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টার পরিকল্পনা করতে পারেন, কিন্তু গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন পরিচালনা করার হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অরবিন্দের ছিল না। অরবিন্দ নিবেদিতার অতীত রাজনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না— এমন ভাবাও ভুল হবে। সেটা জানতেন বলেই হয়তো তিনি তাঁর বিপ্লবী পরিষদের অন্যতম সদস্য করেছিলেন নিবেদিতাকে। আর নিবেদিতাও তাঁর আয়ারল্যান্ডের অভিজ্ঞতা দিয়ে অরবিন্দের দলকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন—এমনটিও কিন্তু অসম্ভব নয়।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। নিবেদিতা ব্যক্তিগতভাবে বিপ্লবী রাজনীতির সমর্থক হলেও নরমপন্থী বা মডারেটদের সঙ্গেও দূরত্ব বজায় রাখতেন না। বরং, বেশ কয়েকজন মডারেট নেতা বা নরমপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গেও নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই ছিল। এর একটি কারণ অবশ্য অনুমান করা যায়। মডারেট জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পিছনে নিবেদিতার একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এই মডারেট নেতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রশাসনের সম্পর্ক যে ভালো তা নিবেদিতা জানতেন। তিনি চাইতেন, এঁদের মাধ্যমে প্রশাসনের অন্দরের সংবাদ আগাম জেনে নিতে। দ্বিতীয়ত, তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রমে এই মডারেটদের সহানুভূতি আদায়ও তাঁর একটা বড় লক্ষ্য ছিল। তবে, এসবের বাইরেও আর-একটি বড় কারণ ছিল; রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চরমপন্থী হলেও, নিবেদিতা কখনোই সংকীর্ণমনা ছিলেন না। এই মডারেট ব্যক্তিত্বদের অনেকেরই দেশের শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি জগতে বিশেষ ভূমিকা এবং

অবদান ছিল। যে কারণে, তাঁদের বিশেষ শ্রদ্ধাও করতেন নিবেদিতা। রাজনৈতিক সংকীর্ণতার অনেক উর্দ্ধে উঠেই নিবেদিতা এঁদের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক রেখেছিলেন। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের উর্দ্ধে উঠেও এই যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এটি কেমন ছিল তা জানা যায় দীনেশচন্দ্র সেনের 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' গ্রন্থে 'ভগিনী নিবেদিতা' শীর্ষক অংশখানি পড়লে। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, 'নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন, আমার সহিত প্রথম আলাপের পর তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে একেবারেই আলোচনা করিতে চাহিতেন না। আমাকে ভীরু, কাপুরুষ, স্ত্রীলোক হইতেও হীনবল ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিতেন— রাজনৈতিক কোনো কথা বলিলে ক্ষোভের সহিত বলিতেন—"দীনেশবাবু, ওটি আপনার ক্ষেত্র নহে—আমি আপনার সঙ্গে ও সম্বন্ধে কথা বলিব না"।' ওই লেখাতেই দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, 'একবার তাঁহার কোনো এক ইংরেজ বন্ধু দেখা করিতে আসিলে তিনি আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন—"বঙ্গদেশের সামাজিক তত্ত্ব ইনি যেরূপ জানেন, এই দেশের কুঁড়ে ঘর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সকল জায়গার ইতিহাস যাহা ইনি ছেঁড়া পুঁথিপত্রের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছেন সে বিষয়ে ইঁহার সমকক্ষ কেউ নাই"— ইত্যাদি।'

আরো লিখেছেন দীনেশচন্দ্র, 'নিবেদিতা আমার পাণ্ডুলিপি পড়িতে পড়িতে যখন খুশি হইতেন, তখন মাঝে মাঝে বলিতেন, "দীনেশবাবু, আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার মতের ঘোর অনৈক্য। যখন সে দিক দিয়া আপনার কথা ভাবি, তখন আপনার কাপুরুষতা আমাকে শুধু লজ্জা নহে, মর্মপীড়া দান করে, কিন্তু তবুও আমার আপনাকে ভালো লাগে, কেন শুনবেন? আপনি বিনা আড়ম্বরে দেশের জন্য এতটা খেটেছেন ও দেশের উপর এতটা মমতার পরিচয় দিয়েছেন, যে আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি প্রকৃত দেশ-ভক্তের স্থানের দাবী করিবার যোগ্যতা রাখেন—এজন্য আমার আপনাকে ভালো লাগে"।'

এই ঔদার্য নিবেদিতার ভিতর ছিল বলেই মডারেট গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, আনন্দমোহন বসু প্রমুখের সঙ্গে অত্যন্ত হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল নিবেদিতার। এঁদের প্রত্যেকের কাজের প্রতিও নিবেদিতা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই প্রসঙ্গে গোখলেকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিকভাবে মডারেটরা একটু জমি হারিয়ে ফেলায় এক সময় গোখলে কিছু বিষণ্ন এবং হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়ে, ১৯০৩-এর ২০ মার্চ, গোখলেকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'But I wish I could infect you with my view of the whole thing. Instead of sadness, you wd. then

be filled with such an infinite joy! And you might just as well have it. There is a great festival of struggle and growing life before us. When one feels baffled and sad, it is because one has failed to find the true lines of action, along which the fire leaps to the blaze. When one has found those, is there any time for sighing? Do not let us spend our effort longer in tryring to reform abuses; let us make life. Manhood and womanhood will find out for itself what way to work. Set [Get?] Life free! Accept all that comes of it. The instinct of a great pepole filled with divine austerity and the highest human passion, will lead them very far from your thoughts or mine about them. So much the better.

'I wish I cd. give you gladness that fills me! I love the sorrow and the struggle and the divine self—sacrifice that may be ours!'

এর কিছুদিন পরেই ভাইসরয়ের কাউন্সিলে গোখলের অসাধারণ বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ১৯০৩-এর ২৯ মার্চ আর একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, 'It is with very great pleasure that I offer. you congratulation on your recent speech in council and on the impression which your scope and attitude have created on all hands. It is an infinite joy to me to know that a Maharatha is loved in Bengal as you have caused yourself to be, by our first men here and when that love is joined with such respect for your intellect, and such implicit confidence in your courage and disinterestedness, it is beyond all price.

'I am sure you know, without feeble words of mine to tell you that you have more than sustained the impression that you made last year.'

গোখলের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের খাতিরে জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে নানারকম সরকারি সাহায্য গোখলের মাধ্যমেই জোগাড় করতেন নিবেদিতা। গোখলের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক নিয়ে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী একটি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'অরবিন্দ লোকমান্য তিলকের গুণমুগ্ধ, এমনকী অনুগামী। কিন্তু মি. গোখলেকে তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। এমনকী গভর্ণমেন্টের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অবস্থায়

নিবেদিতার সহিত গোখলের এতটা ঘনিষ্ঠতা হইল কি করিয়া।' ঘনিষ্ঠতা হওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। মনে রাখতে হবে, অরবিন্দ রাজনৈতিকভাবে বিপ্লববাদী এবং সংকীর্ণও ছিলেন। তিনি নরমপন্থী বা মডারেটদের সঙ্গে কখনো ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলেননি। অথচ, নিবেদিতা রাজনৈতিক মতপার্থক্যের গণ্ডি ডিঙিয়ে সেইটা করতে পেরেছিলেন। অরবিন্দ আর নিবেদিতার ভিতর এটাই ছিল বড় পার্থক্য। যে কারণে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গোপালকৃষ্ণ গোখলে, আনন্দমোহন বসু বা ভূপেন্দ্রনাথ বসুও সাগ্রহে নিবেদিতার বন্ধুত্ব স্বীকার করেছেন।

রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও মডারেটদের বিপুল শ্রদ্ধাও যে নিবেদিতা পেয়েছিলেন তার একটি বড় উদাহরণ, তাঁর মৃত্যুর পর স্মরণসভায় গোখলের বক্তব্য। ১৯০৭-এর শেষ দিকে সুরাট কংগ্রেসে গোখলের ভূমিকায় নিবেদিতা চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। গোখলে সম্পর্কে নিবেদিতা তিক্ত মন্তব্য করেছেন। সুরাট কংগ্রেসের পর সেই অর্থে দুজনের আর কোনো সম্পর্কও ছিল না। এই বিষয়টি পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কিন্তু এখন এই বিষয়টি এই কারণেই উল্লেখ করা হল যে, এই চূড়ান্ত মতপার্থক্যের পরও নিবেদিতার স্মরণসভায় গোখলে কিন্তু তাঁর উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন। গোখলে বলেছিলেন, 'ভগিনী নিবেদিতাকে দশ বৎসরের অধিককাল জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব অপূর্ব ও চমকপ্রদ। তা এমনই যে, তাঁর সাক্ষাতে এলে মনে হত বুঝি কোনো বিরাট নৈসর্গিক শক্তির সম্মুখীন হয়েছি। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও মননশক্তি, কাব্যময় রচনা প্রতিভা, বিপুল শ্রম-সামর্থ্য, আদর্শ ও বিশ্বাস সুতীব্র আবেগে ধরে রাখার ক্ষমতা, সর্বোপরি যে কোনো বস্তুর আত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করার যথার্থ বিরাট প্রতিভা — এই সকলই যে তাঁকে যে-কোনো দেশে যে-কোনো কালের এক অত্যাশ্চর্য নারী করে তুলেছে। এদের সঙ্গে যখন যুক্ত হল সর্বপ্লাবী সীমাহীন ভারতপ্রেম, যে-প্রেমের অর্থ ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে প্রাণব্যাকুল অনুরক্তি, ভারতের সেবায় পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন এবং ব্যক্তি জীবনে কঠোর অথচ আক্ষেপহীন, আনন্দময় কৃচ্ছ্রসাধনা —তখন ভগিনী নিবেদিতা যে আমাদের কল্পনাকে আলোড়িত করে হৃদয়কে অধিকার করে নেবেন, কিংবা চতুষ্পার্শের মানুষদের উপর সুগভীর, সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবেন, এবং আমরা তাঁকে দেশসেবায় নিয়োজিত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানবগণের অন্যতম বলে গ্রহণ করব—তাতে বিস্ময়ের কী আছে?'

'...ভারতের ডাক শুনেছিলেন বলেই এসেছিলেন—ভারতের সম্মোহনে ধরা দিয়েছিলেন বলেই এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন ভারতে তাঁর হৃদয়ের পূজা

নিবেদন করতে, সেই সঙ্গে ভারতের সন্তান-সন্ততিদের পাশে দাঁড়িয়ে সামনে যে বিরাট কর্মভার রয়েছে তার দায়িত্ব নিতে। তাঁর সেই অপরূপ ভারত-বরণের মহিমাকে মানবভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

ভারত তথা বাংলার রাজনীতিতে ১৯০৫ সালটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরেই কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সমগ্র বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। এই বছরই ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে কার্জনের ভাষণকে ঘিরে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আর এই দুটি ক্ষেত্রেই কার্জনের বিরুদ্ধে এক প্রধান প্রতিবাদীর ভূমিকা নিয়েছিলেন নিবেদিতা স্বয়ং। এর ভিতর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে কার্জনের বক্তৃতার পর তাঁকে আক্ষরিক অর্থেই বেশ বেকায়দায় ফেলতে পেরেছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে লর্ড কার্জন রাজ্যবাসীকে কার্যত মিথ্যাবাদী বললেন।' তিনি বললেন, 'প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্যের নীতিকথার স্থান অনেক উচ্চে।' কার্জনের বক্তব্য ছিল এইরকম, 'Untruthfnlness consists in saying or doing anything that gives an erroneous impression either of one's own character or of other people's conduct or the facts and incidents of life. I say that the highest ideal of truth is to a large extent a western conception. Undoubtedly, truth took a higher place in the moral codes of the west before it had been similarly honoured in the East. Flattery may be either honest or dishonest. Whichever it be, you should avoid it. If it is the former, it is neverthless false, if it is the latter, it is vile.'

নিবেদিতা ওই কনভোকেশনে উপস্থিত ছিলেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'সভায় উপস্থিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উক্তিতে বিলক্ষণ অপমানবোধ করলেও কেহ কোন উত্তর দিলেন না। সভাকক্ষে অখণ্ড নীরবতা দেখা গেল। বক্তৃতান্তে লর্ড কার্জন চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সেনেট হলের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া এই অপমানজনক উক্তির আলোচনা করিতে লাগিলেন। নিবেদিতাও সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং ক্রোধে, অপমানে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। অবিলম্বে এই অপমানের সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া প্রয়োজন। অধীর হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, লর্ড কার্জনের 'প্রবলেমস অব দি ফার ইস্ট' নামক পুস্তকখানি কাহারও নিকট আছে কিনা। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ওই পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তিনি সেই রাত্রেই উত্তর প্রস্তুত করিলেন।'

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর 'শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ওই কনভোকেশন সভায় ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। ...তিনি সভা হইতেই উত্তেজিত অবস্থায় গুরুদাস ব্যানার্জিকে টানিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গেলেন। লর্ড কার্জনের 'প্রবলেমস অব দি ইস্ট' পুস্তকটি বাহির হইল।'

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, 'বক্তৃতান্তে তিনি (কার্জন) চলিয়া যাইবার পর যখন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের প্রদেশদ্বারে দাঁড়াইয়া সেই অপমানজনক উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করেন, কাহারো নিকট কি কার্জনের 'প্রবলেমস অব দি ফার ইস্ট' পুস্তক আছে? উহা গুরুদাসবাবুর কাছে ছিল। নিবেদিতা তাঁহার সহিত তাঁহার গৃহে যাইয়া উহা আনায়ন করেন। ...ভগিনী নিবেদিতা যে পল্লীতে বাস করিতেন, সেই পল্লীতে অমৃতবাজার পত্রিকার কার্যালয় অবস্থিত। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় লর্ড কার্জনের ওই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন লর্ড কার্জন স্বয়ং মিথ্যাসক্ত ও তোষামোদকারী। লর্ড কার্জনের পক্ষে যেন জলৌকামুখে চুণ পড়িল। বিখ্যাত সাংবাদিক গার্ডিনার এই ব্যাপারে মন্তব্য করেন, 'India was dissolved in laughter. It almost forgot the insult for sake of the jest.'

নিবেদিতা চেয়েছিলেন কার্জনের দম্ভ চূর্ণ করে কার্জনকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে। তা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে করেওছিলেন নিবেদিতা। কনভোকেশনে কার্জনের বক্তৃতার অংশবিশেষ এবং 'প্রবলেমস অব দ্য ফার ইস্ট' গ্রন্থে কার্জনের লেখার একটি অংশবিশেষ একত্রিত করে তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। 'প্রবলেমস অব দ্য ফার ইস্ট' গ্রন্থের যে অংশটি নিবেদিতা তুলে দিয়েছিলেন সেটি এই,

'Before proceeding to the royal audience, I enjoyed an interview with the President of the korean Foreign Office.

I remember some of his questions and answers. Having been particularly warned not to admit to him that I was only 32 years old, an age to which no respect attaches in korea, when he put to me the straight question (invariably the first in an oriental dialogue) 'How old are you?' I unhesitatingly responeded 'Forty.'

'Dear me,' he said, 'You look very young for that. How do you account for it?'

'By the fact,' I replied, 'that I have been travelling for a month in a superb climate of his Majesty's dominions.'

Finally he said to me, 'I presume you are a near relative of Her Majesty, the Queen of England.' 'No', I replied, 'I am not.' But observing the look of disgust that passed over his countenance, I was fair to add, 'I am, however, as yet an unmarried man,' with which unscrupulons suggestion I completely regained the old gentleman's favour.'

এর একটি বঙ্গানুবাদও এখানে দেওয়া হল ঃ 'রাজসভায় যাত্রার আগে কোরিয়ান বৈদেশিক দফতরের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমি এক সাক্ষাৎকার উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

'সেখানে প্রশ্ন ও উত্তরের কিছু অংশ আমার স্মরণে আছে। আমাকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, আমি কদাপি যেন স্বীকার না করি যে, আমার মাত্র ৩২ বৎসর, কারণ কোরিয়ায় ওই বয়সেই কেউ সম্মানভাজন হতে পারে না। তাই প্রেসিডেন্ট যখন আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন (যে প্রশ্ন প্রাচ্য দেশে অবধারিতভাবে প্রথমেই করা হয়) 'আপনার বয়স কত?' আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বললাম, 'চল্লিশ'। তিনি বললেন, 'প্রিয় মহাশয়, বয়সের তুলনায় আপনাকে তো রীতিমতো তরুণ দেখায়। এটা কীভাবে সম্ভব হল?' 'সম্ভব হল এই কারণে,' আমি উত্তর দিলাম, 'মহামহিম মহারাজের রাজ্যের অপূর্ব আবহাওয়ায় আমি মাসাধিকাল ভ্রমণ করেছি।' শেষে তিনি বললেন, 'আমি ধরে নিচ্ছি আপনি ইংলন্ডের মহারাণীর নিকট আত্মীয়।' 'না তো, আমি তা নই।' কিন্তু যখন দেখলাম, আমার উত্তরে তাঁর মুখের উপর বিতৃষ্ণার ছায়াপাত হল তখন সানন্দে যোগ করলাম, 'আমি অবশ্য অদ্যপি অবিবাহিত।' এই নীতিহীন ইঙ্গিতের দ্বারা সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রসাদ পুনরায় অর্জন করে ফেললাম।'

অমৃতবাজারে কার্জনের বক্তৃতা এবং 'প্রবলেমস অব দ্য ফার ইস্ট' গ্রন্থের এই অংশ প্রকাশ করে এটিও লেখা হয়েছিল যে, গ্রন্থটির সর্বশেষ সংস্করণ থেকে চালাকি করে এই অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। লর্ড কার্জন কনভোকেশনে ভাষণ দিয়েছিলেন ১৯০৫-এর ১১ ফেব্রুয়ারি। আর কার্জনকে ব্যঙ্গ করে এই লেখাটি প্রকাশিত হল ১৩ ফেব্রুয়ারি।

'অমৃতবাজার'-এ প্রকাশিত এই লেখাটি যে নিবেদিতাই তৈরি করেছিলেন, তা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বা নিবেদিতা কেউই প্রকাশ করেননি। তবে, নিবেদিতার অন্তরঙ্গ মহলে সকলেরই জানা ছিল লেখাটি নিবেদিতার তৈরি করা। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা এ প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসুর একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। ওই চিঠিতে নিবেদিতাকে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, 'Personally I feel much strengthened by the thought that many illusions which blind our men will now end. I do not wish that they should find out who wrote the article. The thunderbolt should always be behind dark clouds and they should not know from what part of the heavens the weapon is hurled.'

এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর কার্জনের মিথ্যাচারটি পুরোপুরি উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। রাতারাতি কার্জন পরিণত হয়েছিলেন এক ব্যাঙ্গাত্মক চরিত্রে। সর্বত্র কার্জনকে নিয়ে নিন্দা এবং হাসিঠাট্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল। 'অমৃতবাজার'-এ এটি প্রকাশিত হওয়ার পরদিন 'দ্য স্টেটসম্যান'-এ এই সংবাদটি আবার পুরো প্রকাশ করা হয়। 'দ্য স্টেটসম্যান'-এ এটি প্রকাশিত হওয়ার পিছনেও যে নিবেদিতার একটি বড় ভূমিকা ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ 'দ্য স্টেটসম্যান'-এর সম্পাদক র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কটি ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 'দ্য স্টেটসম্যান' কাগজ এই সংবাদটি পরিবেশন করার পর একটি মন্তব্যও জুড়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে। 'দ্য স্টেটসম্যান' লিখেছিল, 'But the convocation play would not have been complete without the delicious little comedy which wound up the entertainment. How his Excellency must have grinned when next day he saw the pictures which our smart contemporary, the Amrita Bazar Patrika held up before his gaze, depicting 'The Chaucellor in convocation' side by side 'Lord Curzon in korea'. The pure fun which these two pictures have given in India and will ere long give in England was worth the whole performance. And the beauty of it was that the actor was quite unconscions of the well of pure delight he was giving to the people.'

কাগজে প্রকাশিত এই সংবাদগুলি কার্জনের চোখে পড়েছিল— এ ধারণা করাই যায়। তাঁকে নিয়ে যে চারিদিকে হাসিঠাট্টা শুরু হয়ে গিয়েছে এ-ও যে কার্জন জেনেছিলেন এটিও বুঝতে অসুবিধা হয় না। কোরিয়ায় গিয়ে তাঁর মিথ্যাচরণ করে

আসা এভাবে জনসমক্ষে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় কার্জনের মানসিক অবস্থা কী হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

কার্জনকে এতেই ছেড়ে দেবার পাত্রী নিবেদিতা ছিলেন না। 'অমৃতবাজার'-এ প্রকাশিত সংবাদটি যেদিন 'দ্য স্টেটসম্যান' উদ্ধৃত করে, সেদিনই নিবেদিতা 'দ্য স্টেটসম্যান' কাগজে ছদ্মনামে একটি নিবন্ধ লেখেন। এটির শিরোনাম ছিল, 'দ্য হাইয়েস্ট আইডিয়াল অব ট্রুথ।' নিবন্ধটির শুরু করেছিলেন নিবেদিতা এইভাবে, 'On saturday last, for the first time, it was authoritatively explained to India why professor Max Muller thought it neccssary to devote the second chapter of his book on what India Has to Teach us to the subject of 'The Truthful Character of the Hindus.'

এই নিবন্ধে নিবেদিতা কনভোকেশনে কার্জনের বক্তৃতা যাঁরা চুপ করে শুনেছিলেন, তাঁদেরও ছেড়ে কথা বললেন না। নিবেদিতা লিখলেন, 'There is however, another, and to Indians a more important element in the situation. The students to whom these statements were addressed, received them in a 'faultless silence.' They did well, less well, however, must we think it, if they stepped into manhood, remebering charge so levelled at their dead ancestors and their national codes, with never a word offered in defence!'

গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, 'নিবেদিতা শুরু করেছিলেন এই বলে ঃ 'গত শনিবার প্রথম ভারতবর্ষের কাছে প্রামাণ্যভাবে ব্যাখ্যাত হল, কেন অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার তাঁর 'ভারত আমাদের কি শেখাতে পারে' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়টিকে 'হিন্দুদের সত্যাশ্রয়ী চরিত্র' বিষয়ে আলোচনায় নিয়োজিত করেছিলেন। আমরা এই প্রথম অক্সফোর্ডের পণ্ডিত মানুষটির এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত কারণ বুঝতে পারলাম ঃ 'প্রায় প্রতিটি (ইংরাজ) ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভেন্টের মূলগত প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে—সকল ভারতবাসীই মিথ্যাবাদী।'... আর-একটি অংশে তিনি বলেছেন, '(ভারতীয়দের বিরুদ্ধে) অসত্যভাষণের অভিযোগ এত বেশি পরিমাণে কথিত হয় এবং সচরাচর এমনভাবে তাদের বিশ্বাস করা হয় যে, তার বিরুদ্ধে লড়াই ডন কুইকজোটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো দাঁড়াবে।' তিনি যোগ করেছেন, 'এই দুভার্গ্যজনক লড়াই আমি করতাম না। যদি না আমার এই স্থির বিশ্বাস থাকত—একটি গোটা জাতির বিরুদ্ধে আনীত এই ধরনের একটি অভিযোগ —অনুরূপ অভিযোগগুলির মতোই অত্যন্ত ক্ষীণ অনুমান ও যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে

আছে এবং তা অতীতে, বর্তমানে, বা ভবিষ্যতে যে দুষ্কার্য ঘটিয়েছে, ঘটাচ্ছে, বা ঘটাবে, তার তুল্য কিছু ভারতে ইংরাজ-রাজ্যের চরমতম শত্রুও আবিষ্কার করতে সমর্থ নয়।

'ম্যাক্সমুলার ভারতে প্রাচীন গ্রন্থাদির সঙ্গে অন্যান্য দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত সত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন— ভারত এক্ষেত্রে কারো থেকে পিছিয়ে নেই। সে প্রসঙ্গ উপস্থিত করার পরে নিবেদিতা বলেন, 'ঘটা করে ম্যাক্সমুলারের লেখার কথা তোলার দরকার কী —ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অমন একটা কল্পনাতীত অসার অভিযোগের খণ্ডনে?' নিবেদিতা ঘনীভূত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'কী বলছ, প্রয়োজন নেই? অবশ্য আছে। জানো না—ম্যাক্সমুলারের চেয়ে অনেক বড় মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে বিপরীত কথা বলছেন!! বলাবাহুল্য উক্ত মহাপুরুষের নাম জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন।'

এই লেখাগুলির সূত্র ধরে পত্র-পত্রিকায় বহু চিঠিপত্র প্রকাশিত হতে থাকল। সব কটি চিঠিই ছিল কার্জনের সমালোচনায় মুখর। কার্জনের বক্তব্যের প্রতিবাদে নানা জায়গায় প্রতিবাদ সভাও অনুষ্ঠিত হল। ১১ মার্চ কলকাতার টাউন হলে কার্জনের বক্তব্যের প্রতিবাদে একটি বড়সড় সভার আয়োজন করা হল। ডা. রাসবিহারী ঘোষ সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই সভা থেকে কার্জনের শাসননীতির বিরুদ্ধে সমগ্রিকভাবেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। ১৭ মার্চ 'ইন্ডিয়া' পত্রিকায় এই সভার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। 'ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত ওই সংবাদের শঙ্করীপ্রসাদ বসু কৃত অনুবাদটি তুলে দেওয়া হল, 'এখানে টাউনহলে জনাকীর্ণ প্রকাণ্ড এক সভায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় প্রদত্ত লর্ড কার্জনের বক্তৃতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়। সেই সঙ্গে প্রতিবাদ করা হয় তাঁর ব্যাপক প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংকোচ, উচ্চতর শিক্ষার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট দ্বারা সংবাদপত্রের বন্ধন, এবং নিম্নতর সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের ব্যাপারে প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার লোপ।

'ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ (দেশীয় আদালতের নেতা, সুপ্রিম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অ্যাডিশনাল মেম্বার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম গ্র্যাজুয়েটদের অন্যতম) সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, ভাইসরয় তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতায় এশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা উপস্থিত করেছেন, যে মহাদেশ বুদ্ধ, খ্রীস্ট ও মহম্মদের জন্ম দিয়েছে। মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের দ্বারা ভাইসরয় কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা হ্রাস করেছেন। সেই তিনি এখন জনগণের

দেশাত্মবোধ ও সর্বজনীন আশা আকাঙ্ক্ষার বিরোধী বঙ্গবিভাগ চাইছেন। নিম্নতর সরকারি চাকুরির জন্য ভাইসরয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিলোপ ঘটিয়েছেন। যদিও সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞদের মতে, ওই পরীক্ষা ব্যবস্থা সরকারি চাকুরিয়াদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করেছিল। (তাঁর প্রবর্তিত) ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট কেবল যে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ ও স্বাধীনতার ক্ষতি করেছে তাই নয়, শিক্ষা এখন অনেক মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

'ডাঃ ঘোষ 'ইংলিশম্যান' উদ্ধৃত করে দেখান ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের সম্মিলিত প্রতিবাদের বিরুদ্ধে ভাইসরয় কীভাবে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট পাশ করেছেন। বাস্তব কথা হল, ভাইসরয় জনমতের কোনো গুরুত্ব দেন না, নিজের ইচ্ছা বলবৎ করতে বদ্ধপরিকর এবং তাঁর প্রায় সকল ব্যবস্থাই সিমলার আমলাতন্ত্রকে জোরদার করতে ও শাসনতন্ত্রে রুশীয় কাঠামো আনতে উদ্যোগী।'

কার্জন এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের দমনমূলক মনোভাব সম্পর্কে নিবেদিতা এর অনেক আগে সচেতন হয়েছিলেন। ১৯০৪ সালের এপ্রিল মাসে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'You do not know how terrible the government is becoming. The Thibet expedition, the new stand about Education, the division of Bengal, the offcial Secrets Bill, the Ancient Monuments. Every measure is oppressive and tyrannical, and aimed at the undermining of the faculty fot liberty.'

১৯০৪ সালের গোড়ার দিকে এই ক্ষোভ যে কার্জনের পরবর্তী কার্যকলাপে আরো বৃদ্ধি পাবে সেটাই স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে কার্জন যখন আর ভাইসরয় ছিলেন না, তখনও কার্জনের কুকীর্তিগুলিকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে নিবেদিতার কসুর ছিল না। এ প্রসঙ্গে ১৯০৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর এ কে র‍্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠির উল্লেখ করা যায়। র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'People are terrifically interested, naturally, in the personal connection of Curzon with the geneses of the unrest. My view is, as you know, that it was the Education Bill that did the work—the convocation Speech that roused the spirit— and partition that opened war— when this masterly strategy had prepared the way.'

এই সব বিষয় নিয়ে 'আউটলুক' এবং 'আটলান্টিক মান্থলি'-তে র‍্যাটক্লিফকে কয়েকটি নিবন্ধ লিখতেও অনুরোধ করেছিলেন নিবেদিতা।

১৯০৫-এর মার্চে নিবেদিতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসায় ধরা পড়ে তাঁর মেনিনজাইটিস হয়েছে। প্রায় তিন সপ্তাহ এই সময়ে তাঁকে ভুগতে হয়। তাঁর দেখভাল এবং সেবার জন্য নার্স রাখা হয়। চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে বোসপাড়া লেনের বাড়ি থেকে সরিয়ে জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ির কাছাকাছি একটি বাড়িতে এনে রাখা হয়। নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে এই অসুস্থতার সংবাদ পাওয়া যায়। ১৯০৫-এর ৫ এপ্রিল জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, '2 or 3 weeks I have been lying very ill—beginning with brain fever— 2 trained murses.

...I have had SUCH a doctor. They moved us from Bose para Lane to this great empty house near the Bose— and say this saved my life.'

একটু সুস্থ হয়ে বসু দম্পতির সঙ্গে দার্জিলিংয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারে গেলেন নিবেদিতা। ফিরে এলেন ৩ জুলাই। এর ভিতর লর্ড কার্জন বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত পাকা করে ফেলেছেন।

পাঁচ

লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'নিবেদিতা তখন দার্জিলিঙে। ১৯০৫ সনের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আইন চালু হল। শহরে বাজারে সব যেন থমকে থেমে গেল। সর্বত্র একটা গভীর বিষাদের কালো ছায়া। কাগজে-কাগজে খবর বেরল যখন, তখন দোকান-পশারে ঝাঁপ পড়ল, হল 'দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে।' প্রাণের চিহ্ন আর কোথাও যেন চোখে পড়ে না। সেদিন রান্না করে কেউ কিছু মুখে তোলেনি। অনেকে একেবারে উপবাসী রইল।

'সবই বৃথা হল? ভারত-সচিবের কাছে এত আবেদন, বড়লাটের কাছে স্মারকলিপি আর শেষপর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণকে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে গোখলের প্রতিবেদন পাঠানো, কিছুতেই কিছু না? ষাট হাজার স্বাক্ষর-সুদ্ধ একখানা আবেদনপত্র 'হাউস্ অব কমন্সে' পাঠানো হয় একটা কিছু করার অনুরোধ জানিয়ে। হার্বার্ট রবার্ট এ নিয়ে পার্লামেন্টে বিতর্কও তুলেছিলেন। কিন্তু কোনও ফলই ফলল না শেষ পর্যন্ত।

'দার্জিলিঙ টাউন হলের আশেপাশে আস্তে আস্তে লোকের ভিড় জমে। সবারই মুখে একটা বেদনার ছাপ। সংক্ষেপে অথচ প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রতিবাদ জানানো হল। সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন দুজন, দেশবন্ধু আর নিবেদিতা। বক্ষে করাঘাত করে নিবেদিতা বলে উঠলেন, 'ধিক আমার জন্মভূমিকে! বাংলার বুকে এই যে ভেদের প্রাচীর তুলে সে দেশকে অপমান করছে, ভারতবাসীর শৌর্য আর আত্মত্যাগ যতদিন তাকে তা তুলে নিতে বাধ্য না করে, আমরা চালিয়ে যাবই এ-সংগ্রাম!'

'সভাভঙ্গের আগে সমবেত জনতা একবার একযোগে তাদের ডান হাতখানি তুলে ধরল। মনিবন্ধে তাদের রাখি বাঁধা। নাড়ীর বাঁধনের চেয়েও বড় বাঁধন এই মিলন-রাখি। সেদিনের জনতার এই ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছিল এক নীরব তর্জন।

ব্যথাহত মাতৃভূমিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকে সেদিন বদ্ধপরিকর, তাকে রক্ষা করতেই হবে।

'নিবেদিতা এর পরে ফি-বছর এই তিথিটি পালন করতেন। বন্ধুরা তাঁর বাড়িতে একত্র হতেন, তিনি ফল আর পাঁচমিশালী স্যালাড খাওয়াতেন সবাইকে।'

১৯০৫ সালটি বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওই বছরই বাংলাকে ভাগ করার সরকারি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন বড়লাট কার্জন এবং ওই বছর অক্টোবর মাসে বঙ্গভঙ্গ আইন কার্যকর করেন তিনি। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারা বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালিই কার্জনের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ান। এর আগে বা পরে, কখনোই এরকমভাবে সমগ্র বাঙালি জাতিকে কোনো একটি ঘটনায় এরকম আবেগমথিত হয়ে পড়তে দেখা যায়নি। বাংলার এই প্রতিবাদের সমর্থনে অন্য রাজ্যগুলি থেকেও সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং ধিক্কার শোনা যেতে থাকে। আর এই বঙ্গভঙ্গ থেকেই জন্ম নিল স্বদেশি এবং বয়কট আন্দোলন। এর আগে যে আবেদন-নিবেদনের পথে কংগ্রেস এবং বাঙালি শিক্ষিত মডারেট শ্রেণি চলছিল, কার্জনের এই বঙ্গভঙ্গ বাঙালিকে সরাসরি প্রতিরোধের পথে নামিয়ে দিল। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের পিছনে সরকার যুক্তি দেখিয়েছিল বাংলা প্রদেশের আয়তন এত বিরাট এবং লোকসংখ্যা এত বিপুল যে, একে দুটি প্রদেশে বিভক্ত না করলে ঠিকমতো প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করা যাবে না। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, এ যুক্তি কিন্তু ঠিকই ছিল। বাস্তবিকই তখন বাংলা প্রদেশের আয়তন ছিল বিরাট। অবিভক্ত বাংলা ছাড়াও তখন বিহার এবং ওড়িশা যুক্ত ছিল এই প্রদেশের সঙ্গে। এই প্রদেশের জনসংখ্যা তখন ছিল আট কোটি। কিন্তু মুখে সরকার যতই প্রশাসনিক উদ্দেশ্যের কথা বলুক না কেন, কার্জন বা অ্যান্ড্রু ফ্রেজারদের মতো ভারতবিদ্বেষী শাসকদের প্রকৃত অভিপ্রায় কিন্তু তা ছিল না। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ করার সিদ্ধান্তের পিছনে মূল কারণটি ছিল রাজনৈতিক। কার্জন বাঙালিদের রাজনৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আঁচ করেছিলেন, বাংলাদেশ থেকেই প্রথম ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এ আঁচ করেই বাংলাদেশকে ভাগ করে সেই সম্ভাবনাকে গোড়াতেই দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, বাংলাকে ভাগ করলে বাঙালিদের যথেষ্ট দুর্বল করে তোলা যাবে।

১৯০৩ সালের শেষদিকে কার্জনের বাংলাকে ভাগ করার পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে আসে। এই পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসার পরই আপামর বাঙালি,

হিন্দু-মুসলমান, ধনী-নির্ধন সকলেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। ১৯০৩ এবং ১৯০৪-এর কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলাকে ভাগ করার জন্য সরকারের এই ভাবনা-চিন্তার বিরোধিতা করে প্রস্তাবও নেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন ছিল কার্যত উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত মডারেট নেতৃবৃন্দের দখলে। এঁরা ভেবেছিলেন, সরকারকে স্মারকলিপি দিয়ে, আবেদন-নিবেদন করে এ ভাবনা থেকে বিরত রাখা যাবে। কিন্তু কার্জন এই মডারেট কংগ্রেসি নেতাদের গুরুত্ব দিতে মোটেই রাজি ছিলেন না। বছর দেড়েক চুপচাপ থাকার পর ১৯০৫-এর ২০ জুলাই কার্জন বঙ্গভঙ্গের সরকারি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন। আর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আইন কার্যকর করার, অর্থাৎ, বাংলাকে ভাগ করে নতুন একটি প্রদেশের যাত্রা শুরুর দিনক্ষণও ধার্য হয়ে গেল। সরকার সিদ্ধান্ত নিল বাংলা ভাগ হয়ে একটি প্রদেশ হবে 'ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম।' এর অন্তর্ভুক্ত হবে চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহি ডিভিশন, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদা ও অসম। অন্য প্রদেশটির নাম হবে বেঙ্গল—যার অন্তর্ভুক্ত হবে বিহার, ওড়িশা এবং অবশিষ্ট বাংলা। জনমতকে কার্যত উপেক্ষা করেই সরকার এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বসল। কার্জনের এই সিদ্ধান্তে মডারেট কংগ্রেস নেতৃত্ব যথেষ্ট অপমানিত বোধ করল।

কার্জনের বাংলাকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সভা-সমিতি, সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রতিবাদ, স্মারকলিপি—সব মিলিয়ে পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে উঠল। কিন্তু, এইসব সভা-সমিতি ও স্মারকলিপি—এসব যেন ধর্তব্যের মধ্যেই আনলেন না কার্জন। তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে অবিচলিত রইলেন। কার্জন ২০ জুলাই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এবং ওই সভা থেকে বয়কট আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। আবেদন-নিবেদনের পথ ছেড়ে সেই প্রথম প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে আসা। অবশ্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে আসার একটি চাপ তৃণমূল স্তর থেকেই আসছিল। টাউন হলের এই সভার আগে বিভিন্ন জেলায় যে প্রতিবাদ সভাগুলি হয়েছিল, সেখান থেকেই বয়কট আন্দোলনের দাবি উঠছিল। টাউন হলের প্রতিবাদ সভার উদ্যোক্তারা এবং নেতৃস্থানীয়রা সেই দাবিকে স্বীকৃতি না জানিয়ে পারেননি।

অরবিন্দ যে বিপ্লব-পরিকল্পনা করেছিলেন, তার একটি ধাপ ছিল 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।' বয়কট আন্দোলন ছিল প্রকৃত অর্থেই সেই 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।' বয়কট আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক পণ্য বর্জন করা। তা করা হলে ব্রিটিশের বাণিজ্যিক স্বার্থে আঘাত করা যাবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর এই পরোক্ষ আঘাত

হানার ধারণা থেকেই বয়কট আন্দোলনের জন্ম। সমস্ত বাঙালি জাতির হৃদয়ে ঝড় তুলে দাবানলের মতো এই বয়কট আন্দোলন বাংলার জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ল।

এই বয়কট আন্দোলন কিন্তু ব্রিটিশ শাসকদের যথেষ্ট বিড়ম্বনায় ফেলেছিল। বয়কট আন্দোলনের ফলে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ নষ্ট হতে বসেছে দেখে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সরকারও এই প্রবল বিদ্রোহের মুখে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে গেল। বয়কট আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার নানাভাবে পীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল। এই আন্দোলনে একটি বড় ভূমিকা ছিল ছাত্র ও যুবদের। ছাত্রদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ১৯০৫-এর ১০ অক্টোবর বাংলার অফিসিয়েটিং চিফ সেক্রেটারি আর ডবলিউ কার্লাইল একটি সার্কুলার জারি করলেন। এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে ২৫ অক্টোবর কলকাতায় একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল। সেখানে স্বাধীন জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। কার্লাইলের মতো আর একটি সার্কুলার জারি করলেন পূর্ববঙ্গের চিফ সেক্রেটারি পি. বি. লায়ন। বরিশালে বয়কট আন্দোলন সবথেকে সর্বাত্মক রূপ নিয়েছিল। সেখানে আন্দোলন দমন করতে গুর্খা সেনাদের নামিয়ে দিলেন পূর্ববঙ্গের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফুলার। অকথ্য অত্যাচার চলল আন্দোলনকারীদের ওপর।

এরই মাঝখানে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য কার্জন একটি নোংরা চাল চাললেন। কার্জন ঢাকার নবাব নাজিমুল্লাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন নবগঠিত 'ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম' প্রদেশটিতে হিন্দুদের আধিপত্য খর্ব করে মুসলিম আধিপত্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে স্বল্প সুদে ১৪ লক্ষ টাকা ঋণও দেওয়া হবে। কার্জনের প্রতিশ্রুতি এবং টাকা পাওয়ার পর সলিমুল্লা দাঙ্গায় নেতৃত্ব দিতে নেমে পড়লেন। সলিমুল্লার সমর্থনে এসে দাঁড়ালেন মৌলবাদী মুসলিম ধর্মীয় নেতারা। ১৯০৬ সালে কুমিল্লা এবং জামালপুরের দাঙ্গায় হিন্দুরা নির্যাতিত হলেন। প্রশাসন সলিমুল্লা এবং দাঙ্গাবাজ মুসলিম মৌলবাদীদের মদত দিল। যে বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান একত্রে গর্জে উঠেছিলেন—সেই সম্প্রীতি কার্জন আর সলিমুল্লা নষ্ট করে দিলেন।

শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্র নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বঙ্গভঙ্গ এক বিরাট ঝড় নিয়ে এল। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'ক'টা দিন যেন হতোদ্যম বিপদে কাটল। তারপর হঠাৎ সারাদেশে স্বাধীনতা-লাভের একটা দুর্জয় সংকল্প জেগে উঠল: কলকাতার লোক ছুটল আনন্দমোহন বসুর বাড়িতে। ত্রিশ বৎসর ধরে তিনি হিন্দুদের এক হতে বলেছেন, কেউ তাঁর কথা শোনেনি। আনন্দমোহন তখন মরণাপন্ন। দূরদর্শী বৃদ্ধকে

জনতা সেদিন ধরে নিয়ে গেল তাঁরই বাড়ির সামনে একখণ্ড পড়ো জমিতে। ঐখানেই বাংলার আদি 'জাতিসদন' গড়ে উঠবে, আনন্দমোহন তাঁর আশীর্বাদ দিয়ে সমর্থন করুন জাতির এ প্রচেষ্টাকে। নেতারা সমস্বরে বললেন, 'স্বরাজ চাই।' অমনি সমবেত কণ্ঠে জনতা বজ্রনির্ঘোষে গর্জে উঠল, 'আমরা স্বরাজ চাই।'

'সেই উত্তাল পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

'বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা...'

বাংলা ভাগের এই সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলার সংস্কৃতি জগতও ক্ষোভে ফুঁসে উঠল। বাংলার অখণ্ডতা, বাঙালির ঐক্য এবং সম্প্রীতি কামনা করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পথে নামলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এল। শুধু রবীন্দ্রনাথ বা ঠাকুর পরিবার নয়, চারণকবি মুকুন্দ দাস তাঁর স্বদেশী যাত্রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ দেশাত্মবোধক গানে এবং নাটকে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রমুখ চিত্রকলায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা রঙ্গমঞ্চে দেশপ্রেম এবং জাতীয় আবেগকে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। বলতে গেলে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ভিতর দিয়েই প্রথম সার্বিক ব্রিটিশ বিরোধী প্রত্যক্ষ আন্দোলনের জন্ম হল বাংলায়। ১৯০৫-এ জন্ম নেওয়া এই বয়কট আন্দোলনই পরে বীজ বপন করে দিয়ে যায় দেশব্যাপী চরমপন্থী রাজনীতির, যে রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন পাঞ্জাবের লাজপত রাই এবং মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলকের মতো নেতারা। এই বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে আর-একটি শক্তি ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। কংগ্রেসে মডারেটদের পাশাপাশিই জোরদার হতে থাকে চরমপন্থীদের মত। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনেরই একটি নতুন ধারার জন্ম দিতে সক্ষম হয়।

এখানে একটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত দেওয়া দরকার। অরবিন্দ ঘোষ যে বিপ্লব প্রচেষ্টার কথা ভেবেছিলেন, তার একটি স্তর ছিল সংগঠন তৈরি করা, জনমত গঠন করা এবং অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে যাওয়া। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে এই বয়কট আন্দোলন অরবিন্দের বিপ্লবপন্থা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রাজনীতিকেই আরো ত্বরান্বিত করল। শুধু ত্বরান্বিত করল তা-ই নয়, ইতিমধ্যে বিপ্লবী ভাবধারায় যাঁরা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন, আরো সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করল। বয়কট আন্দোলনে এই বিপ্লববাদীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বসলেন।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'নভেম্বর-৪ঠা; গোলদীঘিতে ছাত্রদের সভা। রংপুরে ছাত্রদের দণ্ডের প্রতিবাদ। এই শতাব্দীর ছাত্র আন্দোলন এই সভাতেই শুরু হয়। ৫ই, শ্যামপুকুর ময়দানে সভা। বগুড়ার নবাব আব্দুল সোহ্‌বান চৌধুরী সভাপতি। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-- রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্র ব্যানার্জীকে এই বলিয়া আক্রমণ করিলেন যে, তাঁহারা এই আন্দোলনে পুরাপুরি যোগ দিতেছেন না। ৯ই, ছাত্ররা গোলদীঘিতে সভা করিল। আবার ফীলড্ এন্ড অ্যাকাডেমি ক্লাব-এ রাজা সুবোধ মল্লিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা দিবেন ঘোষণা করিলেন। ...১১ই গোলদীঘির সভায় বিপিন পাল ও হীরেন দত্ত প্রভৃতি ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বলিলেন। ইহার মূলে ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। এইখানেই নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে ফাটল ধরিল। ১৭ই, ফীলড্ এন্ড অ্যাকাডেমি ক্লাব-এর সভায় সুরেন্দ্র ব্যানার্জী সভাপতি হইয়া ছাত্রদের বলিলেন, তাহারা যেন বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ না করে। এইদিন নরম ও চরমপন্থীদের ভেদ পাকা হইয়া গেল। ...২৪শে পান্তির মাঠে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প হইল। ২৬শে, ঐ মাঠের সভায় রংপুরে গুর্খা সৈন্য রাখার তীব্র প্রতিবাদ করা হইল। ছাত্র আন্দোলন সংহত ও সুগঠিত হইতে চলিয়াছে।

'ডিসেম্বর-৩রা, পান্তির মাঠে সম্পূর্ণ গভর্নমেন্ট নিরপেক্ষ হইয়া 'আত্মপ্রতিষ্ঠা' ও 'আত্মরক্ষার' সংকল্প গ্রহণ করা হইল। ইহাই বাংলার চরমপন্থী দলের ক্রীড (creed)-রূপে গৃহীত হইল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের প্রভাব দেখা যায়। ইহা সুরেন্দ্র ব্যানার্জী ও গোখলের মতো Moderate-দের আবেদন-নিবেদন নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী আদর্শ। ৯ই, গোলদীঘিতে সভা হইল। ১৮/২১/২২/২৩শে এই চারিদিন, বিপিন পালের নেতৃত্বে ফীলড্ এন্ড অ্যাকাডেমি ক্লাব-এ আলোচনার পর ২৪শে তারিখে, সি. আর. দাশের বাড়িতে চরমপন্থীদের প্রতিষ্ঠান 'স্বদেশী মণ্ডলী' ভূমিষ্ঠ হইল। ইহা ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। স্বদেশী মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চরমপন্থী বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি এইখান হইতেই পৃথক হইয়া কাশী কংগ্রেসে রওনা হইলেন। বাংলার নরমপন্থী ও চরমপন্থী কাশী কংগ্রেসের পূর্বেই মি. সি. আর. দাশের বাড়ি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল। সি. আর. দাশ নরমপন্থী বিরোধী, চরমপন্থী দলভুক্ত। এই পাঁচমাসের আন্দোলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন— (১) বিপিনচন্দ্র পাল, (২) উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, (৩) শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, (৪) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, (৬) রাজা সুবোধ মল্লিক, (৭) ব্যারিষ্টার এ চৌধুরী, (৮) ব্যারিষ্টার জে.এন.রায়, (৯) সি.আর.দাশ, (১০) মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, (১১) হীরেন্দ্রনাথ

দত্ত, (১২) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, (১৩) কৃষ্ণকুমার মিত্র, (১৪) মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন, (১৫) শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, (১৬) রমাকান্ত রায়, এবং (১৭) অশ্বিনী কুমার দত্ত।'

বাংলার এই আন্দোলন সেইসময় সারাদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করা নয়, জাতীয় রাজনীতির অগ্রগণ্য চরিত্রদের কাছ থেকে বাংলার এই আন্দোলন প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'হিস্ট্রি অব দ্য ফ্রিডম-মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে জানিয়েছেন, বাংলার এই আন্দোলনের প্রভূত প্রশংসা করে গোখলে বলেছিলেন, 'বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলায় মানুষের মধ্যে যে চেতনা এবং জাতীয় আবেগ দেখা দিয়েছে, তা জাতীয় ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জাতীয় অগ্রগতির পক্ষেও এ বিরাট সহায়ক। ব্রিটিশ শাসনে এই প্রথম সর্বশ্রেণীর ভারতীয় একটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। বাংলার এই বীরত্বপূর্ণ কাজ সারাদেশকে বিস্মিত করেছে। সমগ্র দেশ আজ ভারতের কাছে কৃতজ্ঞ। বাংলার দুঃখ এবং যন্ত্রণা দেশের বাকি অংশকে তার প্রতি সহমর্মী করে তুলেছে।'

এবার দেখা যাক, এই উত্তাল সময়টিতে নিবেদিতা কী করছিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট টাউন হলে যে বিশাল প্রতিবাদ সভা হয়েছিল, নিবেদিতা সেই সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। কারণ, নিবেদিতা তখন মেনেনজাইটিস অসুখে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িটি ছিল অত্যন্ত ছোট। ওই বাড়িতে রেখে তাঁকে চিকিৎসা করা সম্ভবপর ছিল না। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'ডাক্তার বলে গেলেন টাইফয়েডের সঙ্গে ব্রেন ফিভার। কলকাতার ভ্যাপসা গরম তাঁকে মেরে ফেলেছে। প্রাণ সংশয় হয়ে উঠল। ত্রিশদিন ধরে জ্বর, বার-বার নিবেদিতার মর-মর অবস্থা হয়েছে। ক্রিস্টিন উদ্বিগ্ন অন্তরে শুশ্রূষা করে চলেছেন। এদিকে টাকার টানাটানি।

'সারদা দেবী এসে বিছানায় বসেন। নিবেদিতা চিনতে পারেন না। বাগবাজারের বাড়িটায় এতরকম অসুবিধা যে শেষে অনেক কষ্টে তাঁকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল জগদীশ বসুর বাড়ির পাশে একখানা খালি বাড়িতে। এ বাড়িটায় আলো-বাতাস আছে। ডাক্তার সরকার দুজন নার্স মোতায়েন করে নিজে ঘণ্টায় ঘণ্টায় রোগিণীকে দেখে যেতে লাগলেন।'

নিবেদিতাকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা বলেছিলেন, সুচিকিৎসার জন্য ইংরেজদের হাসপাতালে ভর্তি হতে। কিন্তু নিবেদিতা তাতে রাজি হননি। ফলে, জগদীশচন্দ্রের বাড়ির কাছেই একটি বাড়ি ভাড়া করে তাঁকে রাখা হল। এমনকী কোনো ইংরেজ

চিকিৎসকের দ্বারাও তিনি চিকিৎসিত হতে অস্বীকৃত হলেন। ডা. নীলরতন সরকার নিবেদিতার চিকিৎসার ভার নিলেন। স্বামী সদানন্দ এবং সিস্টার ক্রিস্টিন সর্বক্ষণ নিবেদিতার সঙ্গে রইলেন। রের্মঁ লিখেছেন, 'তখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলছে। নিবেদিতা তার কিছুই জানেন না। তাঁর অসুখের খবরে বন্ধুরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, পালা করে তাঁর সেবা করতে লাগলেন সবাই। কত রাত গোখলে বসে বসে মাথায় আইসব্যাগ দিয়েছেন। উনিই পরিষদ সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে একটা তহবিল খুলেছিলেন, নিবেদিতার উপযুক্ত চিকিৎসায় যেন কোনও ত্রুটি না ঘটে।'

একটু সুস্থ হয়ে নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুর সঙ্গে দার্জিলিং গেলেন। এর ভিতর অর্থাভাবে নিবেদিতার স্কুলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অসুস্থতার ভিতর তাঁকে আর সে খবর জানানো হয়নি। দার্জিলিঙে থাকার সময়ই জগদীশচন্দ্রের 'রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং' গ্রন্থের একত্রিশতম অধ্যায়টি পরিমার্জন এবং সংশোধন করেন নিবেদিতা। রের্মঁ লিখছেন, 'বসুদের যত্নে আর পাহাড়ের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় আস্তে আস্তে নিবেদিতা সামর্থ্য ফিরে পেতে লাগলেন। একদিন তাঁর 'খোকা' বাজার থেকে চারআনা দিয়ে একটা শিয়ালছানা কিনে আনলেন। বাচ্চাটা মিষ্টি দেখতে। নিবেদিতা তার চক্‌চকে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটান, কাজকর্ম করবার কোন তাগিদই যেন পান না। শেষে খানিকটা ঠাট্টা আর অনুযোগের সুরে আচার্য বসু বলেন, 'ওটার 'পরে যদি এত মনোযোগ দেন, তাহলে তো মুশকিল। ও-ই দেখছি আমায় ফতুর করবে।...'

'একদিন সকালবেলা নিবেদিতা শান্ত সুরে বললেন, 'কাজ করতে পারব এবার। ...আজ বিকালে শিয়ালছানাটাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসব...'

১৯০৫ সালের ২৪ মে দার্জিলিং থেকে সারা বুলকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'The Bairn has given me a baby jackal. It costs 4 annas but as I can not help looking at its black eyes, during work, he says he never saw anything so expensive. It is lovely— and it's name is Wild-Heart. We expect to set it free in a few days... It has been decided to set the jackal free today, because it is your birthday!'

অসুস্থ নিবেদিতা টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু সুস্থ হয়ে কলকাতা ফিরে আসার পরই বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন। ১৯০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারা বুলকে লিখলেন, 'Did I tell you of the Great Swadeshi Movement

here, and the sudden resolve to boycott English goods?' ওই বছরই ১৩ সেপ্টেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখলেন, 'India appears to be waking up these days. The incubus of Curzon is off, and of course you have heard of the Boycott. No one knows where it may all end. For the people are feeling their power, I think Curzon has broken the British Empire.'

এই সময়েই বাংলাদেশের বিশিষ্টজনেরা মনে করেন বাংলার সংহতি, সম্প্রীতি এবং দেশাত্মবোধের প্রতীকস্বরূপ একটি 'মিলন গৃহ' প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। সেই ভাবনা অনুসারেই ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কলকাতায় ১৬ অক্টোবর একটি সভায় ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ওই সভায় নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। এবং ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানান স্যার তারকনাথ পালিত এবং নিবেদিতা। এ প্রসঙ্গে 'এ নেশন ইন মেকিং' গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বলেছেন, 'The proposal was carefully considered, and it was warmly supported by the late Sir Taraknath Palit and Sister Nivedita of the Ramakrishna Mission, that beneficent lady who had consecrated her life to, and died in, the service of India.'

যে সভায় ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নেওয়া হয়, সে সভায় সভাপতিত্ব করেন আনন্দমোহন বসু। আনন্দমোহন তখন খুবই অসুস্থ ছিলেন। তবু সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হয় সভাপতিত্ব করবার জন্য। আনন্দমোহন তাঁর সভাপতির ভাষণটি লিখে এনেছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য পাঠ করতে পারেননি। সেটি পাঠ করেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। ওই ১৬ অক্টোবর থেকেই বঙ্গভঙ্গ আইন কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছিল সরকার। কংগ্রেস ওই দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসাবে পালন করে দেশবাসীকে একদিনের জন্য অনশন পালন করতে আহ্বান জানায়। নিবেদিতা ওইদিনই বাংলার বাইরে বসবাসকারী বিশিষ্টজনদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখলেন, বাংলাদেশে যে বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে তাতে তাঁদের সমর্থন এবং সৌভ্রাতৃত্ব চেয়ে। নিবেদিতার এই চিঠিটি এখানে উল্লেখ করা হল, 'With the compliments of Sister Nivedita.

'To-day being 30th Aswin, 16th October, 1905, Partition of the Bengali people is to be made by law.

'This day then designed to be the date of our division, is henceforth yearly to be set aside by us, for the deeper realisation

of our national uniity. Having been made by this threat of division, overwhelmingly conscious of the essential oneness of the whole Indian Nation the heart of Bengal goes out to all parts of our common Motherland.

'Thus to you from us of Bengal, is sent today this thread of Rakhi-Bandhan, is token not merely of the union of Provinces and parts of Provinces but of bond that knits us all as children of one Motherland together. Bande Mataram.'

স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার আত্মিক যোগ এবং সক্রিয় সাহায্যের পরিচয় পাওয়া যায় এগুলির ভিতর দিয়ে। এদিকে, ১৯০৫ সালেই কার্জন ভাইসরয়ের কার্যভার থেকে পদত্যাগ করে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। কিন্তু কার্জন দেশে ফিরে গেলেও ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত থেকে সরেনি। যে কারণে, কার্জনের বিদায়ের পরও স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলনের তীব্রতা বেড়েই চলে। এরই ভিতর ১৯০৫ সালে, বঙ্গভঙ্গের বছরেই, কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে গোখলে ইংল্যান্ডে যান। উদ্দেশ্য ছিল, কার্জনের শাসনে ভারতের, বিশেষত বাংলার অবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, প্রসাশনিক কর্তাব্যক্তি এবং ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট মহলকে অবহিত করা। এই সময় উইলিয়াম স্টেডের মতো প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিককে গোখলে যাতে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা খুলে বলেন সে ব্যাপারে উদ্যোগও নিয়েছিলেন নিবেদিতা। এ নিয়ে গোখলেকে তিনি চিঠিও লিখেছিলেন। চিঠি লিখেছিলেন স্টেডকেও। এ বিষয়টি এ গ্রন্থে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। শ্রীমতী হেস্টিংকেও এই সময়ে একটি চিঠি লিখে 'পজিটিভিস্ট'-দের সঙ্গে গোখলের আলোচনার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নিবেদিতার লেখা তিনটি চিঠি থেকেই বুঝতে পারা যায় ইংল্যান্ডেও একটি জনমত গঠন করতে কতটা আগ্রহী এবং সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ২০ সেপ্টেম্বর গোখলেকে যে চিঠিটি নিবেদিতা লিখেছিলেন, সেই চিঠিতে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতার কথা উল্লেখ করে নিবেদিতা মডারেট গোখলের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা চেয়েছিলেন একটি চাপ গোখলের ওপর রাখতে, যাতে গোখলে বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে যথাযথভাবে ব্রিটিশ সমাজকে অবহিত করেন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'The Boycott meanwhile is spreading even to women and priests— and the amount of sacrifice that has been made is extraordinary. I always feel that by this

particular power of unknown people to perform obscure acts of sacrifice under a dominating idea of the Community, you can exactly measure the national potentiality. It was by this power in the Russian people that Napoleon's march on Moscow was turned into a disaster. It was by the same power in the French that Napoleon's army were raised. By this, America won freedom, and so on and so on. And it was the power that a few months ago seemed unborn amongst us. Today it is seen on all sides. This is element of hope— that out shines all others. Even pretty shopkeepers are found to remonstrate with Indian customers who ask for a videshi commodity!'

প্রশ্ন হচ্ছে, নিবেদিতা কেন গোখলেকে এভাবে স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলনের তীব্রতা বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন? গোখলে এ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন না— এমন মনে করা ভুল হবে। তাহলে কি এরকম কোনো সন্দেহ নিবেদিতার মনে জন্ম নিয়েছিল যে, যেহেতু স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলনে চরমপন্থীদেরই উৎসাহ বেশি ছিল, কাজেই, মডারেট গোখলে হয়তো এ সম্পর্কে ব্রিটিশ সমাজকে ততটা অবহিত করবেন না? নিবেদিতার মনের কোণে এরকম সন্দেহ দানা বাঁধা অসম্ভব নয়। কেননা, গোখলে ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে এখানে সংবাদ রটে যায় যে, বঙ্গভঙ্গের সমর্থনেই গোখলে ও দেশে গিয়ে মত দিয়েছেন। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'গোখলে ইংল্যাণ্ডে গেছেন, এ-খবর নিবেদিতা জানতেন না তা নয়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে সব ঘটনা ঘটে গেল। গোখলের অনুপস্থিতিতে দলের অবস্থা খারাপ হয়ে ওঠে। নরমপন্থীরা ভাবলেন তাঁর বিলাত যাত্রাটা উচিতই হয়েছে, চরমপন্থীরা বিশ্বাসঘাতক বলে তাঁকে দুষতে লাগলেন।' ২০ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে নিবেদিতা গোখলেকে লিখেছেন, 'A rumour has been started here, it is said by the authorities— that you gave your opinion in favour of Partition. We of course know that this is not true— but it is being used to cause such a soreness, that a categorical denial published over your own signature would be an admirable step. Is it possible that any of the European members of the council could have cousulted you— and that you could have said anything tentative, which would be liable to said misconstruc-

tion? Even if you did, it would still be open to you to write asserting that the will of the people should be supreme with regard to their own interest in this matter.'

পত্রের এই অংশটি পড়লে বোঝাই যায়, মুখে যা-ই বলুন না কেন, গোখলে সম্পর্কে একটু সন্দেহ থেকেই গিয়েছিল নিবেদিতার মনে। গোখলে সম্পর্কে যা রটেছিল, তার পুরোটা হয়তো তিনি অবিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল অসতর্কভাবে গোখলে ওইরকম একটি কাজ করে থাকলেও থাকতে পারেন। চিঠিতে সে ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে গোখলেকে এ-ও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, এই ব্যাপারে (স্বদেশী আন্দোলন) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ। কারণ, এর সঙ্গে তার স্বার্থ জড়িত।

গোখলে বিদেশে থাকার সময়েই বেনারসে কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। গোখলের বয়স তখন মাত্র ৩৫। এত কম বয়সে আর কেউ কংগ্রেস সভাপতি হননি। এ জন্য গোখলেকে অভিনন্দন জানিয়ে ওই চিঠিতেই নিবেদিতা লিখেছেন, 'We were glad indeed to know that you had accepted the Presidency of the Congress. I think that with this year the principle of organization seems to have taken fresh possibilities.'

গোখলেকে লেখা এই চিঠিতে নিবেদিতার আর একটি ভাবনাও ধরা পড়ে। তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি দিয়ে নিবেদিতা বুঝেছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে উন্মাদনা দেখা দিয়েছে, তা নিছকই আবেগপ্রসূত আন্দোলন হিসাবে একসময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। এই আন্দোলনকে যদি সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে হয় তাহলে তার একটি সাংগঠনিক রূপ দেওয়া দরকার। সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের আন্দোলনকে সামনে রেখে কংগ্রেস সভাপতি গোখলেকে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন নিবেদিতা। ২০ সেপ্টেম্বরের চিঠিতেই নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Have you heard how 300 clerks in one house of business here have struck work? (The Burn co. incident)

'To us, who look on, the extra-ordinary thing is the spontaneous loyalty of the Indian people— utterly unpractised and inexperienced in these matters, as thay are— to their brothers. They say that even in Madras this particular firm has advertised for clerks, and none will come forward. Thay stand or fall together— this is real unity.'

ভারতে আসার পূর্বে নিবেদিতা ইংল্যান্ডে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বও দিয়েছেন। ফলে, শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি নিবেদিতার অজানা ছিল না। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'ওদিকে বিদ্রোহের ঝাঁজে লোকের আসল ঔদাসীন্য যেন উবে গেল। বড়-বড় শহরে ধর্মঘট হতে লাগল। মিলের শ্রমিক, অফিসের কেরানী, চা-বাগানের কুলী সবাই একজোট হয়। তাদের দাবিকে গুরুত্ব দেবার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গড়বার আলোচনা চলে ভাসা-ভাসা।'

স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলনকে কতটা যে আন্তরিকভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন নিবেদিতা, তা বোঝা যায় ১৯০৬-এর মার্চে 'দ্য ইন্ডিয়ান রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি লেখা পড়লে। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'The note of manliness and self-help is sounded throughout the Swadeshi Movement. There is here no begging for help, no cringing for concession... There will yet come a time when in India a man who buys from a foreigner what his own countrymen would by any means supply will be regarded as on a level with the killer of cons today. For assuredly, the two offences are morally identical...It is precisely in a matter like the keeping of the Swadashi vow that the Indian people especially can find an opportunity to show their true mettle.'

আরো লিখেছিলেন, 'The clear sight that shows us where to strike, and the strong love of our own people, the helpless, the little children of the Motherland, that is to make every blow tell, these, and these only, are the conditions that we want. Having these, we can not fail. And we shall not fail. For all the forces of the future are with us. The Swadeshi Movement has come to stay, and grow, and to drive back forever in modern India the tides of reaction and despair.'

বোঝাই যাচ্ছে, স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন জানালেও, তার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হলেও, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট শঙ্কিত ছিলেন নিবেদিতা। শুধুই উচ্ছ্বাস এবং আবেগ এই আন্দোলনকে একসময়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবে কিনা– সে সংশয় নিবেদিতার ছিল। আর সে কারণেই তিনি হয়তো এর একটি সাংগঠনিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন।

শেষপর্যন্ত অবশ্য স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে নিবেদিতাকে হতাশ হতেই হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে কোনো সাংগঠনিক রূপ দেওয়া যায়নি। ফলে স্বদেশী আন্দোলন অনেকটাই বিক্ষিপ্ত এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। ১৯১০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর এই হতাশা নিবেদিতা ব্যক্ত করেছিলেন এস. কে. র‍্যাটক্লিফের কাছে। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'But for the moment, things grow steadily worse. The people have lost ground in Educational opportunity. What an infinite loss! Then journalism has been crushed. Swadeshi has been shattered. And poverty grows worse and worse...I am down-hearted— but oh! things are dreadful!!! The poverty makes one ill, to look upon— and it is growing. And is there, after all, any hope? These peoplc are children. It is really sheep against wolves.'

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে বেনারসে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। ডিসেম্বরের ২৫ থেকে ৩১ এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে গোখলে ব্যক্তিগতভাবে নিবেদিতাকে আমন্ত্রণ জানান এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্য। গোখলে এবং নিবেদিতার এই সম্পর্ক নিয়ে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রশ্ন তুলেছেন, 'প্রিন্স ক্রপটকিন-শিষ্যা এবং অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির পরামর্শদাতা নিবেদিতা কি মনে করেন যে, আবেদন-নিবেদনকারী গোখলে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধবাদী বিপিনচন্দ্র, আর সন্ত্রাসবাদী অরবিন্দ কংগ্রেস মণ্ডপে একসঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ করিতে পারেন?' গিরিজাশঙ্করের বক্তব্য, 'নিবেদিতা প্রথম শ্রেণীর আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক (patriot), কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ধুরন্ধর রাজনীতি বিশারদ (shrewd politician) নহেন।... নিবেদিতার গোখলের প্রতি কিছুটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর কিছুটা রাজনীতির দিক দিয়া হয় তো প্রতিপত্তিশালী গোখলেকে হাতে রাখিবার চেষ্টা বটে।'

গোখলের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিবেদিতা বেনারস কংগ্রেসে যোগদান করেন। গিরিজাশঙ্কর লিখছেন, 'নিবেদিতা দার্জিলিং হইতে কলিকাতা আসিয়া একটি বাগান বাড়িতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গত কয়েক মাসে তিনি কলিকাতায় ছিলেন না। সুতরাং পুলিশ তাঁহার কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল। পুলিশের উপদ্রবের মধ্য দিয়াই সাবধানী অথচ নির্ভীক নিবেদিতা তাঁহার জীবনের ব্রত সম্পন্ন করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার জীবনের পথে অগ্রসর হইতে বহু বিঘ্ন ছিল। এখন তিনি

কাশী কংগ্রেসে রওনা হইবেন। কাশী রওনা হইবার পূর্বে তিনি কংগ্রেস সম্পর্কে সংবাদপত্রে এই বলিয়া একটি বিবৃতি প্রচার করিলেন যে, কংগ্রেস ইহার সভ্যদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবে। এবং হিমালয় হইতে কেপ্ কমোরিন এবং মণিপুর হইতে পারস্য উপসাগর মধ্যে যে বিরাট পরিবার বাস করে, তাহাদের পরস্পর সহানুভূতির ভাব কংগ্রেস প্রকাশ করিবে।' গিরিজাশঙ্কর নিবেদিতার যে বিবৃতির কথা উল্লেখ করেছেন, সেটির অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হল ঃ 'It must animate its own members in the sense of nationality. ...it must push forward to bring to light the mutual sympathy that binds the vast family living between the Himalayas, and Cape Comorin, between Manipur and the Parsian gulf.'

নিবেদিতার এই ধরনের বিবৃতি প্রচার করার একটি উদ্দেশ্য ছিল আঁচ করা যায়। নিবেদিতা কংগ্রেসের একটি জোটবদ্ধ রূপই দেখতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা এরকমই হয়তো অনুমান করেছিলেন যে, কংগ্রেস জোটবদ্ধ থাকলে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তা আরো কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে। কংগ্রেসের নরমপন্থী এবং চরমপন্থী অংশ বিচ্ছেদের পথে পা বাড়াতে পারে— এরকম একটা আশঙ্কাও হয়তো নিবেদিতার ছিল।

কংগ্রেস অধিবেশন শুরুর তিনদিন আগে নিবেদিতা কাশী এসে পৌঁছলেন। সঙ্গী গণেণ মহারাজ। গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, 'গণেণ মহারাজ আগে গিয়া বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিলভাণ্ডেশ্বরের সংকীর্ণ গলির মধ্যে খোলার বাড়িটি অবস্থিত ছিল। এই বাড়ীটির নীচের ঘরগুলিতে অফিস বসিয়াছিল। কতকগুলি সেক্রেটারি লইয়া নিবেদিতা এই অফিসে বসিয়া কাজ করতেন। বিরুদ্ধ মতের নেতারা সকলেই নিবেদিতার কাছে আসিতেন, পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিতেন। রমেশ দত্তকে সঙ্গে করিয়া বরোদার মহারাজা আসিতেন। নিবেদিতা পূর্বেই বরোদার মহারাজার সহিত বরোদাতে গিয়া (১৯০২ অক্টোবর) পরিচিত হইয়াছিলেন। একদিন রাত্রিতে নিবেদিতার বাড়িতেই গোখলে আসিয়া বরোদার মহারাজার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া গেলেন। এবং তাঁহার পরিকল্পনাটি সকলকে বলিলেন। নিবেদিতার বন্ধুরাই গোখলের 'Servants of India Society'-র প্রথম সভ্য হইলেন। গোখলের কাজে নিবেদিতার হস্ত সর্বদাই লক্ষিত হয়।

'নিবেদিতাকে বাহিরে বড় একটা দেখা যাইত না। অথচ নেতাদের গতিবিধির জন্য তিলভাণ্ডেশ্বরের গলি সরগরম হইয়া উঠিল। নিবেদিতা অন্তরালে থাকিয়া

সকল কাজ করিলেন।' নিবেদিতার সক্রিয় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনো নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি, বরং অনেক ক্ষেত্রে অন্তরালে থেকেই কাজ করেছেন একটাই কারণে; তা হল, তাঁর আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে কোনো বিদেশির নেতৃত্বদান অনুচিত হবে। এক্ষেত্রে ভারতীয়রা নিজেরাই নেতৃত্বের মাধ্যমে নিজেদের পথ খুঁজে নিক— এমনটাই চাইতেন স্বামীজি। ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতা যখন বিপ্লব প্রচেষ্টায় রত হয়েছিলেন— তখন স্বামীজি একথা বলেওছিলেন নিবেদিতাকে। পরবর্তী সময়ে নিবেদিতা স্বামীজির এই বক্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করে কখনোই নেতৃপদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে চাননি।

বেনারস কংগ্রেসের একটি বর্ণনা এঁকেছেন লিজেল রেমঁ। রেমঁ লিখেছেন, 'গোখলে যখন বারাণসীতে পৌঁছলেন, লোকের উৎসাহ-উত্তেজনা চরমে উঠল। লণ্ডন থেকে আসতে পথশ্রমে তিনি ক্লান্ত কিনা সে খোঁজ কে নেয়— গোখলে তাদের আপনজন এই যথেষ্ট। মহাসভার একপ্রাণতা যেন গোখলের মাঝে রূপ ধরেছে। দেশ তাঁকে চায়। বিপক্ষবাদীরাও প্রতীক্ষায় আছে, তাদেরও গভীর আস্থা তাঁর 'পরে।

'মহাসমারোহের মধ্যে গোখলে পুণ্যধাম কাশীতে এসে ঢুকলেন। বাজনা বাজিয়ে জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা করল। স্টেশন থেকে একটু দূরে জমকালো একখানা জুড়ি দাঁড়িয়ে আছে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য। দেশের নিয়ম, একটি মেয়ে পুরবাসীদের হয়ে নেতাকে স্বাগত জানাবে। সবাই একবাক্যে নিবেদিতাকে এ-কাজের ভার দিল। গোখলে নামতেই নিবেদিতা এগিয়ে এসে তাঁর সামনে ধরলেন এক পাত্র দুধ— বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ। তারপর গলায় পরিয়ে দিলেন সোনালী জরির থোপনা-গাঁথা ফুল-কর্পূরের মালা।

'বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে শহরের দিকে। নিবেদিতা চললেন গোখলের বন্ধুদের সঙ্গে। হঠাৎ জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল, অধীর উত্তেজনায় ঘিরে ধরল গোখলের গাড়ি। গোখলেকে দেখতে চায়, ছুঁতে চায় তারা। একখানা খোলা গাড়িতে গোখলেকে চড়ানো হল। তারপর ঘোড়া খুলে দিয়ে সবাই মিলে তাকে টেনে নিয়ে চলল।

'এমনই প্রবল উত্তেজনার মধ্যে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন শুরু হল। অধিবেশন গৃহেও যেন উৎসবের উচ্ছ্বাস। রঙিন কাগজের ঝুলন-মালা আর নিশান উড়ছে চারদিকে। আশেপাশের অলি-গলিতে লোকের কী হৈ-চৈ, যেন মেলা বসেছে। যাওয়া-আসার পথে দোকানীরা দোকান খুলেছে, বইয়ের দোকানই বেশী। গাছের তলায় বসেছে অস্থায়ী ভিয়ান, বিক্রি হচ্ছে কচৌড়ি পাকৌড়া, ডালমুট।'

বেনারস কংগ্রেসে আলোচ্য বিষয়গুলির ভিতর অন্যতম ছিল বাংলার স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলন। চরমপন্থীদের ভিতর মহারাষ্ট্র থেকে বাল গঙ্গাধর তিলক এবং পাঞ্জাব থেকে লালা লাজপত রাই তাঁদের অনুগামীদের নিয়ে এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলা থেকেও মডারেট এবং চরমপন্থীরা এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলার স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলনকে কংগ্রেস অনুমোদন দেয় কিনা—সেদিকেই সবার আগ্রহ ছিল। বাংলার বিপিনচন্দ্র পালের মতো চরমপন্থীরা চাইছিলেন কংগ্রেস স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিক। এ ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃত্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিপিনচন্দ্ররা তিলক এবং লাজপত রাইয়ের সঙ্গে জোটবদ্ধ হলেন। ফলে, কংগ্রেস অধিবেশন শুরুর আগে থেকেই মডারেট এবং চরমপন্থীদের ভিতর একটা স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। অধিবেশনের সময় এই স্নায়ুযুদ্ধ আরো চূড়ান্ত আকার নেয়। স্বদেশী বা বয়কট আন্দোলনকে প্রকাশ্যে নাকচ করে দিতে না পারলেও, নরমপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করেছিলেন— বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলনকে অনুমোদন দিলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তা প্রত্যক্ষ এবং চূড়ান্ত সংগ্রামে নামাই হবে। তাতে সমস্তরকম শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

নরমপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের এই মনোভাব ধরা পড়ল গোখলের সভাপতির অভিভাষণে। গোখলে বললেন, 'বয়কট কথাটার ভিতর একটা প্রতিশোধ ও বিদ্বেষের ভাব রয়েছে। ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক, তাতে কংগ্রেস দেশের পক্ষ থেকে বয়কট প্রস্তাব সমর্থন করতে পারে না।' কিন্তু একথা বললেও বাংলার বয়কট প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেননি গোখলে। কিছুটা হলেও চরমপন্থীদের চাপের কাছে গোখলে যে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিলেন তার একটি বড় কারণ নিবেদিতার প্রভাব এবং কৌশল। কিছুটা হলেও নিবেদিতা গোখলেকে নিজেদের মতবাদের পক্ষে নরম করতে পেরেছিলেন। নিবেদিতার এই প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন অমলেশ ত্রিপাঠীর মতো ঐতিহাসিকও।

এরই পাশাপাশি তিলক; বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রাইয়ের মতো চরমপন্থীদের প্রবল চাপও গোখলের ওপর ছিল। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। অধিবেশন চলাকালীনই সেখানে সরলা দেবী চৌধুরাণী এসে উপস্থিত হন। সরলা দেবীকে অধিবেশন স্থলে দেখে অনেক প্রতিনিধিই দাবি করতে থাকেন— তাঁকে মঞ্চে 'বন্দে মাতরম' গাইতে দেওয়া হোক। গোখলে এই প্রস্তাবে প্রথমে রাজি হননি। কারণ, সেইসময় বাংলাদেশে 'বন্দে মাতরম' সংগীতটি নিষিদ্ধ ছিল। গোখলে মনে করেছিলেন, বারাণসী অধিবেশনের এই মঞ্চে 'বন্দে মাতরম'

গীত হলে ইংরেজ শাসকরা রুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত চরমপন্থীদের চাপের মুখে সরলাদেবীকে গানটির কয়েকটি লাইন গাইতে দেওয়ার অনুমতি দেন গোখলে। এরই পাশাপাশি তিলক এবং বিপিন পাল জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলার বয়কট প্রস্তাবকে যদি অধিবেশনে গ্রহণ করা না হয়, তাহলে প্রিন্স অব ওয়েলসকে অভ্যর্থনা জানিয়ে যে প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করতে চলেছে—তাতে তাঁরা বিরোধিতা করবেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, '...বাংলার চরমপন্থীরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। যুবরাজের অভিনন্দন-প্রস্তাবের সময় বাংলার চরমপন্থীরা কংগ্রেসের বাহিরে চলিয়া গেলেন। যুবরাজ-বয়কটের ইহাই প্রথম সূত্রপাত। যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী ২৩ ডিসেম্বর কলিকাতায় আগমন করেন। বাংলার চরমপন্থীরা যুবরাজের অভিনন্দনে যোগদান করেননি। লোকমান্য তিলক সিংহবিক্রমে বাঙ্গালীর পক্ষে হইয়া কংগ্রেস মণ্ডপে গোখলে প্রভৃতি মডারেটদের আক্রমণ করিয়াছিলেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, লাজপৎ রায় বাংলার আন্দোলনকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন যে, বাংলার সিংহ এতদিন শৃগালের মতো ছিল, কিন্তু লর্ড কার্জনের উৎপীড়নে বাংলা এখন সিংহবিক্রমে জাগিয়া উঠিয়াছে।' নিবেদিতার ব্যক্তিগত প্রভাব এবং চরমপন্থীদের চাপের মুখে তাই বাংলার ক্ষেত্রে বয়কটকে সমর্থন জানাতে বাধ্য হন গোখলে। অধিবেশনে বলেন, 'বাঙালির ওপরে বঙ্গভঙ্গ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজের পক্ষে সেটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক ভ্রান্তি, আর বাঙালির প্রতি ক্রূর অন্যায়। বাংলার জনমত যেভাবে উপেক্ষা করে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছে তাতে বাঙালির পক্ষে বয়কট সমর্থনযোগ্য।' যদিও গোখলের এই বক্তব্য চরমপন্থীদের পুরোপুরি খুশি করতে পারেনি। তবে, গোখলেকে কিছুটা হলেও বয়কটের পক্ষে বক্তব্য রাখতে বাধ্য করতে পারাটাকে, নিবেদিতা সাফল্য বলেই মনে করেছেন। বারাণসী অধিবেশনের পর ১৯০৬-এর ২৪ জানুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, '...But Swamiji really has allowed me to do something for Him in Benaras.'

বেনারস কংগ্রেসে নিবেদিতা বক্তব্যও রাখেন। অধিবেশনের শেষপর্বে গোখলেকে ধন্যবাদ জানানোর দায়িত্ব তাঁর ওপর পড়েছিল। নিবেদিতা এই ধন্যবাদজ্ঞাপন বক্তৃতাকে রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। মডারেটরা যে ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যেতে চাইছেন না এবং মনে করছেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে গেলে ভারতবাসীর খুব লাভ হবে না— এটা নিবেদিতা জানতেন। এই মডারেটদের ভিতর গোখলেও ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে যাঁরা চেষ্টা চালাচ্ছিলেন সেই লাজপত

রাই, বালগঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পালের মতের সমর্থক ছিলেন নিবেদিতা। তিনিও চাইছিলেন কংগ্রেস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিক। কংগ্রেস অধিবেশনে এই মতের পক্ষে সমর্থক জোগাড় করতে একটু কৌশলে নিবেদিতা তাঁর ভাষণ দিলেন। ওই ভাষণে নিজেকে একজন ইওরোপীয় হিসাবে পরিচয় দিয়ে নিবেদিতা বললেন, 'জাতীয়তার জন্ম ইওরোপেই হয়েছিল। সেই বিরাট ঐতিহ্যকে ইংল্যান্ড ভুলে গিয়েছে। ভারতের জনগণকেই এখন উঠে দাঁড়াতে হবে, বাধ্য করতে হবে ইংল্যান্ডকে তার পুরনো আদর্শে ফিরে যেতে।' অর্থাৎ, ভারতের জাতীয় আন্দোলন যে বস্তুত ইংল্যান্ডের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করারই একটি পন্থা হতে পারে— তা বলে ব্রিটিশ জনগণের প্রতিও একটি বার্তা দিতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতার এই বক্তব্যের নিগূঢ় অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয়নি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের। ফলে, বিপুল অভিনন্দন কুড়িয়েছিলেন তিনি। ভারতের জাতীয় সংগ্রামের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে নিবেদিতা বলেছেন, 'ভারতের জাতীয়তার স্বপ্ন ভারতের পক্ষে কোনো স্বার্থের স্বপ্ন নয়—এ হল মানবতার স্বপ্ন, যেখানে ভারত বিরাট আদর্শের জননী, যা কিছু মহৎ, প্রেমময় এবং বৃহৎ, তারই পালিকা ধাত্রী।' বেনারস কংগ্রেসের বিবরণ রোজ 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় লিখে পাঠাতেন তিনি। 'অ্যান ইংলিশ অবজার্ভার' এই ছদ্মনামে লেখাগুলি লিখতেন। 'স্টেটসম্যান'-এর এই লেখাগুলির ভিতর কংগ্রেস সম্পর্কেও নিবেদিতার মূল্যায়ন ছিল। কংগ্রেস সম্পর্কে নিবেদিতার বক্তব্য, তিনি কী আশা করতেন কংগ্রেসের কাছে তার পরিচয় পাওয়া যায় 'The Task of the National Movement in India' প্রবন্ধে। ওই প্রবন্ধে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Thus the Congress represents, not a political, or partisan movement, but the political side of a national movement— a very different thing. It is successful, not in proportion as its views are officially adopted, but in proportion to the abilty and earnestness with which it conducts its own deliberations, in proportion to the number which it can call together and make efficient in political methods, and in proportion to the information it can disseminate throughout the country on question of national siginficance. If these fundamental facts be once clearly understood, it will matter very little thereafter what form the resolutions take in Congress, matters very little about an act of politeness more or less, or about the number

of adjectives in a given sentencc. For it will be understood that the real task of the Congress is that of an educational body, educating its own members in that new mode of thinking and feeling which constitutes a sense of nationality, educating them in the habit of prompt and united action, of political trustiness, of communal open- eyedness; educating itself, finally, in the knowledge of a mutual sympathy that embraces every member of the vast household which dwells between the Himalayas and Cape Comorin, between Manipur and the Arabian sea.'

কংগ্রেসের একটি ঐক্যবদ্ধ চেহারা নিবেদিতা বরাবরই দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ চেহারা দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। বরং বেনারস কংগ্রেসের পর দেশের রাজনৈতিক চিত্রটি দ্রুত পালটে যেতে শুরু করল। কংগ্রেসের ভিতরও মডারেট এবং চরমপন্থীদের বিরোধ আরো তীব্র আকার ধারণ করল। বাংলার চরমপন্থীরা পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের লাজপত রাই এবং তিলকের গোষ্ঠীর সঙ্গে আরো নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলল। বাংলায় বিপিনচন্দ্র পালের বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন লাজপত রাই। অন্যান্য রাজ্যের নরমপন্থীরা একে তো সমর্থন করলই না; উপরন্তু বিরোধিতা করল। বেনারস কংগ্রেসের পরবর্তী সময় থেকেই দেশের রাজনীতিতে লালা লাজপত রাই, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল (লাল-বাল-পাল) অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন। বেনারস কংগ্রেস চলাকালীন অরবিন্দ ঘোষ কলকাতায় ছিলেন না। বেনারস কংগ্রেসে অরবিন্দ ঘোষ যোগদানও করেননি। অরবিন্দ কলকাতায় এলেন ১৯০৬ সালে। নরমপন্থী, চরমপন্থীদের পাশাপাশি বিপ্লববাদীদের গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও শুরু হল এই সময় থেকেই। মনে রাখতে হবে, তিলক বা বিপিন পালের মতো নেতারা চরমপন্থী এবং বয়কট আন্দোলনে বিশ্বাসী হলেও অরবিন্দের মতো বিপ্লববাদ এবং গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বিশ্বাসী ছিলেন না। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, অরবিন্দ কলকাতায় আসার পর তিনটি রাজনৈতিক ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হতে থাকল। এরই মধ্যে ১৯০৬-এর কলকাতা কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ আরো চরম আকার ধারণ করল; পরের বছর, ১৯০৭-এ, সুরাট কংগ্রেসে তা মারামারি-হাতাহাতিতে গিয়ে পৌছল এবং কংগ্রেস ভেঙে টুকরো হল। এই দুটি কংগ্রেসে নিবেদিতা উপস্থিত থাকতে পারেনি। ১৯০৬ সালে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় নিবেদিতা গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। আর ১৯০৭-এ তিনি ভারতে

ছিলেন না। ব্রিটিশ পুলিশের দৌরাত্মে এই সময় তাঁকে কিছুদিন ইওরোপে চলে যেতে হয়েছিল।

কংগ্রেসের বিভাজন নিবেদিতার মোটেই ভালো লাগেনি। কংগ্রেস বিভক্ত হলে জাতীয় আন্দোলনে তার বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে—এরকম আশঙ্কা হয়তো নিবেদিতার ছিল। যে কারণেই ১৯০৮ সালে সুরাট কংগ্রেসের পর 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'We dislike the terms 'Moderate and Extremist'. To our thinking, there is but one party in Indian politics, and that is the nationalist party. Nor do we see, in the history of Surat Congress, any reason to change our opinion. The differences between the two resultant bodies are mere differences of method. And these are easily explained. All statesmen have to determine between rival parties and convictions as to which is, in their personal opinion, a survival from the past, and which a prophecy of the future. In the present case, it would be quite impossible, to our thinking, to be in any doubt on this point.

'We have always held that except on one or two points, the two sections of the nationalist party hold the same principles in common. They are not be judged by their worst adherents, but by the noblest. Violence and vilification are no more inherent in 'extremism' than timidity, flunkeyism and want of faith in the nation, in the principles of the 'moderates.'

আরো লিখলেন, 'Political struggle has never been all smooth-sailing in any country. Everywhere the political horizon has been occasionally overcast with storm-clouds. In India there was the danger of too easy and glib a political method rushing the people over quickly on self-satisfaction, and preventing their development of that intensity which only comes of the sense of struggle. That danger seems no longer to exist. We are now only on the threshold of the struggle, internal and external. Let us eliminate the unworthy and the merely personal elements from the struggle, and strive

manfully and devotedly for the Motherland, never forgetting that a want of uniformity is not want of unity.'

অরবিন্দ ঘোষ কলকাতায় আসার পর চরমপন্থীদের রাজনৈতিক শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি পেল। যদিও চরমপন্থী নেতারা অরবিন্দের সশস্ত্র বিপ্লববাদের সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু অরবিন্দ যে বিপ্লব পন্থার কথা ভেবেছিলেন তার একটি ধাপ ছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। তার সঙ্গে বয়কট আন্দোলনের সাদৃশ্য ছিল। কাজেই অরবিন্দ বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন। অরবিন্দের অনুগামী বিপ্লববাদীরাও বয়কট আন্দোলনকে সফল করতে সক্রিয় হলেন। ১৯০৬-এর কলকাতা কংগ্রেসে অরবিন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং চরমপন্থীদেরই সমর্থন জানিয়েছিলেন। কংগ্রেসের এই দলাদলি নিবেদিতাকে হতাশ করেছিল। কংগ্রেস যে আর কোনোভাবেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না—তা নিবেদিতা বুঝে যান তখনই।

তবে, কংগ্রেসে মডারেট-চরমপন্থী বিরোধ যতই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোক না কেন, ১৯০৭-এর শেষ অবধি অন্তত গোখলের সঙ্গে নিবেদিতার সুসম্পর্ক বজায় ছিল। গোখলের সঙ্গে নিবেদিতার এই অন্তরঙ্গতায় অরবিন্দ যে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিলেন, তা বোঝা যায় তাঁর স্মৃতিচারণে। সেখানে অরবিন্দ বলেছেন, 'নিবেদিতার একটা ব্যবহার আমার কাছে অবোধ্য ছিল— গোখলেকে তিনি খুব সমীহ করতেন। কোনো বিপ্লবীর পক্ষে গোখলেকে শ্রদ্ধা করা আমার ধারণার অতীত। গোখলে ছিল, যাকে বলে as tepid as warm water. একবার গোখলের জীবন সংশয়াবস্থায় নিবেদিতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কাছে ছুটে এসে বলেন, 'মি. ঘোষ, আপনার দলের ছেলে কি এই কাণ্ড করেছে?' আমি বললাম 'না।' তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে কোনো free lancer হবে'।'

যে ঘটনাটির কথা অরবিন্দ উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'মি. গোখলে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি চিঠি পাইলেন যে, তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। নিবেদিতা এই চিঠির কথা জানিয়া পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তিনি সন্ত্রাসবাদী যুবকদের একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'তুমি কি ইহা করিয়াছ? আমি সম্ভব মনে করি না। এখন যে সময়, তাতে নিজেদের মধ্যে এইরূপ খুনাখুনি করা উচিত হবে না।'

আগেই বলেছি, অরবিন্দ রাজনৈতিকভাবে সংকীর্ণমনা ছিলেন। নিবেদিতা তা ছিলেন না। অরবিন্দের বিপ্লব প্রচেষ্টার সহায়ক হয়েও নিবেদিতা রাজনৈতিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। যে কারণে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের কথা তিনি বলতেন এবং কংগ্রেসের বিভাজনও চাইতেন না। এই উদার মনোভাবের

কারণেই নরমপন্থী গোখলে বা রমেশচন্দ্র দত্তের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। কারণ, তিনি মনে করতেন, রাজনৈতিক পথ যা-ই হোক না কেন, গোখলে বা রমেশচন্দ্রের দেশভক্তিতে কোনো খাদ ছিল না। ১৯০৪ সালের ১৪ আগস্ট ডন সোসাইটিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেছিলেন, 'No matter what may be the particular line of action adopted by a person, we must honour him as a national hero, if only he shows his earnest devotion by real work, by actual sacrifice to the cause of the country. For this whole souled devotion to a national ideal may be equally found in every sphere of public activity in a Romesh Chander Dutt, or a G.K. Gokhale as in a Vidyasagar.'

নিবেদিতার সঙ্গে গোখলের সম্পর্ক ব্যক্তিগত পর্যায়ে কতখানি অন্তরঙ্গ ছিল, তার আঁচ পাওয়া যায় বেনারস কংগ্রেসের পর ১৯০৬ সালের ২৩ জানুয়ারি নিবেদিতার লেখা একটি চিঠিতে। ওই চিঠিতে নিবেদিতা গোখলেকে লিখেছেন, 'Will you please forgive me for my unintentional act of unkindness this afternoon? I know you have forgive me and are blaming yourself. But I want you not to do that, for you were not in the least to blame. It was all entirely my fault. Only it is really really true that I never dreamt of your taking my rash words so seriously and bestowing on them such a depth of meaning as you did.

'But you may take me as seriously as you like when I say that there is nothing I would not do— if I could, to make up for my error, and induce you to banish the memory. Please come again, and let me prove this!'

নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়ে বোঝা যায় কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গোখলের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ হয়েছিল। এবং তখন নিবেদিতা নিশ্চয়ই গোখলের সঙ্গে কটু ব্যবহার করেছিলেন। আর এই ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়েই নিবেদিতা এই চিঠিটি লেখেন গোখলেকে। বোঝাই যাচ্ছে, গোখলের সঙ্গে কোনোভাবে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যাক— তা নিবেদিতা চাননি। এমনকী, রাজনৈতিক মতের মিল না ঘটলেও, গোখলের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী ছিলেন নিবেদিতা। কলকাতা কংগ্রেস অবধি অন্তত গোখলে সম্পর্কে নিবেদিতার এই আগ্রহ অটুট ছিল। তখনও যে নিবেদিতা গোখলের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছিলেন

তার প্রমাণ ১৯০৭-এর ২৫ ফেব্রুয়ারির চিঠি। গোখলেকে এই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'May I, on your return, have couple of hours of your time here? I want to consult you seriously on a matter which is not of course my own, yet interests me much more, and makes me need your advice and help. Any day this week will do— but I shall have to ask you, when you come, for an interview alone. There is a train from Sealdah here at 2-3 p.m. local time, daily and another at 5-40 in the afternoon. We could easily put you up for the night, if you would stay. Or there is a train back to Calcutta at 10.15 railway time. This would be too late. There must be others from the Junction, and we can send you either there or to the tram. I am so very sorry to trouble you. But I am compelled to ask you to come.'

গোখলের সঙ্গে আলোচনা করতে কতটা ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন নিবেদিতা—চিঠিটি তাঁর প্রমাণ। তবে কী বিষয়ে গোখলের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন, তা এই চিঠিটি পড়ে জানা যায় না। শুধু এটুকু আঁচ করা যায় যে, কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য নিবেদিতা গোখলেকে আসতে বলেননি। নিবেদিতার সঙ্গে গোখলের যে শুধু রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হত, তা নয়। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার বিষয়টিও তাঁদের আলোচনায় অনেক সময়ই থাকত। গোখলে যেহেতু ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন, তাই গোখলের মাধ্যমে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় সরকারি সহায়তা আদায় করার চেষ্টা করতেন নিবেদিতা। এমনকী, এস. কে. র‍্যাটক্লিফ যখন 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন তখনও র‍্যাটক্লিফের জন্য একটি বিকল্প চাকরির সন্ধান করে দিতে গোখলের শরণাপন্ন হয়েছিলেন নিবেদিতা।

১৯০৭ সালে গোখলে ভাইসরয় কাউন্সিল থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তে সবিশেষ আপত্তি জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৭-এর ২৮ মার্চ নিবেদিতা গোখলেকে লিখেছেন, '...We cannot contemplate your leaving Calcutta without this. I do hope you will not succeed in giving up the Council. That seems to me to be your place—where you are invaluable. Besides, you are someday to be in India what Lamartine was in Paris, in the great crisis. I have always thought

this was your destiny. Still, that will come to you, whether you remain in the council or off. "Thy place in life is seeking after thee — therefore be thou at rest from seeking after it."

জগদীশচন্দ্রও যে গোখলের সঙ্গ কতটা কামনা করেন, এই পত্রে সেকথাও জানিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Dr. Bose particularly wishes this and hopes to see you to-night and urge it.'

গোখলের কাছ থেকে যেসব সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে, ভাইসরয় কাউন্সিল থেকে তিনি পদত্যাগ করলে তা আর পাওয়া যাবে না— এমনটিই হয়তো ভেবেছিলেন নিবেদিতা। যে কারণে গোখলের পদত্যাগ করার সিদ্ধান্তের এত বিরোধিতা করেছিলেন তিনি।

নিবেদিতার সঙ্গে গোখলের যোগাযোগের শেষ তথ্য পাওয়া যায় ১৯০৭ সাল পর্যন্তই। তারপর থেকে নিবেদিতার সঙ্গে গোখলের সরাসরি যোগাযোগের আর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৯০৬ সালে অরবিন্দ ঘোষ কলকাতায় এসে পৌঁছবার পর থেকেই বিপ্লববাদ ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এই সময় থেকেই ব্রিটিশ প্রশাসনের ওপর সশস্ত্র হামলা, তার পরিণতিতে নির্বাসন, কারাদণ্ড, প্রাণদণ্ড এসব ঘটনা ঘটতে শুরু করে। একথাও অস্বীকার করার জো নেই যে, এইসব বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিবেদিতার সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। এই সময়েই ব্রিটিশ পুলিশের তীক্ষ্ণ নজর পড়ে নিবেদিতার ওপর। তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে এরকম একটি সম্ভাবনারও সৃষ্টি হয়। নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ জনেরা এ বিষয়ে তাঁকে সতর্ক করে দেন। ফলে, ভারতে থাকা নিবেদিতার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ বিষয়টি পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এ প্রসঙ্গে শুধু গোখলে-নিবেদিতা সম্পর্কের কথাটি বলে নিই। ১৯০৭ সালের ১ আগস্ট নিবেদিতা গোখলেকে যে চিঠিটি লেখেন, সেটি পড়ে মনে হয়, সে সময়ে গোখলেও ব্রিটিশ পুলিশের নজরে পড়েছিলেন। আর পড়েছিলেন সম্ভবত নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে। নয়তো মডারেট গোখলের পুলিশের কুনজরে পড়ার কোনো কারণ ছিল না। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'They say that even you are scarcely safe. I think I should like to see you on trial, however!'

এরপরে গোখলেকে লেখা নিবেদিতার আর কোনো চিঠিপত্র বা যোগাযোগের প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯০৭ সালের পর নিবেদিতার সঙ্গে গোখলের এই সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দুটি কারণ আছে বলে মনে হয়। প্রথমত, নিবেদিতা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পুলিশের নজরে পড়ার পর গোখলের পক্ষে

রাজনৈতিকভাবে আর সম্ভব ছিল না নিবেদিতার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা। তাছাড়া, নিবেদিতা তখন বিলেতেও চলে গিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। দ্বিতীয় আর একটি কারণ হল, ১৯০৭-এর শেষে সুরাট কংগ্রেসে গোখলের আচরণ। গোখলের এই আচরণ নিবেদিতাকে গোখলে সম্পর্কে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত করে। নিবেদিতার পরবর্তীকালের চিঠিপত্রগুলিই তার প্রমাণ। গোখলের ওই আচরণের কারণেই নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন— এমনও কিন্তু হতে পারে।

সুরাট কংগ্রেসে গোখলের ভূমিকাটি বুঝতে হলে একটু পিছিয়ে ১৯০৬-এর কলকাতা কংগ্রেসের সময় থেকে শুরু করতে হবে।

তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ চরমপন্থীদের মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বরাজ। বয়কট বা স্বদেশীতেই তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। বা, স্বদেশী-বয়কট এগুলি তাঁদের মূল লক্ষ্যও ছিল না। কোনোরকম ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন তাঁরা মেনে নিতে চাননি। কলকাতা কংগ্রেসেই এ নিয়ে নরমপন্থী-চরমপন্থীদের ভিতর তুমুল বিতর্ক বেধেছিল। পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জড়াতে নরমপন্থীরা রাজি ছিলেন না। এরই ভিতর ১৯০৬-এর মাঝামাঝি তিলক কলকাতায় এলে বাংলার চরমপন্থীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আরো দৃঢ় হয়। কলকাতা কংগ্রেসে তিলককে সভাপতি করার প্রস্তাবও দেন চরমপন্থীরা। কিন্তু তিলককে সভাপতি করার প্রশ্নে গোখলে এবং অন্যান্য নরমপন্থী নেতাদের আপত্তি ছিল। কংগ্রেসের বোম্বাই গোষ্ঠী হুমকি দেয়, তিলককে সভাপতি করা হলে তাঁরা কংগ্রেস অধিবেশন বর্জন করবেন। শেষপর্যন্ত বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজিকে সভাপতি করে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন বসেছিল দ্বারভাঙার মহারাজার বাড়িতে। দ্বারভাঙার মহারাজ আবার অধিবেশনের প্রতিদিনের ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানাতেন বড়লাটের সচিব ডানলপ স্মিথকে। এ থেকেই বোঝা যায়, নরমপন্থীরা ব্রিটিশ সরকারকে খুব বেশি অস্বস্তিতে ফেলতে মোটেই রাজি ছিলেন না। বরং, আবেদন-নিবেদন এবং কিছু প্রস্তাব পাশের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ বিরোধিতা সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন তাঁরা।

গোখলে যদিও তার আগে বেনারস কংগ্রেসে চরমপন্থীদের চাপের মুখে পড়ে বাংলার বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের অভিমুখ বদল করে চরমপন্থীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে রাজি ছিলেন না। কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হলে চরমপন্থীরাই হয়তো জিততেন। কিন্তু নরমপন্থী নেতৃত্বের কথায় দাদাভাই নৌরজি ভোট করতে দেননি। ভোট না হতে দেওয়ায় চরমপন্থীরা সভা ত্যাগ করেন। পূর্ণ অধিবেশনে

অবশ্য দাদাভাই একটি চাল চাললেন। তিনি তাঁর ভাষণে 'স্বরাজ' শব্দটিকে এমনভাবে ব্যবহার করলেন, যার ব্যাখ্যা চরমপন্থীরা তাঁদের মতো করতে পারেন, আবার নরমপন্থীরাও তার পছন্দমতো অর্থ করতে পারেন। দাদাভাই এটা করেছিলেন, চরমপন্থীদের সাময়িকভাবে শান্ত করার জন্য। দাদাভাই বলেছিলেন, 'Self Government or Swaraj like that of the United Kingdom or the Colonies.'

আর বয়কট প্রসঙ্গে চরমপন্থীদের বক্তব্য ছিল— সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন বয়কট। নরমপন্থীরা কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্রিটিশ পণ্যের বয়কটের ব্যাপারে সায় দিয়েছিলেন। মদনমোহন মালব্য এবং তাঁর সমর্থক নরমপন্থী নেতারা বাংলার বাইরে বয়কট আন্দোলন চাননি। কিন্তু চরমপন্থীরা চাইছেন সারাদেশে বয়কট আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করুক কংগ্রেস। নরমপন্থীদের প্রতি এতটাই তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল চরমপন্থীদের মনে যে, তাঁদের হাতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং ফিরোজ শাহ মেটা লাঞ্ছিত হন।

কলকাতা কংগ্রেসের সময়েই তিলক ও অন্যান্য চরমপন্থী নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন, কংগ্রেসের ভিতরে থেকে তাঁদের মতকে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং স্বদেশী ও বয়কটের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। তিলক নতুন সংগঠন গড়ে নাম দিলেন 'নিউ পার্টি'। পাঞ্জাবের চরমপন্থী নেতা অজিত সিং গঠন করলেন 'ভারতমাতা সভা'। তেমনি বাংলাতেও স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে জন্ম হল বেশ কয়েকটি সংগঠনের। এর অন্যতম 'অনুশীলন সমিতি'। বাংলার বিপ্লববাদে 'অনুশীলন সমিতি' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া বরিশালের 'স্বদেশ বন্দনা', ফরিদপুরের 'ব্রতী', ময়মনসিংহের 'সুহৃদ' এবং 'সাধনা' নামে সংগঠনগুলি গড়ে তুললেন চরমপন্থীরা।

মনে রাখতে হবে, এরই ভিতর বাংলায় কিন্তু বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছে। ১৯০৭ সালে ঢাকার জেলাশাসক অ্যালেনকে হত্যার চেষ্টা, দু-দুবার ছোটলাট ফ্রেজারের ওপর হামলার চেষ্টা, বিভিন্ন 'স্বদেশী ডাকাতির' ঘটনা ঘটে। ১৯০৭ সালেই শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার সহায়তায় হেমচন্দ্র কানুনগো প্যারিসে যান বোমা তৈরির কৌশল শিখতে। ফিরে আসেন ১৯০৮ সালে। পাশাপাশি মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে বারীন্দ্র ঘোষ অস্ত্র সংগ্রহ এবং তরুণদের অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিতে শুরু করেন। অজিত সিংয়ের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, ওই সময়ে গুরুদাসপুর, আম্বালা, ফিরোজপুরে সৈন্যদের উত্তেজিত করা হয়। রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে

ইংরেজদের ওপর হামলা হয়। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, 'বাংলায় এসব কাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন অরবিন্দ, কিন্তু তাঁর কোনও ব্যাপক পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হয় না। নিজে মিস্টিক স্বভাবের ছিলেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন মা (দেশমাতা ও কালী অবশ্যই সমার্থক) প্রয়োজনে সব জুগিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি শুধুই গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না— নরমপন্থীদের হাত থেকে কংগ্রেসের কর্তৃত্বও কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। প্রকাশ্যে কংগ্রেসের মাধ্যমে এবং গোপনে বিপ্লবীদের মাধ্যমে তিনি যুগপৎ আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। প্রথমে মেদিনীপুর প্রাদেশিক কনফারেন্সে সুরেন্দ্রনাথকে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশের দায়ে অভিযুক্ত করে অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। তারপর সদ্যমুক্ত লাজপৎ রায়কে জানালেন পরবর্তী কংগ্রেসের সভাপতি হবার আহ্বান। গোখলে ও সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে লাজপৎ পিছিয়ে যেতে তিনি তিলকের নাম তুললেন।'

সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থীরা কোনোভাবে প্রাধান্য পেয়ে যান, এটা নরমপন্থীদের কাছে কোনোমতেই কাম্য ছিল না। চরমপন্থীদের ঠেকাতে গোখলে এবং ফিরোজ শাহ মেটা হাত মেলালেন। দুজনে ঠিক করলেন নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হবে এবং রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করা হবে। এতে নরমপন্থীদের গরিষ্ঠতা বজায় থাকবে— এমনটিই ভেবেছিলেন মেটা এবং গোখলে। আর, একবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলে কলকাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে গুরুত্বহীন করে তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমতো প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু নাগপুরে অধিবেশন ডাকায় এই প্রচেষ্টাটি শেষপর্যন্ত ভেস্তে যায়। তখন অধিবেশনের 'অভ্যর্থনা সমিতি'-ই সভাপতি নির্বাচন করত। 'অভ্যর্থনা সমিতি' সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে চরমপন্থীদের হাতে চলে গিয়েছিল। 'অভ্যর্থনা সমিতি'র কার্যনিবাহী কমিটিতে চরমপন্থীরা নিজেদের লোক ঢুকিয়ে তিলকের নাম সভাপতি হিসাবে প্রস্তাব করলেন। মেটা এবং গোখলে এতে প্রমাদ গুণলেন। দুজনেই নাগপুর থেকে অন্যত্র অধিবেশন সরাতে চাইলেন। বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিব ডানলপ স্মিথও তাঁদের সেই পরামর্শ দেন। কারণ, ব্রিটিশ প্রশাসনও কখনো চায়নি কংগ্রেসের রাশ চরমপন্থীদের হাতে চলে যাক। ১৯০৭ সালের ১০ নভেম্বর স্থায়ী কমিটির সভায় সুরাটে অধিবেশন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিলক অবশ্য সুরাটে অধিবেশন করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ভোটদানে বিরত থাকেন।

১৯০৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর সুরাট কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। মনে রাখতে হবে, সুরাট কংগ্রেসের সময় নিবেদিতা লন্ডনে, বিপিনচন্দ্র পাল বকসার জেলে বন্দি। কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হতে অম্বালাল দেশাই রাসবিহারী ঘোষের নাম সভাপতি

পদে প্রস্তাব করেন। আর গোলমাল তখন থেকেই শুরু হয়। লাজপত রাই একটি মধ্যস্থতার চেষ্টা করলে তিলক বলেন, অধিবেশনে যেসব প্রস্তাব আসবে তা যদি বিষয় নির্বাচনী কমিটির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্ব মেনে নেবেন। কিন্তু তিলকের অনুগামীরা নমনীয় হতে রাজি ছিলেন না। ২৭ ডিসেম্বর তিলক সভাপতি অনুমোদনের একটি সংশোধনী আনতে চাইলেন। কিন্তু তাঁকে বলতে দেওয়া হল না। ফলে উত্তেজনা আরো ছড়িয়ে পড়ল। এরই মধ্যে নরমপন্থী প্রতিনিধিরা অরবিন্দ ঘোষকে কটূক্তি করায় বাংলার চরমপন্থীরা খেপে উঠেছিল। রাসবিহারী ঘোষ তখন তাঁর সভাপতির ভাষণ পাঠ করছিলেন এবং তিলক উঠে দাঁড়িয়ে আপত্তি জানাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ একটি 'মারাঠি জুতো' এসে পড়ল মঞ্চের ওপরে। ফিরোজ শাহ মেটা এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির গায়ে লাগল সেই জুতো। মুহূর্তে অধিবেশন স্থল পরিণত হল রণাঙ্গনে। লাঠালাঠি, মারধর, মাথা ফাটার ঘটনা ঘটল। অবস্থা সামাল দিতে পুলিশ এল। ব্রিটিশ সাংবাদিক নেভিনসন তাঁর 'New Spirit in India' গ্রন্থে লিখেছেন, 'Suddenly something flew through the air—a shoe— Maratha shoe—reddish leather, pointed toe, sole studded with lead. It struck Surendranath Banerjee on the check; if cannoned off upon Sir Pheroze Shah Mehta...I cought glimpses of the Indian National Congress disolving in chaos...like Goethe at the Battle of Valmy, I could have said, 'Today marks the beginning of a new era, and you can say that you were present at it.'

সুরাটের কংগ্রেস অধিবেশন এভাবে পণ্ড করার পুরো কৃতিত্বটাই অরবিন্দ ঘোষের। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে পরবর্তী সময়ে অরবিন্দ বলেছিলেন, 'আমি তিলকের সঙ্গে পরামর্শ না করেই হুকুম দিয়েছিলাম কংগ্রেস অধিবেশন ভেঙে দিতে।' আর বারীন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন, 'সবারই কাঁধে দক্ষযজ্ঞনাশী পিনাকীর এক একটি দানা সওয়ার হইয়াছে, সবাই পুরাতনের কালাপাহাড়। নূতনের নেশাখোর নবাস্বাদিত শক্তিসুরার মাতাল।' এরপর অন্তত সুরাট অধিবেশন পণ্ড করার জন্য তিলককে দায়ী করা যায় না।

সুরাট কংগ্রেস এভাবে পণ্ড হয়ে যাওয়ার পর গোখলের রাজনৈতিক মর্যাদা কোথায় দাঁড়াল? চরমপন্থীদের রুখতে গোখলে যেভাবে ফিরোজ শাহ মেটা গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গে যা যা কাজ করেছিলেন, তাকে এককথায় গোখলের আত্মসমর্পণই বলা চলে। ব্রিটিশ প্রশাসনের ধারণা ছিল, গোখলে

চরমপন্থীদের আয়ত্তে রাখতে পারবেন। এরকম ধারণা থেকেই গোখলেকে তাঁরা পছন্দও করতেন। কিন্তু যখনই ব্রিটিশ শাসকরা বুঝতে পারেন গোখলে চরমপন্থীদের মোকাবিলা করতে পারবেন না, তখনই গোখলের প্রতি তাঁরা বিরূপ হতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ১৯০৭ সালে লর্ড মিন্টোর একটি নোট সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিন্টো লিখেছেন, 'As to Gokhale, if he chooses to play with fire he must take the consequences...I am thoroughly disappointed in Gokhale. I had liked what I had seen of him and believed he was honest at heart, but the part he has played of late has disgusted me. As an honest moderate he has lost a great opportunity of discountenancing rank sedition.'

সুরাট কংগ্রেসের পর রাজনৈতিকভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে গোখলের গুরুত্ব আরো কমে যায়। সুরাট কংগ্রেসের এই ঘটনাবলী এবং গোখলের ভূমিকার কথা নিবেদিতা বিলেতে বসে শুনতে পাননি একথা ভাবা ভুল। প্রথমত ব্রিটিশ সাংবাদিক নেভিনসন নিবেদিতাকে সুরাট কংগ্রেসের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়েছিলেন। তদুপরি, বিলেতে থাকলেও, এখানকার রাজনৈতিক মহল, বিশেষত চরমপন্থী গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে নিবেদিতার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তাঁরাও নিবেদিতাকে এসব ঘটনা জানিয়েছিলেন, এটা মনে করতে কোনো অসুবিধা হয় না। এবং এরপর থেকেই গোখলের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বরং অন্যদের লেখা কয়েকটি চিঠিতে গোখলে সম্পর্কে তাঁর তিক্ত মনোভাবই ধরা পড়েছে এরপর। ১৯০৯-এর অক্টোবর এস কে র‍্যাটক্লিফকে তিনি লিখছেন, 'However he has gone so very wrong of late— that a step more matters little. His prime error in my opinion has lain in barricading the Congress and giving himself to the Parsi.'

গোখলের প্রতি তাঁর যে আর কোনো সমর্থনই নেই, তা জানিয়ে ১৯০৯-এর ৩ নভেম্বর র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Of course you know the foolishness of Mr. Gokhale's. 2 now famous speeches, which have brought him great unpopularity, and for which no one, however great the personal affection, seems to be able to say one word.'

ব্যক্তিগত স্নেহ-সৌহার্দ্য থাকলেও গোখলে সম্পর্কে একটিও সমর্থনসূচক শব্দ যে তিনি আর উচ্চারণ করতে চান না, তা নিবেদিতার চিঠিতে পরিষ্কার। ১৯১০-এর ১০ ফেব্রুয়ারি র‍্যাটক্লিফকে তিনি আবার লিখেছেন, 'A curse seems to have

fallen on Katie's friend, (Gokhale) and he does nothing but make blunders!'

১৯১০ সালের ২০ জানুয়ারির চিঠিতে নিবেদিতা গোখলের জনপ্রিয়তা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন। র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন, 'Poor Mr. G [Gokhale] is now at the height of unpopularity. Doubtless, he is popular with the Govt. as he is unpopular with the people...'

গোখলের প্রতি শেষপর্যন্ত নিবেদিতার এই ক্ষোভ এবং তিক্ততার কারণ কিন্তু সহজেই আঁচ করা যায়। নিবেদিতা রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে চরমপন্থী এবং বিপ্লববাদীদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ফিরোজ শাহ মেটাদের কাছে গোখলের আত্মসমর্পণ তিনি কখনোই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। ব্যক্তি-গোখলের প্রতি ভালোবাসা থাকলেও তাঁর মনে রাজনীতিবিদ-গোখলের প্রতি বিরূপ ধারণাই জন্মেছিল। এই বিরূপ ধারণা থেকেই গোখলের সঙ্গে সম্পর্কটি তিনি ছিন্ন করেছিলেন— এ অনুমান করাই যায়।

তবে, গোখলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চরমপন্থীদের দমন করতে চেয়েছেন—এমন অভিযোগ অবশ্য নিবেদিতা কখনোই মেনে নেননি। বিপিনচন্দ্র পাল ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত তাঁর 'স্বরাজ' পত্রিকায় ১৯০৯ সালে অভিযোগ করেছিলেন, গোখলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিলকের মতো বিরোধী রাজনীতিকদের জেলে পাঠিয়েছেন। নিবেদিতা কিন্তু এই কুৎসার প্রতিবাদ করেছিলেন। ওই বছরই 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকায় এর বিরোধিতা এবং বিপিনচন্দ্রের সমালোচনা করে নিবেদিতা একটি লেখা লেখেন। নিবেদিতা বলেছিলেন, 'গোখলের মতো একজন মানুষ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দেবার জন্য ভারত সচিবের ওপর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করেছেন, এমন ইঙ্গিত ঘৃণ্য। কোনো স্বদেশবাসীর ভিতর সাহস ও মর্যাদাবোধ দেখলে তাঁকে অস্বীকার করার মতো অধঃপতন আমাদের হয়নি। গোখলের সম্পর্কে যে অভিযোগ আনা হয়েছে--তা নৈতিকভাবে কতটা ঘৃণ্য কাজ—তা 'স্বরাজ' পত্রিকার লেখক বুঝতে পারেননি।'

আর এখানেই, যাবতীয় রাজনৈতিক মতবিরোধের উর্ধ্বে উঠে নিবেদিতা ও গোখলের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অমলিন দিকটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নিবেদিতার সৌজন্যবোধে প্রসারিত হৃদয়খানিও।

ছয়

বাংলার রাজনীতিতে ১৯০৬ সালে বরিশাল জেলার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলন দমন করতে বরিশাল জেলাতেই সর্বাধিক দমন পীড়ন চালিয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। এর আগেই স্বদেশী আন্দোলন দমন করতে তৎকালীন বাংলার অফিসিয়েটিং চিফ সেক্রেটারি আর ডাবলিউ কার্লাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলার জারি করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রসমাজের ভিতর উন্মাদনা সৃষ্টি হওয়ায় এই কার্লাইল সার্কুলার জারি করে ছাত্রদের দমন করার চেষ্টা হয়েছিল। কার্লাইল সার্কুলারের অনুরূপ একটি সার্কুলার জারি করলেন পূর্ববঙ্গের চিফ সেক্রেটারি পি. সি. লায়ন। নানাভাবে ছাত্র এবং শিক্ষকদের নিগ্রহ করা শুরু হল। এরই ভিতর আবার বরিশালে অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠল। অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে এই বরিশাল জেলাতেই বয়কট আন্দোলন সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেছিল। ফলে, সেখানে অত্যাচারও উঠেছিল চরমে। বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন দমন করতে পূর্ববঙ্গের লেফটেনান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার আন্দোলনকারীদের ওপর গুর্খা সৈন্য লেলিয়ে দিলেন। ফুলার ছিলেন অতীব অত্যাচারী, তদুপরি সাম্প্রদায়িকতায় মদতদাতা একজন শাসক। বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলনেও ফুলারের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ বাহিনী গিয়ে হামলা চালাল।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'নিবেদিতা এই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন না। অরবিন্দ ছিলেন। তথাপি পরোক্ষভাবে এই কনফারেন্সের প্রভাব নিবেদিতা ও অরবিন্দের জীবনে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে।

'জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ব্যারিষ্টার এ. রসুল এই সভার সভাপতি। বিলাতে থাকাকালীন তিনি অরবিন্দ ও মিঃ সি. আর. দাশের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে

আবদ্ধ হন। এই কনফারেন্সের বিশেষত্ব হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বও নয়; চরমপন্থী ও নরমপন্থী দ্বন্দ্বও নয়। ইহা ফুলারী দমননীতির চরম প্রকাশ।

'কারলাইল সাহেবের সার্কুলার অনুযায়ী "বন্দে মাতরম" ধ্বনি কেহ করিতে পারিবে না, মুখে উচ্চারণ মাত্রও নিষিদ্ধ। কিন্তু সভাপতি লইয়া শোভাযাত্রার সময় "বন্দে মাতরম" ধ্বনি শোনা গেল। ফলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মিঃ এমার্সন সুরেন্দ্র ব্যানার্জীকে গ্রেপ্তার করিয়া চারশ' টাকা জরিমানা করিলেন। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র বালক চিত্তরঞ্জনকে পুলিশ লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত দেহে পুকুরের জলে ফেলিয়া দিল। সভায় ব্যান্ডেজ বাঁধা চিত্তরঞ্জনকে সম্মুখে রাখিয়া মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা যে আবেগময়ী বক্তৃতা দিলেন, তাহার ফলে সভার মধ্যেও একটা হিংস্র উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পাইল। পুলিশ আসিয়া সভা ভাঙিয়া দিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য শাখার জন্য যে অভিভাষণ লিখিয়া নিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পকেটে লইয়াই কলিকাতায় ফিরিলেন। সভার সকলে উঠিয়া আসিলেও কৃষ্ণকুমার মিত্র একা বসিয়া রহিলেন। ভূপেন বসু তাঁহাকে অবশেষে হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিলেন।

'বিপ্লবী অরবিন্দ নীরবে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে এ দৃশ্য চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখ নীরব ছিল, কিন্তু মন নীরব ছিল না।

'এই সভায় নরমপন্থী ও চরমপন্থী—দুই দলই আসিয়াছিলেন। নরমপন্থী দলে সুরেন্দ্র ব্যানার্জী, ভূপেন বসু, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রভৃতি আর চরমপন্থী দলে বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ছিলেন। অরবিন্দ চরমপন্থী দলভুক্ত ছিলেন।' বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলনে এই হামলার ঘটনাটি ঘটে ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল। বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলনে এই পুলিশি হামলার ঘটনার কিছুদিন পূর্বেই নিবেদিতা এবং অরবিন্দের যৌথ উদ্যোগে 'যুগান্তর' পত্রিকার পত্তন হয়েছে। কলকাতায় এই 'যুগান্তর' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বিপ্লবীদের একটি চক্রও গড়ে উঠেছে। বরিশাল সম্মেলনে পুলিশের এই হামলার এবং পূর্ববঙ্গে ফুলারের পুলিশি দমন-পীড়ন বিপ্লবী কার্যকলাপকে আরো ত্বরান্বিত করে তুলল। এ প্রসঙ্গে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত এবং হেমচন্দ্র কানুনগোর বক্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উল্লাসকর দত্ত বলেছিলেন, '১৯০৬ সালে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতিতে ইংরাজ রাজকর্মচারী ও পুলিশের অকথ্য অত্যাচার তাঁহার মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া দেয়। সেই হইতে তিনি বিপ্লবী হইবার সাধনা আরম্ভ করেন।' (ভারতে জাতীয় আন্দোলন—প্রভাতকুমার মুখার্জি) আর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' গ্রন্থে হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন, '১৯০৬ এপ্রিল পুণের বিশাল

বরিশালের ঠিক পরেই কিন্তু বিপ্লববাদের মন্ত্রগুলো লোকের কানে সহজে ঢুকত। এমনকি হোমরা মডারেটও বিপ্লবের শোয়ালে সই দিতেন।'

পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে বরিশালে এই পুলিশি অত্যাচারের জন্য লেফটেনান্ট গভর্নর ফুলার হয়ে উঠলেন বিপ্লবীদের লক্ষ্যবস্তু। বরিশাল সম্মেলনের একমাস পরেই ফুলার-বধের পরিকল্পনা করেন বিপ্লবীরা। ফুলার-বধের মূল পরিকল্পনাটি করেন অরবিন্দ। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, '...নিবেদিতার সহিত পরামর্শ করিয়া অরবিন্দ ফুলার বধের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন।' অর্থাৎ ফুলার-বধের পরিকল্পনায় যে নিবেদিতাও জড়িত ছিলেন গিরিজাশঙ্কর সেটিই বলেছেন। গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, 'বরিশাল কনফারেন্সের মাত্র একমাস পরেই নিবেদিতার সহিত পরামর্শ করিয়া অরবিন্দ ফুলার বধের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। বারীন্দ্র ফুলারের গ্রীষ্মাবাস শিলং যাত্রা করিলেন। তারপরে হেমচন্দ্র কানুনগোকে হত্যাকারী মনোনীত করিয়া শিলং পাঠানো হইল।' হেমচন্দ্র কানুনগো 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'মেদিনীপুরের একজন (হেমচন্দ্র নিজেই) ফুলার বধের ভার পেল। সেইদিন সন্ধ্যার ট্রেনে সে গোয়ালন্দ যাত্রা করল। সেটা বোধহয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহ। সন্ধ্যেবেলা তাকে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেলেন পূর্ব্বোলিখিত শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।'

গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, 'বরিশালের দমননীতির প্রতিক্রিয়া খুব দ্রুত কাজ আরম্ভ করিল। ইহা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হইবে কি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে হইবে; সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ আছে কেননা অরবিন্দ তাঁহার শ্বশুর ভূপাল বসুকে ১৯০৬, ৮ই জুন শিলং-এ চিঠি লিখিতেছেন যে, 'বারীন অসুস্থ, আমি তাকে শিলং চেঞ্জে (change) যাইতে বলিতেছি। যদি সে শিলং যায়, তবে আমি জানি আপনি বারীনের ভার নিবেন এবং তাকে যত্ন করিবেন।' সুতরাং, হেমচন্দ্রের যে মাসের তারিখ ঠিক নয়। অরবিন্দের চিঠি প্রমাণ করে যে, ইহা ৮ই জুনের ঘটনা।'

কিন্তু, অরবিন্দ ফুলার-বধের পরিকল্পনা করলেও শেষপর্যন্ত তা সফল হল না। শিলং, গৌহাটি, বরিশাল, রংপুর সর্বত্র বিপ্লবীরা ফুলারকে অনুসরণ করলেও তাঁকে হত্যা করতে পারলেন না। হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন, 'সামনে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাঘ দূরে চলে গেলে, নূতন কাঁচা শিকারীদের যে সোয়াস্তি মিশ্রিত আফশোষ হয়, ফুলার শিকারীদেরও প্রায় তাই হয়েছিল।'

গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, 'হেমচন্দ্র নিজের ব্যর্থ হওয়ার কারণ খুব ঠিকভাবেই লিখিয়াছেন। তাঁহারা অরবিন্দের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সব কথা বিস্তারিত বলিলেন। তিনি নীরবে সমস্ত কথা শুনিয়া শুধু হাত দিয়া ইসারা করিলেন, 'তোমরা বাড়ী চলিয়া

যাও।' এরূপ নির্লিপ্ত ও নীরব বিপ্লবী পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।' এই প্রসঙ্গেই গিরিজাশঙ্কর দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। প্রথমত, ফুলার হত্যার এই পরিকল্পনা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আগে থেকেই জানতেন কিনা এবং দ্বিতীয়ত, নিবেদিতা ফুলার হত্যার পরিকল্পনার সঙ্গে কতটা জড়িত ছিলেন? গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, 'সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃঃ ২৩১-২৩৪) এমনভাবে লিখিয়াছেন যে, তিনি যেন আগে কিছুই জানিতেন না। যখন প্রথম শুনিলেন, তখন কিঞ্চিৎ হতভম্ব হইয়া গেলেন। ("I was little staggered.") কিন্তু আমরা অন্য প্রমাণে দেখিতেছি যে, তিনি আগে হইতেই সব জানিতেন। কেননা, ভূপেন্দ্রনাথ স্পষ্ট লিখিয়াছেন—"ফুলারের উদ্দেশ্যে বোমা ফেলা-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া বারীন্দ্র ও আমি যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিমুলতলার গ্রীষ্মাবাসে গিয়াছিলাম, তখন তিনি এই 'সোনার বাঙ্গলা' pamphlet-এর কথা বলেন।" (দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম, পৃঃ ১৪৬)

'ভূপেন দত্তের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। অতএব সুরেন্দ্রনাথ এই ষড়যন্ত্র আগে হইতেই জানিতেন।'

গিরিজাশঙ্করের এই মতামতের সঙ্গে সহমত হয়ে বলাই যায়, সুরেন্দ্রনাথ ফুলার-বধের এই পরিকল্পনার কথা জেনেছিলেন। কিন্তু পাশাপাশি এটাও সহজেই অনুমেয়, ফুলার-বধের এই আগাম পরিকল্পনার কথা জেনে থাকলেও সুরেন্দ্রনাথ তাতে সম্মতি দেননি। কারণ, রাজনীতিগতভাবে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন মডারেট। মানসিকভাবেই তিনি অরবিন্দের বিপ্লবী কার্যকলাপকে সমর্থন করার জায়গায় কোনোমতেই ছিলেন না। আর, নিজের আত্মজীবনীতে সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতার ভান হয়তো করেছেন। কারণ, এই পরিকল্পনার কথা তিনি আগাম জেনেছিলেন, এটা প্রকাশ্য হোক— এ নিশ্চয়ই মডারেট সুরেন্দ্রনাথ চাননি। তাছাড়া, ফুলার-বধের পরিকল্পনা নিয়ে বিপ্লবীরা যে তাঁর সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন— ব্রিটিশ প্রশাসন এটা কোনোভাবে জানুক, তা-ও নিশ্চয়ই সুরেন্দ্রনাথ চাননি।

এবার নিবেদিতার প্রসঙ্গ। গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, 'যে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আগে হইতে জানিতেন, তাহা সম্পর্কে কি ভগিনী নিবেদিতা অবিদিত ছিলেন? বারীন্দ্র ও ভূপেন্দ্র দত্ত বোমা দেখাইতে শিমুলতলায় সুরেন্দ্রনাথের নিকট ছুটিয়া গিয়াছিলেন, আর তাহারা কি কলিকাতায় ভগিনী নিবেদিতার নিকট ইহা গোপন রাখিয়াছিলেন? নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে বসিয়াই না বারীন্দ্র ও ভূপেন দত্ত যুগান্তরের "প্রথম সূচনা" নিবেদিতার সহিত পরামর্শ করিয়া খসড়া করেন। সেই যুগান্তরের আড্ডার প্রথম বৈপ্লবিক কর্ম নিবেদিতার অজ্ঞাতসারে তো হইতেই পারে না। বরং মনে করি, বিশ্বাস করি,

যে অরবিন্দ ও নিবেদিতার একত্রে মিলিত পরামর্শ অনুসারেই এই ভয়ঙ্কর বৈপ্লবিক কর্মের সূত্রপাত হইয়াছিল।'

গিরিজাশঙ্করের এই যুক্তি একেবারেই অকাট্য। মডারেট সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিপ্লবীরা পরামর্শ করেছেন, অথচ অরবিন্দর বিপ্লবী প্রচেষ্টার অন্যতম সহযোগী নিবেদিতা অন্ধকারে থাকবেন—তা অবিশ্বাস্য এবং অবাস্তব। বিশেষ করে, ফুলারবধের পরিকল্পনা যখন নেওয়া হচ্ছে, সেইসময় নিবেদিতা বিপ্লবীদের যুগান্তর গোষ্ঠীর অন্যতম প্রেরণাদাত্রী। আরো মনে রাখতে হবে, অরবিন্দের গোপন বিপ্লব প্রচেষ্টার অনেক পরিকল্পনাই নিবেদিতার পরামর্শমতো করা হত। কাজেই, ফুলার বধের পরিকল্পনাটি যে নিবেদিতার জ্ঞাতসারেই হয়েছিল—এ সহজেই অনুমেয়। নিবেদিতার জীবনীকাররা অবশ্য এ বিষয়টি উল্লেখ করেননি। হয়তো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতাই এক্ষেত্রে তাঁদের এ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে নীরব থাকতে বাধ্য করেছে। কিন্তু ফুলার হত্যা পরিকল্পনায় নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে উদাসীন থাকলে বাংলায় বিপ্লববাদে নিবেদিতার ভূমিকাটি নিয়ে আলোচনাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

১৯০৬ সালের মাঝামাঝি পূর্ববঙ্গে প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের ভিতর ত্রাণকার্য চালানোর জন্য অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে ১৬০টি জায়গায় ত্রাণকেন্দ্র খোলা হল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য ত্রাণ এসে পৌঁছতে শুরু করল। কলকাতা থেকে স্কুলছাত্ররা তাদের একদিনের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে তা ত্রাণ তহবিলে দান করল। এই ত্রাণকার্য পুরোটাই চলেছিল অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে, বেসরকারিভাবে। সরকার একে কোনো স্বীকৃতি দিল না, সাহায্যও করল না। বরং ফুলার এই প্রবল দুর্ভিক্ষের ভিতরও নোংরা রাজনীতি করলেন। বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন দমন করতে না পেরে ফুলার এবার এক ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করলেন। বরিশালে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি পরিদর্শন করে গিয়েও ফুলার সরকারিভাবে একে দুর্ভিক্ষ বলতে রাজি হলেন না। বরং, সরকারি ত্রাণ সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হল। ফুলারের এই ঘৃণ্য কাজের পরই অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে বেসরকারি উদ্যোগে জোরকদমে ত্রাণকার্য শুরু হয়। কিন্তু ফুলার এর পরে বেশিদিন সরকারি পদে থাকতে পারেননি। ফুলারকে পূর্ববঙ্গের লেফটেনান্ট গভর্নর পদে নিয়োগ করেছিলেন কার্জন। কার্জনের মদতেই ফুলার পূর্ববঙ্গে দমননীতি চালু করেছিলেন। কিন্তু কার্জনের বিদায়ের পর লর্ড মিন্টো বুঝেছিলেন, এই দমননীতি অব্যাহত থাকলে ব্রিটিশ প্রশাসন সম্পর্কে ক্ষোভ আরো বাড়তে থাকবে। ফলে, ফুলারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হল।

পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতির কিন্তু উত্তরোত্তর অবনতিই ঘটে চলল।

এইরকম পরিস্থিতিতে নিবেদিতা চুপ করে কলকাতায় বসে থাকলেন না। ছুটে গেলেন পূর্ববঙ্গে। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'বিপিন পাল ও অরবিন্দ যখন সন্ত্রাসবাদ লইয়া 'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় মাতামাতি করিতেছেন, নিবেদিতা তখন বন্যা-প্লাবিত বরিশালে একহাঁটু জল ও কাদার মধ্য দিয়া কোনোক্রমে পথ করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গরীব মুসলমান পল্লীর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মিঃ নেভিন্‌সন নিবেদিতাকে বলিয়াছেন "আগুন" —'Something flame— like about her and not only her language but her whole vital personality often reminded me of fire.'

লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'দেশের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। বরিশাল থেকে নিবেদিতা সে দুর্দিনের ভয়াবহ বিবরণ নিয়ে এলেন। মানুষ একেবারে সর্বস্বান্ত। কলাপাতা পরছে, খাচ্ছে আগাছা, আর ভাঙা কুঁড়ের সামনে পড়ে মরছে। মেয়েরা আর্তনাদ করছে, 'মা গো ভাত দে।' বাজারে সওদার জিনিস বলতে এক নৌকা শসা আর লঙ্কার চারা। বন্যার স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে একখানা বজরায় চেপে নিবেদিতা চারদিন ধরে খালে খালে ঘুরলেন। জল ক্রমেই বাড়ছে, সেইসঙ্গে বাড়ছে জিনিসের দাম। চাল আর পাওয়া যাচ্ছে না। রূপকথায় যেমন, তেমনি বন্যার তাড়ায় বাঘে-গরুতে একত্র হয়, ছাগলের খুরের নিচে কুণ্ডলী পাকায় গোখরো সাপ। আতঙ্কে হিংসা ভুলে গেছে সবাই।

'কলকাতার লোককে এ বিষয়ে অবহিত করার চেষ্টা করলেন নিবেদিতা। তিনি আর পুষ্পদেবী নামে তাঁর মহিলা সঙ্গিনী আরেকটি ভাষণ দিলেন টাউনহলে, কাগজে-কাগজেও লিখলেন। কিন্তু কেউ গা করল না।'

মণি বাগচি লিখেছেন, 'অশ্বিনীকুমার তাঁহার (নিবেদিতা) সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। সাহায্য সমিতি গঠন করিয়া অশ্বিনীবাবু একবার কলিকাতায় আসিলেন। ফিরিবার সময় তিনি নিবেদিতাকে বরিশালে লইয়া গেলেন। গৈরিকবসনা নিবেদিতার প্রাণ দুঃস্থ ও দুর্গতদের সেবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। তিনি বাখরগঞ্জের বহু স্থানে বক্তৃতা দিয়া প্রচুর টাকা তুলিয়াছিলেন। সেই টাকায় পাঁচ হাজার লোককে তিনদিন অন্তর পেট পুরিয়া খাইতে দেওয়া হইত। বন্যার স্রোতের সঙ্গে লড়াই করিয়া অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে একখানি বজরায় চাপিয়া নিবেদিতা চারদিন ধরিয়া বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিলেন। বন্যাপ্লাবিত বরিশালে একহাঁটু জল ও কাদার মধ্য দিয়া কোনোক্রমে পথ করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দরিদ্র মুসলমান পল্লীর বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়াইলেন। এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে নিবেদিতা এমন অনেক সমাজবিজ্ঞান

ও অর্থনৈতিক জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্বে এমন করিয়া আমরা শুনি নাই। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "হাজার হাজার বৎসরের সভ্যতা এক দুর্ভিক্ষেই ধ্বংস হইতে পারে। দুর্ভিক্ষ সমাজের পক্ষাঘাতস্বরূপ। দুর্ভিক্ষ সমাজে সকলরকম বিশৃঙ্খলা আনে। ইহা শুধু ক্ষুধা নয়, দেহের নগ্নতা, রাত্রির ভীষণ অন্ধকার, অজ্ঞান মুমূর্ষুদের আর্তনাদ।" কলিকাতায় ফিরিয়া বরিশালের ব্যাপার লইয়া কাগজে কাগজে লিখিলেন, টাউন হলে বক্তৃতা করিলেন— এইভাবে কলিকাতার লোককে এই বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য নিবেদিতা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। বীরাঙ্গনা নিবেদিতার এই কল্যাণময়ী ও করুণাময়ী মূর্তি দেখিয়া বাঙালি সেইদিন তাঁহাকে লোকমাতার আসনে বসাইল।'

লিজেল রেমঁ এবং মণি বাগচির লেখার ভিতর সামান্য একটু তফাৎ রয়েছে। রেমঁ লিখেছেন, নিবেদিতা কলকাতার মানুষদের কাছে সাহায্যের আবেদন করলেও 'কেউ গা করল না।' অথচ, মণি বাগচির লেখা পড়লে মনে হয়, কলকাতার লোক যথেষ্ট সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছিল। এক্ষেত্রে মনে হয়, মণি বাগচির বক্তব্যই ঠিক। কারণ, পূর্ববঙ্গের ত্রাণে কলকাতা থেকে যথেষ্ট সাহায্য গিয়েছিল। এমনকী, স্কুল ছাত্ররাও সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল।

পূর্ববঙ্গের এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে নিবেদিতা বেশ কয়েকটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। এইসব নিবন্ধে দুর্ভিক্ষের কারণ, ব্রিটিশ প্রশাসনের বৈমাতৃসুলভ মনোভাব, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের দুর্দশা তিনি তুলে ধরেছিলেন। বলতে গেলে, বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে এমন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নিবেদিতার কলম থেকেই প্রথম পাওয়া যায়। এই দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় ব্রিটিশ প্রশাসনের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করলেও কিছু কিছু ব্রিটিশ আমলার মানবিকতাও নিবেদিতার চোখ এড়ায়নি। নিবেদিতা লিখেছেন, 'In one place that I have heard of, the English Magistrate himself was a man of some heart. In this neighbourhood, a European firm of rice-dealers, whose ware-houses were filled with grain, announced their intention of putting up the price. In reply to remonstrances, including those of the Magistrate, they stated simply that they were guided, not by cosiderations of sentiment but by those of 'business,' and that this was their opportunity for making a profit. The people, as it chanced, howevre, were not leaderless, and an intimation reached these valiant brokers that— their warehouses would that might be looted by the populace. They, it appears, demanded from

the chief official an increased police force to meet the crowd. But he very properly declined to take any cognisance of an appeal based only on a vague threat, and ultimately designed to starve an already famine stricken populace. And the result was that this firm found itself compelled to give its word to the people, not to raise the price of rice. Subsequently, a small deputation waited on them unarmed, to acknowledge their promise, and also perhaps to let them see what they might have expected, had they proved more obdurate.'

বাংলার এই দুর্ভিক্ষ প্রত্যক্ষ করে নিবেদিতা লিখলেন, 'For famine is many thing besides hunger. True, it is hunger so keen that one man whom I know, spending some days in a district as yet unrelieved, could not sleep at night, for the wail of the famine-stricken in his ears. Hunger so keen, oh. God! so keen! But it is more than this, as we have already seen. It is the extreme of poverty, bringing amongst other thing, nakedness, darkness at nightfall, ignorance, and unrepair in its train. It is poverty breeding poverty. Under its pressure, the milk-cows are sold to the butcher, something for eight annas or a shilling, because their owner can no longer maintain them, and by the new master are killed immediately for their hides, at the value of which he bought them. When it comes, the seed of the next year is eaten as food, the saving of lifetimes are scattered to the winds. Economic relationships that seemed inherent in the social organism are broken to pieces.'

নিবেদিতা আরো লিখলেন, 'Femine is a social paralysis. A civilisation that has taken thousands of years to build up, may be shattered by a single season of it.'

বাংলার দুর্ভিক্ষ প্রত্যক্ষ করে নিবেদিতার লেখা এই নিবন্ধগুলি পরে 'Glimpses of Famine and Flood in East Bengal 1906' শিরোনামে একটি পুস্তকে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এর আগে ১৯০৭ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় এই লেখাগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত

হয়েছিল। ওই বছরই এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস লেখাগুলিকে একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে।

পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায় ত্রাণকাজ করতে গিয়ে কী ধরনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা-ও বর্ণনা করেছেন নিবেদিতা। লিখেছেন, 'There was, however, one case in the worst neighbourhood, I visited, that contained in it some elements which made it possible of realisation. As we rowed up to a wretched-looking hut, in what ought to have been the humanly as well as physically beautiful village of 'the Broken Lands', there suddenly came to us, across the water, the unmistakable wail of the Hindu widow. We know that the woman we were going to visit lived alone, with her four children; but now we saw her standing outside her door, with a group of sorrowing neighbours gathered round her. The story was soon told. She had been discovered, by the relief-workers, some six or seven weeks earlier, lying in a state of unconsciousness, on the floor of her cottage. Food, however, was given her, and she had gradually revived. Then the tale was heard, of how she, and her husband, and their four children, had been living for somedays on leaves, till at last, in despair, the man had fled, hoping to find work and food for them, near a distant city.Gradually by those manifold paths that cannot be named, along which news is won't carried in India, word had travelled back to the village that things were no better, in the district to which the man had gone, or at least that he had been unable even there, to find the help he sought. So much was known to everyone. But it is now evident that he had at last turned homewards again, desiring, in his despair to make his way back to his little family. He may have thought, in his ignorance that friends had been found for them, that death together was better than apart. But he was destined, alas, —never to see that little home again! News had this moment been brought to his wife, of the finding of his deadbody, some few hours previously, in the jungle two or three miles to the north of the village.

'I stayed long with the weeping woman, but what could I, or anyone, say to comfort her? Could I not feel, as well as she, the heart-rending anguish of the outcry "O my Beloved, if but I might have saved thee!"?'

এই দুর্ভিক্ষে ত্রাণকাজে আসা এক চিকিৎসকের অভিজ্ঞতাও নিবেদিতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। নিবেদিতা লিখেছেন, ওই চিকিৎসক তাঁকে বলেছেন, '....I had never thought, said the young doctor, "to see such scenes. So many people were unconscicous. Children were lying on the earth, unable to move. Mothers were crying. The people were in rags. There were no lights after dark. At eight or nine in the evening, we entered a house in which the children lay unconscious in the yard, and the mother with a baby in her arms, across the threshold. It was dark and I stepped on her. Then I struck a match and saw. Some of the women in the neighbouring villages were quite naked, and had to shrink back in the shadow that I might not see them. Three or four women with children had been deserted by their husbands. ...one morning at this time I came to village situated on a swamp and found a number of women standing up to their throats in water, gathering unripe grain stalk by stalk. I offered them help and my boat. But they could not accept, saying, "We are naked."

১৯০৬-এ পূর্ববঙ্গের সেই দুর্ভিক্ষ যে কী ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল, তা নিবেদিতার এই লেখাগুলি পড়লেই বোঝা যায়। 'মডার্ন রিভিউ'য়ে নিবেদিতার এই লেখাগুলি প্রকাশিত হওয়ার আগে অনেকেরই সম্যক ধারণা ছিল না— কী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পূর্ববঙ্গ পড়েছে। ব্রিটিশ সরকার চেয়েছিল দুর্ভিক্ষের খবর সবরকমভাবে চেপে যেতে। এ খবর কোনোভাবেই কলকাতায় এসে পৌঁছোক, তা ব্রিটিশ সরকার চায়নি। বলতে গেলে, নিবেদিতাই এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সবার গোচরে এনে সবাইকে অবহিত করেন।

বারবারা ফক্স তাঁর 'লং জার্নি হোম' গ্রন্থে লিখেছেন, পূর্ববঙ্গে, বিশেষত বরিশালে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের ভিতর ত্রাণকার্য চালানোর সময়েই নিবেদিতা কয়েকটি বিষয় উপলব্ধি করেন। বিশেষত, নিবেদিতা চেয়েছিলেন এই ত্রাণকার্যটিকেও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত করে তুলতে। নিবেদিতা দেখেছিলেন,

অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে যে তরুণ এবং যুবকরা ত্রাণকার্যে অংশ নিয়েছে—তাদের ভিতর, সম্পূর্ণ না হলেও, ধীরে ধীরে এক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটছে। এই বোধটিকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। চেয়েছিলেন, এই ছেলেরা গ্রামে গ্রামে যাক এবং গ্রামের মানুষদের তাঁত বোনা, হস্তশিল্প, ফলচাষ এইসব বিষয়ে উৎসাহী করে তুলুক। এভাবেই স্বদেশীয়ানা জাগ্রত হয়ে উঠবে এবং স্বদেশী আন্দোলনও জোরদার হবে।

এই অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে এই সময়ে নিবেদিতার শরীর ভেঙে পড়তে থাকে। এমনিতেই, এর আগে মেনেনজাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার পর নিবেদিতার স্বাস্থ্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারপর পূর্ববঙ্গে এই দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের ত্রাণের কাজে গিয়ে শরীর একেবারেই ভেঙে পড়ল। এই সময়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে নিবেদিতা শয্যাশায়ী হলেন। ক্রিস্টিন এবং অবলা ও জগদীশচন্দ্র বসু এই সময়ে তাঁর পরিচর্যার দায়িত্ব নিলেন। বেলুড় মঠ থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দও ঘন ঘন তাঁর খোঁজখবর নিতে আসতেন। একটু সুস্থ হয়ে নিবেদিতা আর ক্রিস্টিন কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য দমদমে আনন্দমোহন বসুর বাড়িতে এসে উঠলেন। নিবেদিতার স্কুলটিও এই সময় কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতে হল। এই সময়েই নিবেদিতা 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' এবং 'ক্রেডেল টেলস অব হিন্দুইজম' বই দুটি রচনার কাজে হাত দেন। জগদীশচন্দ্রের 'কম্পারেটিভ ইলেকট্রো-ফিজিওলজি' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনার কাজেও সাহায্য করেন এই সময়। এই সময়েই মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্বরূপানন্দের প্রয়াণের পর 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় 'অকেশনাল নোটস' শিরোনামে নিয়মিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতেও শুরু করেন। অর্থাৎ, অসুস্থতার সময়টিতে লেখালেখির কাজে নিজেকে নিমগ্ন রেখেছিলেন নিবেদিতা।

এই সময়ে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছিল। বাংলায় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে দমন করার জন্য একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসকরা নির্মম দমন-পীড়ন চালাচ্ছিল, পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানের ভিতর বিভেদ সৃষ্টির নোংরা প্রয়াসটিও তারা চালিয়ে যাচ্ছিল। মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় একটি অংশ ব্রিটিশ শাসকদের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন থেকে মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশকে সরিয়ে রাখলেন। প্রিন্স আগা খাঁ এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর যোগসাজশে মুসলিম লিগ গড়ে উঠল। মুসলিম লিগ জন্ম নেওয়ার পর লর্ড মিন্টো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লিখলেন, 'I must send your excellency a line to say that a very big thing has happened today; a work of

statesmanship that will affect India and Indian history for many a long year. It is nothing less than the pulling back of sixty two millions of people from joining the ranks of seditious opposition.'

ব্রিটিশের উদ্দেশ্য সফল হল। মুসলমান সম্প্রদায়কে এই আন্দোলন থেকে যে দূরে সরিয়ে রাখা গেল তা-ই নয়, ইংরেজদের মন্ত্রণায় এবং নবাব সলিমুল্লাহর মতো মুসলিম নেতাদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় পটুয়াখালি, জামালপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গাও শুরু হল। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'ঢাকায় মুসলিম লীগ ভূমিষ্ঠ হইবার দুইমাস পরেই কুমিল্লার দাঙ্গা। কুমিল্লার দেড়মাস পরে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে (১৯০৭) জামালপুরে বাসন্তী পূজার সময় মুসলমানেরা বাসন্তী প্রতিমা ভাঙিয়া ফেলিল। হিন্দু স্ত্রীলোকদের ধরিয়া লইয়া গিয়া মুসলমান গুণ্ডারা অকথ্য পাশবিক অত্যাচার করিল। গভর্নমেন্ট নির্যাতিত হিন্দুদের গ্রেফতার করিল। নরমপন্থী ও চমরপন্থী দল, কেহই মুসলমানদিগকে হাতে রাখিতে পারিল না। পরন্তু গভর্নমেন্ট মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণ হাত করিল। চল্লিশ বৎসর পর ইতিহাসের এই ধারাই বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিবে। অবাঙ্গালী কংগ্রেস নেতারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবে। ইহাতে সায় দিবে।' ব্রিটিশ সাংবাদিক নেভিনসন সেই সময়ের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'Hindu shops were looted, Hindu widows abducted and the cases of outrage upon Hindu women by gangs increased in number.'

রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানের প্রতিবাদে মুসলমান সমাজ গান ধরল—

'বাংলার মাটি বাংলার পানি
খোদা তোমার মেহেরবানি
ভাগ কর, ভাগ কর, ভাগ কর হে রহমান।'

ব্রিটিশ এবং মুসলিম নেতাদের এই জঘন্য চক্রান্ত প্রত্যক্ষ করে ১৯০৭ সালের ১ মে 'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখলেন, 'If Bengal has been seized with such a severe palsy as not to strike a blow ever for the honour of our women, it is better for her people to be blotted from the earth than cumber it longer with their disgrace.'

প্রায় একই প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিলক 'মারাঠি' পত্রিকায় লিখলেন, 'বাসন্তী প্রতিমা ভাঙা এবং হিন্দু স্ত্রীলোকদের ওপর অত্যাচার দেখেও তা প্রতিকারে রাস্তায় রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়নি— একথা কি বিশ্বাস করতে হবে?' লক্ষ্যণীয়, অরবিন্দ

এবং তিলক কেউই এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদে অহিংস আন্দোলনের পন্থা অবলম্বন করা বা নিছক আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি করার কথা বলেননি। বরং, প্রত্যাঘাতের মাধ্যমেই এই নোংরা রাজনীতির জবাব দিতে বলেছিলেন।

১৯০৬-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন বসল। অসুস্থতার জন্য নিবেদিতা এই কংগ্রেস অধিবেশনে অংশ নিতে পারেননি। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজিকে সভাপতি করা হয়েছিল। রাসবিহারী ঘোষ 'অভ্যর্থনা সমিতি'র সভাপতি হয়েছিলেন। রাসবিহারী ঘোষের অভিভাষণকে ব্যঙ্গ করে অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় লিখলেন, বাঘ বিড়ালের মতো মিউ মিউ করছে (the tiger muses)। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দাদাভাই নৌরজি বললেন, 'স্বরাজ অর্থ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন।' বিপিন পাল তিলকের মতো চরমপন্থীরা এর বিরোধিতা করে বললেন, 'স্বরাজের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা।' বিপিন পাল যে বয়কটের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, তাতে বলা হল শুধু বিদেশি পণ্যসামগ্রী নয়, বিদেশি সরকারকেও বয়কট করতে হবে। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে গোখলে বলেন, 'এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।' এই সম্মেলনেই ফিরোজ শাহ মেহতার সঙ্গে চরমপন্থীদের তুমুল বিরোধ হয়। বিপিন পাল তাঁর অনুগামী বাংলার চরমপন্থীদের সঙ্গে নিয়ে বিষয় নির্বাচনী সভা থেকে বেরিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়িতে চলে অসেন। বিপিন পালের এই বয়কটের প্রস্তাবকে একমাত্র তিলক ছাড়া অন্য প্রদেশের কংগ্রেস নেতারা সমর্থন জানালেন না। মদনমোহন মালব্য বয়কট প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। কংগ্রেসকে অখণ্ড দেখার যে বাসনা নিবেদিতার ছিল, তা কলকাতা কংগ্রেসেই ম্লান হয়ে গেল।

কলকাতা কংগ্রেসে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের ভিতর গণ্ডগোলের খবর সবটুকুই নিবেদিতা পেয়েছিলেন। গোখলে ওই সময়ে প্রায়ই অসুস্থ নিবেদিতাকে দেখতে যেতেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা চলাকালীনই কংগ্রেস অধিবেশনের খবর জেনে নিতেন নিবেদিতা। কলকাতা কংগ্রেসের খবরে নিবেদিতা বিচলিত হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে, নিবেদিতা সুস্থ হয়ে উঠে কিন্তু পুরোদমেই বিপ্লব প্রচেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এবং যে কারণে, ১৯০৭ সনে তাঁর ব্রিটিশ পুলিশের হাতে আটক হওয়ার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়।

১৯০৬-এর শেষদিকে, অসুস্থ থাকাকালীন নিবেদিতার মনে একধরনের বিষণ্ণতা বোধ জন্ম নিয়েছিল। লিজেল রেমঁ এবং প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা দুজনের লেখাতেই এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, '...তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল তিনি বেশীদিন বাঁচিবেন না। তাঁহার পত্রের মধ্যে বারবার এ বিষয়ে

উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর কৃস্টীন অর্থাভাবে বিদ্যালয় পরিচালনায় কোনোরূপ অসুবিধা ভোগ না করেন, সেজন্য তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকিতেন। তথাপি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার চিন্তায় তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতেন। ...একাধিকবার বন্ধুগণের অনুরোধে ও প্রয়োজনে পাশ্চাত্যগমনের সংকল্প করিয়া পরে আবার লিখিয়াছেন, তিনি অসুস্থ বোধ করিতেছেন, সুতরাং এখন আর যাইবেন না। এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, আমার একান্ত প্রার্থনা, আমি যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতবর্ষেই অবস্থান করিতে পারি। অর্থাভাব বা কোনো ব্যক্তিগত কারণে আমাকে যেন এদেশ পরিত্যাগ করিতে না হয়।'

লিজেল রের্মঁ লিখছেন, '...নিবেদিতা যেন সেই শান্তির ডাক শুনতে পেয়েছেন। তবুও তিনি বীরাঙ্গনার প্রহরণ আঁকড়ে আছেন। একটা অধীর আবেগে কটা দিন কাটে। রহস্যানুভূতির উন্মাদনায় অদ্ভুত কটা দিন। তারপর হঠাৎ নিবেদিতা এলিয়ে পড়েন।

'কাজের পালা সাঙ্গ এবার। ভারতের জন্য শেষ বাণীটি রেখে যাব চরমপত্রের আকারে। একদিন বিকালে বসে-বসে ভাবছিলাম, ভারতবর্ষকে আমার শেষ কথাটি বলতে হলে স্বামীজির সমগ্র আদর্শকে রূপ দিতে হবে একটি বাণীতে। চেষ্টা করে দেখব লিখতে পারি কিনা। সম্ভবতঃ ঐ হবে আমার চরমপত্র।'

'যুযুৎসু হিন্দুধর্ম (Aggressive Hinduism) সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত ভাষণ দিয়েছেন, তিনদিনের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় নিবেদিতা তার সার সঙ্কলন করেন। কাজটা করতে গিয়ে পুরানো দিনগুলো যেন ফিরে এল, কানে ভেসে এল জনতার সহর্ষ উচ্ছ্বাস আর প্রশস্তি। সবাই যেন তাঁরই মুখপানে চেয়ে আছে। আবার সব ঝাপসা হয়ে যায়। কলম সরিয়ে রাখেন নিবেদিতা। কিন্তু এখনও উইলটা লেখা হয়নি যে।

'খুব বেশি সময় লাগল না লিখতে। মিসেস বুলের দানপত্রে একটা মোটা অঙ্কের উল্লেখ আছে। কথা ছিল, নিবেদিতা তার সদ্ব্যয়ের ব্যবস্থা করবেন। যদি নিবেদিতা মিসেস বুলের আগে মারা যান, তাহলে সে টাকাটার কি হবে এই নিয়ে তাঁকে একটা চিঠি লিখলেন। চিঠিতে ছিল, 'আমার ইচ্ছা, শিল্প-প্রতিযোগিতার জন্য দেশবাসীকে বছরে হাজার পাউন্ড দেওয়া হোক। ক্রিস্টিনকে দিয়ে গেলাম স্বামীজির বইয়ের আয়ে আমার যে অংশ আছে আর আমার বইয়ের যে আয় তাই, সেইসঙ্গে আরো তিন হাজার পাউন্ড। আর এদেশের বিজ্ঞানচর্চার জন্য খোকার হাতে দিয়ে যাব তিন হাজার পাউন্ড...'

'ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে নিবেদিতা বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবার। তারপর সারারাত ধরে চলল আত্মবিলয়ের ধ্যানগম্ভীর তপস্যা।

'তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আর কর্মক্ষমতা যেন মিলিয়ে গেছে। অবশ দেহ-মন নিয়ে কতদিন কেটে গেল। প্রায়ই এখন নির্জনে কাঁদেন নিবেদিতা।

'জীবন যেন নির্মল হতে নির্মলতর হয়ে চুঁইয়ে পড়ছে তিলে-তিলে। কিন্তু আলো কই; আলো?...বাড়িটার চারপাশে বাতাস যেন কেঁপে মরছে আজ। শান্তি। শান্তি। আঁধার রাত। তবু ডাক শুনতে পাচ্ছি। মায়ের ডাক। আমি যাব, আমি যাব। বলি দেব নিজেকে...'

'ধীরে ধীরে আবার জীবনীশক্তি ফিরে আসে।... কিন্তু এ যেন আরেকটা মানুষ। নতুন নিবেদিতাকে তাঁর বন্ধুরা আর কোনোদিনই পুরাপুরি চিনতে পারেনি। ইচ্ছার স্বাতন্ত্রকে যিনি রাজদণ্ডের মতো ব্যবহার করেছেন একদিন, আজ তিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, শুধু মায়ের দাসী। মা বলেছেন, 'একদিন সবার পুরোভাগে তোমায় স্থান দিয়েছিলাম, সে আমারই ইচ্ছা। আজ আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়েছে, তোমারও কাজ শেষ...'

'রণরঙ্গিণী তাঁর প্রহরণ নামিয়ে রাখলেন।

'...নৈষ্কর্মের সাধনা করছি এবার। এর চাইতে বড় আর কিছু নাই। ভেবে দেখলাম, সংসারের কুরুক্ষেত্রে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ, নীরন্ধ্র আঁধারে সে বন্দী হয়, আলোর আভাস কোথাও মেলে না তার। মহাজীবনের ছন্দে এই আয়াস নাই, আছে উপচে পড়া। কণ্টকিত হয়ে ভাবি, আমিও কতবার হৃদয়ের বাতায়ন রুধেছি যে। ওঁ শান্তি। শান্তি!

'হাতের খড়্গ আজ খসে পড়েছে রণোন্মাদিনীর।'

১৯০৭ সালের ২ জুন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন নিবেদিতা, 'I am beginning to worship passivity as the highest and best mood. I see that when one struggles too hard, one shuts out light from all about one. So there is less effort, and more growing, in the Great Life, than one knew! I fear that I too, often darken the windows of the house! Oh Yum I feel as if the years were growing very very few— and some touch here of our life on the Jhelum banks. If only one could put on record that which has been entrusted to one! If only! If only! Nothing else matters, save to fulfil the trust! Dear— I do not know if I shall see you. All is doubtful again.'

নিবেদিতা জীবনীকারদের লেখাগুলি এবং এই চিঠিটি পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না সাময়িকভাবে এক বিষণ্ণতা এবং মানসিক অবসাদ সেইসময় নিবেদিতাকে

গ্রাস করেছিল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে বেশকিছু দিন সক্রিয় কাজকর্মের বাইরে তাঁকে থাকতে হয়েছিল বলেই এই হতাশা তাঁকে গ্রাস করেছিল— এটি অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। তবে, একটু সুস্থ হয়ে ওঠার পরই নিবেদিতা ফিরে এসেছিলেন সক্রিয় রাজনীতিতে।

১৯০৭ সালে বিনা বিচারে লাজপত রাই, অজিত সিং, কৃষ্ণ মিত্র সহ আরো দুজনকে নির্বাসন দণ্ড দিল ব্রিটিশ সরকার। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারাদেশে বিক্ষোভ দেখা দিল। বাংলার বিপ্লবীরাও এবার প্রত্যাঘাত দেওয়ার জন্য তৈরি হল। লাজপত রাইকে নির্বাসন দেওয়ার পিছনে কাজ করেছিল পাঞ্জাবের কৃষক বিদ্রোহ। এমনিতেই ওই সময়ে পাঞ্জাবে গুজব রটেছিল যে, সিপাহি বিদ্রোহের পঞ্চাশ বছর পর আবার একটি বিদ্রোহ হবে। এরকম একটি গুজবে পাঞ্জাবের ব্রিটিশ প্রশাসনও কিছুটা আশঙ্কিত ছিল। এরই মধ্যে কৃষি কর বৃদ্ধি হওয়ার ফলে বারি দোয়াব খালে চেনার বস্তির কৃষকরা বর্ধিত কৃষি কর দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এইসব কৃষকদের বহু আত্মীয়স্বজনই আবার ব্রিটিশ সরকারের শিখ রেজিমেন্টের সৈন্য ছিল। 'ইন্ডিয়া' নামে তৎকালীন একটি সংবাদপত্রে শিখ রেজিমেন্টের এই সৈন্যদেরও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আহ্বান জানানো হল। ১৯০৭-এর ২২ মার্চ লাজপত রাই এবং ৭ এবং ২৯ এপ্রিল অজিত সিং কৃষকদের সভায় কর হ্রাস না হওয়া পর্যন্ত কৃষিকাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিলেন। এই সভায় অনেক পেনশনভোগী শিখ সৈন্যও ছিলেন। ২ মে রাওয়ালপিন্ডিতে ক্ষিপ্ত কৃষকরা সাহেবদের বাংলো এবং বাগান আক্রমণ করলেন। রেল লাইন ধ্বংস করে দিলেন। এই ঘটনার জেরেই ৯ মে লাজপত রাই এবং অজিত সিংকে গ্রেপ্তার করে বর্মার মান্দালয় দুর্গে পাঠানো হল। পাশাপাশি মাদ্রাজে বয়কট আন্দোলনের সমর্থনে প্রচার করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র পাল গ্রেপ্তার বরণ করেন।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'কলিকাতায় ভীষণ প্রতিক্রিয়া, উৎসাহ ও আতঙ্কের মধ্যে দেখা দিল। অরবিন্দ ঘুমাইয়া ছিলেন, তাঁহাকে খবর দেওয়া মাত্রই তিনি নিদ্রোত্থিত হইয়া বন্দেমাতরমের জন্য লিখিলেন, "Men of the Punjab! Race of the Lion! আমলাতন্ত্র আমাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে, যুদ্ধ দাও। একজন লাজপতের জায়গায় একশত লাজপত দণ্ডায়মান হও। এখন বক্তৃতা দিবার ও প্রবন্ধ লিখিবার সময় অতীত হইয়াছে।" ('The time now for speeches and fine writings is past'— বন্দেমাতরম্ ১০ মে)।'

ঠিক এই সময়েই কলকাতার টাউন হলে একটি সভা হল। সভায় বক্তা ছিলেন নিবেদিতা। বক্তৃতার বিষয় ছিল ডায়নামিক রিলিজিয়ন। নিবেদিতা বক্তৃতা দিতে

উঠে বললেন, আর কথা নয়। এবার আমরা কাজ আরম্ভ করি (No more words-words-words— let us have deeds-deeds-deeds)। অরবিন্দের কথারই যেন প্রতিধ্বনি করলেন নিবেদিতা। নিবেদিতার এই বক্তৃতা শুনে বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছিলেন, 'এটা ডায়নামিক রিলিজিয়ন নয়, ডায়নামাইট।' বারবারা ফক্স তাঁর লেখায় নিবেদিতার ডায়েরি উদ্ধৃত করে লিখেছেন, লাজপত রাইয়ের গ্রেপ্তারের পর নিবেদিতা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'Is the Government crazy?'

১৯০৭-এর জুলাই মাসেই 'যুগান্তর' পত্রিকায় দুটি নিবন্ধ লেখার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ভূপেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং তাঁকে খালাস করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এবং বারবারা ফক্স দুজনেই লিখেছেন— বিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে নিবেদিতা এই সময় সক্রিয় হয়ে ওঠায় গোয়েন্দারা সর্বক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করত। এই সময়েই পুলিশ নিবেদিতাকে আটক করতে পারে এই সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। তবে, এটা ঠিক যে, সুস্থ হয়ে উঠে নিবেদিতা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এবং লিজেল রেমঁ দুজনের লেখাতেই একথা জানা যায়। রেমঁ লিখেছেন, 'দমদম কি বাগবাজার যেখানেই থাকুন, তাঁর বাসাটি পলাতকদের আস্তানা। সেখানে তাদের জন্য খাবার, টাকা-পয়সা পালাবার জন্য পথের মানচিত্র সবই মজুত থাকত।'

বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপে নিবেদিতা কীভাবে সহায়তা করতেন, তার চিত্র পাওয়া যায় রেমঁর লেখায়। রেমঁর বিবরণ বলছে, অরবিন্দর পরিকল্পনা অনুযায়ী মুরারিপুকুরের গোপন আস্তানায় বিপ্লবীরা যে বোমা বানাবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন, তা থেকে নিবেদিতা নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। বরং, ওই কর্মকাণ্ডে নিবেদিতারও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। বারীন ঘোষ এবং তাঁর সহযোগীদের এ ব্যাপারে সমানেই সাহায্য করে চলেছিলেন নিবেদিতা। ইতিমধ্যেই বিস্ফোরক তৈরির কৌশল শিখতে হেমচন্দ্র কানুনগোকে পাঠানো হয় ফ্রান্সে। তিনি ফিরে আসার আগেই বেশকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে উল্লাসকর দত্ত মেলানাইট তৈরির কায়দা বের করে ফেলেন। এই সময় ব্রিটিশ এনসাইক্লোপিডিয়ার ত্রয়োদশ খণ্ডে বোমা তৈরির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া থাকত। কিন্তু বাংলায় বিপ্লববাদীদের সক্রিয় কার্যকলাপ শুরু হওয়ার পর এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে এই বোমা তৈরির বিবরণ বাদ দেওয়া হয়।

রেমঁর লেখায় আর একটি চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়। রেমঁ লিখছেন, 'এইসব রসায়ন রসিকদের গোপনে প্রেসিডেন্সি-কলেজ ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে নিবেদিতা দ্বিধা করতেন না। জগদীশ বসু আর প্রফুল্ল রায় ছিলেন সেখানকার অধ্যাপক।

দুজনেরই ল্যাবরেটরিতে সহকারী দরকার হত। অবশ্য দু-জনের কেউ-ই নিবেদিতার দুঃসাহসের খবর রাখতেন না। প্রফুল্ল রায়কে ভাবুক স্বভাবের লোক বলেই সবাই জানত, প্রায়ই কোনোকিছুর খেয়াল থাকত না তাঁর। ভালমানুষ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল, গরিবানা চালে দিন কাটিয়ে আয়ের বেশীর ভাগটা দান করতেন অভাবগ্রস্তদের। রোজ সন্ধ্যায় কার্জন পার্কে বসে বন্ধুদের নিয়ে অনেকক্ষণ গল্পগুজবে কাটাতেন। ফেরবার পথে নিজের ল্যাবরেটরিতে ঘুরে যেতেন একপাক। জানতেন উৎসাহী কয়েকটি ছাত্র সহকারীদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ল্যাবরেটরিতে কাজ করে। কাউকে কিছু প্রশ্ন করতেন না। একটা ফ্যাসাদ যা দেখতেন, ওরা বড় বেশী অ্যাসিড খরচ করে। ছেলেরা চলে যাবার পর প্রায়ই উনি সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখতেন, ব্ল্যাকবোর্ডটা ভাল করে মুছে সাফ করতেন। কিন্তু কখনও কোনো মন্তব্য করতেন না। এ জন্য নিবেদিতা যে তাঁর কাছে কত কৃতজ্ঞই ছিলেন।'

নিবেদিতার অন্য কোনো জীবনীকারেরা অবশ্য এই তথ্য দিতে পারেননি। কিন্তু, রেমঁর দেওয়া এ তথ্যও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। মনে রাখতে হবে, অরবিন্দ বা তাঁর সতীর্থরা যতই বিপ্লবের পরিকল্পনা করুন না কেন, গোপন বৈপ্লবিক কাজকর্মের পূর্ণ অভিজ্ঞতা কিন্তু তাঁদের ছিল না। সে ছিল একমাত্র নিবেদিতার। আয়ারল্যান্ডে আইরিশ গুপ্ত সংগঠনগুলির সঙ্গে জড়িত থাকার সময়েই গোপন বৈপ্লবিক কাজকর্মের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন নিবেদিতা। তাঁর সেই অভিজ্ঞতাই অরবিন্দের বিপ্লবী সংগঠনের কাজে লাগিয়েছিলেন নিবেদিতা। সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই নিবেদিতা জানতেন, পরিচয় গোপন করে একজন বিপ্লবী কীভাবে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারেন। তাছাড়া, জগদীশচন্দ্র ছিলেন নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। সেই বন্ধুত্বের সুবাদে পরিচয় গোপন করে দু-একজন তরুণ বিপ্লবীকে প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরিতে পাঠানো নিবেদিতার পক্ষে কিছু কঠিন কাজ ছিল না। আর সেরকম কাজ নিবেদিতা করেছিলেন— তা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

রেমঁর লেখা অন্য একটি সন্দেহেরও উদ্রেক করে। তা হল, রেমঁ বলছেন, তাঁর ল্যাবরেটরিতে যে ছাত্ররা গবেষণা করতে আসত, তাঁদের কাউকে কোনো প্রশ্ন করতেন না প্রফুল্লচন্দ্র। ছাত্ররা চলে যাবার পর তিনি জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতেন, ব্ল্যাকবোর্ডটি ভালো করে মুছে সাফ করতেন। কিন্তু কখনো কোনো মন্তব্য করতেন না। রেমঁর লেখার এই অংশটি পড়লে স্বাভাবিকভাবেই একটি সন্দেহ উদ্রেক হয়। তা হল, প্রফুল্লচন্দ্র কি জানতেন, ল্যাবরেটরিতে কারা পরিচয় গোপন করে গবেষণা করতে আসেন? তিনি কি জেনেশুনেই নীরব থাকতেন? তাহলে কি প্রফুল্লচন্দ্রেরও

প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ছিল এই বিপ্লববাদী তরুণদের প্রতি? এসব সংশয় দূর করার জন্য কোনো তথ্য অবশ্য পাওয়া যাবে না কোথাও।

বাংলার এই তরুণ বিপ্লবীরা নিবেদিতাকে যে যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং মান্য করতেন তা রেমঁ এবং গিরিজাশঙ্কর দুজনেরই লেখা থেকে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে দুজনই ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে বেলুড় মঠের উৎসবের কথা উল্লেখ করেছেন। গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, 'জুলাই মাসে বেলুড় মঠে উৎসব হইল। নিবেদিতার শিষ্য যুগান্তর দলের যুবকেরা তাহাকে বেলুড় মঠে লইয়া গেল। নিবেদিতা, যে ঘরে স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যে ঘরে তিনি পাঁচ বৎসর পূর্বে (১৯০২, ৫ই জুলাই প্রাতে) পুষ্পে আচ্ছাদিত স্বামীজির মৃতদেহকে পাখা দিয়া বাতাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মস্তক আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেই ঘরে তীর্থযাত্রীর মতো করজোড়ে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর বারান্দা দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিলেন। ফরাসী জীবন চরিতে আছে, মহেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গে ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা, কিন্তু আমার মনে হয়, মহেন্দ্র নয়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গে ছিলেন।'

ওইদিনের বিবরণ দিয়ে রেমঁ লিখেছেন, '... নিবেদিতাকে উপরের বারান্দায় দেখেই ময়দানের লোক মহাকলরবে সংবর্ধনা জানাল।

'কিছু বলুন, কিছু বলুন আমাদের।' চীৎকার করে সবাই।

'বন্ধুদের দিকে ফিরে নিবেদিতা শুধ'ন, 'বলব'?

'আলিসার ধারে এগিয়ে গেছেন কথা কইবার জন্য, হঠাৎ একটা ছেলে সতর্ক করে দেয়, 'কিছু বলবেন না, শুধু আশীর্বাদ করুন ওদের।'

'বুঝে নিলেন নিবেদিতা। লোকের ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে পুলিশ রয়েছে।

'নিবেদিতা শুধু যুক্তকর কপালে ছুঁইয়ে উঁচু গলায় বললেন, 'ওয়াহ গুরুকী ফতেহ!' সদ্য উপহার পাওয়া ফুলগুলি ছড়িয়ে দিলেন সামনে।

'জনতা প্রতিধ্বনি করে উল, 'ওয়াহ্ গুরুকী ফতেহ্!'

১৯০৭ সালের জুলাই মাসেই স্বামীজির ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই সময় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নিবেদিতার নির্দেশেই জামালপুরে দাঙ্গার তদন্ত করতে গিয়েছিলেন। জামালপুরের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' গ্রন্থে ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'জামালপুরে সতের বৎসরের এক বালক সুধীর এক ভাঙা বন্দুক হাতে লইয়া এক মন্দিরের ভিতর আনীত বহু হিন্দু মহিলা ও শিশুদের প্রাণ, ধর্ম্ম ও সতীত্ব সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ইংরেজ পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট পরিচালিত বিশ হাজার উন্মত্ত মুসলমান গুন্ডার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল।'

ভূপেন্দ্রনাথ যখন জামালপুরে তখনই 'যুগান্তর' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক নিবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে ৩ জুলাই ১৯০৭ পত্রিকা অফিসে তল্লাশি চালাল পুলিশ। ৫ জুলাই ভূপেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ওই পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তাঁকে গ্রেফতার করা হল। ভূপেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়ে ১৮ জুলাই বন্দেমাতরম পত্রিকায় অরবিন্দ লিখলেন, 'আরও অত্যাচার চাই' (wanted more repression)।

যে দুটি নিবন্ধের জন্য ভূপেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সে দুটি নিবন্ধ তিনি লেখেননি। বারীন্দ্র ঘোষ এই নিবন্ধের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করে নিজের পিঠ বাঁচালেন। তবে, তাঁর লেখা না হলেও ভূপেন্দ্রনাথ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব স্বীকার করলেন। ২১ জুলাই ভূপেন্দ্রনাথের বিচার শুরু হল। ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে 'যুগান্তর' পত্রিকার আরো কয়েকজন কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথের মুক্তির জন্য নিবেদিতা সক্রিয়ভাবে আসরে নামলেন। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যুগান্তরের দুইটি বিশেষ প্রবন্ধের জন্য আমাকে আসামী করা হইল। আমার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হইল। মোকদ্দমার সময়ে কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট সুইন হো যখন বিশ হাজার টাকা জামীন তলব করেন, তখন ভগিনী নিবেদিতা এই জামানৎ টাকা দিতে রাজী হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং আদালতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।' ভূপেন্দ্রনাথের জামিনের জন্য টাকা জোগাড়ের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। রেমঁ লিখেছেন, '...ভূপেন্দ্রনাথের বন্ধুরা টাকা জোগাড়ের ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন, নিবেদিতা তাদের বললেন, 'ব্যাঙ্কে আমার ঐ পরিমাণ টাকাই আছে, সবটা তোমরা নাও! আমি ভিক্ষা করে ও টাকাটা পূরণ করব!'

রেমঁর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, শুধু ভূপেন্দ্রনাথের জন্য নয়, 'যুগান্তর'-এর আরো যে কর্মীরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁদের জন্যও নিবেদিতাকে অনেক কিছু করতে হল। কয়েকজন ধনী বন্ধুদের টাকায় একটা গোপন তহবিলও বানিয়েছিলেন। তা থেকে পুলিশদের ঘুষ দিতেন, যাতে ধৃতদের উপর পুলিশ অত্যাচার না করে। ভূপেন্দ্রনাথের অবশ্য এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। অরবিন্দ ভূপেন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় ২৫ জুলাই সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখলেন। ভূপেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারির খবর জানিয়ে ১৯০৭-এর ২০ জুলাই সারা বুলকে নিবেদিতা লিখলেন, 'Swamiji's youngest brother, whom you remember, is on trial for seditious publications. He has just been telling us how the idea of Nationalism has changed the face of the country. The bad boys who were only 'street-loafers' have become fine

National Volunteers. He is anxious about his mother and grand-mother, as the older son is no comfort to them. But he himself is likely to get from 6 months to 3 years in prison. He is so brave and good, humoured about it all, but says, "it is extremely unpleasant for a gentleman, and I, you know, am a proud Datt!" so like Swamiji!'

নিবেদিতার আর এক জীবনীকার মণি বাগচি লিখেছেন, 'যেদিন মোকদ্দমার রায় বাহির হইল, সেইদিন আদালত হইতে নিবেদিতা সোজা চলিয়া গেলেন, তিন নম্বর গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটে। ভূপেন্দ্রনাথের মায়ের সঙ্গে দেখা করিলেন। বলিলেন—"মা, আজ আপনার আর একটা আনন্দের দিন। একদিন আপনার এক ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, আজ আর এক ছেলে দেশের কাজে প্রথম শহীদ হয়ে হাসি মুখে জেলে গেল। আপনি সত্যিই রত্নগর্ভা। আমি ভূপেনের ললাটে রক্ত-তিলক এঁকে দিয়েছি, মা।" ভুবনেশ্বরী স্তব্ধ হৃদয়ে নিবেদিতার কথাগুলি শুনিয়া গেলেন।'

ভূপেন্দ্রনাথের মুক্তির জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠায় এবার নিবেদিতার ওপরও শ্যেনদৃষ্টি পড়ল পুলিশের। এমনিতেই নিবেদিতার কার্যকলাপ নিয়ে সরকার যথেষ্ট সজাগ ছিল। বিশেষ করে বাংলার অফিসিয়েটিং চিফ সেক্রেটারি আর.ডব্লিউ. কার্লাইল, যিনি সার্কুলার জারি করে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ করেছিলেন, তিনি নিবেদিতার কার্যকলাপের ওপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হয়ে যাওয়ার পর নিবেদিতাকেও গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা দেখা দিল। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এবং মণি বাগচি দুজনেই লিখেছেন, গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য নিবেদিতাকে কিছুদিন ভারতের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা। গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, 'জাতীয় দলের নেতারা নিবেদিতাকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হইবে প্রায় স্থির হইল। তিনি হাস্য করিলেন। নির্বাসন বা কারাগার তিনি কিছুর ভয় করিলেন না; কিন্তু বন্ধুরা তাঁহাকে বুঝাইল যে, ভারতের বাহিরে গিয়াও তিনি ভারতের জন্যই বহু কাজ করিতে পারিবেন— যাহা নির্বাসন বা কারাগারে থাকিয়া তিনি পারিবেন না। অবশেষে তিনি রাজী হইলেন।' একই কথা লিখেছেন লিজেল রেমঁও। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা অবশ্য এঁদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, নিবেদিতার শরীর ভেঙে পড়ায় জোসেফিন ম্যাকলিয়ড, সারা বুলের মতো ঘনিষ্ঠদের অনুরোধেই কিছুদিনের জন্য বিদেশ যেতে রাজি হন নিবেদিতা। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'বন্ধুগণের

নিকট ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ এবং ডন সোসাইটি, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতিতে বিপ্লবাত্মক ভাবপ্রচার করিলেও তিনি কোনদিন প্রকাশ্যে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা অথবা বিদ্রোহমূলক আচরণ করেন নাই, যাহার জন্য তাঁহার গ্রেপ্তারের আশঙ্কা থাকিতে পারে। তবে সরকার তাঁহাকে সন্দেহের চোখে দেখিতেন, এবং দেশের তদানীন্তন অবস্থা এরূপ ছিল যে, কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ ঘটিলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইত। সেরূপ কারণ তাঁহার পক্ষে সর্বদাই বর্তমান ছিল, তাঁহার পাশ্চাত্য গমনের পূর্বে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও। সুতরাং উহার জন্য তাঁহার ভারত ত্যাগ করিবার প্রয়োজন ছিল না। গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য তিনি অবশেষে ভারতবর্ষের বাহিরে যাইতে সম্মত হন, কথাটির আদৌ ভিত্তি নাই।' তবে, পরে মুক্তিপ্রাণা স্বীকার করেছেন, অরবিন্দকে কলকাতা থেকে পালিয়ে যাওয়ায় সহায়তা করার পর নিবেদিতার গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

তবে, একথাও ঠিক, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রেপ্তার হওয়ার বেশকিছু আগে থেকেই নিবেদিতার লন্ডন যাওয়ার কথাবার্তা চলছিল। ১৯০৭ সালের ৪ এপ্রিল জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Isn't it interesting— that afterall, I am likely to come West in August or Sept.? I always had the feeling that it might be so, that the whole thing might change suddenly, and I go this year. And so many friends whom one valued have died, since I was last in England, that I like to think I am once more to see mother. Poor little soul! She seems so frail!'

এরপর ১১ এপ্রিল জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে আবার লিখেছেন, 'I have just been writing to S. Sara, asking her to settle with you what I do about coming West. My own idea is to leave Bombay by the Italian line in the middle of August, and to change at Naples or Genoa for New York. Would it be possible, or would it be too late to meet you at the latter place, and go to America with you? I fear it would be much too late. If not, however, would you mind going by the Italian line?'

এই চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায়, ভূপেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হওয়ার অনেক আগেই নিবেদিতার বিলেতে যাওয়ার একটি পরিকল্পনা হচ্ছিল। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই নিবেদিতাকে বিলেতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর সুহৃদরা— এই ধারণাটিই গ্রহণযোগ্য। তবে, এ সম্ভাবনাও আছে যে, ভূপেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তারের আগে থেকেই

নিবেদিতারও আটক হওয়ার একটি আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সেই আশঙ্কা দেখা দিতেই নিবেদিতার বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা শুরু হয়। মনে রাখতে হবে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ব্রিটিশের দমননীতি চূড়ান্ত জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এই আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা এবং তিলক, বিপিন পাল প্রমুখ চরমপন্থীদের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সরকারের অজানা ছিল না। সে সময় ধরপাকড় এবং দমনপীড়ন যে কী পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা গোখলেকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি থেকেও আঁচ পাওয়া যায়। মডারেট গোখলেও যে গ্রেপ্তার হতে পারেন, এমন আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল। ১৯০৭-এর ১ আগস্ট গোখলেকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'They say that even you are scarcely safe. I think I should like to see you on trial, however!'

মডারেট গোখলেরই যদি গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে নিবেদিতার সে সম্ভাবনা যে আরো প্রবল ছিল— এটা মনে করাই স্বাভাবিক। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জামিনের ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠার পর সে সম্ভাবনা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল নিশ্চয়ই। এই পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে এটিই মনে হয়, ঘনিষ্ঠজনদের অনুরোধে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বিলেতে যাওয়া একটা কারণ যেমন ছিল, তেমনই কিছুদিনের জন্য পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়াও একটা কারণ হয়তো ছিল।

১৯০৭ সালের ১৫ আগস্ট নিবেদিতা বিলেতের উদ্দেশে বোম্বাই থেকে জাহাজে যাত্রা করলেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা এবং প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা লিখেছেন— বিলেত যাত্রার আগে সারদা মায়ের বাড়ি, দক্ষিণেশ্বর মন্দির এবং বেলুড় মঠ ঘুরে এলেন নিবেদিতা। তাঁর স্কুলের ভার গ্রহণ করলেন ক্রিস্টিন। মণি বাগচি লিখেছেন, বিলেত যাত্রার আগে তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে একদিন তরুণ বিপ্লবীদের ডেকে পাঠালেন নিবেদিতা। উল্লাসকর দত্ত, বারীন্দ্র ঘোষ এবং হেমচন্দ্র কানুনগো গেলেন নিবেদিতার বাড়ি। নিবেদিতা তাঁদের বললেন, 'তোমাদের একজন সহকর্মী জেলে গিয়েছে। তার শূন্যস্থান পূর্ণ করতে হবে। তোমরা জেনো, কালের ভেরী বেজেছে, রুদ্রের আহ্বান এসেছে। আমি দেখেছি, দেশজননী তোমাদের ললাটে রক্ত-তিলক পরিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের সামনে অগ্নিপরীক্ষা। এই রুদ্রযজ্ঞে হয়তো তোমাদের কয়েকজনকে জীবনাহুতি দিতে হবে। তোমাদের একহাতে অরবিন্দ তুলে দিয়েছেন গীতা আর অন্য হাতে আমি দিয়েছি বোমা। আমি যেন ফিরে এসে দেখি, তপ্ত রৌদ্রদাহ উপেক্ষা করে বিপ্লবের পথে তোমরা অনেক দূরে এগিয়ে গেছ। ওয়াহ্ গুরু কি ফতেহ্।'

মণি বাগচি জানাচ্ছেন, বিলেত যাত্রার আগে নিবেদিতা অরবিন্দের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে গিয়েছিলেন। অরবিন্দকে বলেছিলেন, "...মনে রাখবেন, বিধাতা আপনার দক্ষিণ হস্তে কঠোর আদরে দুঃখের যে দারুণ দীপ দিয়াছেন— দেশের অন্ধকার বিদ্ধ করিয়া ধ্রুবতারার মতো সেই আলো আজ জ্বলিয়াছে। আপনি বিপ্লবের রুদ্রদূত; দেখিবেন— সে আলো যেন নিভিয়া না যায়। সাগরপার হইতে আমি যেন আপনার জয়শঙ্খ শুনিতে পাই। ওয়া গুরু কি ফতে!"

লিজেল রেমঁ লিখেছেন, '১৫ই আগস্ট নিবেদিতা রওনা হলেন। একটু আগেই চলে যেতে হল। খবর পেয়েছিলেন, ব্রিটানিতে ছুটি কাটিয়ে ক্রপটকিন সস্ত্রীক লন্ডনে ফিরে আসছেন। সেখানে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করবার বন্দোবস্ত হয়েছে।'

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'যে কারণে এবং যে অবস্থায় প্রিন্স ক্রপটকিন ইংল্যান্ডে পালাইয়া আসিয়া এই সময় অবস্থান করিতেছেন ঠিক সেই কারণে এবং সেই অবস্থায় নিবেদিতা ভারত ছাড়িয়া লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একই অবস্থা, একই কারণ, ইতিহাস-বিখ্যাত বিপ্লবীরা সবদেশেই এইরূপ করিয়াছেন। বিপ্লবীদের ইহা একটি টেকনিক। নিবেদিতার মৃত্যুভয় নাই— সুতরাং কারগার বা নির্বাসনের ভয়ে তিনি পালান নাই। ভারতের বাহিরে আসিয়া ভারতের জন্যই আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে পারিবেন আশা করিয়াই তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া চলিলেন।'

গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, 'নিবেদিতা জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ গিয়া সমুদ্রে পড়িল। উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া নিবেদিতাকে লইয়া জাহাজ ভাসিয়া চলিল। নিবেদিতা জাহাজে একাকী কী ভাবিতেছিলেন? ১৮৯৯ সালের সেই জুন মাসে 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে উঠিয়া নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত লন্ডন যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং দীর্ঘ ছয় সপ্তাহ একত্রে জাহাজে বাস করিয়াছিলেন। ডেকের উপর স্বামীজির সহিত একত্রে বেড়াইবার সময় কত জ্ঞান, ধর্ম ও পূণ্য কাহিনীর কথাই তিনি স্বামীজির মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। সে আজ আট বৎসর আগের কথা। আজ নিবেদিতা একা চলিয়াছেন। তিনি সন্ত্রাসবাদী কার্যের মধ্য হইতেই হঠাৎ চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার বাগবাজারের ছোট বাড়িটির কথা মনে হইল। সেখানে যুবকদের দল তাঁহাকে দিবারাত্র ঘিরিয়া থাকিত। তিনি একটি রিভলবার হাতে লইয়া তাহাদের সম্মুখে খেলা করিতেন, যেন হত্যা করা বা হত হওয়া কিছুই নয়। সেই যুবকদের শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।'

সাত

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নিবেদিতা লন্ডনে এসে পৌঁছলেন। লন্ডনে নিবেদিতা তাঁর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যক্তিবর্গকে পেয়ে গিয়েছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দ কুমারস্বামী প্রমুখও এই সময় ইংল্যান্ডে আসেন। সাময়িকভাবে ভারত ছেড়ে এলেও এঁদের সান্নিধ্য নিবেদিতাকে বিচ্ছেদবেদনা অনুভব করতে দেয়নি। তাঁর রাজনৈতিক গুরু পিটার ক্রপটকিনের সান্নিধ্যও আবার তিনি নতুন করে লাভ করেন এই সময়ে। এঁরা ছাড়াও ছিলেন বসু দম্পতি—জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসু। বসু দম্পতির সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতার বিশদ ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে। লন্ডনে এসেও সেই বসু দম্পতিকে ঘনিষ্ঠভাবেই কাছে পেলেন নিবেদিতা। নিবেদিতা ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কিছুদিন পর, সেপ্টেম্বর মাসে বসু দম্পতি ইওরোপের দিকে যাত্রা করেছিলেন। ইংল্যান্ড থেকে ভিসবাডেনে এসে নিবেদিতা বসু দম্পতির সঙ্গে মিলিত হলেন।

বসু দম্পতির ১৯০৭ সালে ইওরোপে আসার পিছনেও নিবেদিতার একটি ভূমিকা ছিল। নিবেদিতা ভারত থেকে রওয়ানা হওয়ার কিছুদিন আগেই বসু দম্পতির সঙ্গে কয়েকদিন মায়াবতীতে কাটিয়ে আসেন। ওই সময়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর 'ইলেকট্রোফিজিওলজি' গ্রন্থটি রচনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ১৯০৭-এর মে মাসে জগদীশচন্দ্র বইটির কাজ শেষ করে উঠলে ঠিক হয় বসু দম্পতি, নিবেদিতা, ক্রিস্টিন এবং অরবিন্দমোহন বসু কাশ্মীরে ছুটি কাটাতে যাবেন। ১৯০৭-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতার লেখা চিঠি থেকে এই কাশ্মীর যাত্রার পরিকল্পনার কথা জানা যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Meanwhile the Boses talk of Kashmir for May and June. If it is done Mrs. Sevier may join.

Then she and Bo (Abala Bose) will have dandies and we 3 March. I fear it will be a great expense to the Boses, for they pay most of the holidays always. But Derjeeling has smallpox.'

নিবেদিতার এই চিঠিগুলি থেকে কতকগুলি তথ্য জানা যাচ্ছে। প্রথমত, শ্রীমতী সেভিয়ারেরও কাশ্মীর ভ্রমণে সঙ্গী হওয়ার কথা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, তিনি যদি যান, তাহলে তাঁর এবং অবলা বসুর জন্য ডান্ডি ভাড়া নেওয়া হবে। বাকিরা পায়ে হেঁটেই যাবেন। আরো জানা যাচ্ছে, দার্জিলিংয়ে সেইসময়ে পক্সের প্রকোপ ছড়িয়েছিল। যে কারণে, দার্জিলিং যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। আরো একটি আকর্ষণীয় তথ্যও এই চিঠিটি থেকে জানা যায়। তা হল, এইসব বেড়াতে যাওয়ার খরচ পুরোটাই বসু দম্পতি বহন করতেন। তবে শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে ওই বছর মে-জুন মাসে শ্রীমতী সেভিয়ারের আমন্ত্রণে বেশ কিছুদিন মায়াবতীতে কাটিয়ে আসেন বসু দম্পতি, নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন।

ছুটি কাটাতে আসার আগে, জগদীশচন্দ্র যেমন তাঁর 'ইলেকট্রো-ফিজিওলজি' গ্রন্থের কাজ শেষ করেন, তেমনই নিবেদিতাও তাঁর 'ক্রেডেল টেলস অফ হিন্দুইজম' গ্রন্থটির কাজ শেষ করেন। এই গ্রন্থটি নিবেদিতা উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রকে। কিন্তু জগদীশচন্দ্র তা করতে দেননি। জগদীশচন্দ্র চেয়েছিলেন নিবেদিতা গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রটি সাদা রাখুন। ১৯০৭ সালে ২৪ এপ্রিল সারা বুলকে লেখা নিবেদিতার একটি পত্র থেকে একথা জানা যায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'I would have liked so much to have dedicated it to "One whose whole life speakes his love of Mahabharata". But he [Dr. Bose] say he would rather have a blank page.'

উৎসর্গপত্রে ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখতে জগদীশচন্দ্রের এই অনীহার কারণ কী— তা অবশ্য পরিষ্কার নয়। এমনিতে অবশ্য দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জগদীশচন্দ্র কখনোই নিজেকে জড়াননি। বা, নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কোনো আঁচ তাঁর গায়ে লাগুক— তা-ও কখনো চাননি জগদীশচন্দ্র। কারণ, তাঁকে গবেষণার কাজ চালাতে সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হত। নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়ালে তাঁর ওপরও যে রাজরোষ নেমে আসতে পারে এবং তার জন্য গবেষণার কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে— সে আশঙ্কা জগদীশচন্দ্রের ছিল। যে কারণে সরকার-বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডেই জগদীশচন্দ্র জড়িত থাকতেন না। এই কারণেই

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি। তবে, উৎসর্গপত্রে নিজের নাম দেখতে না চাওয়ার পিছনে সম্ভবত কোনো রাজনৈতিক আশঙ্কা ছিল না। কী কারণে জগদীশচন্দ্র উৎসর্গপত্রটি সাদা রাখতে বলেছিলেন নিবেদিতাকে, তা অবশ্য অজানা রহস্য হয়েই রয়ে গিয়েছে।

কিন্তু নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের কথা মতো উৎসর্গপত্রটি সাদা রাখেননি। 'ক্রেডেল টেলস অফ হিন্দুইজম' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'To all those souls who have grown to greatness by their childhood's love of the Mahabharata'.

একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, নিবেদিতা গ্রন্থটি শেষপর্যন্ত জগদীশচন্দ্রকেই উৎসর্গ করলেন। তবে তা প্রতীকীভাবে।

নিবেদিতা ১৫ আগস্ট ইওরোপের দিকে যাত্রা করেছিলেন। বসু দম্পতি ইওরোপ যাত্রা করেন ৫ সেপ্টেম্বর। এর বেশ কিছু দিন আগে থেকেই জগদীশচন্দ্র ইওরোপ যাত্রার পরিকল্পনা করতে থাকেন। জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি গ্রন্থ সেই সময়ে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে বেশ সাড়া ফেলেছিল। বিভিন্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগদীশচন্দ্রের কাজের প্রশংসা করা হতে থাকে। তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থগুলি রুশ ভাষায় অনুবাদ করতে চায়। জগদীশচন্দ্র এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি। জগদীশচন্দ্র বুঝেছিলেন, বিদেশে বিজ্ঞানী মহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর গবেষণাগুলি দেখানোর এটিই প্রকৃষ্ট সময়। এইসব ভেবেই জগদীশচন্দ্র ছুটির আবেদন করেন। চিকিৎসকরাও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য জগদীশচন্দ্রকে বিদেশ যাত্রার সুপারিশ করেন।

ব্রিটিশ সরকার জগদীশচন্দ্রের বিদেশ যাত্রার প্রয়োজনীয়তা নীতিগতভাবে মেনে নিলেও প্রশাসনিক কারণে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করছিল। যে কারণে জগদীশচন্দ্রকে সাধারণ ছুটি (ফার্লো) মঞ্জুর করা হয়। জগদীশচন্দ্রকে সাধারণ ছুটি মঞ্জুর করায় ক্ষুব্ধ হন নিবেদিতা। আগেই বলা হয়েছে নিবেদিতার আর-এক ঘনিষ্ঠ সুহৃদ গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার কারণে অনেক সময়েই তাঁকে দিয়ে নিবেদিতা সরকারি মহলের অনেক কাজ করিয়ে নিতেন। জগদীশচন্দ্রকে যাতে ব্রিটিশ সরকার ডেপুটেশনে যেতে দেন, তার জন্য গোখলের শরণাপন্ন হয়েছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৭-এর ১৯ জুলাই গোখলেকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখলেন, '...We have news today that Dr. Bose has 2 years furlough under medical pressure. This is an unspeakable relief, for it ensures his getting off, and more of the human surrounding would

have killed his mind. I think Genius is not the robust plant that foolish men suppose — but the most delicate of products.'

জগদীশচন্দ্রকে ডেপুটেশন না দিয়ে ফার্লো দেওয়ায় তাঁর ক্ষোভ ওই চিঠিতেই প্রকাশ করেন নিবেদিতা। লেখেন, 'But I am by no means content about furlough instead of deputation. When I reflect that this country in INDIA, and see how foreigners can batten on her bounty, while a child of the soil may have to undergo privations in his service of her that amount to punishment, I am exasperated. How right L.L.R. [Lala Lajpat Rai?] was in asking if the English had brought the land down from the skies.'

চিঠির শেষে নিবেদিতা স্বাক্ষর করলেন ঃ 'Nivedita the furious'.

নিবেদিতা জানতেন, গোখলেকে লেখা তাঁর এই পত্র ব্যর্থ হবে না। বরং, তাঁর এই পত্র পাওয়ার পর গোখলে জগদীশচন্দ্রকে ডেপুটেশন পাইয়ে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠবেন। তাই হয়েওছিলেন গোখলে। বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকে জগদীশচন্দ্রের যে জীবনী প্রকাশিত হয়, তাতে লেখা হয়েছিল ঃ 'জগদীশচন্দ্রকে ডেপুটেশনে পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করে গোপালকৃষ্ণ গোখলে এই সময় ভারত সরকারের কাছে এক স্বতন্ত্র চিঠি লিখেছিলেন।' এর ফল এটাই যে, পরের বছর এপ্রিল মাসে জগদীশচন্দ্রকে সরকারিভাবে জানানো হল— ভারত সচিব এক বছরের জন্য তাঁর ডেপুটেশন মঞ্জুর করেছেন। নিবেদিতার চেষ্টা বিফলে গেল না। এই সময় থেকেই আন্তর্জাতিক মহলে জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার পিছনে নিবেদিতার যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তা স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথও। 'জগদীশচন্দ্র' শীর্ষক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এই সময়ে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য। তখন থেকে তাঁর কর্মজীবন সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হল বিশ্বভূমিকায়।'

বসু দম্পতির সঙ্গে এই ইওরোপবাসের অনেক মধুর স্মৃতি জড়িয়েছিল নিবেদিতার জীবনে। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখা থেকে জানতে পারা যায়, এই সময়েই একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার হাত থেকে জগদীশচন্দ্র, অবলা বসু এবং নিবেদিতা অল্পের জন্য রক্ষা পান। ইওরোপ বাসের সময়েই একদিন যখন তিনজন রাস্তা দিয়ে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় আচমকা একটি গাড়ি

দ্রুতগতিতে প্রায় তাঁদের গায়ের ওপর এসে পড়ে। শেষ মুহূর্তে তিনজনই রাস্তার ধারে সরে যাওয়ায় অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যান। এই ঘটনার পর আতঙ্কিত জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমরা একদম মারা যেতাম।' তার উত্তরে শান্তস্বরে নিবেদিতা বলেছিলেন, 'তাতে কী, আমরা সবাই একসঙ্গেই তো মরতাম।'

লন্ডনে এসে পৌঁছনোর পর তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর দেখা হল নিবেদিতার। এর একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। লিখেছেন, 'দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর মাতা ও ভাই-ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ। মেরীর বিস্ময়ের সীমা নাই। তাঁহার শিশুকন্যা মার্গট পিতার ভবিষ্যৎবাণী সফল করিয়াছে। তাহার জীবন এক বিরাট মহৎ কার্যে উৎসর্গীকৃত, ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার চালচলন, কথাবার্তা, চিন্তাধারা সমস্তই পৃথক। মেরী সবিস্ময়ে কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন। ভারতের যে আধ্যাত্মিক জীবন নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহার আস্বাদ প্রিয়জনকে দিবার জন্য তাঁহার কী আগ্রহ! কত জিনিস তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন আত্মীয় এবং বন্ধুদের জন্য— মাটির প্রদীপ, ধূপ, ধূপদানি, নানারকমের মালা, কবচ, পাথরের নুড়ি, ছোট ছোট বেতের বাক্স, কৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি দেবতার ক্ষুদ্র পট। জিনিসগুলি তুচ্ছ, কিন্তু নিবেদিতার নিকট তাহাদের সৌন্দর্য কম নহে। বোতলে করিয়া আনিয়াছেন গঙ্গাজল। একদিন গোপালের মার সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিয়া নিবেদিতা যখন তাঁহার নিকট রক্ষিত মালাটি মাতাকে স্পর্শ করিতে দিলেন, তিনি অভিভূত হইলেন। কোথায় ইংল্যান্ড, কোথায় সুদূর ভারতবর্ষ! কিন্তু নিবেদিতা উভয়ের মধ্যে সংযোগসাধন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের নিকট ভারতবর্ষ যেন কত পরিচিত, কত প্রিয়।'

কয়েকদিন লন্ডন শহরে কাটিয়ে জার্মানির ভিসবাডেন শহরে এলেন নিবেদিতা। বসু দম্পতির সঙ্গে এখানেই মিলিত হন তিনি। এখানেই জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং শ্রীমতী লেগেটের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজির প্রয়াণের পর জোসেফিনের সঙ্গে নিবেদিতার এটাই প্রথম সাক্ষাৎ। অতীত স্মৃতিচারণায় ডুবে গিয়েছিলেন সেদিন দুজনেই। ভিসবাডেন থেকে অক্টোবর মাসে সবাই একত্রে লন্ডনে ফিরে আসেন। লন্ডনের ক্ল্যাপহ্যামে একটি বাড়ি ভাড়া করে বসু দম্পতির সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। সারা বুলও এই সময় আমেরিকা থেকে লন্ডনে এসে পৌঁছন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখা থেকে জানা যায়, এই সময় জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক অভিঘাত যাতে সফল হয় তার জন্য সারা বুলের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। নিবেদিতার 'ক্রেডেল টেলস অফ হিন্দুইজম' শীর্ষক পুস্তকখানিও এই সময়ে

প্রকাশিত হয়। দেখতে দেখতে ১৯০৭ সাল শেষ হয়ে গেল। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার লেখা থেকে জানা যায় ১৯০৭-এর ৩১ ডিসেম্বর নিবেদিতা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'A wonderful year! Began at Dum Dum. Ends in London. Two books—Comparative Electro-Physiology and Cradle Tales out— others proceeding— Oh blessed year! Mother!- Mother! Mother!'

লক্ষ্যণীয় যে নিবেদিতা নিজের ডায়েরিতে শুধু নিজের বইয়ের কথা লিখলেন না, জগদীশচন্দ্রের বইটিরও উল্লেখ করলেন। উল্লেখ করলেন এমনভাবে, যেন সেটিও তাঁরই নিজস্ব কোনো গ্রন্থ।

এবার ইংল্যান্ডে এসেও পিটার ক্রপটকিনের সঙ্গে আবার যোগাযোগ গড়ে উঠল নিবেদিতার। নিবেদিতার সঙ্গে ক্রপটকিনের যোগাযোগের বিষয়টি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ারও পূর্বে ক্রপটকিনের সংস্পর্শে আসেন নিবেদিতা। ক্রপটকিনের বৈপ্লবিক মতবাদ নিবেদিতাকে আকৃষ্ট এবং প্রভাবিত করেছিল। ক্রপটকিনকেই রাজনৈতিক গুরু বলে স্বীকারও করে নিয়েছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতার মাধ্যমেই বিবেকানন্দ এবং জগদীশচন্দ্রের সঙ্গেও পরিচিত হন ক্রপটকিন। আইরিশ বিপ্লবীদের ভিতরও ক্রপটকিনের প্রভাব ছিল। ১৮৯৯ সালে যখন স্বামীজির সঙ্গে লন্ডনে আসেন নিবেদিতা, সেই সময়েও ক্রপটকিনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল; এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। লন্ডনে পৌঁছেই ক্রপটকিনের সঙ্গে তিনি আবার যোগাযোগ গড়ে তুললেন। ক্রপটকিনকে ভারতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতেন তিনি এবং ক্রপটকিনের কাছ থেকে রাজনৈতিক পরামর্শ নিতেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, '...এইসব বন্ধু-বান্ধবের সহিত তিনি ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার কথাবার্তায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং তাঁহার কর্মপন্থাকে সমর্থন করিল। তিনি লন্ডনস্থ রুশীয় রাষ্ট্রদূতাবাসে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি সম্প্রতি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়া ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের—অথবা কুশাসনের একটি বাস্তব চিত্র তুলিয়া ধরিলেন।'

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখা থেকে জানতে পারি, অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিজ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি. কে. চেইন, সাংবাদিক নেভিনসন প্রায়ই নিবেদিতা এবং জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করতে আসতেন।

এছাড়া নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন 'রিভিউ অফ রিভিউজ'-এর সম্পাদক উইলিয়াম স্টেড এবং লন্ডনের 'দ্য কামিং ডে'-র সম্পাদক জন পেজ হপ। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার পদত্যাগী সম্পাদক এস. কে. র্যাটক্লিফও এই সময়ে লন্ডনে ছিলেন। তিনিও নিবেদিতার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে আসতেন। র্যাটক্লিফ এবং স্টেডের আগ্রহে নিবেদিতা এই সময় লন্ডনের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আবার লেখালেখি শুরু করেন। নিবেদিতার এই সময়ের লেখাগুলি মূলত দুধরনের ছিল। এক, মিশনারিরা ভারত সম্পর্কে যে মিথ্যা ধারণার জন্ম দিতেন এবং কুৎসা প্রচার করতেন, তার বিরোধিতা করা। ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি-দর্শনকে পাশ্চাত্যের সামনে উপস্থিত করা। এবং দুই— ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের দমনপীড়ন, ব্রিটিশ শাসনের কুফল এবং ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা। অচিরেই নিবেদিতার লেখাগুলি ব্রিটেনের বিদ্বজ্জন সমাজে সাড়া ফেলল। তেমনই মিশনারিরাও অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তাঁর ওপর।

ভারতীয় দর্শনকে পাশ্চাত্যের বিদ্বজ্জনদের কাছে উপস্থিত করায় নিবেদিতা কতখানি প্রয়াসী হয়েছিলেন, তা বোঝা যায় অধ্যাপক চেইনকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে। ১৯০৭ এর ২৭ ডিসেম্বর অধ্যাপক চেইনকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Meanwhile I want to say— you misread the Indian message until you understand that it is not I but my Beloved, who will remain eternally. You don't really want to be two eternally. On the contrary, what you want is an indissoluble Union. This, however, is qualified by your longing to remain ever conscious of the Union—

"I do not want to be sugar
I want to EAT sugar."

— and this means that while this is your desire, you will be eternally conscious. When the desire ceases, it will only be to be lost in the Beloved. This anguished cry of the poor tortured human heart is only the other side of the screen. It is its only proof of the truth of Eternal Rest in the Loved One. There is no death. There is no separation. There is only the will of God expressing Itself in Time and Space. The one is to you your Beloved. Do not for one instant fear to believe that She is with you and Eternal. When the heart is thus at Peace (and the FACT is better, not worse,

than our conception of it), Truth comes in, and one learns the how and why of all that has befallen.'

ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি ছিল নিবেদিতার। ভারতের রাজনীতি কোন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে— সে সম্পর্কে সর্বদাই খোঁজখবর রাখতেন তিনি। যে বিপ্লববাদের সূচনা তিনি এবং অরবিন্দ করেছেন বাংলায়, সে বিপ্লববাদের সমর্থনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে মত বিনিময় করতেন। তাঁদের মতামত জানতে চাইতেন। এ প্রসঙ্গে পিটার ক্রপটকিনের সঙ্গে নিবেদিতার মত বিনিময় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রপটকিন মনে করতেন, গোপন আন্দোলন দ্বারা কৃষক শ্রেণি থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভিতর রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করা এবং সমাজের প্রতিটি শ্রেণির পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া বিপ্লব-আন্দোলন সফল হতে পারে না। ক্রপটকিনের এই তত্ত্ব 'মিউচুয়াল এইড' নামে বিশ্বে প্রসিদ্ধ লাভ করে। নিবেদিতা ক্রপটকিনের এই মতকে সমর্থন করেন। রাশিয়ার বিপ্লব নিয়েও ওই সময় ক্রপটকিনের সঙ্গে নিবেদিতার আলোচনা হয়। সেই আলোচনা 'A chat with a Russian about Russia' শিরোনামে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিবেদিতার বহু লেখার মধ্যেও ক্রপটকিনের 'মিউচুয়াল এইড' গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কেও নিবেদিতা ক্রপটকিনের মতামত নিয়েছিলেন এবং ক্রপটকিনের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন— এ অনুমান করাই যায়।

ইতিমধ্যে ভারত এবং বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। বাংলায় বিপ্লবী কার্যকলাপ আরো জোরদার হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, 'বাংলায় এসব কাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন অরবিন্দ, কিন্তু তাঁর কোনো ব্যাপক পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হয় না। নিজে মিস্টিক স্বভাবের ছিলেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন মা (দেশমাতা ও কালী অবশ্যই সমার্থক) প্রয়োজনে সব জুগিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি শুধুই গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না—নরমপন্থীদের হাত থেকে কংগ্রেসের কর্তৃত্বও কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। প্রকাশ্যে কংগ্রেসের মাধ্যমে এবং গোপনে বিপ্লবীদের মাধ্যমে তিনি যুগপৎ আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন।' ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সুরাট কংগ্রেসে তিলক ও অরবিন্দ মডারেটদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার দরুণ পৃথক হয়ে গেলেন। সুরাটের অধিবেশনে কংগ্রেস ভেঙে যাওয়ার পর সরকারের কাছে মডারেটদের অন্যতম নেতা গোখলের মূল্য কমে গেল। পাশাপাশি, মডারেটদের নিজেদের বিরোধও প্রকাশ্য হয়ে পড়ল। গোখলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সম্পর্কে

বলেন, 'pompous and inefficient–' আর মতিলাল ঘোষকে 'sneak' আখ্যা দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার সহায়তায় হেমচন্দ্র কানুনগো বোমা তৈরির কৌশল শিখতে প্যারিসে যান। হেমচন্দ্র ফিরে আসেন ১৯০৮ সালে। এই ১৯০৭ সালেই বিভিন্ন স্বদেশী ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ঢাকার জেলাশাসক অ্যালেনকে হত্যা করার চেষ্টা হয়। দু-দুবার ছোটলাট ফ্রেজারের ওপর হামলার চেষ্টা হয়। মুরারিপুকুর রোডের বাগানবাড়িতে বারীন ঘোষ অস্ত্র সংগ্রহ করে 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম' প্রভৃতি গোষ্ঠীর ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে শুরু করেন। লাহোরে ইওরোপীয়দের ওপর হামলা হয়। রাওয়ালপিন্ডিতে দাঙ্গা হয়।

১৯০৭-এর ৬ ডিসেম্বর, মেদিনীপুরে কংগ্রেস অধিবেশনের দিনই ছোটলাট ফ্রেজারের ট্রেন বোমা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়। সেইজন্য লাইনের ওপর বোমাও ফাটানো হয়। কিন্তু ট্রেন উল্টায়নি। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'যেমন ফুলার বধে, তেমনি ফ্রেজার বধের ব্যর্থতায় বারীন্দ্রের উপনেতৃত্বের অকর্মণ্যতা প্রত্যক্ষ করা গেল।' সুরাট কংগ্রেসের তিনদিন আগে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেনের ওপর হামলা চালানো হয়। অ্যালেন গুরুতর আহত হয়েও বেঁচে গেলেন। বারীন্দ্র ঘোষ বললেন, তাঁদের দলভুক্ত কেউ এই হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল না। হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁদের 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'অরবিন্দ বারীনের কথা ছাড়া আর কারো কথা কানে তোলেন না। আর অন্যে যে Suggestion দেয়, ঠিক তার উল্টোটা করাই বারীনের স্বভাব।'

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'নিবেদিতার অনুপস্থিতিতে তাঁহারই অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকের দলই এইসব কাণ্ড করিতেছে। ভারতব্যাপী গুপ্ত সমিতিতে ছাইয়া ফেলা নিবেদিতার পরিকল্পনা। আরো উল্লেখযোগ্য যে, নিবেদিতা গুপ্ত সমিতিগুলিকে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ পল্লীমুখী করেন নাই। গেরিলা ও সশস্ত্র বিদ্রোহের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিবেদিতা ভারতব্যাপী গুপ্ত সমিতির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কথামত কাজ হয় নাই। এমনকি হেমচন্দ্রের কথামতও কাজ হয় নাই। অরবিন্দের এই সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। যদি থাকিয়া থাকে তো তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। বারীন্দ্রের হাম বড়াই— অদূরদর্শিতা হঠকারিতা নিবেদিতার সুষ্ঠু বৈপ্লবিক পরিকল্পনাকে হঠাৎ ধ্বংসের মুখে টানিয়া আনিয়া ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছে। ইতিহাস এই রূঢ় সত্যকে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না।'

হেমচন্দ্র কানুনগো এবং গিরিজাশঙ্কর— দুজনের লেখা পড়েই অনুমান করা যায়, অরবিন্দের পরিকল্পনার অভাব এবং বারীন্দ্র ঘোষের অপরিণত কাজকর্ম বিপ্লব

প্রচেষ্টাকে অনেকটাই নষ্ট করেছিল। ভারত ছাড়ার পূর্বে নিবেদিতা যে পরিকল্পনা করে যান— তা-ও নষ্ট হয়েছিল বারীন্দ্র ঘোষের অপরিণামদর্শিতার জন্য।

এ প্রসঙ্গে গিরিজাশঙ্কর আরো লিখেছেন, 'অরবিন্দ 'ভবানী মন্দির' নামে একখানি বিপ্লববাদের চটিগ্রন্থ—১৯০৫ সনের শেষভাগে, বারীন্দ্র কুমারকে দিয়া বাংলাদেশে পাঠাইয়াছিলেন। রাওলাট কমিটি এই চটিগ্রন্থের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, 'The book is a remarkable instance of perversion of religious ideals to political purposes', (R.C Report, p.17).

'অরবিন্দ এই 'ভবানী মন্দির' গ্রন্থে বলিলেন যে, মা সন্ত্রাসবাদী যুবকদলকে সকলরকম বিপদ-আপদে রক্ষা করিবেন; তাহাদের গুপ্ত হত্যা ও ডাকাতির কাজে সাহায্য করিবেন। ইহাই ছিল অরবিন্দের বৈপ্লবিক কর্মে ধর্মের প্রেরণা। ইহা অতিপ্রাকৃত; এবং নিবেদিতার বিপ্লবকর্মে 'আইরিশ রাশিয়ান' টেকনিক হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিবেদিতার টেকনিকে ধর্মের আবরণ নাই। অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কিছুই নাই। অরবিন্দ যে মা ভবানীর উপর কবিতা লিখিয়াছেন সেরকম কোনো কবিতা নিবেদিতা লেখেন নাই। বিপ্লবী অরবিন্দ ও বিপ্লবী নিবেদিতার পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য তাঁহাদের উভয়ের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। অরবিন্দের mysticism নিবেদিতার নাই। নিবেদিতার বিপ্লববাদের technique অরবিন্দের জানা নাই। একে অপরকে সম্পূর্ণ করিয়াছে— একথা বলা চলেও— আবার চলেও না।'

বিপ্লববাদী কার্যকলাপ ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় ব্রিটিশ সরকার সংবাদপত্রগুলির ওপর দমনপীড়ন শুরু করে দিয়েছিল এই সময়ে। ভারত ত্যাগের সময় নিবেদিতা 'যুগান্তর' পত্রিকার ওপর রাজরোষ এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাবাস দেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু এরপর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার ওপরও রাজরোষ নেমে এল। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার ভার বিপিনচন্দ্র পালের হাত থেকে অরবিন্দের হাতে আসার পর এর সুর অত্যন্ত চড়া হয়েছিল। আর 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের আক্রমণাত্মক লেখাগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। বড়লাট মিন্টো এইসব সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে কঠোর দমনমূলক পদক্ষেপ নিলেন। এইসব পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হল। এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হতে পারে শুনে অরবিন্দ পুলিশের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে আগাম জামিন নিলেন। কিন্তু 'বন্দেমাতরম'-এর বিরুদ্ধে যখন আদালতে মামলা উঠল— বিপিনচন্দ্র পাল তখন বিবেকের দোহাই দিয়ে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলেন। ফলে, বিপিনচন্দ্রের ছয়মাসের জন্য জেল হল। আর 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদক কে—সে ব্যাপারে কোনো উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ

না পাওয়ার কারণে অরবিন্দ বেকসুর খালাস পেলেন। বিপিনচন্দ্রকে বক্সার জেলে চালান করা হল। ১৯০৮-এর ৯ মার্চ বক্সার জেল থেকে ছাড়া পেলেন বিপিনচন্দ্র। ছাড়া পেয়ে বিপিনচন্দ্র ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন।

বিপিনচন্দ্রের মামলা চলাকালীনই আদালত প্রাঙ্গণে এক ব্রিটিশ পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে সুশীল সেন নামে এক চোদ্দবছরের বালকের হাতাহাতি হয়। ওই বালককে কিংসফোর্ড বেত্রাঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করেন। সুশীল সেন ছাড়া পেয়েই মুরারিপুকুরে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতিতে গিয়ে নাম লেখায়।

১৯০৭-এর ১৩ আগস্ট 'সন্ধ্যা' কাগজে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একটি আক্রমণাত্মক নিবন্ধ লেখেন। নিবন্ধটি রাজদ্রোহমূলক এই অভিযোগে ৩১ আগস্ট ব্রহ্মবান্ধবকে গ্রেফতার করা হল। ব্রহ্মবান্ধব আদালতে লিখিতভাবে জানালেন, 'I accept the entire responsibility of the paper and the article in question. But I don't want to take any part in the trial, because I do not believe that in carrying out my humble share of this God-appointed mission of 'Swaraj', I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development.'

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'মি. সি. আর. দাশ, বিপিন পাল ও উপাধ্যায় এই উভয়ের পক্ষে আদালতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই দুইজনের একজনেরও অপরাধ অস্বীকার করেন নাই। যেমন আসামী, তার উপযুক্ত কৌসুলী। উপাধ্যায়ের জবাবে মি. সি. আর. দাশের হাত ছিল, একথা মি. সি. আর. দাশ আমাকে বলিয়াছেন। বিপিনবাবুর জবাব বিপিনবাবু নিজেই লিখিয়াছিলেন। উপাধ্যায় মি. সি. আর দাশকে বলিয়াছিলেন, 'চিত্ত, ফিরিঙ্গির আদালতে মিছে কথা বলা হবে না।'...' ২৭ অক্টোবর ক্যাম্পবেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর লেখায় আর-একটি তথ্যও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গিরিজাশঙ্কর মনে করেন যে, নিবেদিতার পরামর্শেই হেমচন্দ্রকে প্যারিসে বোমা তৈরির কৌশল শেখার জন্য পাঠানো হয়েছিল। গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, 'ঠিক এই সময় (১৩ আগস্ট, ১৯০৬) সম্ভবতঃ নিবেদিতার পরামর্শেই বাংলার সিন্ ফিন অর্থাৎ যুগান্তরের দল বোমা তৈয়ারী শিখিবার জন্য হেমচন্দ্রকে প্যারিসে পাঠাইয়াছিলেন। দুইটি জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১ম, নিবেদিতা একই সময় একইসঙ্গে বন্দেমাতরম-এর সহিত সংশ্লিষ্ট, আবার সেই সঙ্গে গুপ্ত সমিতির

শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত। এইখানেই অরবিন্দের মতোই তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ জটিলতাপূর্ণ। ২য়, তিনি আইরিশ সিন ফিনদের কৌশলাদি (technique) সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতির যুবকদের শিক্ষা দিতে ব্যতিব্যস্ত। সিন্ ফিন্দের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞা।'

১৯০৮ সালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা— মুজফফরপুরে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসক কিংসফোর্ডকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির ছোঁড়া বোমায় দুই ব্রিটিশ মহিলার নিহত হওয়া এবং তারপর মুরারিপুকুর বোমা মামলায় অরবিন্দ ও বারীন্দ্রসহ অনেকের গ্রেফতার হওয়া। কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকিকে বোমাসহ প্রেরণ করার পরিকল্পনা মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে বসেই করা হয়েছিল। অরবিন্দ, চারুচন্দ্র দত্ত এবং রাজা সুবোধ মল্লিকের পরিকল্পনা এবং নির্দেশমতোই ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি মুজফফরপুরে যান কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে। ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল রাতে ভুলবশত তাঁরা যে গাড়িটিতে বোমা ছোঁড়েন, সেটিতে কিংসফোর্ড ছিলেন না। ছিলেন দুই ব্রিটিশ মহিলা। তাঁরা ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরের দিন এই সংবাদ পাওয়ার পর অরবিন্দ বললেন, রাতের অন্ধকারের জন্য এই ভুলটি হয়েছে (It was darkness— it was darkness— the mistake was due to that), প্রফুল্ল চাকি পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই আত্মহত্যা করলেন। ক্ষুদিরাম পালাতে গিয়ে ধরা পড়লেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হল। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে গেল। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মতো গবেষকরা এই অপরিণামদর্শী কার্যকলাপের জন্য বারীন্দ্র ঘোষকে দায়ী করলেন। গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন—'নিবেদিতার অনুপস্থিতিতে রাশিয়ান ও সিন্ ফিন্ টেকনিকে অনভিজ্ঞ, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতে কৌতূহলী— হয়তো বিশ্বাসী— অরবিন্দের নেতৃত্বে ও সবজান্তা, হামবড়াই বারীন্দ্রের উপনেতৃত্বে দেশ, জাতি এইসব অমূল্য জীবন হারাইল। মারিবার জন্য যদি গুলি ছুঁড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া যায়—মারিতে না পারা যায়—তবে সন্ত্রাসবাদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।'

অবশ্য, বিপিনচন্দ্র পালের মতো নেতারাও এই ধরনের গুপ্তহত্যার বিরোধী ছিলেন বহুদিন আগে থেকেই। এর আগে ১৯০৬ সালে 'সোনার বাংলা' নামক একটি গুপ্ত সমিতির পক্ষ থেকে একটি প্রচারপত্র মেদিনীপুরে বিলি করা হয়। এই প্রচারপত্রে গুপ্ত হত্যার সমর্থনে বক্তব্য জানানো হয়েছিল। মেদিনীপুরে সত্যেন বসুর মতো গুপ্ত সমিতির নেতাদের নির্দেশে ক্ষুদিরামই প্রচারপত্রটি বিলি করেছিলেন। এর বিরোধিতা করে ৩ অক্টোবর, ১৯০৬ তারিখে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, 'No

one outside a lunatic asylum will ever think of or counsel any violent or unlawful methods in India, in her present helplessness for the attainment of her civil freedom.'

ক্ষুদিরাম ধরা পড়ার পরই, ২ মে ১৯০৮, মুরারিপুকুরের বাগানবাড়ি থেকে অরবিন্দ, বারীন্দ্রসহ ৪৭ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। একবছর জেলে কাটিয়ে, ১৯০৯-এর ৬ মে, অরবিন্দ বেকসুর খালাস হলেন। বারীন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। মূলত চিত্তরঞ্জন দাশের জন্যই অরবিন্দ খালাস পেয়েছিলেন এবং বারীন্দ্রের ফাঁসির আদেশ রোধ হয়ে দ্বীপান্তর হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন আইনজীবী হিসাবে আদালতে লড়ে এঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অনেকটাই লঘু করে দিতে পেরেছিলেন। কীভাবে মামলাতে চিত্তরঞ্জন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি নস্যাৎ করেছিলেন, তার একটি উদাহরণ গিরিজাশঙ্কর দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'বারীন্দ্র সুরাট কংগ্রেসের সময় একটি গুপ্ত চক্র বসাইয়া অরবিন্দকে সুরাটেই লিখিয়াছিলেন, 'Dear Brother, —We must have sweets all over 'ndia readymade for emergency. I wait here for your answer.'

— Barindra Kumar Ghosh

'আলিপুর বোমার মামলায় ব্যারিষ্টার মি. সি. আর. দাস বারীন্দ্রের এই চিঠিখানিকে জাল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। উহা সুদক্ষ কৌসুলীর বাক্‌বিভূতির কৌশলমাত্র। কেননা, বারীন্দ্র নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার এই চিঠি জাল নহে, সত্য চিঠি।'

মুরারিপুকুর বোমার মামলাকে কেন্দ্র করে কারাগারের ভিতর আর-একটি বিস্ফোরক কাণ্ড ঘটেছিল। বারীন্দ্র ঘোষ পুলিশের কাছে গুপ্ত সমিতির সব তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার ফলে নরেন গোঁসাইকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ক্রুদ্ধ নরেন গোঁসাই এরপর রাজসাক্ষী হয়ে অরবিন্দসহ সমস্ত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন। নরেন গোঁসাইয়ের এই কাজের শাস্তিস্বরূপ ১৯০৯-এর ১ সেপ্টেম্বর জেলের ভিতর সত্যেন বসু এবং কানাই দত্ত নরেন গোঁসাইকে গুলি করে মারেন। এইভাবে যে নরেন গোঁসাইকে তাঁরা মারবেন সেকথা তাঁরা বারীন্দ্র ঘোষকে আগে জানাননি। ক্ষুব্ধ বারীন্দ্র এই ঘটনার পরে জেলের ভিতর সকলকে নিয়ে সভা করে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ১০ নভেম্বর কানাই দত্তের ফাঁসি হল। ২৩ নভেম্বর ফাঁসি হল সত্যেন বসুর। ওই বছরেই ৭ নভেম্বর ছোটলাট ফ্রেজারকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হল। অল্পের জন্য ছোটলাট বেঁচে গেলেন। ৯ নভেম্বর, প্রকাশ্যে পুলিশ অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জিকে রাজপথে গুলি করে হত্যা করা হল।

গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, 'নিবেদিতা কলিকাতায় থাকিলে বারীন্দ্রকুমার যেভাবে মানিকতলা বাগানের সন্ত্রাসবাদী যুবকের দলটিকে অরবিন্দের স্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিল, এবং পুলিশের নিকট গুপ্ত সমিতির সুস্পষ্ট নিয়ম ভঙ্গ করিয়া সমস্ত কথা ফাঁস করিয়া দিল, এবং দিয়া "My misson is over" বলিয়া গুপ্ত সমিতির বিরুদ্ধে যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিল, তাহা সম্ভব হইত না। কেননা, এরূপ কনফেশন (Confession, স্বীকারোক্তি) করিলে, নিবেদিতার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইবে।' গিরিজাশঙ্করের এই লেখাগুলি পড়লে এটুকু বোঝাই যায় যে, তিনি মনে করতেন নিবেদিতার অনুপস্থিতি বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটি অন্যতম কারণ। হেমচন্দ্র কানুনগোও এইরকম মতামত পোষণ করতেন।

অরবিন্দ 'আরো অত্যাচার' চেয়েছিলেন। বাস্তবে তা-ই হল। এরপর অত্যাচার চরমে উঠল। বিপিনচন্দ্র পাল আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, নিছক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে গুপ্ত হত্যা বা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম শুরু করলে, ব্রিটিশ রাজশক্তি তাকে দমন করতে যে পদক্ষেপ নেবে, তার ফলে 'জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে।' আসলে দূরদর্শিতায় বিপিনচন্দ্র অরবিন্দের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। অরবিন্দ দূরদর্শিতার অভাবে এই ভবিষ্যৎটি আঁচ করতে পারেননি। ফলে, একমাত্র পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্র ব্যাতীত দেশের আর কোথাও সেভাবে গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠল না, বা, বিপ্লববাদের প্রতি অন্য প্রদেশগুলিতে তেমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হল না।

নিবেদিতা এই সময়ে কী করছিলেন? যদিও নিবেদিতা ইওরোপে অবস্থান করছিলেন, কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি এই সময়ে নিস্পৃহ ছিলেন বা ভারতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ ছিল না—একথা মনে করা ভুল হবে। বরং ইওরোপে বসেও নিবেদিতা ভারতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ খোঁজ রাখতেন। শুধু তা-ই নয়, বিদেশে বসে লেখালেখির মাধ্যমে তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ এবং সমর্থন যেমন ব্যক্ত করতেন, তেমনি নিজেকে এদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতও রাখতেন। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর গ্রন্থে এই মতের সমর্থনে তথ্যও পাওয়া যায়। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, মুজফফরপুরে ক্ষুদিরামের ছোঁড়া বোমায় দুই ব্রিটিশ মহিলার মৃত্যু ও মুরারিপুকুর বোমা মামলার ঘটনার পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় পরপর কয়েকটি নোট প্রকাশিত হয়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন, এই নোটগুলি পড়লেই বোঝা যায় এইগুলি একজনেরই লেখা নয়। অধিকাংশই নিবেদিতার লেখা, তার ওপর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সংশোধন এবং

সংযোজন রয়েছে। শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, 'যত দূর মনে হয় নিবেদিতা মূল লেখাটি লিখে পাঠিয়ে দেন, (নিবেদিতা তখন পাশ্চাত্যে আছেন) তা মারাত্মকরকম তীব্র ছিল। তাই তার বিপজ্জনক অংশ রামানন্দ বাদ দিয়েছিলেন, বা বদলেছেন, এবং তাতেও তাদের যথেষ্ট ঠাণ্ডা করা না গেলে, মাঝখানে কুণ্ঠিত কিছু কথা যোগ করে দিয়েছেন।'

যে নোটগুলি 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল—(১) পলিটিক্যাল অ্যাসাসিনেশন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন সেন্টিমেন্ট, (২) দ্য জেনেসিস অফ টেররিজম্ ইন বেঙ্গল, (৩) পলিটিক্যাল অ্যাসাসিনেশন বাই বম্ব থ্রোয়িং, (৪) পলিটিক্যাল এনফ্র্যানচাইজমেন্ট বাই অ্যাসাসিনেশন, (৫) হাউ টু ডেয়ার অ্যান্ড ডাই, (৬) দ্য প্রবলেম অফ পাথ, (৭) দ্য গীতা অ্যান্ড বম্ব থ্রোয়িং। শঙ্করীপ্রসাদ লিখছেন, ভাষা এবং রচনারীতি বিচার করলে বোঝা যায়, প্রথম লেখাটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। কিন্তু দ্বিতীয় লেখাটি নিবেদিতার। দ্বিতীয় লেখার একটি এইরকম, 'The ultimate cause of terrorism in Bengal must be sought in the utterly selfish, high handed and tyrannical policy of the Government and in the contemptuous and insulting manner in which most official and non-official Anglo-Indians have spoken of and treated Bengalis...The Russianization of the administration in spirit and methods has led to the conversion of a samll section of the people to the methods of Russian terrorism. It is simply a question of action and reaction, 'stimulus' and response.'

এই লেখাটিতে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। তা হল, এই লেখায় বাংলায় সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নেবার জন্য ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার এবং লাঞ্ছনাকেই দায়ী করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ক্ষুদিরামের ছোঁড়া বোমায় কিংসফোর্ড নিহত হলে তা অন্যায় হত, এমন কথা কিন্তু বলা হয়নি। ৩, ৪ এবং ৫ নম্বর নোট তিনটি রামানন্দের লেখা বলেই মত শঙ্করীপ্রসাদবাবুর। তবে, ৬ নম্বর লেখাটি যে অতিঅবশ্যই নিবেদিতার, তা-ও বলেছেন শঙ্করীপ্রসাদবাবু। ৬ নম্বর লেখাতে আক্রমণাত্মক মেজাজ এবং রচনাভঙ্গি দেখে একেই নিবেদিতার লেখা বলে শনাক্ত করতে ভুল হচ্ছে না। তবে, এই লেখাটির ভিতর রামানন্দের দু-একটি সংযোজন এবং পরিমার্জন থাকলেও থাকতে পারে। ওই নোটে লেখা হয়েছে, 'Both the Government and the people are in the presence of most difficult problem. To Government we have nothing to say. For, the

bureaucracy may not understand that the highest courage and statesmanship consist in recognising one's mistake and retracing one's step from path of selfish tyranny, and that any furthur Russianization of the administration is sure to be confronted with a fiercer Russian response on the part of at least a section of the people.'

ওই নোটে আরো লেখা হয়েছে, 'Let them dare, but dare righteously, and die, if need be, in the country's cause. Let them not indulge in cowardly and insincere exaggeration in condemning the misguided youngmen under trial. It is not for us to judge. God will judge. It may be easy for arm-chair critics who are incapable of risking or sacrificing anything for humanity to inveigh in unmeasured terms against persons who have made a terrible mistake, but who, nevertheless, were prepared to lose all that men hold dear, for their race and country; —persons whose fall has been great, because, perhaps, equally great was their capacity for rising to the heights of being; but, for ourselves, we pause awe—struck in the presence of this mysterious tragedy of mingled crime and stern devotion.'

লেখাটি পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না, পরোক্ষে বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি ধ্বনিত হয়েছে প্রতিটি ছত্রে। ব্রিটিশ রাজশক্তি যখন চরম দমন-পীড়ন চালাচ্ছে, তখন এইরকম একটি লেখা লিখে সাহসের পরিচয় নিবেদিতা দিয়েছেন। তবে সেইসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেও বাহবা দিতে হয় এই কারণে যে, এইরকম একটি লেখা ছাপিয়ে তিনিও অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এই লেখাতে নিবেদিতা দুজন নিরাপরাধ ব্রিটিশ মহিলার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করবার পাশাপাশি, ভারতীয় নরনারীর ওপর ইংরেজদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও যাঁরা চুপ করে থাকেন—তাঁদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন, 'Deplore as we do the death of the two European women, and strongly condemn the murderous deed, we scorn to associate ourselves, even in our condolence and condemnation, with those Anglo-Indian editors and others who have not even a word of regret to express when brutal

Anglo-Indians kill inoffensive and defenceless Indians or assault helpless Indian women.'

এরপর আর বলে দিতে হয় না নোটটি কার লেখা। ৭ নম্বর নোটটিও নিবেদিতার লেখা বলেই মনে করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

নিবেদিতার সঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সৌহার্দ্য নিয়ে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। তবে, এখানে একটি উল্লেখ করা দরকার 'মডার্ন রিভিউ'-এর জন্মলগ্ন থেকেই নিবেদিতা এই পত্রিকাকে নানাভাবে সাহায্য করে এসেছেন। বিশেষত, এই পত্রিকার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তিনি যেসব লেখা একের পর এক লিখে গিয়েছিলেন, তা সত্যিই প্রশংসা এবং একই সঙ্গে বিস্ময়ের দাবি রাখে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তাদেবী লিখেছিলেন যে, 'তিনি (নিবেদিতা) 'মডার্ন রিভিউ'-এর জন্মকাল হইতে লেখা দিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে সম্পাদককে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন তেমনি সাহায্য সচরাচর কারো নিকট মেলে না। সম্পাদক বলিতেন যে, নিবেদিতা সাধারণত কথাবার্তার সময় সম্পাদকের কাজের দোষত্রুটি যাহা দেখিতেন তাহার কঠোর সমালোচনা করিতেন। সেই সমালোচনাও কম মূল্যবান ছিল না। এই-যে নানাভাবের সাহায্য, ইহার মূল্য নিবেদিতার মৃত্যুর পরেও সম্পাদক স্মরণ করিতেন। ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই।' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার জন্ম ১৯০৭ সনে। নিবেদিতার মৃত্যু ১৯১১-র অক্টোবরে। এই কটি বছর নিবেদিতা কিন্তু নিয়মিত লিখে গিয়েছেন 'মডার্ন রিভিউ'-এ।

নিবেদিতার সান্নিধ্যে এবং অনুপ্রেরণায় রামানন্দের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকাটিও চরিত্রগতভাবে অসম সাহসী হয়ে উঠেছিল। এবং রামানন্দও এমন সব লেখা লিখছিলেন, যার ফলে তাঁর ওপরও রাজরোষ বাড়ছিল। ১৯১০ সালে পাঞ্জাব ট্রিজনেবল কন্সপিরেসি মামলায় তাঁকে জড়িয়ে দিয়ে সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য লাহোরে ডেকে পাঠানো হয়। এই মামলায় সরকারি উকিল বিভান পেটম্যান রামানন্দকে রাজদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করে আসামীর কাঠগড়ায় তোলা উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন। 'মডার্ন রিভিউ' কাগজ রাজদ্রোহ ছড়াচ্ছে— এ অভিযোগও আনা হয়। কিন্তু 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সংখ্যাগুলি যখন আদালতে পেশ করা হয়েছিল, তখন এই পেটম্যানই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। 'মডার্ন রিভিউ' কাগজে তখন দেশীয় এবং বিদেশি চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি নিয়মিত ছাপা হত। এই ছবিগুলি ছাপার পিছনেও নিবেদিতার ভূমিকা ছিল। নিবেদিতাই উদ্যোগী হয়ে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় এই ছবিগুলি ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। পেটম্যান এই ছবিগুলি দেখে

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত সুর পালটে রামানন্দকে এই ছবিগুলি অ্যালবাম হিসাবে প্রকাশ করতে বলেছিলেন।

তবে, রামানন্দের ওপর রাজরোষ কিন্তু এতে কমেনি। বরং, রামানন্দের গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছিল। নিবেদিতার চিঠিতেই তার প্রমাণও পাওয়া যায়। ১৯১০ সালের ৬ জুলাই র‍্যাটক্লিফকে লিখেছিলেন নিবেদিতা, 'But the gag is awful— unthinkable. Ramananda for instance has reason to fear being brought up for DACOITY! He says he would be very glad to face a political charge— but as they know that he has piles of other evidence behind the military articles, which would at least be ventilated, they want to avoid this.'

যে নিবন্ধগুলির কথা নিবেদিতা উল্লেখ করেছিলেন, রামানন্দ ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কে সেই ১৩টি নিবন্ধ তখন পরপর লিখেছিলেন। এই নিবন্ধগুলি ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ওই চিঠিতে নিবেদিতা আরো লিখেছেন, 'Bhupen Bose went to Jenkins, and Jenkins sent word to P.L. Roy— who is evidently now one of the devils in hell— that it would not be well for him if he brought honourable men to the dock. Moti (Motilal Ghose) —who probably does not know all this— told me that the 'Bengali' yesterday published a rumour that P. Mitter, J. L. Roy and one other were to be arrested on the same charge. Publication is something of course, and Lawrence Jenkins is something— but how long can things go on!'

রামানন্দকে যদি গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে 'প্রস্তুত' থাকার জন্যও র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন নিবেদিতা। লিখেছেন, 'Please be ready, in case anything happens to Ramananda, to do what you can. I need not remind you how easily the prosecution might win the most ridiculous case.' রামানন্দ গ্রেপ্তার হলে র‍্যাটক্লিফ কী করতেন, বা কী করার জন্য র‍্যাটক্লিফকে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন নিবেদিতা, তা পরিষ্কার নয়। কিন্তু এটুকু আন্দাজ করাই যায় যে, রামানন্দ গ্রেপ্তার হলে নিবেদিতা একটা হেস্তনেস্ত করতে আসরে নামতেনই।

রামানন্দর গ্রেপ্তারি নিয়ে নিবেদিতা এরপরও আশঙ্কায় ভুগেছেন। ১৩ জুলাই র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন, 'On Saturday night, came news that the arrest had been definitely determined on— and that it might happen —

together with 10 others at anytime within a couple of weeks. A particular informant called Lalit Kumar Chakraborty is shut up within Fort William giving statements suggested by police. Rd's [Ramananda's] name will probably be brought up on 'East Bengal Dacoity' Charge. You know the type of the man— and how ridiculous.'

এরপর ১৯ তারিখ আবার র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন, 'We expected to hear of R's [Ramananda's] arrest. That was not made...'

২৮ জুলাই র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন, 'Ramananda is not yet taken— but may be anyday.'

তবে, শেষপর্যন্ত অবশ্য রামানন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। কোনো কারণে তাঁর নামটি অভিযুক্তদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এই সংবাদও নিবেদিতা জানিয়েছিলেন র‍্যাটক্লিফকে। ১৯১০-এর ১৪ অক্টোবর র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Ramananda was also in it— but his name was erased later from the list.'

প্রশ্ন উঠতেই পারে, কী কারণে রামানন্দকে অভিযুক্তদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল? এক্ষেত্রেও একটি অনুমান মনে আসে। ব্রিটিশ সরকারের অনেক কর্তাব্যক্তির সঙ্গেই নিবেদিতার সম্পর্ক বেশ ভালো ছিল। সেই প্রভাব খাটিয়ে নিবেদিতাই রামানন্দকে বিপন্মুক্ত করেননি তো? সঠিক জানার অবশ্য কোনো উপায় নেই।

মুজফ্‌ফরপুরের ঘটনা এবং মুরারিপুকুর বোমা মামলার প্রসঙ্গে তিলকের কী ভূমিকা ছিল— তা-ও এ প্রসঙ্গে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। বলতে গেলে, মুজফ্‌ফরপুরে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকির বোমা ছোঁড়ার ঘটনার ভিতর দিয়েই এদেশের রাজনীতিতে বোমার আবির্ভাব। এই ঘটনা এবং তার সূত্র ধরে মুরারিপুকুর ও অন্যত্র বোমা এবং অস্ত্র আবিষ্কার, অরবিন্দ-বারীন্দ্রসহ বিপ্লবীদের ধরপাকড় সেইসময় দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় পাঁচটি প্রবন্ধ লেখেন। তিলক বুঝতে পেরেছিলেন, এই বোমার রাজনীতির তাৎপর্য কী এবং ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি এটা কী ইঙ্গিত বহন করে আনছে। তিলক সরাসরি বোমার রাজনীতিকে সমর্থন করেননি ঠিকই, কিন্তু কোন পরিস্থিতি এই রাজনীতির জন্ম দিয়েছে, তা ব্যাখ্যা করে দেখান তিনি। তিলক তাঁর প্রবন্ধে লেখেন, 'আমরা কখনও ভাবিনি যে, ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

এত শীঘ্র এ পর্যায়ে পৌঁছবে। আমাদের দেশের ব্রিটিশ শাসকদের ঔদ্ধত্য ও বিকৃতি এত দ্রুত আমাদের তরুণদের এমন নৈরাশ্যের মধ্যে ঠেলে দেবে যে, দেশের অগ্রগতি ঘটাবার জন্য তারা বিদ্রোহের পথ ধরবে— তাও আমরা ভাবিনি।' ধৃত বিপ্লবীদের বিবৃতির ব্যাখ্যা করে তিলক লেখেন, 'কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ঘৃণায় তারা এই কাজ করেনি। তারা বোকা বা পাগল নয়। তারা জানে দু-একটা বোমা ছুঁড়ে ইংরেজকে তাড়ানো যাবে না। তারা ব্যক্তিস্বার্থচালিত নয়, তারা চোর বা বদমাশও নয়— তারা এই পথে নেমেছে ব্রিটিশ শাসকদের বেপরোয়া শক্তিমত্ততা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে।' বোমার রাজনীতিকে সরাসরি সমর্থন না করলেও এইসব কথা লিখে তিলক কিন্তু বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখলেন, 'সকলেরই জানা আছে, নিহিলিস্টদের বিদ্রোহ, যা রাশিয়ায় অবিরাম ঘটছে, তার কারণও একই। এই দৃষ্টিতে দেখলে বলতেই হয়, রাশিয়ার স্বদেশী প্রশাসকদের উৎপীড়ন-ব্যবস্থায় সেখানে যা ঘটেছে, সেটাই এখানেও ঘটছে বিদেশি শাসকদের অত্যাচারের কারণে। সবাই জানে, ব্রিটিশরাজ কতখানি শক্তিশালী। কিন্তু লাগামছেঁড়া ক্ষমতা-ব্যবহারকারী শাসকদের এ-ও জানা উচিত—মানুষের ধৈর্যের সীমা আছে।... বাঙালিরাও তো মানুষ, যত শক্তিহীনই তাদের মনে করা হোক। বহু বৎসর বিদেশি শাসনে থেকে ভারতবাসীর মন থেকে স্বাভাবিক রাগ-তাপ-তেজ ঠান্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তা শূন্য ডিগ্রিতে বরফ-ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে না। ...শাসকরা যদি এইপ্রকার দমনপীড়নের (রুশ পদ্ধতি) নিয়ে চলে, তাহলে ভারতীয় প্রজারা রাশিয়ার জনগণের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। যেমন চাষ, তেমনি ফলন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত সেইরকম সময় এসেছে যখন রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স এসব দেশের নিহিলিস্ট দলের মতো দল এদেশেও তৈরি হবে।' পরিশেষে ব্রিটিশ শাসকদের সতর্ক করে দিয়ে তিলক লিখলেন, 'মুজফফরপুরের মতো ঘটনা অবশ্যম্ভাবী।'

তিলকের প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালের ১২ মে। ১৯ মে আর একটি প্রবন্ধে তিলক লিখলেন, 'যখন শাসনকর্তারা অযৌক্তিকভাবে জনগণকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখে, তখন বোমার শব্দ শাসকদের এই বার্তা দেয় যে, যে জনগণ আগে হাতজোড় করে শাসকদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত, তারা এখন সেই অবস্থা থেকে উন্নীত হয়েছে।'

৯ জুন আর একটি প্রবন্ধে তিলক লিখলেন, 'বাংলার বোমার পিছনে রয়েছে দেশপ্রেমের আতিশয্য। বাঙালিরা নৈরাজ্যবাদী নয়। তারা শুধু নৈরাজ্যবাদীদের অস্ত্র ব্যবহার করেছে।' তিলক লিখলেন, ' সরকারের কঠোর নিপীড়ন ব্যবস্থা যদি বহাল

থাকে তাহলে বোমা বাংলার কুহকভূমি থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে আর কদিনই বা লাগবে?'

তিলকের এই জ্বালাময়ী লেখাগুলি স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ সরকারকে রুষ্ট করে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসকরা বেশ কিছু দিন ধরেই তিলককে শায়েস্তা করার উপায় খুঁজছিলেন। কারণ, তিলকই ছিলেন একমাত্র নেতা, যিনি কংগ্রেসে মডারেটরদের প্রভাব খর্ব করেছেন, বঙ্গভঙ্গ রদে বাংলার চরমপন্থী গোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তদুপরি তাঁর 'কেশরী' এবং 'মারাঠা' পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে সরকারবিরোধী নিবন্ধ লিখে গিয়েছেন। কাজেই, এই মওকায় তিলককে শায়েস্তা করার সুযোগ ছাড়তে চাইল না ব্রিটিশ প্রশাসন। তিলকের জীবনী থেকে জানা যায়, 'কাল' পত্রিকার সম্পাদক, চরমপন্থী লেখক শিবরাম পরাঞ্জপের বিরুদ্ধে আনা মামলার তদ্‌বির করার জন্য তিলক বোম্বাই এসেছিলেন পুণে থেকে। তিলককে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, তিনি বোম্বাইতে গ্রেফতার হতে পারেন। বোম্বাইয়ে তিলকের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় ১৯০৮-এর ২৩ জুন। পরদিন সন্ধ্যা ৬টার সময় সেটি কার্যকর করে তিলককে গ্রেপ্তার করা হয়। এর একটিই কারণ ছিল— যাতে তিলক আদালতে জামিনের আবেদন করতে না পারেন। ২৫ জুন তিলকের বাসভবন, 'মারাঠা' এবং 'কেশরী'র অফিসে পুলিশ তল্লাশি চালায়। ইংরেজ সরকার আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিল, তিলককে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কাজেই এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তিলক যাতে আত্মপক্ষ সমর্থন না করতে পারেন। তাঁর মামলায় স্পেশাল জুরি নিয়োগ করা হল। সেই জুরিরা মারাঠি ভাষা না জেনেই মারাঠিতে লিখিত তিলকের প্রবন্ধের বিচার করতে বসলেন। তাছাড়া, মারাঠি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধগুলির ইচ্ছাকৃত বিকৃতিও ঘটানো হল। তিলক নিজেই অবশ্য ২১ ঘণ্টা ধরে আত্মপক্ষ সমর্থনে আদালতে বক্তব্য রেখেছিলেন। তিলক আদালতে বলেন, 'আমি এখানে আপনাদের কাছে দয়াভিক্ষা করতে আসিনি। আমি আমার কাজের ফলাফলের সম্মুখীন হতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তাতে সন্দেহ করার কারণ নেই। আমি একথা কখনোই বলব না যে, ঐসব নিবন্ধ আমি খ্যাপামির ঝোঁকে লিখেছি। আমি পাগল নই। আমি ওগুলি লিখেছি, কারণ জনস্বার্থে ওগুলি লেখা কর্তব্য বোধ করেছি। আমার স্বদেশবাসীরও তা-ই মত বলে আমি মনে করেছি।'

তিলকের মামলাকে কেন্দ্র করে আদালতের সামনে উত্তেজিত জনতা ভিড় করেছিল। কিন্তু জনতার উপস্থিতিতে রায় ঘোষণা করতে চায়নি আদালত। বিকেল পাঁচটাতেও যখন রায় ঘোষণা হল না, তখন জনগণ ধরে নেয় যে, সেদিন আর রায় ঘোষণা হবে না। ফলে আদালত চত্বর ফাঁকা হয়ে যায়। এই সুযোগটার জন্যই

অপেক্ষা করেছিল শাসকরা। রাত আটটার সময় তড়িঘড়ি মামলার রায় ঘোষণা করা হল। তিলককে ৬ বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হল। তিলককে নির্বাসন দিয়ে, জনজীবন থেকে সরিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ শাসকরা যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্তিমিত করে দিতে চেয়েছিল এবং সে কাজে সফলও হয়েছিল, তা লিখেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ লেখক ভ্যালেনটাইন চিরল। চিরল লিখেছেন, '...it was by the prosecution of Tilak that the forces of unrest in the Deccan lost their ablest and boldest leader—perhaps the only one who might have concentrated their direction, not only in the Deccan, but in the whole of India, in his own hands and given to the movement, with all its varied and often conflicting tendencies, an organisation and unity which it still happily seems to lack.'

তিলককে এই নির্বাসন দণ্ড দেওয়ার পিছনে মডারেটদের মদত ছিল কিনা—তা পরিষ্কার নয়। তবে, তিলকের রাজনৈতিক উত্থান এবং প্রভাব বিস্তারে মডারেটরা যে খুব খুশি ছিলেন না এবং তিলকের গুরুত্ব খর্ব করতে তাঁরাও যে উৎসাহী ছিলেন, তা সত্য। সেক্ষেত্রে তিলককে নির্বাসনে পাঠানোর পিছনে মডারেটদের মদত থাকতেই পারে। এ সন্দেহ দূর হয় চিরলের লেখার একটি অংশ পড়লে। চিরল লিখেছেন, 'Sir George Clarke,...though... failed to secure the active support which he might have expected from the Moderates, there were few of them who did not secretly approve and even welcome his action.'

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, মুজফ্ফরপুর বোমা বিস্ফোরণ এবং মুরারিপুকুর বোমার মামলাকে কেন্দ্র করে তিলকের এই ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়, এবং সেইসঙ্গে অকুতোভয় একজন দেশনায়কের। একথাও অস্বীকার করা যায় না, তিলককে বাদ দিয়ে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে কোনো আলোচনাও করা সম্ভব নয়। উচিতও নয়। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও বারবার তিলকের প্রসঙ্গটি আসবে। কেননা, নিবেদিতার সঙ্গে তিলকের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়েও দুজনে অনেক কাছাকাছিই ছিলেন। গোখলের সঙ্গে নিবেদিতার যতই সখ্য থাকুক না কেন, তিলকের সঙ্গেই রাজনৈতিক মতৈক্য বেশি ছিল নিবেদিতার। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সময় তিলকের সঙ্গে নিবেদিতার দেখা হওয়ার পর অন্যান্য চরমপন্থী নেতাদের পাশাপাশি তিলকের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক ভাব আদান-প্রদান হয়েও

থাকতে পারে এই সময়ে। তবে, নিবেদিতার চিঠিপত্রে তিলকের খুব একটা বিস্তৃত উল্লেখ নেই। এটি অবশ্য একটু বিস্ময়েরই। সমকালীন রাজনীতিতে যে তিলক চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে নিবেদিতার কাছাকাছি ছিলেন—তাঁর কোনোই উল্লেখ নিবেদিতার চিঠিতে থাকবে না—এটা ভারতে একটু অবাকই লাগে। বিশেষত, সেই সময়ের রাজনীতিতে তিলক যখন উল্লেখযোগ্য একটি চরিত্র। তবে, নিবেদিতার চিঠিপত্রে তিলকের সরাসরি উল্লেখ না থাকার একটি কারণও থাকতে পারে। রাজনৈতিকভাবে যাঁদের ওপর সেই সময় পুলিশের নজর ছিল, বা, যেসব রাজনৈতিক চরিত্রকে ব্রিটিশ প্রশাসন 'বিপজ্জনক' মনে করত— সরাসরি তাঁদের নাম নিবেদিতা কোনো চিঠিতে উল্লেখ করতেন না। বা কোনো চিঠিপত্রে তাঁদের নাম সরাসরি উল্লেখ করলে বা তাঁদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে কোনো মন্তব্য বিশ্লেষণ করলেও— সেই সব চিঠিপত্র নষ্ট করে ফেলতেন বলেই মনে হয়। এটা নিবেদিতা করতেন ওইসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নিরাপত্তার জন্যই। যে কারণেই, ব্যক্তিগতভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও নিবেদিতার চিঠিপত্রে অরবিন্দের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে, এরকমই অনুমান হয় যে, যেসব চিঠিপত্রে অরবিন্দের উল্লেখ ছিল, তবে তা নিবেদিতা নিজে অথবা নিবেদিতার নির্দেশে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। তিলকের ক্ষেত্রেও এরকম হলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

তবে, নিবেদিতার কিছু কিছু চিঠিপত্রে অবশ্য তিলকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিলকের সম্পাদিত পত্রিকায় যেসব লেখা বেরত তার সম্বন্ধে নিবেদিতা যে ওয়াকিবহাল ছিলেন, তা বোঝা যায় ১৯০২ সালের ১ অক্টোবর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠিতে। ওই চিঠিতে কয়েকটি বক্তৃতার কথা উল্লেখ করে নিবেদিতা জোসেফিনকে জানিয়েছিলেন, তিলকের সম্পাদিত কাগজে তিনি ওই বক্তৃতা-সংক্রান্ত সংবাদ দেখতে পাবেন, 'I am to send you a copy of Tilaks paper containing a long report of the first. You will not be able to read the paper, but you will have no difficulty in finding the report.'

তিলক ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে নিবেদিতার যে একটি যোগাযোগ হয়েছিল, তা বোঝা যায় ১৯০৪-এর ৫ অক্টোবর গোখলেকে লেখা চিঠিতে। নিবেদিতা ঠিক করেছিলেন, ওই সময় ক্রিস্টিনের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরবেন এবং পুণেতে কয়েকদিন কাটাবেন। এ প্রসঙ্গে গোখলেকে তিনি লিখেছেন, 'An invitation has come for the 50th time from Sholapur and I think

that between October 20 and November 10 it would be well to give Sister Christine a holiday by accepting it and spending a few days there and also at Poona. Could this be arranged? I should like so much that Christine— the real hope of the women, though my name is used in that regard! —should meet Mrs. Ranade, and know the Maharatta ladies.

'And then we hope on the return journey to see Ellora and Ajanta.

'Ought I to write Mr. Tilak about Poona. Or can I leave this matter to you and others?

'I do want also to see Mr. Kolhatkar of Nagpore an Mr. Khaparde of Amravati.'

তিলকের 'ওরিয়ন' গ্রন্থটি পাঠ করে নিবেদিতা মুগ্ধ হয়েছিলেন। সে মুগ্ধতা তিনি গোপনও করেননি। ১৯১১ সালের ২৪ আগস্ট ড. চেইনকে লেখা একটি চিঠিতে নিবেদিতা বলেছেন, 'I am now reading for the first time Tilak's 'Orion'. Between him and Hewitt it is clear that most valuable historical data may be obtained from old modes of time reckoning. I suppose there would be traces of this in the Bible also?'

ওই বছরই ৩১ আগস্ট আবার ড. চেইনকে লিখছেন, 'I have been reading Tilak's wonderful first book, called 'Orion' and have been learning the admitted importance of ancient calenders. He works out a very clear theory of 6000 B.C. or there about as a date certified by its relics, in Indian literature. I am sure something of the sort is true. And he thinks the bulk of the hymns of the Rig Veda date from 4000 to 2500 B.C.— which is what he calls the Orion Period.'

কিন্তু মুজফ্ফরপুর বোমা বিস্ফোরণ এবং মুরারিপুকুর বোমা মামলায় তিলকের অসীম সাহসী ভূমিকা ও বিচারের নামে প্রহসন করে তিলককে নির্বাসন দণ্ড দেওয়ার প্রসঙ্গে নিবেদিতা কোথাও কোনো মন্তব্য করেননি। এটি কিন্তু আমাদের আশ্চর্য করে। এমন নয় যে, নিবেদিতা এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। নিবেদিতা পাশ্চাত্যে থাকলেও ভারতীয় রাজনীতির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তাঁর কাছে

নিয়মিত পৌঁছত। তিলকের বিচারের ঘটনা সে সময় সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফলে, সে সংবাদ যে নিবেদিতার কানে পৌঁছায়নি, এমন মনে করা ঠিক হবে না। মুজফফরপুরে বোমা বিস্ফোরণ এবং মানিকতলার বোমা মামলা নিয়ে নিবেদিতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ন রিভিউ'য়ে পরপর বেশ কয়েকটি নোট লিখেছিলেন। তৎসত্ত্বেও, তিলক প্রসঙ্গে নিবেদিতা একেবারে নীরব রইলেন কেন—তা কিন্তু বিস্ময়ের।

নিবেদিতার এই নীরবতার পিছনে দু-তিনটি কারণ অনুমান করা যায়। হয়তো গোখলের সঙ্গে সখ্যতা এবং গোখলের প্রভাবই তিলক সম্পর্কে নিবেদিতাকে উচ্ছ্বসিত হতে দেয়নি। আবার গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন, 'তবে কি তিলকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে নিবেদিতা কিছু সন্দিগ্ধ ছিলেন, তিলকের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনায় তিনি চিন্তিত ছিলেন? এর পক্ষেও যথেষ্ট প্রমাণ নেই। তবে এটা দেখা গেছে যে, তিনি অরবিন্দকেই ন্যাশনালিস্টদের নেতা বলে চিহ্নিত করেছেন, এবং বলেছেন, রক্ষণশীল মহারাষ্ট্রীয়রা এই নবজাতীয়তার তাৎপর্য বুঝতে সমর্থ নন। নবজাতীয়তা ক্ষাত্রধর্মকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হবে।'

তবে, এ সবই অনুমান। তিলকের এই সাহসী ভূমিকাটি সম্পর্কে কেন নীরব ছিলেন নিবেদিতা— তা কিন্তু রহস্য হিসাবেই থেকে যাবে।

নিবেদিতা ভারত থেকে পাশ্চাত্যের দিকে রওয়ানা দেওয়ার কিছুদিন আগে ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা কেয়ার হার্ডির সঙ্গে তাঁর এদেশেই দেখা হয়। হার্ডি সেইসময়ে এই দেশেই অবস্থান করছিলেন। হার্ডি এদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে নানারকম সংবাদ পাঠাতেন। তা নিয়ে লন্ডনে ব্রিটিশ সমাজে যথেষ্ট হইচই হত। নিবেদিতা লন্ডনে অবস্থান করাকালেই হার্ডি পাশ্চাত্যে ফিরে এলেন। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'কেয়ার হার্ডি লন্ডনে ফিরে এলে জনকয়েক ভারতীয় জাতীয়তাবাদীকে নিয়ে নিবেদিতা তাঁকে স্বাগত জানালেন। নিবেদিতার মত এই ভারতীয়েরাও 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা' বানিয়েছেন, একসঙ্গে কাজ করবার উদ্দেশ্যেই লন্ডনেই একটা সমিতি গড়েছেন। এ ব্যবস্থার সত্যই তখন প্রয়োজন ছিল, কেননা কাগজে ভারত সম্বন্ধে ভয়াবহ সব সংবাদ বার হচ্ছিল। বাংলার শহরে-শহরে খুন, দাঙ্গা হাঙ্গামা, বোমা ফাটানো, সেইসঙ্গে ব্যাপক ধরপাকড় আর নির্বিচারে ফাঁসি দেওয়া চলছে। ১৯০৮ সনের জুলাইয়ে তিলককে ছয় বৎসরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হল। তাঁর কি যে হল, দু'মাস পরে কেউ আর খবর পেল না। ব্রহ্মদেশের কোনও দুর্গেই আটকে রাখা হল, না পাঠানো হল আন্দামানে?

'এদিকে লন্ডনবাসী ভারতবন্ধুরা রুষ্ট হয়ে উঠলেন। হাউস অব কমন্সে নানা গুজব রটতে লাগল। ক্যাক্সটন হলে বসল প্রতিবাদ সভা। নিরঙ্কুশ অত্যাচার যে জাতীয়তাবাদীদের পিষে মারছিল, এতে আর সন্দেহ নাই।

'নিউজ পেপার অ্যাক্টে সমস্ত জাতীয়তাবাদী পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। এ খবর যখন এল, নিবেদিতা রাগে কাঁপতে লাগলেন। হাঁক দিলেন, 'ওরা বিদেশে চলে যাক!' এইবার নিবেদিতা বুঝতে পারলেন লন্ডনে তাঁর কী কাজ। ইওরোপে, ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় যেসব ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে তাঁকে। আর নিষিদ্ধ পত্র-পত্রিকাগুলি আবার গোপনে ছাপিয়ে বিতরণ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। নানান ছুতা দেখাবার চেষ্টা করলেও ভ্রমণ-সূচী দেখেই তাঁর আসল কাজের আভাস পাওয়া যায়। যেমন, ১৯০৮-এর সেপ্টেম্বরে নববিবাহিত ভাইকে দেখতে নিবেদিতা আয়ার্ল্যান্ডে গেলেন, আর ঠিক সেইসময়েই আইরিশ স্বতন্ত্রবাদী সাংবাদিকরা বাঙালি সম্পাদকের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রস্তাব আনলেন।'

এইদিক গিয়ে দেখলে, এই সময়ে নিবেদিতা এবং বিপিনচন্দ্র পালের রাজনৈতিক চিন্তার কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৮ সনের মার্চ মাসে বিপিনচন্দ্র কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পরেই ইংল্যান্ডে যান। বিপিনচন্দ্র মনে করতেন ইংল্যান্ডে প্রচারের মাধ্যমে ভারতের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা এবং তার ফলে ওদেশেও ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন গড়ে তোলা জরুরি। বিপিনচন্দ্র লিখেছেন, 'ইংল্যান্ডে কাজের প্রয়োজন আছে! লাজপতের মুক্তির কারণ ব্রিটিশ জনমতের চাপ। ভারত সরকার ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন।' নিবেদিতাও এই মতই পোষণ করতেন। কিন্তু অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী অরবিন্দ এই মত মানতেন না। অরবিন্দ লিখেছেন, 'বর্তমানে ইংল্যান্ডে কাজ নৈরাশ্যজনক, অর্থ ও শক্তির অপচয়।' গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'নিবেদিতার ভাইয়ের সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, ইংল্যান্ডের অধীনতা হইতে আয়ারল্যান্ডকে মুক্ত করিবার সমর্থনে যে সকল সংবাদপত্র বাহির হয় তাহা গোপনে বাংলাদেশে পাঠানো হইবে। তখন বাংলাদেশ অর্থই ভারতবর্ষ। আবার বাংলাদেশের বিপ্লবপন্থী কাগজগুলিও গোপনে আয়ারল্যান্ডে পাঠানো হইবে।' অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, নিবেদিতার ভ্রমণ কার্যসূচির অন্তরালে গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এবং পাশ্চাত্যে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রচারের জন্য তিনি যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন।

লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'মিসেস বুল এবং বসু পরিবারের সঙ্গে এ যাত্রায় আয়ারল্যান্ডে গিয়ে নিবেদিতার যেন নতুন করে চোখ খুলে গেল। ১৫ বছর পরে

আবার জন্মভূমিতে এসেছেন। দেশের মাটিকে চুম্বন করে হাত বুলোন মাটিতে, গাছপালাগুলোকে আদর করেন। সেই ছেলেবেলার আইভিলতা আর ঝোপঝাড়, তার ফাঁকে ফাঁকে জমে রয়েছে রাতের কুয়াশা। বাত্যাজীর্ণ ধ্বংসস্তূপে নিবেদিতার মনে পড়ে ও দেশের কৃষকের জীবন সংগ্রাম, চোখে পড়ে খ্রিষ্টপূর্ব এক আর্য সংস্কৃতির নিদর্শন। মাঠে কর্মরত কৃষকের সঙ্গে কথা বলবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েন, — শোনেন আয়ারল্যান্ডকে নিয়ে কি গর্ব তাদের। স্বাধীনতা লাভের কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাদের তেজোদৃপ্ত, কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে ভারতের জন্য চোখে জল আসে। হায়রে, এদেশের তুলনায় ওদেশের প্রস্তুতি কতটুকু! তার আক্ষেপ দেখে ভাইয়ের মনে যেন ঈর্ষার কাঁটা ফোটে। দিদির অন্তরে আয়ারল্যান্ডের স্থান অধিকার করেছে ভারতবর্ষ।'

আয়ারল্যান্ডে ভাই এবং ভ্রাতৃবধূর সান্নিধ্য যে নিবেদিতা যথেষ্ট উপভোগ করেছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে চিঠিতে। ১৯০৮ সালে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Rich (Richmond) and Beatrice have been so good to me! She seems now to be far more one of us than of her own family, and there is an Indian girl studying medicine in Dublin for whom she is willing to do anything socially. Isn't this nice? Basides all this, we are really studying Ireland— and the Man of Science (Jagadish Chandra Bose) derives the greatest benefit from it all.'

এই চিঠিটি নিবেদিতা লিখেছেন আয়ারল্যান্ডে ছুটি কাটিয়ে আমেরিকা যাওয়ার পথে। এই চিঠিতে স্বামীজির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথের জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধও জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। 'যুগান্তর' মামলায় ১১ মাস কারাবাসের পর মুক্তি পেয়ে ভূপেন্দ্রনাথ তখন বিদেশে একটি চাকরির খোঁজ করছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন, 'I am writing to YOU and NOT to S. Sara, about Swamis youngest brother— Bhupandra Nath Dutt to whom Christine refers as 'The Ocean's protege', because I would rather not have to ask S. Sara's help for any Indian boy in America, if I can avoid it. But that would not prevent your asking, if you wished. Bhupendra was in prison for 11 months— getting of 1, because of good conduct. His CHARACTER is perfectly wonderful— but I understand that he has no trace of

Swami's great intellect. We— the man of science and I— think it would be a splendid thing if he could go into some business establishment— like Mr. Leggett's or Mr. Roethhisberger's and earn his living there— picking up incidentally a training in business ways. But as I say this quite in the dark as to his feelings and ideas, you will not attach too much importance to it. He is really a splendid fellow— and has smile which will remind you irresistibly of the great Brother. He is manly and heroic and went to prison, entirely in order to screen others. He declared himself the sole responsible person— whereas really he was neither Editor nor the proprietor of the prosecuted paper. He has always refused to marry, and Swami— when He found him determind on this point gave him the blessing of 'a very very great man'. But I don't think I have to plead for him with you. As you will see from Christine's letter, he can be found through Miss Waldo 249 Manroe St. Brooklyn.'

চিঠিটি পড়েই বোঝা যাচ্ছে, স্বামীজির কনিষ্ঠ ভ্রাতাটির জন্য কতখানি উৎকণ্ঠিত ছিলেন নিবেদিতা। স্বামীজির অবর্তমানে স্বামীজির মা এবং ভ্রাতাদের জন্যই যে কার্যত তাঁর এই উৎকণ্ঠা— তা নিবেদিতার পত্রে বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই চিঠিটি যে সময়ে লেখা, কারাবাসের কারণে এদেশে কোনো চাকরি জোটেনি বলে ভূপেন্দ্রনাথ চাকরির খোঁজে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও চূড়ান্ত আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন তিনি। অন্যদিকে স্বামীজির মাতাও কলকাতায় আর্থিক সংকটের কারণে কনিষ্ঠ পুত্রকে বিদেশে টাকা পাঠাতে পারছিলেন না। এই অবস্থার কথা জানিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ সিস্টার ক্রিস্টিনকে একটি চিঠি দেন। ১৯০৮-এর ২৩ আগস্ট ক্রিস্টিন নিবেদিতাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকেই এই তথ্য জানা যায়। ক্রিস্টিন লিখেছেন, 'The Ocean protege needs help. He had a letter to Miss Waldo but it seems that she had gone away for the summer. He had practically no money. His mother has the ten thousand which I left her out at interest and can not realise it for a month or two, after that she will send it. But you know the sacrifice that would be. He will need a home in the beginning, after that he

can probably take care of himself! Do you think S. Sara would take him in? Miss Waldo is too have to do anything. His brother asked me to write to you some times ago to ask you to organise some help for him but I could not write sooner. Miss Waldo, 249 Manroe Street, Brooklyn will know his address.'

বারবারা ফক্সের লেখা 'লং জার্নি হোম' গ্রন্থ থেকে জানা যায় আয়ারল্যান্ডে বসু দম্পতি এবং রিচমন্ডের পরিবারের সঙ্গে বেশ আনন্দে, হইচই করেই একটি মাস কাটিয়ে দিয়েছেন নিবেদিতা। বারবারা ফক্স লিখেছেন, আয়ারল্যান্ডে এই একটি মাস জগদীশচন্দ্র নানারকম মজার মজার গল্প বলে, হাসিঠাট্টা করে সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন। জগদীশচন্দ্রের বলা একটি মজার চুটকিরও উল্লেখ করেছেন ফক্স। চুটকিটি এইরকম— একটি লোক সবসময়ে ভাবত তাঁকে দেশের রাজা বলে ভুল করে সবাই। একদিন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বলে, 'এ আর এমন কী! প্যারিসের রাস্তায় তো একজন আমার পিঠে চাপড় মেরে বলেছিল— সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আপনি এখানে!' আর-একদিনের একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছেন ফক্স। লন্ডনে রিচমন্ড আর তাঁর স্ত্রী মাঝে মধ্যেই ইংলিশ পাবে যেতেন। একদিন আয়ারল্যান্ডের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে রিচমন্ডের স্ত্রী বলেছিলেন, 'আমাদের একটা ভালো পাব খুঁজে বের করতে হবে।' সেইসময় রিচমন্ড এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নিবেদিতাও ছিলেন। রিচমন্ড স্ত্রীর কথায় অস্বস্তিতে পড়ে যান। কারণ, একে তো নিবেদিতা সন্ন্যাসিনী, তদুপরি, সেইসময় আয়ারল্যান্ডে মেয়েদের পাবে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। নিবেদিতা ভাইয়ের অবস্থা বুঝতে পেরে অস্বস্তি দূর করতে তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, একটা ভালো দেখে পাব আমরা খুঁজে বের করব।'

ওই বছর সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ তারিখ নিবেদিতা এবং বসু দম্পতি আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ৫ অক্টোবর তাঁরা বোস্টনে এসে পৌছলেন এবং সারা বুলের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। পরদিন নিবেদিতা গ্রিন একরে বেড়াতে গেলেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামীজি জনৈকা মিস ফার্মারের আমন্ত্রণে কয়েকদিন গ্রিন একরে অবস্থান করেছিলেন। এখানে খোলা জায়গায় একটি তাঁবুর ভিতর থাকতেন স্বামীজি। গাছের নীচে বসে ভক্তদের বেদান্তের ক্লাস নিতেন। এই জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। গ্রিন একর দর্শনের পর নিবেদিতা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, 'This is like Dakshineswar or Belur Math; for, Swamiji was here.'

নিবেদিতার ডায়েরির এই অংশটি প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা তাঁর লেখা নিবেদিতার জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। আমেরিকায় পরিচিত অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎও হল নিবেদিতার—এঁদের মধ্যে ছিলেন মিস এমা থার্সবি, মাদাম কালভে, মিস ফার্মার প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই নিবেদিতার কাজে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মিসেস লেগেট এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে কয়েকদিন রিজলি ম্যানরেও ছুটি কাটিয়ে এলেন নিবেদিতা। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'তিনজনেরই স্বামিজীর সহিত অবস্থানের দিনগুলি মনে পড়িতে লাগিল।' নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে নিবেদিতা তাঁর স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহের লক্ষ্যে বক্তৃতা সফরে বেরিয়ে পড়লেন। উইনস্লো, কনকর্ড, হার্টফোর্ড, আলবেনি, পিটসবুর্গ, ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বাল্টিমোরে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলি বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তু ছিল—'প্রাচ্যের নারী এবং শিক্ষা,' 'নারীর আদর্শ,' 'প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য', 'বেদান্ত' এবং 'ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে ভারতীয় ভাবনার গুরুত্ব।' এই সময়ে কয়েকদিন নিউইয়র্কে বিখ্যাত সংগীতশিল্পী এমা থার্সবির বাড়িতেও অতিবাহিত করেন নিবেদিতা।

এই সময়েই বিশিষ্ট সাংবাদিক এফ. জে. আলেকজান্ডারের সঙ্গে পরিচয় হয় নিবেদিতার। আলেকজান্ডার ভারত সম্পর্কে খুব কৌতূহলী ছিলেন। যে কারণে, নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় করতে এবং ভারতীয় রাজনীতি, সমাজনীতি এবং দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন। ওই সময়ে নিবেদিতা একটি সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে আলেকজান্ডার তাঁর এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়ে আলেকজান্ডার লিখেছেন, 'I had long since read certain of her writings, and therefore it was with something like reverent expectation that I anxiously awaited the hour I was to meet her. But a railway station is not the most advantageous of places for making acquaintances, and worst of all is a railway station in the city of New York. Yet for me the meeting was most interesting in spite of this difficulty. A friend of the Sister and myself had been waiting for some considerable time, scrutinizing the different trains that came from Boston.

'We had almost given up hope, when the last train from Boston came plunging in the distance. We said, 'Let us wait for the last

train and if she is not aboard this train, let us give it up.' The train was slowing down and in a minute it was beneath the huge shed of the Grand Central Station and in another minute the compartments were getting emptied of their loads of human freight. It was an exciting scene, people pouring in and out of the station gates and the passengers dashing here and there and everywhere. We strained our eyes for several minutes. My heart was throbbing with anticipation and I was getting on edge. 'There she is', my friend cried out. And my eyes fell upon a woman of about medium height, dressed in a garb resembling that of a nun. She was carrying her own package and walked along with an intensity of manner that would confuse even a New Yorker, accustomed to strenous life of a big city. 'Come, let us have tea', were the first words after she had bid us greeting. And so we went into the adjoining restaurant, where amidst the refreshing influence of tea I had my first glimpse of the Sister Nivedita.'

আলেকজান্ডারের সঙ্গে সেদিন প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা আলোচনা করেন নিবেদিতা। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে ভারতীয় দর্শন— সবকিছুই সেই আলোচনায় স্থান পেয়েছিল। সেই আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে পরে আলেকজান্ডার লিখেছিলেন, 'During my journalistic experience of five or six years, during which time I have interviewed all types of people from United States Senators to interesting had- carriers and from famous artists to turbulent leaders of labour, I have never meet a personality which impressed me in less than an hour's time with being possessed of such a synthetic mind and cyclonic personal energy.'

নিবেদিতা সম্পর্কে আলেকজান্ডারের এই লেখাটি ১৯১২ আগস্ট মাসে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি পড়ে বোঝাই যায় আলেকজান্ডার কতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন নিবেদিতার সঙ্গে কথা বলে। নিবেদিতার কথাবার্তায় আলেকজান্ডার এতখানি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, পরে যখন তিনি কলকাতা আসেন তখন প্রায়ই নিবেদিতার বাড়িতে যাতায়াত করতেন।

তবে, আমেরিকায় অবস্থানকালে নিবেদিতা আরো কিছু কাজের সঙ্গেও জড়িয়ে ছিলেন। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'আমেরিকায় গিয়ে শুধু সাংবাদিকের দায় নয়, মিসেস বুলের দাক্ষিণ্যে যেসব হিন্দু ছেলে ওখানে পড়ছে, তাদের মায়ের স্থান নিতে হল নিবেদিতাকে। গত এক বছরে রাজনীতিক নির্বাসিতেরাও এসে জুটেছেন। জেল-ফেরত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের মধ্যে ছিলেন। ছাত্র শিক্ষানবিশ শ্রমিক সবাই একটা না একটা কাজ শিখে নিচ্ছে। বরাদ্দ টাকা দুদিনেই ফুরিয়ে গেছে, এখন এরা নানাভাবে অর্থ ও সাহায্যের প্রত্যাশী। ভিক্ষা করে যোগাড় করতে হবে অনেক কিছু। পলাতক রাজবন্দীদের আস্তানার জন্য ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে নিবেদিতার একটা বাড়ি কেনার মতলব ছিল। যে তিনমাস মাসাচুসেটস-কেমব্রিজে মিসেস বুলের বাড়িতে ছিলেন, এইসব কাজেই তাঁর সারাক্ষণ কাটত।'

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'তারক দাস, ভূপেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি যে দুই- চারিজন পলাতক বিপ্লবী আমেরিকায় ছিলেন, তাঁহারা নিবেদিতার নিকট প্রায় যাতায়াত করিতেন। বিদেশে ইহাদিগকে পরামর্শ ও উপদেশ ব্যতীত সর্বপ্রকার সাহায্যদানে তাঁহার কী আগ্রহ। ভারতবর্ষে স্বাধীনতালাভে সহায়তার জন্য গঠিত আমেরিকান লীগের সভাপতি জে.টি. সান্ডারল্যান্ডের সহিত তাঁহার বহু আলোচনা হয়।'

এ প্রসঙ্গে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী একটি তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'নিবেদিতা চিন্তা করিলেন যে, ভারতবর্ষে ফরাসী উপনিবেশের কোনও স্থানে এই সকল পলাতক বিপ্লবীদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা। কিন্তু এজন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। অতএব তিনি অর্থ সংগ্রহে মন দিলেন।

'তিনি বাল্‌টিমোর (Baltimore), বোস্টন্‌ (Boston) ও নিউইয়র্ক (New York) শহরে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং বৎসরের শেষভাগে এই বক্তৃতার ফলে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন।' গিরিজাশঙ্কর এই ইঙ্গিতই দিয়েছেন যে, নিবেদিতার ওই বক্তৃতা সফরগুলি শুধুমাত্র স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ছিল না, তার অন্য আর-একটিও লক্ষ্য ছিল। তবে, এই তিনটি লেখা থেকে এটুকু পরিষ্কার যে— আমেরিকায় অবস্থানকালে পলাতক বিপ্লবীদের সঙ্গে নিবেদিতার একটি নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এবং এটাই স্বাভাবিক যে, তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতা রাজনৈতিক পরিকল্পনাও করতেন।

আমেরিকায় থাকাকালীন নিবেদিতা আরো একটি কাজও করেন। ইতিমধ্যেই মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম থেকে স্বামীজির রচনা ও বক্তৃতাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বামীজির একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশের ব্যাপারে স্বামী বিরজানন্দও বিশেষ উৎসাহী হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে নিবেদিতা যথাসাধ্য সাহায্যও করেন।

আমেরিকায় এসে নিবেদিতা মেরি হেলকে লেখা স্বামীজির পত্রগুলি সংগ্রহ করেন। নিবেদিতার অনুরোধে মেরি হেল পরিবারের অন্যান্যদের লেখা স্বামীজির পত্রগুলিও নিবেদিতাকে দেন। নিবেদিতা চিঠিগুলির হুবহু নকল করে তা মায়াবতীতে পাঠান। মেরি হেল কয়েকদিনের জন্য নিবেদিতাকে শিকাগো এসে ছুটি কাটিয়ে যেতে অনুরোধও করেন। কিন্তু নিবেদিতা শিকাগো যেতে পারেননি।

এই সময়ে নিবেদিতার মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মা-র অসুস্থতার সংবাদ শুনে নিবেদিতা ইংল্যান্ড ফিরে আসা মনস্থ করেন। ১৯০৯-এর জানুয়ারিতে নিবেদিতা ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন। নিবেদিতার মা তখন মৃত্যুশয্যায়। অসুস্থতার সংবাদ শুনে মা মেরি ইসাবেল হ্যামিলটন নোব্‌লকে একটি চিঠি লিখেছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৮-এর ১৭ নভেম্বর ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Blessed, blessed, blessed one, we all love you!— and oh, how you love us. How you have loved and worked and suffered and never grudged it, through all these years. It is only this love that exists, Darling, not the poor expression. Oh! when this reaches you, perhaps you will be in pain, too great to have it read to you, Darling! I am praying, praying, praying all the time for you. Oh! if only you were not in pain. If only I could take it for you.

'Poor darling, poor darling. My sweet mother, the ideal love in all calm and whenever I go and pray for you in the little Meditation room such a stillness comes to me. I can be so quiet, and I send it to you, dear. Beloved, Beloved, God enfold you.

'This world is all a dream. God alone is real.

Siva! Oh Siva! Carry my heart to the other shore.'

লন্ডনে ফিরে এসে নিবেদিতা উঠলেন তাঁর বোনের বাড়িতে। নিবেদিতার অসুস্থ মা তখন সেখানেই ছিলেন। নিবেদিতার আক্ষেপ ছিল, তিনি তাঁর মা-র জন্য কিছু করতে পারেননি। শেষের কটা দিন মা'র পাশে উপস্থিত হয়ে প্রাণ ঢেলে শুশ্রূষা করেছিলেন নিবেদিতা। এর একটি বিবরণ দিয়েছেন লিজেল রেমঁ—'হোয়ার্ফ ডেলের বাড়িতে বোনের বাড়ি। সময় থাকতেই নিবেদিতা পৌঁছলেন গিয়ে। রোগিণী তাঁর প্রতীক্ষায় ছিলেন। জানতেন মেয়ে আসবেই। যাঁর পায়ে সন্তানকে উৎসর্গ করেছেন, শেষ মুহূর্তে তিনি নিবেদিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। সব ভাবনা বিসর্জন দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে নিস্পন্দ দেহে অপেক্ষায় ছিলেন মা, তাঁর মার্গারেট আসার

আগেই যেন জীবনদীপ নিবে না যায়। মেয়ের কবোষ্ণ স্পর্শ অনুভব করবেন মৃত্যুশীতল হাত দু'খানিতে, হৃদয়ে হৃদয় রেখে খুলে দেবেন অন্তরের দ্বার।

'দেখা হল। অমৃতের দূত তখন হংসশুভ্র পক্ষ বিস্তার করে ধীরে নেমে আসছে। জীবনদেবতার সান্নিধ্যে একটি হাসির আভা ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে।

'মা গো! তোমার চোখের আলোয় যে দেবতার হৃদয়কে দেখছি আজ!'

'আর তুই? তুই যে আমার কাছে তাঁর করুণার নিশ্চিত আশ্বাস।'

'অমৃতলোকে ভূমিষ্ঠ হতে চলেছ মা, মৃত্যু তো একটা নবজন্ম শুধু। আমার প্রার্থনা আর ভালোবাসা তোমার সঙ্গী হো'ক সে- রহস্যলোকে।'

'অমৃত প্রাণের প্রশান্ত অনুভবে ঘরে যেন ভরে উঠল। মৃত্যুর বিভীষিকা কোথায় মিলিয়ে গেল। নিবেদিতা দেখছেন, গুরু তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পথের দিশা দেখিয়ে দিচ্ছেন। আনন্দে তাঁর দুচোখ বেয়ে ধারা নামল।'

২৬ জানুয়ারি সকাল থেকেই মেরি ইসাবেল নোব্‌লের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'মাতার শয্যাপার্শ্বে নিবেদিতা ফুলের গুচ্ছ রাখিলেন, বাতি জ্বালিয়া দিলেন; ধূপের গন্ধে কক্ষ ভরিয়া উঠিল। সর্বত্র বিরাজ করিতে লাগিল এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি। নিবেদিতা মাতার শিয়রে বসিয়া ধীরে 'হরি ওম্‌' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন— মৃত্যুপথযাত্রীর কানে ইহাই যেন শেষ শব্দ হয়, এবং যাত্রাকালে হৃদয়ে যেন শান্তি ও আনন্দ থাকে।'

মায়ের এই অন্তিম মুহূর্তটির বর্ণনা নিবেদিতা দিয়েছেন ২৬ তারিখেই তাঁর একটি লেখায়। তিনি কাকে উদ্দেশ্য করে লেখাটি লিখেছিলেন তা বোঝা যায় না। নিবেদিতা লিখেছেন, 'Oh! what a spell of peace is in the room where she lies, the room she has left. The torture of constant nausea was terrible, was a long haemorrhage set in on Thursday, it would have grown intolerable but for the morphia that kept her soothed and unknowing. When she did come back to the misery of the phyical side of things she would ask in disappointment, 'What, here still?' But Mary has been surprised that there was not more agonising pain. That ceased on the day she wrote of, and except for a moment once or twice, never returned.

'Isn't this wonderful?

'I think the shock to her refinement as finding herself overwhelmed by the terrible morphia nausea was perhaps

the most terrible thing that she suffered. Of her absolute starvation since Friday morning last, she was kept unconscions. She took tea twice on Friday with pefect gaiety and cheer, in spite of the dreadful consequences, but the Holy communion on Saturday was our last common festivity. I had prayed so hard that it would not nauseate her, and do you know, it seemed to do her good.

'There have been many many touches of the world beyond the veil, but of these I shall write and tell you later. For the present she is sleeping in her beautiful room upstairs, and her sleep is sound and sure. Rich is to arrive in the morning.

'Oh if you could only have heard her references to you throughout the days when she could talk. I have told you alreaday how she coupled your name with our Father's on Saturday. Another day, she said if only you had been here, you would have protected her.

'...It was you who enabled me to come at the right moment, so that she was "fully satisfied."

মায়ের অন্তিম সময়ে এই লেখাটি কার উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন নিবেদিতা? এই লেখাটি তিনি কাউকে সম্বোধন করে লেখেননি। তবে, বোঝাই যায়, এমন কাউকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন— শোকের মুহূর্তে যাঁর সাহচর্য নিবেদিতার কাছে কাঙ্ক্ষিত হয়েছিল। যাঁর কৃপা তাঁকে শেষ মুহূর্তে মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের শয্যার পাশে উপস্থিত থাকতে সাহায্য করেছিল। তিনি কি স্বামী বিবেকানন্দ? চিঠির শেষ অংশটি পড়লে এইরকম ধারণাই অবশ্য হয়। আর তখনই এ বুঝতেও অসুবিধা হয় না—সশরীরে না থেকেও, স্বামীজিই শোকে তাপে নিবেদিতার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন।

অন্তিম সময়ে নিবেদিতার মা মেরি ইসাবেল নোব্ল ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকে যেন হিন্দুমতে দাহ করা হয়। বোঝাই যায়, তাঁর এই ইচ্ছার পিছনে কন্যা নিবেদিতা এবং স্বামীজির প্রভাব কাজ করেছিল। মায়ের মৃত্যুর পর ১৯০৯-এর ৩০ জানুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'One of the last coherent things she said, was that she was 'dying an Indian death.' We think her mind was turning towards Cremation, for Which she

wished. It was carried out on Thursday afternoon, and our own clergyman read the service— oh so beautifully! The only change he made was-' Commit her body to the fire, in the sure and certain hope of the resurrection of the body.' And I felt so glad— for she is already, in that sense, risen again, only the garment that we put away has nothing at all to do with that body!'

লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'অতীতের স্মৃতি নিয়ে বাড়ির সবাইর সঙ্গে কাটল কিছুদিন। বসুদের অপেক্ষায় ছিলেন, এপ্রিলে তাঁরা আমেরিকা হতে ফিরলেন। দু'জনেই অসুস্থ, নিবেদিতাকে তাঁদের দরকার। স্থির হল, জুলাইয়ে ভারত ফেরা হবে।'

আমেরিকায় বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক ইংল্যান্ড ফিরে এসেছিলেন ১৯০৯-এর মার্চ মাসে। মে মাসে সারা বুল, নিবেদিতা এবং বসু দম্পতি ইওরোপের কয়েকটি জায়গায় ঘুরতে যান। ওই সময়ে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডও নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায়ে ইওরোপে আসেন। এই সময়েই জোয়ান-অব-আর্কের জন্মস্থান পরিদর্শন করেন নিবেদিতা। জার্মানির ভিসবাডেন ঘুরে জুন মাসের শেষে তাঁরা জেনিভা আসেন। ২ জুলাই সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিবেদিতা এবং বসু দম্পতি মার্সেই থেকে ভারতগামী জাহাজে উঠলেন।

আট

মার্সেই থেকে যেদিন নিবেদিতা এবং বসু দম্পতি ভারতে আসার জাহাজে উঠলেন, তার আগের দিন, ১ জুলাই ১৯০৯, লন্ডনে পাঞ্জাবি যুবক মদনলাল ধিংড়া কার্জন উইলিকে গুলি করে হত্যা করেন। এই ঘটনা শুধু লন্ডনে নয়, সারা পাশ্চাত্য দুনিয়ায় শোরগোল ফেলে দিয়েছিল। নিবেদিতা জেনেভাতে উপস্থিত হয়ে এই সংবাদ পেয়েছিলেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'নিবেদিতা ভারতে রওনা হইবার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে এই বিপ্লবপন্থী সংবাদপত্রগুলির প্রকাশ কেন্দ্র স্বচক্ষে দেখিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং তিনি বার্লিন পর্যন্তও গমন করিলেন। জেনেভাতে আসিয়া 'বন্দে মাতরম্' প্রকাশের অফিসে গমন করিলেন। জেনেভার এই 'বন্দে মাতরম্' অফিসেই তিনি শুনিতে পাইলেন যে, লন্ডনে একজন হিন্দু যুবক কার্জন উইলিকে হত্যা করিয়াছে।' ধিংড়া এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার পর তার দায় স্বীকার করে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। ওই বিবৃতিতে ধিংড়া বলেছিলেন, 'I attempted to shed English blood intentionally and of purpose as an humble protest against the inhuman transportations and hanging of Indian youths...I do not want to say anything in defence of myself, but simply to prove the justice of my deed. I hold the English people responsible for the murder of 80 millions of Indian people in the last 50 years, and they are responsible for taking away $ 100,000,000 every year from India to this country. Just as the Germans have no right to occupy England , so the English have no right to occupy india.'

ধিংড়া আত্মপক্ষ সমর্থনে গেলেন না। বরং খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন ব্রিটিশ শাসকরা গত পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতে যে হত্যা এবং লুঠতরাজ চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদ জানাতেই তিনি এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, জেনেভাতে থাকতেই নিবেদিতা ধিংড়ার এই বিবৃতিটি পাঠ করেছিলেন। ধিংড়ার এই কাজ যে ভারত এবং ইয়োরোপে ব্রিটিশদের ভিতর শুধু আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল তা-ই নয়, ইয়োরোপে বহু বিপ্লবের কেন্দ্রস্থলেও এই ঘটনা আলোড়ন ফেলেছিল। আয়ারল্যান্ডে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে ধিংড়াকে সম্মান এবং অভিবাদন জানানো হয়। ভারতে ধিংড়ার এই কাজের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। বিপ্লববাদে বিশ্বাসী অরবিন্দ 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় ৩১ জুলাই লিখলেন, এ কাজের জন্য তিনি ধিংড়াকে কোনোরকম অভিশাপ অথবা ধিক্কার দেবেন না। আবার গোখলে এই ঘটনার পরপরই পুণেতে একটি বক্তৃতায় ধিংড়ার কড়া সমালোচনা করলেন। নিবেদিতার সুহৃদ এবং 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ ধিংড়ার এই কাজকে কাপুরুষোচিত অ্যাখ্যা দিলেন। ১৯০৯ সালের আগস্ট মাসে রামানন্দ 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় লিখলেন, 'His was a foul, treacherous and cowardly deed.'

সেই সঙ্গে রামানন্দ এ-ও লিখলেন যে রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার মাধ্যমে কোনো দেশ বড় হয় না, 'Political assassination has never made any country great.'

তবে ধিংড়ার মরদেহকে তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী দাহ না করে ব্রিটিশ সরকার যে কবর দিয়েছিল, তাতে ব্রিটিশ সরকারের জিঘাংসাপরায়ণ মনোবৃত্তিই দেখা গিয়েছিল বলে মন্তব্য করেছিলেন রামানন্দ। ১৯০৯-এর অক্টোবরে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় এজন্য ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনাও করেছিলেন তিনি। সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কার্জন উইলির হত্যার পর ইংল্যান্ডের 'টাইমস' পত্রিকায় ধিংড়ার প্রশংসা করে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পর সরোজিনী নাইডু ব্রিটিশ সরকারের কোপে না পড়ার জন্য 'টাইমস' পত্রিকায় দুটি চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের কোনো সংশ্রব নেই। আমি, আমার পিতা ও পরিবারের অন্য সকলে ব্রিটিশ এবং নিজাম ভক্ত।' উল্লেখ্য যে সেই সময়ে সরোজিনী নাইডু ও তাঁর পরিবার হায়দরাবাদে থাকতেন।

মদনলাল ধিংড়া লন্ডনে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার আশ্রয়ে ছিলেন। শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ধিংড়া কার্জন উইলিকে হত্যা করেছিলেন। গোখলে ধিংড়ার

এই কাজের সমালোচনা করার পর শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা লিখেছিলেন, 'আমি নৌরজিকে, ফিরোজ শাহ মেহতাকে এবং দিন শা ওয়াচাকে বুঝি। ইহারা পার্শী ব্যবসায়ী। ইহুদিদের মত ইহাদের কোনো দেশেই জন্মভূমির আকর্ষণ নাই, ইহারা জানে স্বর্ণমুদ্রা ও তাহার প্রস্তুত প্রণালী। কিন্তু বুঝি না গোখ্‌লেকে। ব্যাটা মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, সেবাব্রতী, তোর কেন এই চাটুকার বৃত্তি? তোমরা জান ত, ধিঙ্গড়ার কার্য্যের পর ঐ ব্যাটা পুনায়, বোম্বেতে কিরূপ প্রলাপ বকেছে? সে চায় ভারতে ইংরেজ শাসন অটল রাখতে। তার সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটির মেমোরেন্ডমেই একটি ধারায় আছে, ভারতে যে কোনো প্রকারে ব্রিটিশ রাজ্য অটুট রাখা এই সোসাইটির একটি উদ্দেশ্য। অথচ এমন লোককেও বেছে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস সভাপতি করেন। গোখ্‌লে বলছে, বিনা অস্ত্রে ভারত স্বাধীন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইংরেজদের সঙ্গে অস্ত্র পরীক্ষা করা আরও দুই শতাব্দী সম্ভব নয়। সুতরাং আরও একশত বৎসর স্বাধীনতার কথা ভাবাও উন্মাদের লক্ষণ বলে মনে করি।

'যাক্ আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। মোট কথা এই, গোখ্‌লের মন্তব্য হতে আমরা বুঝি যে অস্ত্র ব্যতীত ভারত উদ্ধার অসম্ভব। কবে কখন অস্ত্র আবশ্যক, সে সম্পর্কে তাঁর কাছে উপদেশ নিতে হবে না। তিনি জ্যোতিষী নহেন, ভবিষ্যৎদ্রষ্টাও নহেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের দূরত্ব উভয় মেরুর মধ্যে দূরত্বের মত। আমি বলতে চাই তোমরা বার্লিনে একটা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে ভারতে অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাতে পারবে? ধর, অর্থ যদি আমি চালাই, তোমাদের যদি কোনো আর্থিক ক্ষতি না হয়,...' (শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার এই বক্তব্য গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী দ্বারা অনূদিত)।

অবশ্য শুধু শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা নয়, পুণের ওই বক্তৃতার জন্য অরবিন্দও গোখলের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। গোখলে পুণের বক্তৃতায় বলেছিলেন, ধিংড়ার এই কাজে তাঁর মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। পাশাপাশি এ-ও বলেছিলেন, ভারতে যাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেন তাঁরা পাগলা গারদের বাইরের পাগল মাত্র। এর জবাবে ওই বছর ১৭ জুলাই অরবিন্দ বললেন, 'গোখলে একজন দেশদ্রোহী ও স্বজাতি বিরোধী। গোখলে ত্রেতাযুগের বিভীষণ।'

শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা ছিলেন কাথিয়াড়বাসী গুজরাটি। ধনী এবং মেধাবী কৃষ্ণবর্মা একই সঙ্গে ছিলেন উগ্র এবং আত্মম্ভরী। ১৯০৫-এর জানুয়ারি মাসে লন্ডনে তিনি ইন্ডিয়ান হোম রুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করে 'ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। ইয়োরোপ প্রবাসী ধনী ভারতবাসীদের থেকে চাঁদা তুলে তিনি কয়েকজন ভারতীয় যুবককে পাশ্চাত্যে নিয়ে যান। এই কাজে কৃষ্ণবর্মাকে প্রচুর অর্থসাহায্য করেন প্যারিস নিবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী শ্রীধর রঞ্জিত

রানা। কৃষ্ণবর্মা প্যারিসে হেমচন্দ্র কানুনগোকে বোমা তৈরির প্রণালী শিখতে সাহায্য করেছিলেন। বিপ্লবী বিনায়ক সাভারকরকেও কৃষ্ণবর্মা পাশ্চাত্যে নিয়ে যান। ভারতীয় ছাত্রদের জন্য বিলেতে বৃত্তির ব্যবস্থা করতেন কৃষ্ণবর্মা। তবে তাঁর শর্ত ছিল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে এই বৃত্তির টাকা পরিশোধ করে দিতে হবে। সাভারকার এইরকম বৃত্তি নিয়েই বিদেশে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণবর্মার লক্ষ্য ছিল এইসব ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে গুপ্ত সমিতি গঠন করে বিপ্লবী কাজকর্ম ছড়িয়ে দেওয়া। লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউস কৃষ্ণবর্মা ও তাঁর সঙ্গীদের বিপ্লবী কাজকর্মের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ১৯০৭ সালে ব্রিটেনের হাউস অফ কমন্সে কৃষ্ণবর্মার কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। লন্ডন আর নিরাপদ নয় বুঝে কৃষ্ণবর্মা তখন প্যারিসে আশ্রয় নেন। কিন্তু তাঁর 'ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' পত্রিকাটি তখনও লন্ডন থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯০৮-এ অরবিন্দ বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর 'ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' কাগজের ওপর ব্রিটিশ পুলিশের নজর পড়ে। ওই কাগজের মুদ্রাকরকে দুবার গ্রেফতার করা হয়। কৃষ্ণবর্মা তখন কাগজটিকে প্যারিসে উঠিয়ে নিয়ে যান।

অরবিন্দ এবং নিবেদিতার বিপ্লববাদের সঙ্গে কৃষ্ণবর্মার কাজকর্মের অনেকটাই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকী, কৃষ্ণবর্মা যখন প্যারিসে বসে বিপ্লবীদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, ঠিক একই সময়ে লন্ডনে এসে নিবেদিতাও প্রায় অনুরূপ কাজ করেছেন। সেক্ষেত্রে দুজনের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিলই। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'ভগিনী নিবেদিতা কৃষ্ণবর্মা হইতে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতেছিলেন। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য দুইজনেরই এক। এই দুইজনের মধ্যে দেখাশোনা হওয়ারই কথা। কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাইতেছি না। লন্ডনে না হইলেও প্যারী নগরীতে দেখা হইতে পারিত। বার্লিনে পারিত। জেনেভাতেও পারিত।'

শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে নিবেদিতার দেখা হয়েছিল কিনা তার প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, এটুকু জানা যায় যে কৃষ্ণবর্মার কাজকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন নিবেদিতা। এবং এ-ও জানা যায়, কৃষ্ণবর্মার কাজকর্মে নিবেদিতা যথেষ্টই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণবর্মাকে কখনোই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা হিসাবে স্বীকার করতে চাননি তিনি। কৃষ্ণবর্মার মতো লন্ডনে বসে একটি পত্রিকা পরিচালনা করে ও কিছু ভারতীয় ছাত্রকে সাহায্য করে জাতীয় নেতা হওয়া যায় না—এমনটাই মনে করতেন নিবেদিতা। তাছাড়া কৃষ্ণবর্মার উগ্র এবং আত্মম্ভরী স্বভাবও নিবেদিতাকে বিরক্ত করেছিল। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতার একটি চিঠি স্মর্তব্য। ১৯০৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এস কে র‍্যাটক্লিফকে ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'It would be impossible to tell you the pleasure I should feel on

hearing that krishnavarma Shyamji had been finally strangled. This is perfectly dreadful. K.S. dares to speaks as if he was the recognised and official leader of nationalism ! Do write to the M.R.(Modern Review) by this post, pointing out the necessity of exposing his fallacy.Nationalism is not an organised party, at this moment, and K.S. would have no claims to its leadership if it were. Personally, I believe the man to be surrounded and represented by agents of the Government and the Police who continually lead him furthur than he would have gone— for the precise sake of exposing plots and treacheries. This I know to be the case with his London branch—for I saw the men— or some of them— at Edinburg.'

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, শুধু যে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মাকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা হিসাবে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছেন নিবেদিতা তা নয়, পাশাপাশি শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার রাজনৈতিক চরিত্র নিয়েও নিজের সংশয় এবং সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কাজেই, কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের কোথাও কোথাও সাদৃশ্য পাওয়া গেলেও তাঁরা একত্রে কোনো কাজ করেছিলেন বা নিবেদিতা শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন— এমনটা কখনোই ঘটেনি বলেই ধরে নেওয়া যায়।

নিবেদিতা যখন ভারতে ফিরলেন, সেই সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। মুরারিপুকুর থেকে অস্ত্র উদ্ধার এবং অরবিন্দ এবং তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তারের ফলে ব্রিটিশ পুলিশের দমন-পীড়ন আরও বেড়েছে। এই দমন-পীড়নের ফলে বাংলার বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলিও ছত্রখান হয়ে গিয়েছিল। তার ওপরে অরবিন্দের মতো নেতৃস্থানীয়ের কারাদণ্ড কিছুটা দিশাহারা করে তুলেছিল বিপ্লবী গোষ্ঠীর সদস্যদের। তবে, কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়লেও বিপ্লববাদ একেবারে নির্মূল হয়ে যায়নি। বরং কিছু কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বিপ্লবীদের ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রইল। তবে, মুরারিপুকুর বোমা মামলার আগে যেভাবে বিপ্লবীদের কাজকর্মে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল— সেই পরিস্থিতি অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। বরং গ্রামে-শহরে ব্যাপক ধরপাকড়, খানাতল্লাশি এবং পুলিশি হামলা অনেকটা সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল সাধারণ মানুষকে। তবে, একটা বিষয় অস্বীকার করলে চলবে না যে, বিপ্লববাদ তখনকার মতো ব্যর্থ হলেও, দেশের মানুষের ভিতর

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটি দ্বেষ এবং পাশাপাশি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অনেকটাই জাগিয়ে দিয়েছিল। তদুপরি, জাতীয়তার উন্মেষও দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে, আবার প্রকাশ্য এবং বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে এই স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে।

নিবেদিতার কলকাতা পৌঁছনোর তিনমাস আগে, বোমা মামলায় এক বছর কারাবাস ভোগ করে ১৯০৯ সালের ৬ মে খালাস পেলেন অরবিন্দ। অরবিন্দের সঙ্গে দেবব্রত বসু, নলিনী গুপ্ত, শচীন্দ্র সেন প্রমুখ ১৭ জন মুক্তিলাভ করেন। এই মামলায় বারীন্দ্র ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের প্রথমে ফাঁসির আদেশ হয়েছিল, পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল, কারো দশ বছর কারাদণ্ডও হয়। এইরকম একটি ছত্রখান অবস্থার ভিতর বিপ্লবী গোষ্ঠীর অনেকেই বিপ্লববাদ সম্পর্কে মতও পরিবর্তন করেন।

অরবিন্দ খালাস পান মূলত চিত্তরঞ্জন দাশের কৃতিত্বে। চিত্তরঞ্জন দাশের সওয়ালের ফলেই বোমার মামলার বিচারক নর্টন অরবিন্দকে চরম দণ্ড দিতে পারেননি। বরং, মাত্র একবছর কারাবাসের পর অরবিন্দকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ প্রশাসন। অরবিন্দের মুক্তির পিছনে চিত্তরঞ্জনের এই ভূমিকার কথা জানতেন নিবেদিতা। যে কারণে, এর অনেক পরে, দার্জিলিংয়ের রাস্তায় চিত্তরঞ্জনের কোটের বোতামে একটি বড় লাল গোলাপ গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি আপনাকে মহৎ বলে জানতাম, কিন্তু এত মহৎ তা জানতাম না।'

কারাগারে থাকাকালীন অরবিন্দের ভিতর কিছু মানসিক পরিবর্তন এসেছিল। অলৌকিকত্বের প্রতি অরবিন্দের একটি স্বভাবগত আকর্ষণ বরাবরই ছিল; কিন্তু এবার তাঁর ভিতর একটা আধ্যাত্মিক বোধেরও প্রকাশ দেখা গেল। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, অরবিন্দ বললেন, কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতার মর্মবাণী বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফলে সচল ও জড় বস্তু— সবেতেই তিনি বাসুদেবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করছেন। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মে মাসে উত্তরপাড়ায় একটি সভাতেও অরবিন্দ তাঁর এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা বললেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'তিনি যাহা দেখিতেছেন, তাহাই বলিয়াছেন। না দেখিয়া মিথ্যা বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার দেখার ফলে বৃক্ষ বাসুদেবে পরিণত হয় নাই। বৃক্ষ বৃক্ষই রহিয়া গিয়াছে। ইহাকে বলে দৃষ্টিভ্রম। এক বস্তু অবলম্বনে অপর বস্তু দেখা, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। উইলিয়াম জেমস্ প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদগণ ইহাকে বলিবেন "illusion", যাহা নয়, তাহাই দেখা, "due to misdirected imagination" আমাদের বৈদান্তিকেরা ইহাকে বলিবেন 'অধ্যাস'।'

কারা-অভ্যন্তরে আরো কিছু পরিবর্তন ঘটল অরবিন্দর। এর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে অনেকটাই প্রভাবান্বিত ছিলেন অরবিন্দ। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'-এর ভাবধারা তাঁকে দেশমাতৃকার রূপ কল্পনা করতে উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু কারাবাসকালে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে সম্পূর্ণ প্রভাবিত হয়ে পড়লেন তিনি। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে 'কর্মযোগিন' পত্রিকা প্রকাশ করে তার প্রথম সংখ্যাতেই লিখলেন, 'Ramkrishna and Vivekananda gave more perfect synthesis than Shankaracharya.'

আর-একটি পরিবর্তনের কথাও অরবিন্দ জানিয়ে দিলেন। এর আগে জাতীয়তাবাদকেই ধর্ম বলে স্বীকার করেছিলেন তিনি; কারাবাস থেকে মুক্ত হওয়ার পর সনাতম ধর্ম (হিন্দুধর্ম)-কেই জাতীয়তাবাদের প্রকৃত রূপ বলে প্রচার করলেন। অরবিন্দ লিখলেন, 'I say no longer that nationalism is a creed, a religion, a faith; I say that it is the Sanatana Dharma which for us is nationalism.'

কারান্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে অরবিন্দ জানালেন, স্বপ্নে স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শনই তাঁর ভিতর এই পরিবর্তন সাধিত করেছে, তাঁকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত করেছে।

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে অরবিন্দ কলেজ স্কোয়ারে তাঁর আত্মীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রর বাড়িতে উঠলেন। কৃষ্ণকুমার অবশ্য তখন আগ্রা জেলে বন্দি। অরবিন্দ জেলে যাবার আগে দেখেছিলেন, সমগ্র দেশ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে উদ্বেল। আর জেল থেকে বেরিয়ে দেখলেন, সন্ত্রাসের পরিমণ্ডলে কেউ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে সাহস করছেন না। তিলক তখন মান্দালয়ে কারাবন্দি। সেখানে তিনি 'গীতারহস্য' লিখছেন। বিপিনচন্দ্র পাল কারামুক্তির পর লন্ডনে চলে গিয়েছেন। সেখানে 'স্বরাজ' পত্রিকা প্রকাশ করে 'Aetiology of Bomb' শিরোনামে নিবন্ধ লিখে যাচ্ছেন। বিপিন পালের লেখা ব্রিটিশ সরকারকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। উইলিয়াম স্টেড তাঁর 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকায় বিপিন পালের এই নিবন্ধগুলির প্রশংসা করে লিখছেন, 'So careful, so judicious and so well informed a study of causes which led to the apparition of the Bomb in India.'

বাংলার এগারো জন বিপ্লবী নেতা নির্বাসিত। অরবিন্দ কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেখলেন তিনি কার্যত একা। কিছুটা অসহায়তা এই সময় সম্ভবত অরবিন্দকে গ্রাস করেছিল। একা কী কর্মপন্থা নেবেন, তা ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না

তিনি। এরই ভিতর ১ জুলাই ইংল্যান্ডে কার্জন উইলিকে হত্যা করলেন মদনলাল ধিংড়া। এরপরই ৩১ জুলাই খবর রটে গেল যে, অরবিন্দকে পুনরায় গ্রেফতার করা হবে। এরকম তিনবার অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করার গুজব রটেছিল। এই গ্রেপ্তারের গুজব রটার পর অরবিন্দ দেশবাসীর উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি লেখেন। ১৯০৯-এর ৩১ জুলাই ওই চিঠিতে অরবিন্দ লেখেন, 'Rumour that Calcutta police submitted case for my departation to the Govt....In case of my departation and if I do not return from it, it may stand as my last political will and testament to my countrymen.'

নিবেদিতা ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা দেওয়ার ঠিক একদিন আগে কার্জন উইলিকে হত্যা করেন ধিংড়া। অনেকেই মনে করেন, নিবেদিতা পাশ্চাত্যে বিপ্লববাদের সপক্ষে যে প্রচার চালাচ্ছিলেন, তারই প্রভাবে ধিংড়া এই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'ধিঙ্গড়ার কার্য্যকলাপ শুধু ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডেই আতঙ্কের সৃষ্টি করে নাই, পরন্তু ইউরোপের বহু বিপ্লবের কেন্দ্রে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। আয়ারল্যান্ডে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল—"Eire ধিঙ্গড়াকে সম্মান করিতেছে।" ইহাতে কি নিবেদিতার হাত ছিল না!

'আয়ারল্যান্ড যাহাকে সম্মান করিতেছে, আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবী মেয়ে নিবেদিতাও যে তাহাকে সম্মান করিতেছেন, একথা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। নিবেদিতা এই সম্পর্কে কোন অভিমত ব্যক্ত করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার নিস্তব্ধতার মধ্যেই ধিঙ্গড়াকে তাঁহার সমর্থন আমরা বুঝিতে পারিতেছি।' তবে, কার্জন উইলিকে হত্যার পরিকল্পনায় নিবেদিতার যে কোনো ভূমিকাই ছিল না, তা বোঝা যায় ৭ জুলাই ১৯০৯ সারা বুলকে লেখা একটি চিঠিতে। ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'We were so startled by the appaling news of the assassination of Sir. C. Wylline in London. It must have happened the night we were journeying to Marseilles. The papers seem to say that the poor lad had personal relations with this man, so probably the motive for the crime has been personal, but in any case it is frightful news and sends us on our journey with heavy hearts.'

নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়েই বোঝা যায় মদনলাল ধিংড়া সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণই অজ্ঞ ছিলেন। তদুপরি, নিবেদিতা মনে করেছিলেন এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কোনো ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে। পাশ্চাত্যে নিবেদিতার কার্যকলাপ সেদেশে আশ্রয় নেওয়া বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু কার্জন উইলি

হত্যাকাণ্ডে তাঁর প্রত্যক্ষ কোনো যোগসাজশ ছিল এরকম ভাবাটা ভুল হবে। তবে এটাও ঠিক, গোখলের মতো ধিংড়াকে নিন্দা করে কোনো বক্তব্য, বা অরবিন্দের মতো ধিংড়ার পক্ষে সমর্থন— কোনোটাই কিন্তু নিবেদিতা করেননি। বরং বিষয়টি নিয়ে নীরব থাকাই তিনি শ্রেয় মনে করেছেন। যে কারণে অনেকের এরকম মনে হতেই পারে— এ ঘটনার প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নিবেদিতার না থাকলেও, ধিংড়ার প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি হয়তো নিবেদিতা দেখাতে চেয়েছিলেন।

১৬ জুলাই নিবেদিতা এবং বসু দম্পতি বোম্বাই এসে পৌঁছলেন। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'প্রথম শ্রেণীর ডেকে দাঁড়িয়ে যে সুবেশা মহিলাটি জাহাজের বন্দরে ভেড়া দেখছিলেন, তাঁকে বোধহয় কেউ-ই নিবেদিতা মনে করবে না। একেবারে নতুন ফ্যাশনের বেশভূষা, প্যাশন-লাগানো মস্ত সাদা হ্যাট আর নিখুঁত কাট-ছাটের গাউন পরে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তিনি জাহাজের সিঁড়িতে যাত্রীদের হুড়োগুড়ি দেখছেন।

'বন্ধুরা লিখেছিলেন, 'তুমি এখানকার মাটিতে পা দিলেই পুলিশ কিন্তু তোমায় গ্রেপ্তার করবে।' কাজেই মিসেস মার্গট (ছদ্মনামে) সতর্ক হয়ে এসেছেন। বোম্বাই থেকে কলকাতা পর্যন্ত এলেন রিজার্ভ কামরায়, তার মধ্যে কোনও ন্যাশনালিস্টকে কেউ খুঁজতে আসবে না নিশ্চয়। সঙ্গে আবার ইংরেজ পর্যটকদের খিদমতগার এক বেয়ারা। কলকাতা পৌঁছবার আগে এক্সপ্রেস ছেড়ে নিবেদিতা একটা প্যাসেঞ্জার ধরলেন। তাঁর রাজধানীতে পৌঁছনোটা একেবারেই কারও নজরে পড়ল না। বসু-দম্পতি অন্য পথে ভারতে আসছিলেন।' বারবারা ফক্স লিখছেন, 'আর একটি মত অনুযায়ী, নিবেদিতা পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য বোম্বে থেকে সরাসরি কলকাতা না এসে, মাদ্রাজ ঘুরে এসেছিলেন।' গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীও লিখেছেন, নিবেদিতা ছদ্মবেশে কলকাতা এসে পৌঁছেছিলেন। তবে, নিবেদিতার কোন বন্ধুরা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম নিবেদিতার কোনো জীবনীকারই জানাননি। এ প্রসঙ্গে কিছুটা অনুমানের ওপর নির্ভর করতেই হবে। প্রথমত, নিবেদিতার যে পাশ্চাত্য বন্ধুরা কলকাতায় থাকতেন, তাঁরাও সতর্ক করে দিতে পারেন। এঁদের অনেকের সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকারের উঁচু মহলে যোগাযোগ ছিল। সেখান থেকে কোনো সূত্রে খবর পেয়ে এঁরা সতর্ক করে দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, গোখলেও নিবেদিতাকে সতর্ক করে থাকতে পারেন। মডারেট গোখলের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজকর্মচারিদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। নিবেদিতাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে, এমন আগাম সংবাদ তাঁর কাছে থাকা স্বাভাবিক ছিল। তৃতীয়ত, অরবিন্দর কাছ থেকেও নিবেদিতা সতর্কবার্তা পেতে পারেন। কেননা, জেল থেকে বেরিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে এরকম ধারণা হওয়া অরবিন্দের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

এঁদের বাদ দিলে, জগদীশচন্দ্রও নিবেদিতাকে দেশের মাটিতে পা রাখার আগে সতর্ক করেছিলেন—এরকম সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে। যদিও জগদীশচন্দ্রও পাশ্চাত্যে ছিলেন এবং নিবেদিতার সঙ্গে একত্রে দেশে ফিরেছিলেন, তবু, দেশের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ভালো যোগাযোগ ছিল। দেশের সব সংবাদই জগদীশচন্দ্র পেতেন। এমনকী, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জগদীশচন্দ্র নিজেকে জড়িত না রাখলেও বিপ্লবীদের কারও কারও সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ভালো যোগাযোগ ছিল এবং তিনি তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীলও ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগের প্রসঙ্গটি এখানে একটু উল্লেখ করলে ভুল হবে না। বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনকাহিনী' গ্রন্থে লিখেছেন—'...স্যার জগদীশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করিয়া অমার নিকট হইতে সমস্ত বিষয় (ডাকাতি প্রভৃতি সম্পর্কেও) জানিয়া লইলেন; প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থিত তাঁহার লেবরেটরী বিশদভাবে দেখাইলেন; কিছু অর্থ সাহায্য করিলেন; বিভিন্ন উপদেশ দিলেন; বোলপুর শান্তিনিকেতনের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন; আমাকেও শান্তিনিকেতনে যাইয়া কবির সহযোগিতায় সমৃদ্ধ হইয়া অনুশীলন সমিতির প্রচারকার্যে ব্রতী থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমাকে বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন "তোমাদের গুপ্ত বিভাগের সঙ্গে প্রকাশ্য প্রচার বিভাগের যেন কোনরূপ সংস্রব না থাকে।" স্যার জগদীশ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'যদি আমরা প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং উপাদানাদি ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি, তবে তুমি নিশ্চিত করিয়া যথেষ্ট উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে কিনা?' আমিও বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, 'হ্যাঁ, পারিব।'

পুলিনবিহারী আরো লিখেছেন, 'তৎকালে স্যার জগদীশ প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে যখনই বক্তৃতা করিতেন, তখন প্রায় সর্বত্রই বক্তৃতার শেষভাগে লাঠি খেলার প্রশংসা করিয়া, এবং উহার প্রয়োজন ও উপকারিতার উল্লেখ করিয়া ছাত্র ও যুবকগণকে আমার নিকট লাঠিখেলা শিখিতে উপদেশ দিতেন।' পুলিনবিহারীর এই লেখাটি পড়লে বোঝা যায়, সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিতর জড়িত না থাকলেও, বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং পরোক্ষে তাঁদের সহায়তায় জগদীশচন্দ্রের একটি উৎসাহ ছিলই। কিন্তু, নিবেদিতার এই সুহৃদদের ভিতর কে যে তাঁকে কলকাতায় আসার পূর্বে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত কেউই দেননি।

সেই সময় ভারতে এসে পৌঁছলে কীরকম খানাতল্লাশির মুখোমুখি হতে হত, তার একটি চিত্র পাওয়া যায় নিবেদিতার চিঠিতে। ভারতে এসে পৌঁছনোর পর ১৯০৯

সালের ২১ জুলাই র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখছেন, 'Landing was a lesson, however, in many many ways. All the wonderful rules about duty on fire arms and ammunition led you to imagine that no arms of any kind are in future to enter India except under heavy embargo, or in well-defined cases. The laws are treated as a dead letter in the case of Europeans, and are enforced against Indians in a fashion that amounts to a species of moral torture. My agent (Grindlays) undertook to meet me at the station with my luggage, and would not even accept my keys. That would be quite unnecessary!! In the case of ones friends however, every box would be opened and examined and the uttermost farthing rigorously exacted without any respect of persons. In our particular case, this unpleasentness was fortunately and with difficulty avoided—but as I crossed the pavement, I saw 2 officers on their knees over a pitiful little steel trunk, of the usual type, about 2½ ft. by 1½, containing a towel-soap-and such trifles for the most part as you and I might put into a hand bag. There was such a ferocity, in the kneeling examiners, that I said, in the hope of shaming them, 'That's an innocent looking box!' They looked up, in amusement, 'Yes! but you see IT'S AN NATIVE'S!' they said, as if it would be an obvious crime, in that case, to treat it with courtesy— and the one saw there two stalwart Europeans holding up to the light and examining this way and that a pathetic little trinket-stand of bevel-edged glass and gilt that the owner was evidently taking home to a young wife... It appears that Bhola's trunk were searched on his arrival, and his personal letters as well as other mss. abstracted and held back for translation and reading!!! Similar treatment was meted out doubtless to L.Lajpat Rai.'

তবে, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা এবং প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার মতো নিবেদিতার জীবনীকাররা মানতে চাননি নিবেদিতা আত্মগোপন করে কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলেন। তাঁরা নিবেদিতার ডায়েরি উদ্ধৃত করে বলেছেন, নিবেদিতা বোম্বাই

থেকে সোজা কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর সঙ্গে বসু দম্পতিও ছিলেন। ১৯ এবং ২২ জুলাই নিবেদিতা সম্ভবত বসু দম্পতির বাড়িতে গিয়েছিলেন। ২৪ জুলাই শ্রীমা-য়ের বাগবাজারের বাড়িতে যান। ২০ এবং ২১ জুলাই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী সারদানন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কাজেই নিবেদিতার ছদ্মবেশে কলকাতা আগমন ও আত্মগোপন করে থাকার কাহিনি এঁরা মানতে চাননি। এঁরা না মানতে চাইতেই পারেন, কিন্তু সে সময়ে নিবেদিতার লেখা চিঠিপত্র প্রমাণ করে তিনি ছদ্মবেশেই কলকাতা এসেছিলেন। কলকাতা এসে পৌঁছনোর পর নিবেদিতা কিছুদিন যে আত্মগোপন করে ছিলেন, তার প্রমাণও নিবেদিতারই একটি চিঠি। ২২ জুলাই ১৯০৯ তারিখের একটি চিঠিতে (কাকে লিখছেন জানা যায় না) নিবেদিতা লিখছেন, 'Please don't mention me by name in your letters. I am keeping quiet and not venturing into street. Devmata is evidently regarded as me and is attracting attention.' চিঠিটি পড়ে বোঝাই যাচ্ছে, নিবেদিতা কলকাতায় ফেরার পর আত্মগোপন করেই থাকতে চেয়েছেন। তিনি যে ফিরে এসেছেন, সেটা কাউকে জানতে দিতে চাননি। বরং, সতর্কতার জন্য চিঠিতে তাঁর নামোল্লেখ করতে না করেছেন। এমনকী, সকলের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য স্বামীজির আর এক বিদেশিনি শিষ্যা সিস্টার দেবমাতাকে যাতে লোকে নিবেদিতা ভেবে ভ্রম করেন, সেরকম একটি ব্যবস্থাও করেছেন। চিঠিটি পড়ার পর বুঝতে অসুবিধা হয় না, পুলিশের নজরদারি এড়াতেই নিবেদিতার এই লুকোচুরি। আর যিনি এভাবে আত্মগোপন করেন, তিনি ছদ্মবেশে কলকাতায় পা রাখবেন এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া সিস্টার দেবমাতার (লরা ফ্রঙ্কলিন গ্লেন) পরবর্তীকালের স্মৃতিচারণাতেও জানা যায় যে, নিবেদিতা ছদ্মবেশেই কলকাতার মাটিতে পা রেখেছিলেন। এই তথ্যগুলিকে বিচার-বিবেচনার ভিতর আনলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই যায় যে, মুক্তিপ্রাণা এবং আত্মপ্রাণার বক্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়। আর দিনলিপি অনুযায়ী নিবেদিতা যদি বাড়ির বাইরে বেরিয়েও থাকেন, তা তিনি অত্যন্ত গোপনে অথবা ছদ্মবেশে যেতেই পারেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'কিন্তু যে অভিযোগে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার ধৃত হইবার আশঙ্কা ছিল, আত্মগোপনের পালা শেষ হওয়ার পর তিনি প্রকাশ্যে চলাফেরা আরম্ভ করিলে সে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হইল কেন, এ কথা কেহ উল্লেখ করেন নাই। যদি অভিযোগ প্রত্যাহার না করা হইয়া থাকে, তবে পরেই বা তাঁহাকে গ্রেপ্তার না করিবার কারণ কি?' এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, ব্রিটিশ প্রশাসনে নিবেদিতার বেশ কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী এবং বন্ধু ছিলেন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত

নিবেদিতার গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনাটি রদ করার চেষ্টা করেছিলেন— এমনটা কিন্তু সম্ভব। এদিক দিয়ে ভাবলে নিবেদিতার ছদ্মবেশে কলকাতায় আসা এবং কয়েকদিন আত্মগোপন করে থাকাকে কোনোমতেই অবাস্তব মনে হবে না। নিবেদিতার ছদ্মবেশ ধারণ এবং আত্মগোপনের বিষয়টি পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

নিবেদিতার এই চিঠিতে আর একটি বিষয়ও সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। সেই বিষয়টি উল্লেখ করলে রামকৃষ্ণ সংঘ জননী সারদা দেবীর চরিত্রের আরো একটি অনালোচিত দিক উন্মোচিত হবে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'All parties are now united to say, new spirit comes from R.K.V. and the men who have been released come to make pranams to Holy Mother. She says 'what fearlessness, only R.K. and Swamiji could have brought about this fearlessness. All their fault!' Isn't she extraordinary.' চিঠিটি পড়েই বোঝা যাচ্ছে, কলকাতায় ফিরে নিবেদিতা বাগবাজারে সারদা দেবীর বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলেন, বিপ্লবীরা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সারদা দেবীকে প্রণাম করতে আসছেন। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণাও তাঁর লেখায় এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এমনকী, প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা এ-ও বলেছেন, যে বিপ্লবীরা মঠে যোগদান করতে ইচ্ছুক হতেন, কোনো কোনো প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁদের মঠে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সওয়ালও করতেন। মুরারিপুকুর বোমার মামলায় খালাসপ্রাপ্ত বিপ্লবী দেবব্রত বসু এবং শচীন সেনকে মঠের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার মতো দুঃসাহস রামকৃষ্ণ মিশন দেখিয়েছিল। এঁরা সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করতে চাইলে স্বামী সারদানন্দ এঁদের ফিরিয়ে দেননি। একথা এখানে মানতেই হবে যে, স্বয়ং সারদা দেবীর অনুমতি এবং সহানুভূতি এই বিপ্লবীদের প্রতি না থাকলে তাঁরা বাগবাজারে সারদা দেবীর গৃহে যাওয়ার অনুমতি পেতেন না। এমনকী, রামকৃষ্ণ মঠেও তাঁদের অন্তর্ভুক্তি ঘটত না। কাজেই, বোঝা যায়, এক্ষেত্রে সারদা দেবীর সম্মতি ছিল।

সারদাদেবীর সম্মতি যে ছিলই, তা বোঝা যায় নিবেদিতার আর-একটি চিঠিতে। ১৯০৯-এর ৫ আগস্ট জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'The Holy Mother is perfect. Bo (Abala Base) came last night, to touch her feet. Wasn't this nice? All the great nationalists do it now—all recognise that the call came through Swamiji— and when I said the other day— 'Mother, the day foretold by S.R.K. (Sri Ramakrishna) when you would have too many children, is almost here—for the whole country is yours!' She said, 'I am seeing it.'

নিবেদিতার এই চিঠিতে আরো দুটি বিষয় বোঝা যাচ্ছে। প্রথমত, সেই সময়ে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় আকৃষ্ট এবং প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। এবং দ্বিতীয়, ব্রাহ্ম জগদীশচন্দ্র যতই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের বিরোধী হোন না কেন, তাঁর স্ত্রী অবলা বসুও সারদা দেবীর বাসভবনে এসে শ্রদ্ধা অর্পণ করতে কার্পণ্য করেননি। চিঠিতে যদিও নিবেদিতা লেখেননি, তবু মনে হয়, নিবেদিতার সঙ্গেই সম্ভবত অবলা বসু সারদা দেবীর বাসগৃহে গিয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দ যে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েই এই বিপ্লবীদের সারদা দেবীর বাসগৃহে আসা-যাওয়ার অনুমতি দিতেন, তা-ও জানা যায় নিবেদিতার আর একটি চিঠিতে। ১৯০৯-এর ১ সেপ্টেম্বর সারা বুলকে নিবেদিতা লিখছেন, 'Oh, it is grand, to be back at one's desk—and near the Holy Mother. I can not say to you how wonderful it is! The place really exists, the whole wonderful dreamland in one's heart is here. And everyone says now that the Swamiji was the source of the new ideas and they come to touch the feet of the Holy Mother and Saradananda will not consent for any reason to turn one away! Isn't this wonderful?'

সেই সময়ে সারদা দেবীর কৃপাধন্য বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকায় ছিলেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (দেবব্রত বসু), স্বামী চিন্ময়ানন্দ (শচীন সেন), স্বামী সহজানন্দ (নগেন্দ্রনাথ সরকার), স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ (প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত), স্বামী সত্যানন্দ (সতীশ দাশগুপ্ত), স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (ধীরেন দাশগুপ্ত), স্বামী সুন্দরানন্দ (রাধিকামোহন অধিকারী), স্বামী তপানন্দ (বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়), ঈশ্বর মহারাজ, স্বামী প্রেমেশানন্দ (ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য), স্বামী নিখিলানন্দ (দীনেশ দাশগুপ্ত), স্বামী অভয়ানন্দ (অতুলচন্দ্র গুপ্ত), মাখনলাল সেন, বিজয়কুমার নাগ, সুরেন কর প্রমুখ। এছাড়াও, বিভিন্ন সময়ে সারদা দেবীকে দর্শন করে গিয়েছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। সারদা দেবীর শিষ্যাদের ভিতর ছিলেন অরবিন্দ পত্নী মৃণালিনী ঘোষ। এই প্রসঙ্গে গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, 'খুবই বিস্ময়কর মনে হবে, অথচ বাস্তবাধিক বাস্তব ঘটনা হল— বিপ্লবীরা রামকৃষ্ণ সংঘে আশ্রয়লাভ করেছিলেন বিশেষভাবে শ্রীমা সারদা দেবীর আনুকূল্যে। শাসক ইংরাজ সুদ্ধ পৃথিবীর সকল মানুষকে যিনি নিজ সন্তান বলে গণ্য করতেন, সেই সারদা মাতা কিন্তু ইংরাজ শাসনের অবসান কামনা করে বারবার বলেছেন, 'ওরা কবে যাবে গো, কবে যাবে গো!' রামকৃষ্ণ মঠভুক্ত বিপ্লবীদের অধিকাংশই শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষিত, এবং পুলিশ প্রাক্তন বিপ্লবী

সন্ন্যাসীদের অবিরাম উত্ত্যক্ত করত বলে শ্রীমার মানসিক কষ্টের অবধি ছিল না। তাঁর কাছে আশ্রয় পাওয়া যাবে জেনে "নির্যাতিত দেশপ্রেমিক, মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবী ও অন্তরীণাবদ্ধ যুবকেরা দলে-দলে মায়ের কাছে আসতেন দীক্ষা নেবার জন্য।" প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) যে কথা বলেছেন তা অবশ্যই সত্য, "স্বামী সারদানন্দজীর স্নেহ ভালবাসা ছিল অতুলনীয়। তাঁহার কৃপা না হইলে ঐ সময়ে আমাদের মতো বিপ্লববাদী দলের সহিত সংশ্লিষ্ট যুবকের শ্রীশ্রী ঠাকুরের আশ্রয়ে আসা অসম্ভব হইত।" ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের কথা সংযোজনী হিসাবে এই সঙ্গে উপস্থিত করা উচিত ঃ "আসলে মা-ই বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন; এজন্যই শরৎ মহারাজ (সারদানন্দ) ওঁদের আশ্রয় দেন।"...

সারদা দেবীর বাসগৃহে বিপ্লবীদের এই আনাগোনা কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশের নজর এড়ায়নি। এবং এ কারণে ব্রিটিশ পুলিশ রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর খাপ্পাও হয়ে উঠেছিল। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'পলাতক রাজবন্দীদের আশ্রয় দিচ্ছে এই সন্দেহে বেলুড় মঠকেও সরকারী হুমকি সইতে হল। দেবব্রত আর শচীন্দ্রনাথ ছিলেন দুই নামজাদা বিপ্লবী, তাঁদের মামলা ডিসমিস হয়ে যায়। গুজব রটল, আলিপুর মামলার পর তাঁরা মঠের ব্রহ্মচারী হয়েছেন। সরকার পক্ষ তেতে উঠে মঠের সীমানা ঘিরে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করল। ১৯১২ সন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা কায়েম ছিল।

'অবস্থা সত্যিই সঙ্কুল হয়ে উঠেছিল। যেসব বিপ্লবী ধরা পড়ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই পরণে গেরুয়া ছিল। কাজেই সন্ন্যাসীদের তখন সংশয়ের চোখে দেখা হত। তাছাড়া এটাও জানা কথা যে, সাধারণে এই বিদ্রোহীদের আত্মত্যাগকে সন্ন্যাসীর সর্বত্যাগের সমান বলেই মনে করত, পরিব্রাজকের পরিচ্ছদে সাজিয়ে সরকারের অনধিগম্য মঠে-মন্দিরে তাদের রেখে দিত। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দু-দুবার মঠের ছেলেদের ও তাঁর প্রতিষ্ঠানটির সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে হয়েছে। পুলিশের হুমকিতে কান দিলেন না তিনি, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য মঠের নিয়ম-কানুন আরও কড়া করলেন। কোনো বাইরের লোকের মঠে প্রবেশাধিকার রইল না। সেবাব্রত ছাড়া সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের সবরকম বাইরের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল। নিবেদিতা ফিরে এসেছেন এ-খবর রটতেই ব্রহ্মানন্দ কলকাতার দৈনিকগুলোতে কর্মজীবনে নিবেদিতার স্বাতন্ত্র্য-সম্বন্ধে আবার একটা বিবৃতি দিলেন।'

রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে স্বামীজির জীবিতাবস্থাতেই সরকারের সন্দেহের দৃষ্টি ছিল। ১৮৯৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের বিদেশ দফতর যে গোপন রিপোর্ট প্রস্তুত করে, তাতে স্বামী বিবেকানন্দকে সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। স্বামীজি যখন নিবেদিতা, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড, সারা বুল প্রমুখের সঙ্গে

আলমোড়ায় অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর পিছনে যে ব্রিটিশ পুলিশের চর লেগেছিল তা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলাও হয়েছে। এদেশের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের ওপর স্বামীজির প্রভাব যে পড়ছিল এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার তখন থেকেই সন্দিহান ছিল। কিন্তু স্বামীজির প্রয়াণের পরে নানাবিধ ঘটনায় রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে ব্রিটিশ পুলিশের সন্দেহ বৃদ্ধি পায়। স্বামীজির ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কার্যকলাপের পিছনে রামকৃষ্ণ মিশনের সমর্থন রয়েছে ব্রিটিশ পুলিশ এমনই মনে করত। পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট এইরকম সন্দেহের কথা তাঁর রিপোর্টেও উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়া দেবব্রত বসু, শচীন সেনদের মতো বিপ্লবীদের মঠে অন্তর্ভুক্তি ব্রিটিশের সন্দেহ আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। তৃতীয় কারণ অবশ্যই নিবেদিতা। শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, 'ভগিনী নিবেদিতাও সরকারের সন্দেহলক্ষ্য। নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে দেখা গেছে, বৈপ্লবিক ডাকাতির অভিযোগ তুলে তাঁকে গ্রেপ্তার করার ইচ্ছা সরকারের হয়েছিল। ভাইসরয় পত্নী লেডি মিন্টো নিবেদিতার কার্যকলাপের চরিত্র বুঝতে নিবেদিতার কাছে গিয়েছিলেন। সরকারের চর কর্নেলিয়া সোরাবজি (নামী সোসাইটি মহিলা) লেডি মিন্টোর সঙ্গে বেলুড় মঠে গিয়ে নানা সন্ধানী প্রশ্ন করেছেন। নিবেদিতার পিছনে স্থায়ীভাবে গোয়েন্দা লাগানো ছিল। তিনি বিদেশে যেতেন ছদ্মবেশ ধারণ করে। চরমপন্থী যুবকদের উপর তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব এবং বক্তৃতা ও রচনার প্রভাব প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল। এহেন নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। স্বামীজির দেহত্যাগের পরে যদিও মিশনের সঙ্গে তিনি সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন, তবু সেটাকে সত্যকার সম্পর্কচ্ছেদ বলে সরকারী মহল স্বীকার করেনি; কেননা দেখা গেছে, নিবেদিতা নিয়মিত বেলুড় মঠ এবং বাগবাজারে মাতৃমন্দিরে যাতায়াত করেন; মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গ্রীষ্ম ও শরতে মাঝে-মাঝেই দীর্ঘ সময় কাটান; তাঁর বাড়িতে মিশনের সাধু সন্ন্যাসীরা আসেন, তাঁর লেখা মিশনের পত্রিকায় বেরোয় ইত্যাদি ইত্যাদি।'

এই সব কারণে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে ব্রিটিশ পুলিশ এবং গোয়েন্দারা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর নজরদারিও বৃদ্ধি করা হয়। তবে, স্বামীজির জীবিতাবস্থাতেই তাঁর ওপর ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের যে সন্দিগ্ধ নজর ছিল তা বোঝা যায় আলমোড়া ভ্রমণকালে তাঁর পিছনে পুলিশের চর লাগায় (বিষয়টি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে এবং ১৮৯৬ সালে ব্রিটিশ-ভারতের বিদেশ দফতরের একটি গোয়েন্দা রিপোর্টেও আছে। ১৮৯৬ সালের ওই রিপোর্টে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা বলে যে, বিবেকানন্দ উপাধিকারী এই ব্যক্তির আসল নাম জানা যায়নি। ইনি অত্যন্ত চতুর। সন্ন্যাসী হলেও রাজনীতিতে আগ্রহ দেখান)। স্বামীজির প্রয়াণের

পরও ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ যে সমস্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিল, তাতেও রামকৃষ্ণ মিশনকে সন্দেহের চোখেই দেখা হয়েছিল। ১৯১১ সালে তৎকালীন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এফ সি ড্যালি যে রিপোর্টটি প্রস্তুত করেন, তাতে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'Both the Ramakrishna Mission and the Arya Samaj have been made considerable use of by the agitators for spreading their doctrines throughout India. The Ramakrishna Mission, with its headquarters at the Belur Math, in the Hooghly district, has been a favourable gathering place for the young missionaries of the revolutionry movement. There is a reason to believe that the heads of the Mission are now beginning to take a stand against the use that has been made of their name in furthering the spirit of unrest. Though revolutionists still resort to the Belur Math, the authorities are taking precautions to prevent presons who are under police suspicion from being actually admitted in the Order... The Arya Samaj has of late been practically absolved of mischievous revolutionary connections, but there is no doubt that, like the Ramakrishna Mission, it has been freely used by revolutionists for spreading their doctrines.'

বেলুড় মঠে যে বিপ্লবীদের অনেকেরই যাতায়াত ছিল এবং তাঁরা যে মঠে আশ্রয় নেবার চেষ্টাও করতেন— তা যে গোয়েন্দাদের দৃষ্টি এড়ায়নি তার প্রমাণ ড্যালির এই রিপোর্টটি। তবে, রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন পুলিশ কর্তা চার্লস টেগার্ট। টেগার্টের এই রিপোর্টে বেশ কয়েকজন বিপ্লবীর উল্লেখ করে দেখানো হয়েছিল তাঁরা কীভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে জড়িত। রিপোর্টে টেগার্ট লিখেছিলেন, 'It will appear from the foregoing that there is evidence to show that the Ramakrishna Mission itself has been used in the past as a revolutionary agency, under the guise of religion and philanthrophy, and that the greatest danger at the present time lies in the unaffiliated asrams which have grown up like mushrooms in the affected areas in Eastern Bengal without the knowledge or sanction of the headquarter mission at Belur. In fact Swami Vivekananda's conmmand to go out and

preach gospel of sri Ramakrishna and found branch asrams throughout India has been taken up by the revolutionaries in Bengal to such good effect that it is evident that, even admitting the best intentions in the world, the authorities of the mission at Belur are unable to control them.' টেগার্টের মনে হয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্লবীরা রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমতি না নিয়ে বা অগোচরেই মিশনের শাখা খুলছিলেন। এবং সেসব শাখার মাধ্যমে তাঁরা বিপ্লবের কাজও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। টেগার্টের এ-ও মনে হয়েছিল যে, মিশন চেষ্টা করেও এইসব কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না।

টেগার্ট এই রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছিলেন ১৯১৪ সালে। নিবেদিতা তখন প্রয়াত। তবে, টেগার্টের রিপোর্টে আলাদা করে নিবেদিতার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। নিবেদিতার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে প্রভাবের কথা উল্লেখ থাকলেও, তাঁর বৈপ্লবিক কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ টেগার্ট দিতে পারেননি। টেগার্ট নিবেদিতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'In 1907, the Bande Mataram, a highly seditious organ, which was eventually supressed by the government, reported that one of the persons who volunteered to stand surety for the Editor of the Jugantar, Bhupendra Nath Dutta, was Sister Nivedita.

'In the same year she went to Europe for the sake of her health and in the beginning of the following year, Girindra Nath Mukherji, the well-known revolutionary, was reported to be living with her in London. She returned to India in 1909 and stayed at Bosepara Lane. At this time Ramakrishna Mission authorities repudiated all connections with her and stated that she severed her connection with them some time previous as they objected to her mixing herself up with politics.'

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদের বিষয়টি ব্রিটিশ গোয়েন্দারা বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখেছেন। নিবেদিতার সঙ্গে মিশনের আদৌ সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছিল কিনা— তা নিয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সন্দেহ ছিল। তারা মনে করছিল মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কচ্ছেদ আসলে দু পক্ষেরই লোক দেখানো ব্যাপার। নিবেদিতার সঙ্গে মিশনের এই সম্পর্কচ্ছেদের বিষয়ে টেগার্টও সন্দেহ প্রকাশ

করেছিলেন। টেগার্ট তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন, 'It has been noted above that the Ramakrishna Mission endeavoured openly to dissociate themselves from sister Nivedita at the time when the latter made herself conspicuous by throwing in her lot with the Indian Nationalists. That she had actually severed her connection from the Mission was doubted at the time, and a recent publication of the Ramakrishna Mission on the "Women's work in the Mission," as carried out by sister Nivedita and Sister Christina from the year 1905 to 1912, confirms these doubts, for we find in this pamphlet a generous recognition of the work done by Sister Nivedita in the Mission upto the date of her death; furthur the "Sister Nivedita Memorial Committee" collected funds on behalf of the Ramakrishna Mission to "Commemorate the hallowed memory of the late sister Nivedita." Again, in a leading article in Bengalee, which appeared a few days after her death, the writer says—

"With the National movement in India she was previously in sympathy, and she knew most of the public men and was held in esteem by all who know her. By her death the Ramakrishna Vivekananda Mission, of which she was a most active member, is distinctly poorer."

টেগার্টের রিপোর্টে এ-ও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অরবিন্দের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভূত প্রভাব ছিল। বিবেকানন্দের ভাবধারাকে অরবিন্দ কীভাবে রাজনৈতিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তা বোঝানোর জন্য টেগার্ট অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। তবে, টেগার্টের এই রিপোর্টে নিবেদিতার বৈপ্লবিক কাজকর্মের বর্ণনা না থাকা বিস্ময়কর। এ বিষয়ে টেগার্ট কোনো তথ্য পাননি— এ মনে করা ভুল হবে। কারণ, নিবেদিতার গতিবিধির ওপর সদাসর্বদা পুলিশের নজর ছিল এবং তাঁর পিছনে চর লাগানো ছিল। এ সংবাদ আমরা নিবেদিতার চিঠিপত্র থেকেই পাই। ১৯১০-এর ২৮ এপ্রিল নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন, 'Grave news was brought to our friend the other evening that I am put down in the accounts of Unspoken-Wisdom Department as absolutely responsible for inspiring—what? The

docoities— if you please! So I am watched— not in the old crude way, since we saw Halliday and rather enjoyed him—but by a supremely clever man who has orders to travel with me. I wouldn't care to be in his cleverness's shoes, if he is identified in solitude on the side of a steep khud, a week or two hence, in the hills!'

নিবেদিতার এই চিঠি পড়েই জানা যাচ্ছে, তাঁকে ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার একটি পরিকল্পনা পুলিশের ছিল। পাশাপাশি তাঁর অনুসরণকারী পুলিশের চরের যে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে—সে ইঙ্গিতও নিবেদিতা দিয়েছিলেন। যে নিবেদিতার ওপর এ নজর পুলিশের ছিল, অনুমান করাই যায়, তাঁর বৈপ্লবিক কাজকর্ম সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য পুলিশের হাতে ছিল। কাজেই, টেগার্ট সে তথ্য পাননি এটা বিশ্বাস করা যায় না। আর তথ্য যদি পেয়েও থাকেন, তবে নিবেদিতার বৈপ্লবিক কাজকর্মের তিনি উল্লেখ করলেন না কেন তা-ও একটা বিস্ময়।

১৯০৯ সালের জুলাই মাসে নিবেদিতা কলকাতা ফিরে আসেন। তার কিছুদিন আগেই, ২৩ মে, বাগবাজারের 'উদ্বোধন' বাড়িতে সারদা দেবীর পদার্পণ ঘটেছে। কলকাতায় ফিরে শ্রীশ্রীমাকে নিজ বাড়িতে অধিষ্ঠিত দেখে বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন নিবেদিতা। স্বামীজির এদেশের এবং পাশ্চাত্যের শিষ্য-শিষ্যাদের ভিতর নিবেদিতাই শ্রীশ্রীমায়ের সর্বাধিক স্নেহধন্যা এবং আদরের ছিলেন। বলতে গেলে একরকম মাতা ও কন্যার সম্পর্ক ছিল এই দুজনের ভিতর। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে তা আলোচিতও হয়েছে। নিবেদিতা যখন আমেরিকায় নিজের স্কুলের জন্য অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত আছেন, সেই সময় ১৯০০ সালের ১১ এপ্রিল শ্রীশ্রীমা নিবেদিতাকে একটি পত্রও লেখেন। স্বামী সারদানন্দ সেই পত্রটি নিবেদিতার কাছে পাঠিয়েও দেন। শ্রীশ্রীমায়ের লেখা মূল বাংলা পত্রটি অবশ্য পাওয়া যায় না। চিঠিটির একটি ইংরেজি অনুবাদ নিবেদিতা নিজেই করেছিলেন। সেটি এখানে তুলে দেওয়া হল, 'May this letter carry all blessing! My dear love to you, Baby daughter Nivedita! I am so glad to learn that you have prayed to the Lord for my eternal peace. You are a manifestation of the ever blissful Mother. I look to your photograph which is with me, every now and then. And it seems as if you are present with me. I long for the day and the year when you shall return. May the prayers you have uttered for me from the heart of your pure virgin soul be answered! I am well and happy. I pray too for your quick return.

May He fulfil your desires about the women's home in India, and may the would-be home fulfil its mission in teaching true dharma to all.

'He, the Breath of the universe, is singing His Own praise, and you are hearing that Eternal song through things that will come to an end. The trees, the birds, the hills, and all are singing praise to the Lord, The Banyan of Dukineswar sings of Kali to be sure, and blessed is he who has ears to hear it.

'I was so glad to hear of the faith of Mrs. Waterman. She who thinks she has not lost her beloved, even after the fall of the body, has really attained to light; for the soul can never die, even when the body falls. I am to hear that it has strengthened her to hear of me. May she be a help to your work. My love and blessings to Mrs. May Wright Sewall.

'My dear love to you and blessings and prayers for your spiritual growth. You are indeed doing good work but do not forget your Bengali! Or I shall not be able to understand you, when you come back. It gave me such delight to know that you are speaking of Dhruba, Savitri, Sita-Ram and so on there!

'The accounts of their holy lives are better than all the vain talk of the world, I am sure. Oh how beautiful are the Name and the doings of the Lord!

your
Mother.

এই চিঠিটির তলায় নিবেদিতা একটি মন্তব্য লিখেছিলেন। সেটি হল, 'Oh, what a sweet soul!— said Mr. Waterman, when I finished reading this last night, and I thought his words the finest expression of the quality.'

শ্রীশ্রীমায়ের এই চিঠিখানি পড়লে কতগুলি জিনিস পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রথমত, নিবেদিতা অসহায়, অনাথ মহিলাদের জন্য যে আশ্রম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সে বিষয়ে শ্রীশ্রীমার সর্বাংশে উৎসাহ ছিল। এবং তিনি মনেপ্রাণে

চাইতেন সে কাজে নিবেদিতা সফল হোন। এই চিঠিতেই জানা যাচ্ছে, নিবেদিতা বাংলা শিখেছিলেন। লিখতে না জানলেও বাংলায় তিনি কথাবার্তা বলতে জানতেন। যে কারণে শ্রীশ্রীমা তাঁকে 'বাংলাটা ভুলে যেতে' না করেছেন। কলকাতায় ফিরে নিবেদিতার অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠেছিল বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি। হাজার কাজের ভিতরও নিবেদিতা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে ছুটে যেতেন। কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে থাকতেন সিস্টার ক্রিস্টিন। একটি আন্তরিক বন্ধন যে দুজনকে পরস্পরের প্রতি আবদ্ধ করে রেখেছিল—তা ব্যাখ্যা না করলেও চলে। শ্রীশ্রীমায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কতখানি সজাগ ছিল নিবেদিতার দৃষ্টি তা ১৯০৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা একটি চিঠিতে বোঝা যায়। ওই সময়ে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটি থেকে কলকাতায় এসে অবস্থান করছেন। ২৪ তারিখে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসার পর নিবেদিতা জোসেফিনকে লিখেছেন, 'The Holy Mother is here, so small, so thin, so dark, worn out physically I should say, with village hardship and village life. But the same clear mind— the same stateliness, the same womanhood, as before. Oh, how may comforts I would like to take her! She needs a soft pillow-a shelf-a rug, so many things. She is so crowded with people about her always. I would like to give her a beautiful picture, a piece of bright colour.'

শ্রীশ্রীমাকে নানা জিনিস উপহার দেবার প্রবল বাসনা থাকলেও, নিবেদিতার সে ইচ্ছা পূরণ হত না। তার কারণ নিবেদিতার অর্থাভাব। যে কারণে, ১৯০৯ সালে বিলেত থেকে ফেরার সময় শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীশ্রীমায়ের ভাইঝি রাধুর জন্য বেশ কিছু উপহার সামগ্রী নিয়ে আসেন নিবেদিতা। পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠজনেরা মায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, নিবেদিতা যেসব জিনিস দিতেন, তা খুব যত্ন করে রেখে দিতেন শ্রীশ্রীমা। নিবেদিতা শ্রীশ্রীমাকে জার্মান সিলভারের একটি কৌটো দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা ওই কৌটোয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একগুচ্ছ কেশ রাখতেন। বলতেন, 'পুজোর সময় কৌটোটা দেখলে নিবেদিতার কথা মনে পড়ে।' নিবেদিতা একটি এন্ডির চাদর উপহার দিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমাকে। চাদরখানি জীর্ণ হয়ে গেলেও মা তা ফেলে দিতে রাজি হননি। ওই জীর্ণ চাদরখানি তিন ভাঁজ করে তুলে রেখেছিলেন। বলতেন, 'কাপড়খানি দেখলে নিবেদিতাকে মনে পড়ে। কী মেয়েই ছিল, বাবা! আমার সঙ্গে প্রথম প্রথম কথা কইতে পারত না। ছেলেরা বুঝিয়ে দিত। পরে বাংলা শিখে নিল।'

নিবেদিতার প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ কতখানি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে বিভিন্নজনের স্মৃতিচারণে। ওই গ্রন্থ থেকেই জানা যায়, একদিন নিবেদিতা মা-কে দর্শন করতে এলে মা তাঁকে পশমের তৈরি একটি ছোট্ট পাখা উপহার দেন। বলেন, 'আমি এটি তোমার জন্য তৈরি করেছি।' পাখাটি পেয়ে নিবেদিতা আনন্দে অধীর হয়ে একবার বুকে ঠেকান, একবার মাথায়। আর বলতে থাকেন, 'কী সুন্দর! কী চমৎকার।' নিবেদিতার আনন্দ দেখে শ্রীশ্রী মা বলেছিলেন, 'একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর কি আহ্লাদ দেখেছ। আহা, কী সরল বিশ্বাস। যেন সাক্ষাৎ দেবী! নরেনকে (স্বামীজি) কী ভক্তিই করে। নরেন এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে। কি গুরুভক্তি। এ দেশের উপরেই বা কি ভালোবাসা!' মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'প্রণাম করিবার সময় নিবেদিতা রুমাল দিয়া অতি সন্তর্পণে শ্রীমার পা মুছিয়া লইতেন। সন্ধ্যার সময় আসিলে তাঁহার চোখে আলো লাগিবে বলিয়া তাড়াতাড়ি একটা কাগজ দিয়া আড়াল করিয়া দিতেন। যেদিন শ্রীমা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিতেন অথবা বিশেষভাবে আশীর্বাদ করিতেন, নিবেদিতা নিজের ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। নিবেদিতার বিদ্যালয়ে মেয়েদের লইয়া আসিবার জন্য যে ঘোড়ার গাড়ি ছিল, সেই গাড়ি করিয়া ছুটির দিনে শ্রীমা গঙ্গাস্নানে যাইতেন এবং কখনও কখনও গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, কালীঘাট ইত্যাদি দেখিয়া আসিতেন।'

১৯০৯ সালে নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে আসার পর ওই বছর ৬ অক্টোবর শ্রীশ্রীমা নিবেদিতার স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এর আগে এবং পরেও বহুবার নিবেদিতার স্কুলে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা। নিবেদিতার স্কুল এবং ওই স্কুলের শিক্ষিকা এবং ছাত্রীদের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের বরাবর স্নেহদৃষ্টি ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠজনেরা পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, নিবেদিতার প্রয়াণের পর তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে শ্রীশ্রীমা কাঁদতেন। বলতেন, 'যে হয় সুপ্রাণী তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী।'

নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে এসে দেখলেন তাঁর মেয়েদের স্কুলটি বেশ ভালোই চলছে। নিবেদিতার দু বছরের অনুপস্থিতির সময় সিস্টার ক্রিস্টিন দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্কুলটি চালানোর। নিবেদিতা যখন এলেন তখনো ক্রিস্টিনই চালাচ্ছেন স্কুলটি। ১৯০৯-এর ২২ জুলাই একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Christine looking strong and school in full swing.'

এই সময়ে স্বামীজির আর-এক বিদেশিনি শিষ্যা দেবমাতাও সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে বাস করতেন। দেবমাতা তার আগে মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ মঠে থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাজে সাহায্য করতেন। বোসপাড়া লেনে

থাকার সময় দেবমাতা মাঝে মাঝেই বেলুড়ে গিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসতেন। আর সারদা দেবী বাগবাজারে থাকলে তাঁর বাড়িতে প্রায়ই যেতেন দেবমাতা। ২২ জুলাই-এর চিঠিতে দেবমাতারও উল্লেখ করেছেন নিবেদিতা। লিখেছেন, 'Sister Devamata here, very very charming, wears costume like mine, so small and frail looking, and absorbed in Holy Mother and religious practices.' নিবেদিতার অনুপস্থিতির সময় জনৈক পুষ্পা দেবী স্কুলের কাজে যোগ দেন এবং ক্রিস্টিনকে সাহায্য করতেন। কিন্তু পুষ্পা দেবীর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় ক্রিস্টিন অসুবিধায় পড়েছিলেন। সেই সময়ে ক্রিস্টিনকে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন সুধীরা দেবী। সুধীরা দেবী সম্ভবত ১৯০৬ সালেই নিবেদিতার স্কুলের কাজে যোগ দেন। কিন্তু নিবেদিতার বিলেতে যাওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে সুধীরা দেবীর তেমনভাবে পরিচয় গড়ে ওঠেনি। পুষ্পা দেবী চলে যাওয়ার পর সুধীরা দেবী ক্রিস্টিনের সঙ্গে স্কুলের কাজ ভাগ করে নেন। ক্রমে স্কুলের কাজে সুধীরাই হয়ে দাঁড়ান চালিকাশক্তি। ক্রিস্টিনের সঙ্গে সুধীরার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুধীরা প্রথম থেকেই বিনা পারিশ্রমিকে স্কুলের কাজ করতেন এবং অধিকাংশ সময় স্কুলেই অতিবাহিত করতেন। ১৯০৯-এর আগস্ট মাসে ক্রিস্টিন বিশ্রামের জন্য দার্জিলিংয়ে গেলে নিবেদিতা সুধীরার সহায়তা নিয়েই স্কুলটি চালাতেন। পরবর্তীকালে নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন দুজনেই এই স্কুলের ব্যাপারে সুধীরার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নিবেদিতার বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, সুধীরাই ছিলেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

পরবর্তীকালে নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিনের অনুপস্থিতিতে এই স্কুলটিকে বৃহৎ রূপ দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠিত করে তোলার পিছনে সুধীরার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। সুধীরার জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৮ নভেম্বর। পিতা আশুতোষ বসু ব্রাহ্ম মনোভাবাপন্ন ছিলেন। সুধীরা অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন। সুধীরার দাদা ছিলেন বিপ্লবী দেবব্রত বসু। এই দেবব্রত বসুই পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্পর্শে এসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। দাদার প্রেরণাতেই সুধীরার দেশসেবা এবং আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। পরে নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিনের সংস্পর্শে এসে তা আরো বৃদ্ধি পায়। নিবেদিতার মৃত্যুর পর ১৯১৪ সালে ক্রিস্টিন দেশে ফিরে গেলে এই স্কুলের সম্পূর্ণ দায়িত্বই সুধীরার কাঁধে এসে পড়ে। এই সময়ে স্বামী সারদানন্দের সহায়তায় তিনি বোসপাড়া লেনেই নিবেদিতার বহু আকাঙ্ক্ষিত আশ্রম বিভাগ ও ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা করেন। ওই আশ্রম বিভাগ এবং ছাত্রীনিবাসের প্রথম নাম রাখা হয় 'মাতৃমন্দির'। পরে সারদা দেবী

দেহরক্ষা করলে তা 'সারদা মন্দির' নামে অভিহিত হয়। ১৯১৮ সালে এই স্কুলটি রামকৃষ্ণ মিশন অধিগ্রহণ করে। তার আগেই অবশ্য স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা এবং কলেবর অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বামীজির পরিকল্পিত এবং নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষিত মহিলাদের জন্য একটি হোম তৈরি করার বিষয়ে সুধীরার বিশেষ আগ্রহ ছিল। এ বিষয়ে সারদানন্দের সঙ্গে তিনি বহুবার আলোচনাও চালিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা তিনি কার্যে পরিণত করে যেতে পারেননি। ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে এলাহাবাদ থেকে ফেরার সময় বারাণসীর কাছে এক পথ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

দু বছর পর কলকাতায় ফিরে এসে স্কুলের কাজ শুরু করেই নিবেদিতা চরম অর্থসংকটের মুখে পড়লেন। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে স্কুলের খরচ চালানোই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর সামনে। ১৯০৯ সালের ৩০ জুলাই নিবেদিতা একটি চিঠিতে লিখছেন (কাকে লিখেছেন সেটি জানা যায় না)— 'Rice and milk have both risen in price and the increasing poverty is something terrible to witness.' এর আগে তাঁর স্কুল যখনই অর্থ সংকটে পড়েছে, সর্বদা নিবেদিতা জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং সারা বুলের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছেন। তাঁরা সাহায্যও করেছেন নিবেদিতাকে। এবার অর্থ সংকটের মোকাবিলা করতে নিবেদিতা প্রথমেই তাঁর ব্যক্তিগত খরচ এবং স্কুলের খরচেও কাটছাঁট করলেন। আর সারা বুলের কন্যা ওলিয়ার কাছে অর্থসাহায্য চাইলেন। ৩০ জুলাইয়ের চিঠিতেই নিবেদিতা লিখছেন, 'We have gone into account and will have to cut down many expenses, but I have written to ask Olea if she can give us $2 a month for one case, that I can not bear to deprive money. I am also trying to subscriptions from others.'

তবে, ওলিয়া ছাড়া আর কেউই সেসময় নিবেদিতাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি।

নিবেদিতার মূল স্কুলের দুটি শাখাও ছিল। অর্থাভাবে এই শাখা স্কুলদুটি বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। ১৬ বোসপাড়া লেনে যে বাড়িটি স্কুলের জন্যই ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, সেটি ছেড়ে দিতে হল। নিবেদিতা যে বাড়িতে থাকতেন, সেই ১৭ নম্বর বাড়িতেই স্কুল উঠিয়ে আনা হল। বাড়িতে স্থান সঙ্কুলানই অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই সময়ে নিবেদিতার বেশ কয়েকজন পাশ্চাত্য বন্ধু বোসপাড়া লেনের এই ঘিঞ্জি বাড়ি ছেড়ে তাঁকে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। নিবেদিতা অবশ্য তাতে কর্ণপাত করেননি। তিনি বলতেন, স্বামীজির স্বপ্ন যদি তাঁকে পূরণ করতেই হয়, এই প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেই করতে হবে। ১৯০৯-এর আগস্ট মাসে

জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'It is a hard battle that has to be fought, but oh! it is so good to be once more in India.'

এই সময়টি সম্পর্কে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'পুরা দুই বৎসর অনুপস্থিতির পর নিবেদিতা দেখিলেন যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি আর চলে না। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দেও পাঁচ মাস বন্ধ থাকিবে। ক্রিশ্চিয়ানা পারিবারিক কারণে আমেরিকা গিয়াছিলেন। নিবেদিতার ইচ্ছামত বিদ্যালয়টি পরিচালিত হইতেছিল না। টাকার অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল।... সেদিন বাগবাজারের চারিপাশের হিন্দু সমাজ এই বিদ্যালয়টিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কোনই চেষ্টা করে নাই। কলিকাতার আদি বাসিন্দা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে তাঁহার প্রাপ্য যথোচিত সমাদর তিনি পান নাই। হিন্দুরা তাঁহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করে নাই। যে কলঙ্ক সত্য, তাহাকে গোপন করিয়া লাভ নাই। স্কুল পরিচালনায় মঠের সন্ন্যাসীদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ নিবেদিতার স্কুল ছাড়িবার আর একটি কারণ। তাঁহারা নিবেদিতার শিক্ষা পদ্ধতি বুঝিতে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা অবতারপূজা, অবতারবাদ প্রচার লইয়া ব্যতিব্যস্ত। এবং শিক্ষা ব্যাপারে নিবেদিতার তুলনায় অনভিজ্ঞ।'

গিরিজাশঙ্করের এই ব্যাখ্যা অবশ্য সম্পূর্ণ সঠিক তা বলা যায় না। ১৯০৯ সালে নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে এসে স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করার সময়ে অর্থসংকট অবশ্যই ছিল। কিন্তু ক্রিস্টিন সেই সময় পারিবারিক কারণে আমেরিকা গিয়েছিলেন– এ তথ্য ঠিক নয়। তাছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন তখনও নিবেদিতার স্কুলের বিষয়ে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করেনি। বলতে গেলে, নিবেদিতার স্কুল চালানোর ব্যাপারে মিশনের তখন কোনো ভূমিকাই ছিল না। অর্থাভাবে শাখা স্কুলগুলি বন্ধ করে দিলেও, মূল স্কুলটি নিবেদিতা তখনো বন্ধ করেননি। তাঁর ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে স্কুলটি চলত তখন। তবে এটা ঠিক, স্কুলের অর্থ সংকট দূর করতে কলকাতার হিন্দু সমাজ এগিয়ে আসেনি।

এবং, এটাও ঠিক যে, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য নানাবিধ কাজে জড়িত থাকার জন্য, স্কুলের বিষয়ে উৎসাহী হলেও, একটানা স্কুলের জন্য সময় নিবেদিতা দিতে পারছিলেন না। যে কারণে স্কুলের দায়িত্ব অনেকটাই তিনি ক্রিস্টিনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সে কথা জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে জানিয়েওছিলেন তিনি। লিখেছিলেন, 'You see I am no longer the worker. That place ought to be Christine's. Even about the school, I cannot hold it much longer; I shall have to turn it over to her.'

প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা জানিয়েছেন, ১৯০৯ সালে কলকাতায় ফিরে এসে নিবেদিতা যখন স্কুলের দায়িত্ব নিলেন, তখন স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ষাট থেকে সত্তরের মতো। স্কুলে নিবেদিতা ছাত্রীদের ভূগোল এবং ইতিহাস পড়াতেন। এছাড়া সূচীশিল্প এবং অঙ্কনের শিক্ষাও দিতেন। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার লেখা থেকে জানা যায়, নিবেদিতার ছাত্রীদের ভিতর কয়েকটি বড় মেয়ে ছিল। তারা আবার ছোট মেয়েদের শিক্ষাদান করত। স্কুলে ছাত্রীদের পড়ানোর জন্য নিবেদিতা ইতিমধ্যেই বেশ ভালো বাংলা শিখে নিয়েছিলেন। তবু কোথাও কোনো অসুবিধায় পড়লে সুধীরা দেবী তাঁকে সাহায্য করতেন। ক্লাস চলার সময় নিবেদিতা ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে ছাত্রীদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। ক্লাসে ছাত্রীরা মেঝেতে চাটাইয়ের ওপর বসত। সামনে ছোট টুলে তাদের বইখাতা রাখত। যদি কোনো ছাত্রী ক্লাসে বসে ঢুলত, নিবেদিতা তার পিছনে এসে দাঁড়াতেন। তাকে সোজা হয়ে বসতে নির্দেশ দিতেন। স্কুলের উঠোনে মেয়েদের শারীরশিক্ষা দিতেন নিবেদিতা। নিবেদিতা বাড়ির পাশে একটি ছোট জমিও কিনে নিয়েছিলেন। সেখানে সুন্দর বাগান করে স্কুলের মেয়েদের খেলার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আত্মপ্রাণার লেখা থেকেই জানা যাচ্ছে, ক্লাসে কড়া শৃঙ্খলা চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন নিবেদিতা। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনারও উল্লেখ করেছেন তিনি। ক্লাসে একটি দুরন্ত মেয়ে ছিল। ক্লাসের অন্য কোনো মেয়েকে প্রশ্ন করা হলে এই মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর বলে দিত। ফলে, অনেক সময়ই ক্লাসের শৃঙ্খলা নষ্ট হত। বারবার বলেও মেয়েটিকে শোধরানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত নিবেদিতা ক্লাসে এই মেয়েটিকে উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর ফলে মেয়েটির ব্যবহারেও শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন এসেছিল। আবার একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে নিবেদিতাকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি ছুটে তাঁর কাছে এলে নিবেদিতা তাঁকে পাশে বসিয়ে আদর করেছিলেন। পরে নিবেদিতার এই ছাত্রীটি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিল, 'স্কুলের ভিতর আমাদের সিস্টার ছিলেন একদম অন্যরকম ব্যক্তিত্ব।'

ছাত্রীদের আঁকা ছবি এবং খেলনা দিয়ে নিবেদিতা স্কুলের ঘরটি সবসময় সাজিয়ে রাখতেন। যিনিই নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাঁকে তিনি ছাত্রীদের আঁকাগুলি দেখাতেন। আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে নিবেদিতা তাঁকেও ছাত্রীদের আঁকাগুলি দেখিয়েছিলেন। নিবেদিতার ছাত্রীদের আঁকা আলপনা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন কুমারস্বামী। স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদানের কথাও ভেবেছিলেন নিবেদিতা। তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের বলতেন, 'আমার ছাত্রীদের লেখা সংস্কৃত দিয়ে যেদিন স্কুলের ঘরটা সাজাতে পারব, সেদিন সবথেকে খুশি হব আমি।'

নিবেদিতার স্কুল পরিচালনার একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা। আত্মপ্রাণা লিখেছেন, নিবেদিতার ইতিহাসের ক্লাসটি ছিল সবথেকে আকর্ষণীয়। কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রের বর্ণনা দেওয়ার সময় নিবেদিতা ভুলে যেতেন যে তিনি ক্লাসে ছাত্রীদের পড়াচ্ছেন। বরং, তিনি সেই চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বর্ণনা দিতেন। নিবেদিতার খুব ইচ্ছা ছিল ছাত্রীদের পুরী, ভুবনেশ্বর, চিতোর বা উজ্জয়িনী নিয়ে যাবেন। কিন্তু অর্থাভাবে তা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ক্লাসে ছাত্রীদের কাছে এমনভাবে সেসব জায়গার বর্ণনা দিতেন, যাতে তারা মানসচক্ষে সেই জায়গাটি দর্শন করতে পারে। রাজপুত রমণীদের বীরত্বের কথা বলতে গিয়ে নিবেদিতা বলতেন, 'তোমাদেরও তাঁদের মতো সাহসী হতে হবে। ক্ষত্রিয় নারীদের মতো বীরাঙ্গনা হতে হবে।' চিতোর ভ্রমণের কথা বলতে গিয়ে একদিন তিনি ছাত্রীদের বলেছিলেন, 'আমি পাহাড়ের ওপর চোখ বুজে বসে রানি পদ্মিনীর কথা ভাবছিলাম। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম জ্বলন্ত চিতার সামনে পদ্মিনী দাঁড়িয়ে আছেন। ওই সময় পদ্মিনীর মনে কী ভাবনা খেলা করছিল, আমি তা ভাবতে চেষ্টা করছিলাম।' তাঁর ছাত্রীদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমতী, তারা বুঝতে পারত নিবেদিতা ঠিক কী বলতে চাইছেন।

ছাত্রীদের খুব দূরে কোথাও বেড়াতে না নিয়ে যেতে পারলেও, মাঝে মাঝে তাদের দক্ষিণেশ্বর, চিড়িয়াখানা বা যাদুঘরে নিয়ে যেতেন। নিবেদিতা চাইতেন, এইভাবে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটুক। একদিন ছাত্রীদের নিয়ে নৌকোয় দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথে নদীতে ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকো টালমাটাল হতে থাকে। ছাত্রীরা ভয় পেয়ে গেলে নিবেদিতা বলেন, 'তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? দক্ষ মাঝিরা বড় ঢেউকে ভয় পায় না। তারা এই ঢেউয়ে শক্ত করে হাল ধরে থাকে। জীবনেও এইরকম নির্ভীক, সংযত থাকতে শিখতে হবে। ভয় পেলে চলবে না।' আর-একবার চিড়িয়াখানায় ছাত্রীদের ক্যাঙারুর খাঁচার সামনে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'এই ক্যাঙারুর বাচ্চারা যখন ভয় পেয়ে যায়, তখন মায়ের কাছে ছুটে আসে। মায়ের আশ্রয়ে চলে যায়। আমাদেরও তেমনই একজন মা (সারদা দেবী) আছেন। আমরাও বিপদ দেখলে তাঁর কাছে ছুটে যাই। তখন আর আমাদের কোনো ভয় থাকে না।'

সরলাবালা সরকারের লেখা থেকে জানা যায়, একবার যাদুঘরে একটি শিলালিপি দেখিয়ে নিবেদিতা ছাত্রীদের বলেছিলেন, 'এই পাথরের কাছে চোখ বুজে প্রার্থনা করলে তা পাওয়া যায়। রাজা অশোক এই পাথরের কাছে বসে প্রার্থনা করতেন।' এরপর নিবেদিতা চোখ বুজে পাথরের সামনে বসে পড়েন। ছাত্রীরাও

তাঁকে অনুসরণ করে। কিছুক্ষণ এভাবে বসে থাকার পর নিবেদিতা ছাত্রীদের কাছে জানতে চান—কে কী প্রার্থনা করল। ছাত্রীরা কোনো উত্তর না দিলে মুচকি হেসে নিবেদিতা বলেছিলেন, 'ভালো ইচ্ছা কখনো সর্বসমক্ষে বলতে নেই।'

আত্মপ্রাণার লেখা থেকেই জানা যায়, নিজের স্কুলের ছাত্রীদের স্বদেশী চেতনা এবং জাতীয়তাবোধেও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। যে কারণে, মাঝে মাঝেই তিনি তাঁর ছাত্রীদের অবলা বসুর ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে নিয়ে যেতেন। তার কারণ, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সংলগ্ন উদ্যানে যেসব স্বদেশী সভা-সমিতি হত, ছাত্রীরা যেন সেগুলি শুনতে পারে। এর আগে ১৯০৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে যে স্বদেশী প্রদর্শনী হয়েছিল, সেখানে নিবেদিতা তাঁর স্কুলের ছাত্রীদের হাতের কাজ প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ছাত্রীদের চরকা কাটা শেখানোর জন্য স্কুলে একজন শিক্ষয়িত্রীও নিয়োগ করেছিলেন নিবেদিতা। ছাত্রীরা তাঁকে 'চরকা মা' বলে ডাকত। সরকার 'বন্দে মাতরম্' সংগীত নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পর এই গানটিকেই নিবেদিতা তাঁর স্কুলে দৈনন্দিন প্রার্থনা সংগীত করেছিলেন। এই ছাত্রীদের নিবেদিতা মাঝে মাঝেই বেলুড় মঠে এবং বাগবাজারে সারদা মা-র বাসভবনে নিয়ে যেতেন। ১৯০৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সারা বুলকে নিবেদিতা লেখেন, 'All these girls are gaining certain ideas and impulses. They hold themselves under Swami and the Holy Mother. They are something of disciples as well as pupils.'

নিবেদিতার স্কুলে অল্প বয়সে বিধবা হয়ে যাওয়া কয়েকটি মেয়েও ছাত্রী হিসাবে এসেছিল। সেই সময়ের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে এই মেয়েদের দুর্দশার কথা শুনে নিবেদিতা খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। নিবেদিতার স্কুলে এমনই একটি ছাত্রী ছিল প্রফুল্লমুখী। একদিন স্কুল ছুটির পর নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে গেছেন। সেখানে পৌঁছে হঠাৎই তাঁর মনে পড়ে— আজ একাদশী। রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের অনুশাসন অনুযায়ী এদিন বালবিধবা প্রফুল্লমুখী উপোস করে আছে। একথা মনে পড়ার পরই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান প্রফুল্লমুখীর কাছে। তাকে পাশে বসিয়ে আদর করে বলেন, 'আমি কী নিষ্ঠুর দেখ। আজ সারাদিন তুমি উপোস করে রয়েছ। আর আমি সে কথা মনে না রেখে নিজে খেয়ে বসে আছি।' নিবেদিতার স্কুলের কয়েকটি ছাত্রী নিয়মিত স্কুলে আসত না। বাড়ির লোকরাই তাদের নিয়মিত স্কুলে পাঠাতেন না। নিবেদিতা এইসব মেয়েদের অভিভাবকদের সঙ্গে বাড়ি গিয়ে দেখা করতেন। তাঁদের বোঝাতেন। এবং নিজের উদ্যোগে এইসব মেয়েদের রোজ স্কুলে আনার ব্যবস্থা করতেন। অসুস্থ ছাত্রীদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতেন নিবেদিতা।

মহামায়া নামে নিবেদিতার স্কুলের একটি ছাত্রী যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছিল। নিবেদিতা এবং ক্রিস্টিন এই মেয়েটির পরিবারকে চিকিৎসার খরচ জোগাতেন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য পুরীতে একটি বাড়ি ভাড়াও করে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মেয়েটি বাঁচেনি।

কলকাতায় ফিরে আসার পর এই সময়টিতে নিবেদিতা স্কুলের কাজ ছাড়াও লেখালেখির কাজে বিশেষ মনোনিবেশ করেছিলেন। এই সময়টিতে প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে দেখা যায়নি। অনুমান করা যায়, জগদীশচন্দ্র বসুর মতো ঘনিষ্ঠজনদের পরামর্শেই এই সময়ে নিবেদিতা প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে একটু সরিয়েই রেখেছিলেন। কারণ, নিবেদিতাও জানতেন, যে বিপ্লবী প্রচেষ্টা তিনি শুরু করে গিয়েছিলেন তা অরবিন্দ এবং বারীন্দ্র ঘোষের অপরিণামদর্শিতার জন্য ইতিমধ্যেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। এবং বিপ্লব প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ শাসকদের দমন-পীড়ন চূড়ান্তে পৌঁছেছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সদা-সতর্ক নজর যে তাঁর ওপর রয়েছে তা-ও তিনি জানতেন। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করলে যে তাঁকে ব্রিটিশ পুলিশ কারাগারে ভরতে পারে সে ধারণাও নিবেদিতার ছিল। ব্রিটিশ পুলিশের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে কতটা সতর্ক নিবেদিতা ছিলেন, তা বোঝা যায় সিস্টার দেবমাতার ভাষ্য পড়লে। নিবেদিতা যে সময়ে কলকাতায় ফেরেন, সেই সময়ে সিস্টার দেবমাতা বাগবাজারের বাড়িতে ক্রিস্টিনের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। নিবেদিতা কলকাতায় ফেরার সময় এবং ফেরার পরেও বেশ কিছুদিন ছদ্মবেশ ধারণ করে ছিলেন। নিবেদিতার চেষ্টা ছিল, সাধারণ মানুষ তাঁকে যেন চিনতে না পারে, এবং সিস্টার দেবমাতাকে নিবেদিতা বলে ভুল করে। এই সতর্কতা থেকেই নিবেদিতা ওই সময় চেয়েছিলেন প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড না করে গোপনে যা কিছু করার করতে।

এই সময়টিতে নিবেদিতা 'Footfalls of Indian History' গ্রন্থখানি লেখার কাজ আরম্ভ করেন। এছাড়া 'স্টেটসম্যান' এবং 'মডার্ন রিভিউ'-তে প্রবন্ধ লেখা তো ছিলই। এই প্রবন্ধগুলিকে 'Studies from an Eastern Home' নামে একটি গ্রন্থে সংকলিত করার পরিকল্পনাও এই সময় নিবেদিতা করেন। দীনেশচন্দ্র সেনের 'History of Bengali Literature' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন এবং পরিমার্জনের কাজও তিনি এই সময়েই করেন। আনন্দমোহন বসুর একটি জীবনী প্রকাশের তোড়জোড়ও তখন চলছিল। ওই গ্রন্থের জন্য তিনি 'Ananda Mohan Bose as a Nation-Maker' নামে একটি প্রবন্ধও লেখেন। আর, এসব ছাড়াও ছিল জগদীশচন্দ্রের গবেষণাপত্র তৈরিতে সাহায্য করা। সিস্টার দেবমাতা স্মৃতিচারণা

করেছেন, 'স্কুল বন্ধ হওয়া মাত্র নিবেদিতা ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করতেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে আবিষ্কারাদি নিয়ে ডাঃ বসু গ্রন্থ রচনা করছিলেন। এই কাজে নিবেদিতার এমনই উৎসাহ যে, নিজের লেখার কাজ তিনি একেবারে ভুলে গেলেন। ডাঃ বসু ৯টার সময় আসতেন, সাড়ে বারটা পর্যন্ত কাজ করতেন, তারপর আমরা একসঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করতাম।'

১৯০৯ সালের আগস্ট মাসে স্বামী সদানন্দ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৫ আগস্ট সারা বুলকে নিবেদিতা লিখছেন, 'I am at this moment so dreadfully disturbed by the news that Sw. Sadananda is fearfully ill. He is away somewhere and everyone said he was strong and well. Now I am so afraid. If news come and there is likely to be time, I want to go to him. It is in the way of Darjeeling. Oh, S. Sara, if he must die, at least I pray to reach him before he goes. Blessed, blessed Sadananda.'

স্বামী সদানন্দের অসুস্থতার সংবাদে নিবেদিতা যে কতটা উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, তা এই পত্রটি থেকেই বোঝা যায়। উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত হয়ে পড়াই নিবেদিতার পক্ষে স্বভাবিক ছিল। কেননা, স্বামী সদানন্দ ছিলেন নিবেদিতার সর্বক্ষণের সঙ্গী এবং এদেশে নিবেদিতার সব কাজের সহায়ক। নিবেদিতা এদেশে আসার পর স্বামীজিই সদানন্দকে নিবেদিতার সহকারী হিসাবে নির্দিষ্ট করে দিয়ে যান। সেই থেকেই সদানন্দ নিবেদিতার সঙ্গেই ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক ছিন্ন হলেও, সদানন্দ নিবেদিতার সঙ্গেই ছিলেন। এমনকী, বাগবাজারে নিবেদিতার স্কুল চালুর পিছনেও সদানন্দের বিশাল অবদান ছিল। ফলে, সদানন্দের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে উত্তরবঙ্গের পীরগঞ্জে নিবেদিতা ছুটে যান তাঁকে দেখতে। ১৯০৯-এর ১৯ আগস্ট জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Just back this noon from a visit to North Bengal to see Sadananda who is lying ill there. He has lost all his teeth and is shrunken and bent. His face is small and smooth-shaven and his eyes very brown and luminous. He is in white, not gerua. Just like some etching of an old Italian Cardinal, whom, I can not remember. I gave him the gold piece and one of the magnifying glasses. This he much appreciated. And I took him a little port wine, as a digestive and oh, the good it did him! He needs food—poor

thing!—and comfort—and to be appreciated. How he asked about you!— and how you were!'

এরপরে আরো দুটি চিঠিতে সদানন্দের কথা উল্লেখ করেছেন নিবেদিতা। ১৯০৯-এর ১৬ সেপ্টেম্বর একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'Sadananda wants to come to Calcutta and me in a few weeks, so I am taking an available home close by for a few months. It is near enough for us to send his tea or cocoa on a tray when he is too infirm to walk. That great strong man has become little and bent and shrunken, and can not walk without help! And he is so sensitive about food, being finely served. The house will probably cost a bout $ 8 or 9 a month and some disciples will live there with him and pay for food and service as they would have to do in a hotel. So my expense will be mainly the rent and the little meals. I hope this plan will work out in a few months of peace and joy for poor Swampsie.'

চিঠিটি পড়ে বোঝা যাচ্ছে, অসুস্থ সদানন্দ কলকাতায় এসে নিবেদিতার কাছেই থাকতে চেয়েছিলেন। এবং নিবেদিতাও কলকাতায় সদানন্দর থাকার সব ব্যবস্থাও করেছিলেন। বাগবাজারে তাঁর বাড়ির কাছেই একটি বাড়ি সদানন্দের থাকার জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি। চিঠিটি পড়ে আরো জানা যাচ্ছে, অসুস্থতার কারণে সদানন্দ দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। এমনকী হাঁটার মতো শক্তিও তাঁর আর ছিল না। ১৯০৯-এর ২৯ সেপ্টেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'I expect Swampsie (Sadananda) back in a few days—to occupy for the winter the little house I have taken for him. Poor Sadananda! He is now a nervous wreck! But there is still something of the old light!'

নিবেদিতার সঙ্গে সদানন্দের এই অটুট বন্ধনটি অব্যাহত ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ১৯১১ সালে, নিবেদিতার প্রয়াণের বছরই প্রয়াত হন সদানন্দ। ওই বছর ফেব্রুয়ারিতে প্রয়াত হন তিনি।

নানারকম কর্মব্যস্ততার মাঝে সময় সুযোগ হলেই নিবেদিতা বেরিয়ে পড়তেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরতে। তাঁর এই ভ্রমণগুলির একটি উদ্দেশ্য ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের আর্থসামাজিক অবস্থা, জনজীবন, তাদের জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান–এসব সম্পর্কে সম্যক ধারণা করার জন্যই নিবেদিতা এই ভ্রমণে

বেরোতেন। এইসব ভ্রমণে অনেক সময়ই জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসু তাঁর সঙ্গী হতেন। ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশিষ্ট ব্রিটিশ চিত্রকর হেরিংহ্যাম ভারতে এসেছিলেন অজন্তা চিত্রাবলীর প্রতিলিপি তৈরির জন্য। হেরিংহ্যামের সঙ্গে নিবেদিতার আগেই পরিচয় ছিল। হেরিংহ্যাম অজন্তা যাচ্ছেন জানতে পেরে নিবেদিতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে নন্দলাল বসু এবং অসিত হালদারকেও অজন্তা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য ছিল, তাঁরাও অজন্তা চিত্রাবলী প্রতিলিপি করে আনুন। এ প্রসঙ্গটি এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে। নন্দলাল এবং অসিত হালদারকে অজন্তা পাঠানোর আংশিক ব্যয়ভার বহন করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। নন্দলাল এবং অসিত হালদার অজন্তা রওয়ানা হয়ে যাবার কয়েকদিন পরেই নিবেদিতাও বসু দম্পতিকে সঙ্গে নিয়ে অজন্তা যান। তাঁদের সঙ্গী হন গণেন মহারাজ। নিবেদিতার চিঠি থেকে জানা যায় ১৯০৯-এর বড়দিনের আগে তাঁরা অজন্তার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। ১৯০৯-এর ২৩ ডিসেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'We are starting today at noon for Ajanta and Ellora— and to be back Jan. 3rd!'

অজন্তা এবং ইলোরা ঘুরে এসে নিবেদিতা 'The Ancient Abbey of Ajanta' শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি ১৯১০ সালে ধারাবাহিকভাবে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে 'Footfalls of Indian History' গ্রন্থে এটি সংযোজিত হয়।

নয়

১৯০৯ সালে নিবেদিতা ইংল্যান্ড থেকে কলকাতা ফিরে আসার পর অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে অরবিন্দ নিজেই একথা স্বীকার করে লিখেছেন, '...আমি মাঝে মাঝে সময় করিয়া বাগবাজারে নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম।' মনে রাখতে হবে, সেই সময়ে বাংলাদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টা ছত্রভঙ্গ। ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির ফলে বিপ্লবী সংগঠনগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন। বহু বিপ্লবীই তখন কারান্তরালে। কারামুক্তির পর অরবিন্দ তখন কার্যত একা, দিগ্‌ভ্রান্ত এবং হতাশ। এমন একটি সময়ে নিবেদিতা কলকাতায় এসে পৌঁছনোর পর অরবিন্দের সুবিধাই হয়েছিল। রাজনৈতিক পরামর্শ করার মতো অন্তত একজনকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। বাগবাজারের বাড়িতে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর যে রাজনৈতিক আলোচনা হত, তা না বলে দিলেও বোঝা যায়। কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর অরবিন্দ 'কর্মযোগিন' এবং 'ধর্ম' নামে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও বের করেন। 'কর্মযোগিন' বেরোত ইংরেজিতে এবং 'ধর্ম' বাংলায়।

লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'নিবেদিতা এসে দেখলেন, অরবিন্দ একেবারে বদলে গেছেন। শীর্ণ মুখের মধ্যে অন্তর্ভেদী চোখদুটি জ্বল-জ্বল করছে। যেদিন তিনি ছাড়া পেলেন, স্কুলটিকে পত্রে-পুষ্পে সাজিয়ে সেদিনটি নিবেদিতা পুণ্যতিথি হিসাবে পালন করলেন।' রেমঁ-র লেখার এই অংশে অবশ্য সঠিক তথ্য নেই। অরবিন্দ কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন নিবেদিতা কলকাতা পৌঁছনোর আগেই। নিবেদিতা যখন কলকাতা এসে পৌঁছন, তখন অরবিন্দ 'কর্মযোগিন' পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। রেমঁ লিখেছেন, 'কারাগারে একটা দিব্যদর্শনের পর অরবিন্দ যেন অপ্রধৃষ্য শক্তির অধিকারী হয়েছেন মনে হল। বিচারাধীন অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই দেখতেন না। সর্বত্র সেই সচ্চিদানন্দ—ঘনবিগ্রহ পুরুষোত্তম। তিনিই কারাধ্যক্ষ,

তিনিই বিচারক, তিনিই কয়েদী।' অরবিন্দ নিজে এই সময়টি সম্পর্কে লিখেছেন— 'গোলমাল আর হট্টগোলের মধ্যেও বিবিক্ত ও নিস্তব্ধ থেকে যোগের অনুশীলন করা অভ্যাস করেছিলাম এই সময়। এর আগে কিংবা পরেও আমার সাধনা পুঁথির নির্দেশে চলেনি, তার ভিত্তি ছিল অন্তরের স্বত-উৎসারিত অনুভব। জেলে গীতা ও উপনিষদ কাছে ছিল। আমি গীতোক্ত যোগাভ্যাস আর উপনিষদের সাহায্যে ধ্যান করতাম। কোনো জটিল সমস্যা উপস্থিত হলে সমাধানের জন্য কখনো-কখনো গীতার আশ্রয় নিতাম। প্রায়ই তা থেকে সাহায্য বা জবাব পেয়ে যেতাম।...জেলে নির্জন ধ্যানের মধ্যে অবিশ্রাম বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর শুনেছি এবং তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করেছি। একপক্ষকাল আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন তিনি।'

রেমঁ লিখেছেন, 'কারামুক্ত অরবিন্দ এসে দেখলেন, তাঁর অনুবর্তীরা সবাই নিরুদ্যম, দলে ভাঙন ধরেছে। নিবেদিতা আর জনকয়েক সহচরকে নিয়ে আবার দেশকে ডাক দিলেন অরবিন্দ, ঝিমিয়ে পড়া সমাজের বুকে আবার দেশহিতৈষণার আগুন জ্বালিয়ে তুলতে চাইলেন। এবার তাঁর সাধনা হল কর্মযোগীর।

'এই সময় অরবিন্দ ইংরাজীতে 'কর্মযোগিন' আর বাংলায় 'ধর্ম' নামে দুটি পত্রিকা বার করেছিলেন। দুটি পত্রিকারই আদর্শ মহান আর সুর বেশ চড়া। ১৯০৯ সনের ১৯ শে জুন 'কর্মযোগিন' প্রথম প্রকাশিত হয়। তাতে পত্রিকার উদ্দেশ্য এইভাবে ঘোষণা করা হয়; দেশের জীবন স্রোত একদিন বিপুল খাতে এই লক্ষ্যে প্রবাহিত হত। দীর্ঘকাল হল সে স্রোত সহস্র সঙ্কীর্ণ এবং অগভীর ধারায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দুটি প্রধান ধারা আজ ধর্ম আর রাজনীতির খাতে বইছে বটে, কিন্তু আজও তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ...জাতীয় শক্তির উৎস অনেক। অতীতেরই হ'ক আর বর্তমানেরই হ'ক, আমরা তার সবগুলি নিয়েই আলোচনা করব, তাদের সর্বজনবোধ্য করবার চেষ্টা করব, জীবনে তাদের নামিয়ে আনব। নিষ্ক্রিয় নয়, শক্তির সক্রিয় রূপ আমরা দেখতে চাই। শক্তিকে শুধু আগলে রাখা নয়, চাই তার উচ্ছলন...'

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'আমরা শুধু দেখিতেছি যে নিবেদিতা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বে অরবিন্দ বঙ্কিমের প্রভাব বহুলাংশে কাটাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। এই প্রথম সংখ্যাতেই অরবিন্দ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্তিত চিত্রকলাকে অতি উচ্চস্থান দিলেন। এমনকি পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপেক্ষা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে বড় সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাও নিবেদিতা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বের ঘটনা। বিপিনচন্দ্র পালের ইংল্যান্ডে প্রচারকার্য্যকে অরবিন্দ আদৌ পছন্দ করিতেছেন না— "Self-help and

passive resistance are not the things to preach before the English people in England." অরবিন্দ তাঁহার যোগের কথাও এই প্রথম সংখ্যাতে খোলসা করিয়া লিখিলেন যে, যোগের গূঢ়তত্ত্ব মানবজাতির নিকট প্রকাশিত না হইলে ক্রমোন্নতির পথে মানুষজাতি ইহার পরের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে পারিবে না (Yoga must be revealed to mankind, because without it mankind cannot take the next step in the human evolution)।'

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর অরবিন্দের মত ও কর্মধারার পরিবর্তন ঘটে। তার একটা বড় কারণ অবশ্যই পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক অবস্থা। অরবিন্দ বুঝতে পেরেছিলেন, যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব প্রচেষ্টায় তিনি নেমেছিলেন, তার দ্বারা দেশের স্বাধীনতা সম্ভব নয়। এই সময় থেকেই তিনি সন্ত্রাসবাদের পথ ছেড়ে বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। সেই আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার পক্ষেই অরবিন্দের মত ছিল। পাশাপাশি, এর সঙ্গে যোগ হল তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন, যোগ, হিন্দুধর্ম— তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তায় এগুলিও যুক্ত হল এবার। এই নতুন ভাবধারায় উজ্জীবিত অরবিন্দ ওই বছর মে থেকে ডিসেম্বর মাসের ভিতর অনেকগুলি বক্তৃতা দিলেন। জাতীয়তাবাদী চেতনায় আবার উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চাইলেন সকলকে। আগের থেকে তফাৎ একটাই, অরবিন্দের এবারের কার্যকলাপ আগের মতো আর গোপনে ছিল না। অরবিন্দের চিন্তাধারায় কেমন পরিবর্তন এসেছিল, তা বোঝা যায় ওই সময়ে প্রদত্ত তাঁর ভাষণগুলিতে। উত্তরপাড়ার ভাষণে অরবিন্দ বলেন, 'এইসময় ঈশ্বরের দিকে মন ফিরল যখন, তখন তাঁর 'পরে আমার বিশ্বাস ছিল না বললেই চলে। ...কারাগারের নিঃসঙ্গতায় তাঁকে বললাম, জানি না কী আমায় করতে হবে, কেমন করেই বা করতে হবে। আমায় আদেশ কর তুমি। এল তাঁর বাণী, এ-দেশকে তুলতে হবে, সেই কাজে সাহায্য করবার ভার দিয়েছি তোমায়। ...আমার বাণী প্রচার করবে বলে এ-দেশকে বড় করে তুলেছি আমি। শক্তি সঞ্চার করেছি জনগণের অন্তরে। দীর্ঘকাল ধরে এ অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি রচেছি। এবার সময় হয়েছে। আমিই পূর্ণতার পথে পরিচালিত করব এ দেশকে...' সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের মুক্তির কথা ভেবেছিলেন যে অরবিন্দ, তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন যেন যোগী রূপে। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন, 'অরবিন্দ অবতার বনবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন।' গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, 'অরবিন্দ তাঁর বঙ্গদেশীয় জীবনের শেষ পর্ব থেকেই ধরাধামে স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করতে শুরু করেছিলেন। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে—রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্যের মতো ঈশ্বরের

আবির্ভাব মনে করেও—রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের কার্যকে তিনি "মানবের কঠোর স্বার্থপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমের উপযুক্ত পাত্র হইবার জন্য" ক্ষেত্র প্রস্তুতির কার্য মনে করেছেন— ততোধিক নয়। তাঁর মতে, ভগবান এখনো "সম্পূর্ণ শক্তিকে" প্রকাশ করেননি। সেজন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে লিখেছেন ঃ "কবে সেই দিন আসিবে যখন তিনি আবার অবতীর্ণ হইয়া চিরপ্রেমানন্দ মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত ও স্থাপিত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিবেন।" অর্থাৎ অরবিন্দ তখনই আরো বড় আকারের অবতারের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। হেমচন্দ্র কানুনগোর কথা যদি সত্য হয় তাহলে—অরবিন্দ নিজেই সেই ভূমিকা গ্রহণে অগ্রসর হয়েছিলেন।' হেমচন্দ্রের কথা যে কিছুটা হলেও সত্য তার প্রমাণ, পরবর্তীকালে পণ্ডিচেরি আশ্রমে ঋষি অরবিন্দরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ।

নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের হৃদ্যতা ছিল। পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধাও করতেন। মূলত রাজনীতিকে কেন্দ্র করেই দুজনের ভিতর এই ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক। নিবেদিতা বরাবরই অরবিন্দকে জাতীয়তাবাদী নেতা বলে স্বীকার করেছেন। অরবিন্দও নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন— নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই যোগাযোগ ছিল। বরোদায় তাঁদের প্রথম পরিচয়ে কী বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী লেডি অবলা বসু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, জগদীশচন্দ্র বসু এবং অরবিন্দ ঘোষ উভয়েই নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। নিবেদিতাই স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ বইখানি অরবিন্দকে বরোদায় প্রথম সাক্ষাতের সময়ই পড়িতে দিয়াছিলেন। এই বইখানি পড়িয়াই অরবিন্দ যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন।'

রাজনীতির সূত্রে নিবেদিতা এবং অরবিন্দ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হলেও, আরো একটি বিষয়েও দুজনের মিল ছিল। দুজনেই ছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুগামী। অরবিন্দের মতে, যা তিনি প্রকাশ্যে বলেওছিলেন, জাতীয় আন্দোলনের মূল শক্তিই ছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। অরবিন্দ জানিয়েছেন, তাঁর শোওয়ার ঘরে একটি ক্ষুদ্র বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের মাটি সংরক্ষিত ছিল। অরবিন্দের মতে, ওটি ছিল 'ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ।' মুরারিপুকুর বোমা-কাণ্ডের সময়ে অরবিন্দের বাড়ি তল্লাশি করতে গিয়ে পুলিশ এই মাটিকে বোমার মশলা ভেবে বাজেয়াপ্ত করেছিল। এছাড়া কারাগারে স্বপ্নে বিবেকানন্দের দর্শন বা তাঁর পরিকল্পিত 'ভবানী মন্দিরে' মানবদেবতা হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অরবিন্দ ভেবেছিলেন। অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে চলে যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী ঘোষ যখন সারদা দেবীর কাছে

দীক্ষা নেন, তখন অরবিন্দ বলেছিলেন, 'আমি জেনে সুখী হলাম যে, আমার স্ত্রী সাধনাতে এমন মহৎ আশ্রয় লাভ করেছে।' অবশ্য একথা বললেও সারদা দেবীর কাছে মৃণালিনীর আনুষ্ঠানিক দীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে অরবিন্দের আপত্তি ছিল বলে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণা লিখেছেন, 'মৃণালিনী দেবীর দীক্ষা নেবার ইচ্ছা শুনে তাঁর পিতা এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মত জানবার জন্য পণ্ডিচেরীতে তাঁর উদ্দেশ্যে পত্র লেখেন। এই চিঠির উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ জানান, মৃণালিনীর দীক্ষা নেবার প্রয়োজন নেই, তাঁর প্রয়োজনীয় যা কিছু আধ্যাত্মিক সাহায্য শ্রীঅরবিন্দই প্রেরণ করবেন। মৃণালিনীদেবী এই আদেশ সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন।' এই ঘটনাটিতেও কিন্তু অরবিন্দের 'অবতার বনবার' বাসনাই প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি, নিবেদিতাও মনে করেছেন, জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগ্রত করতে বিবেকানন্দের অবদান অনস্বীকার্য। এবং তাঁরই চিন্তায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালিত হবে—এমনটাই মনে করতেন নিবেদিতা। তবে, নিবেদিতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অরবিন্দের মতো কোনো অলৌকিকত্ব বা অবতারবাদে বিশ্বাস করতেন না। অরবিন্দের এই অলৌকিকত্বে যে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, তা ১৯০৯-এর ২১ জুলাই র‍্যাটক্লিফকে লেখা একটি চিঠিতে নিবেদিতা জানিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, 'A new paper Karma Yogin— has appeared, in place of Bande Mataram. Arubindo is lecturing widely, and as I think unwisely. But he believes himself divinely impelled and therefore not to be arrested. Of course many of us do strange things, because, for reasons known only to ourselves, "We care no other"—but certainly GOD gives no promise of indemnity! Joan of Arc is a perpetual witness to the contrary. It is when we have suffered all, that we sometimes say "Yes! MY voice were of GOD."

'Meanwhile, religious experience and strategy are by no means the same thing, and ought not to be confused.' চিঠিটি পড়েই বোঝা যাচ্ছে, অরবিন্দের এই অবতারবাদকে অবাস্তর এবং অবাস্তব বলেই মনে করতেন নিবেদিতা। বরং, ১৯০৯ সালে ভারতে ফিরে আসার পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ব্রিটিশ পুলিশের দমনমূলক আচরণ দেখে নিবেদিতার বুঝতে কষ্ট হয়নি—যে কোনো মুহূর্তে কী নির্মম আঘাত নেমে আসতে পারে। এইরকম পরিস্থিতিতে এই ধরনের কল্পনাবিলাস যে কতখানি মারাত্মক তা বুঝেছিলেন নিবেদিতা। ব্রিটিশ পুলিশের হাতে বন্দি হয়ে পড়ার বদলে কৌশলে গ্রেপ্তার এড়িয়ে রাজনৈতিক

কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া যে অনেক বেশি জরুরি, তা অনুধাবন করেছিলেন নিবেদিতা। যে কারণে তাঁর পিছনে পুলিশের চর লেগেছে জানার পর ছদ্মবেশে নানা কৌশলে তিনি তাদের চোখ এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। ১৯০৯ সালে ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় ফিরলেই গ্রেপ্তার হতে পারেন, এই সংবাদ পাওয়ার পর তিনি ছদ্মবেশে এদেশে এসেছিলেন। এই প্রসঙ্গটি পূর্বে একবার উল্লেখ হয়েছে। এখানে বিস্তারিত বলা যাক।

১৯০৯ সালে নিবেদিতা যখন ইংল্যান্ড থেকে কলকাতা এসে পৌছন, তখন সিস্টার দেবমাতা বাগবাজারে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। নিবেদিতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সিস্টার দেবমাতা বলেছিলেন, 'নিবেদিতা আমাকে যতদিন সম্ভব কলকাতায় আটকে রাখার চেষ্টা করেছিলেন— আমি তাঁর আত্মগোপনের সহায়ক হয়েছিলাম। বিদ্যালয়ে আমি পৌঁছোবার কিছু পরে তিনি ইউরোপ থেকে ফিরেছিলেন। আমি দেখে অবাক— তিনি একেবারে আধুনিকতম ফ্যাশনে সজ্জিত, মাথায় মস্ত সাদা হ্যাট, পালক গোঁজা, পরিপাটি জমকালো গাউন। আমি বললাম, 'নিবেদিতা, কি কাণ্ড! আমি ভেবেছিলাম তুমি সন্ন্যাসিনীর পোশাক পরো।' তিনি উত্তর দিলেন, 'এটা আমার ছদ্মবেশ। আমাকে ভারতে না ফেরার জন্য লিখে পাঠানো হয়, কারণ ভারতে পদার্পণ করলেই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তারের শাসানি দিয়ে রেখেছে। আমি কিন্তু ফিরতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমি জানতাম, আমার এই পোশাক দেখে তারা সন্দেহ করতে পারবে না।' পুলিশ সম্বন্ধে নিবেদিতার ধারণা যথাযথ, কারণ যখন আমি বাগবাজারের সরু গলি দিয়ে হাঁটতাম, প্রায়ই আমাকে থামিয়ে প্রশ্ন করা হত— 'আপনি কি সিস্টার নিবেদিতা?' যখন বলতাম— 'না' তখন তারা স্থির করত— আমি স্কুলের দ্বিতীয় সিস্টার। ...আমার কোনো রাজনৈতিক সংশ্রব ছিল না বলে তারা স্কুলে বিশেষ নজর দেয়নি, ফলে নিবেদিতা ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।'

১৯০৯ সালে কলকাতা ফেরার জন্য নিবেদিতা যে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন, সে বিষয়ে আরো তথ্য পাওয়া যায় নিবেদিতার চিঠিপত্রে। ভারতের দিকে রওয়ানা হওয়ার আগে ১৯০৯-এর ৯ মার্চ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Shall you be in London in April? I expect to be there with the Boses. Before leaving, I shall come to you for any old muslin gowns that I could wear on board ship. If I could lift one from you, one from A. and one from Mrs Hellyer, I could wear secular dress.'

এবং এইসব পোশাক পরে ছদ্মবেশ ধারণে যে কতখানি সক্ষম তিনি হয়েছিলেন তা জানা যাচ্ছে ১৯০৯-এর ১১ মে জোসেফিনকে লেখা চিঠিতে। নিবেদিতা লিখেছেন, '...Your cloths are a veritable Godsend. I am to wear secular dress from the moment of finishing up here, till I reach Calcutta. Also there will be a vague impression that I am Mrs. Or Miss Bull. So say nothing!

ছদ্মবেশটি যাতে আরো বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায় তার জন্য জগদীশচন্দ্রও কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন নিবেদিতাকে। সে কথা জানা যায় বোন মেরি উইলসনকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে। ১৯০৯-এর ১৫ মে বোন মেরিকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'The Man of Science begs you to send me the blue serge cap. Can you spare it? He says "I must have something of the sort, with my secular dress!" শেষপর্যন্ত ছদ্মবেশ ধারণে সফল নিবেদিতা ১৯০৯-এর ৪ জুন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে জানাচ্ছেন, 'My disguise is complete— thanks to your attire!' এই চিঠিগুলিই প্রমাণ, পুলিশের চোখে ধুলো দেবার কারণে ছদ্মবেশেই নিবেদিতা কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলেন। পরবর্তীকালে অরবিন্দ অবশ্য বলেছিলেন, 'ঐকালে নিবেদিতার বিপদের কোনো প্রশ্নই ছিল না। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ সত্ত্বেও উচ্চপর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল—ফলে তাঁর গ্রেপ্তারের কোনোই সম্ভাবনা ছিল না।' এই কথা অরবিন্দ বলেছিলেন অনেক বছর পরে, যখন পণ্ডিচেরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি বসবাস করছেন। তবে, অরবিন্দের এই ধারণা সঠিক ছিল না। উচ্চপর্যায়ের ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীদের ভিতর নিবেদিতার অনেক বন্ধু ছিলেন নিঃসন্দেহে। স্বয়ং ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর স্ত্রী লেডি মিন্টোর সঙ্গেই নিবেদিতার হৃদ্যতার সম্পর্কও ছিল। কিন্তু তাঁরা যে নিবেদিতার গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা পুরোপুরি দূর করতে পেরেছিলেন এ কথা জানা যায় না। হয়তো তাঁরা এ ব্যাপারে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নিবেদিতার এই বন্ধুরাই তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন কলকাতায় ফিরলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে। হয়তো তাঁরা বুঝেছিলেন, নিবেদিতাকে রক্ষা করার চেষ্টা বিফল হতে পারে। তদুপরি এই বন্ধুদের ভিতরও কেউ কেউ নিবেদিতার পিছনে চরবৃত্তি করেছিলেন। যেমন, লেডি মিন্টো। এই সব কারণে নিবেদিতাও সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

ছদ্মবেশ ধারণ করে নিবেদিতা শুধু যে ভারতেই এসে পৌঁছেছিলেন তা নয়, পৌঁছনোর পরও বেশ কিছুদিন ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং আত্মগোপন করে ছিলেন।

বোঝাই যাচ্ছে, তখনও গ্রেপ্তারের আশঙ্কা নিবেদিতা করছিলেন। ২২ জুলাই ১৯০৯ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে তিনি লিখেছেন, 'My clothes elicit greatest admiration from such as understand. Wearing them for present, to be pesdu.' ওই একই দিনে আর একটি চিঠিতে (সম্ভবত সারা বুলকে) তিনি লিখেছেন, 'Please don't mention me by name in your letters. I am keeping Quiet and not venturing into street. Devamata is evidently regarded as me and is attracting attention. But such innocence and piety!!!'

এইখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে। স্বামীজির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময়ে এবং প্রথমবার ভারতে আসার আগে নিবেদিতা আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন; বলা ভালো, নেতৃস্থানীয়দের ভিতর একজন ছিলেন। সেই সময়ে পিটার ক্রপটকিনের সংস্পর্শে এসে আইরিশ গুপ্ত সংগঠনগুলির সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগও গড়ে ওঠে। আয়ারল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে প্রকাশ্য সভা-সমাবেশে নিবেদিতা সে সময়ে নিয়মিত বক্তব্য রাখতেন। নিবেদিতার সে সময়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। সেই সময়ে আয়ারল্যান্ডে এই আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের ওপরই ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কড়া নজর ছিল। অনুমান করাই যায় যে, নিবেদিতার ওপরও সেই নজর ছিল এবং সেই সময় থেকেই ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সন্দেহের তালিকায় নিবেদিতা ছিলেন। কাজেই নিবেদিতা যখন প্রথমবার ভারতে পদার্পণ করলেন, তখনও যে গোয়েন্দারা তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিলেন— এরকম ধারণা করাই যায়। পরে, এদেশেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিবেদিতা জড়িয়ে পড়ার পর তাঁর ওপর গোয়েন্দাগিরি শুরু হয়ে যায়।

নিবেদিতার চিঠিপত্রগুলি পড়লেই বুঝতে অসুবিধা হয় না, কীভাবে তাঁর পিছনে সবসময় গোয়েন্দাগিরি চলত। শুধু যে পুলিশের গোয়েন্দাদেরই তাঁর পিছনে লাগানো হয়েছিল তা নয়, সমাজের উচ্চশ্রেণির মহিলাদেরও চরবৃত্তি করার জন্য নিবেদিতার পিছনে লাগানো হয়েছিল। এইরকমই একজন মহিলা ছিলেন কর্নেলিয়া সোরাবজি। কর্নেলিয়া বেশ অনেকদিন ধরেই নিবেদিতার পিছনে চরবৃত্তি করেছিলেন। কিন্তু প্রথমাবধিই নিবেদিতা কর্নেলিয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলেন এবং তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। ১৯০৪ সালের ১৯ এপ্রিল জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লেখেন, 'Miss Sorabji is in Calcutta.

and has taken all ways to get herself invited here. Finally she has written to me direct and asked. So we are obliged to offer tea next Saturday, to my great chagrin. Of course it is of no real importance.'

কর্নেলিয়া সোরাবজি যে প্রকৃত অর্থেই পুলিশের চর তা অবশ্য কয়েকবছর পরই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৯ সালে নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে আসার পর, ১৯১০ সালে ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর স্ত্রী লেডি মিন্টো বাগবাজারের বাড়িতে নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। নিবেদিতার সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরেও যান। এরপর লেডি মিন্টো বেলুড় মঠেও যান একদিন। সেদিন তাঁর সঙ্গে নিবেদিতা ছিলেন না। ছিলেন কর্নেলিয়া সোরাবজি। সোরাবজি বেলুড় মঠে গিয়ে নানা অছিলায় জানার চেষ্টা করেন নিবেদিতা এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে মঠের কী সম্পর্ক। সোরাবজির এই চরগিরিতে ক্ষুব্ধ হয়ে ১৯১০-এর ১০ মার্চ নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে লেখেন, 'On Wednesday, Cornelia [Sorabji] took Lady Minto to the Math, by surprise, and asked a number of direct Questions. What was my connection, were they interested in certain things and so on. This seems to me sheer impertinence, which would have been impossible had I been present.'

ওই দিনই জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে তিনি লিখেছিলেন, 'Next morning she [Lady Minto] visited the Math with your friend Cornelia [Sorabji], who may now be regarded as more or less definitely in the secret service.'

এই কর্নেলিয়া সোরাবজির সঙ্গে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের পরিচয় ছিল। সেই পরিচিতি ভাঙিয়েই কর্নেলিয়া নিবেদিতার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করেছিলেন। ১৯১০-এর ২৮ জুলাই নিবেদিতা জোসেফিনকে লিখেছেন, '... and do you know who is my most powerful and bitter foe—it is your friend, Cornelia [Sorabji]! She is of course nothing in the world but a secret service scout. My safety has lain in my resolute refusal to know her. She is in any case an enemy—and an enemy who boasts of my acquaintance. And I wd. rather have avowed hostility than smooth treachery. Oh yum—she is indeed vile! Well, but for your attempt to bring us together, and the letter that she wrote to me

in London, I should no doubt have walked straight into her arms in India. One had heard so much in her favour all one's life. So you saved us from that.'

কর্নেলিয়া সোরাবজি যে পুলিশের বেতনভোগী গোয়েন্দা তা নিবেদিতা আরো পরিষ্কারভাবে জানতে পারেন মিসেস স্ল্যাক নামী এক মহিলার কাছ থেকে। এই মিসেস স্ল্যাকের স্বামী ছিলেন ভাইসরয় কাউন্সিলের এক প্রভাবশালী সদস্য। ১৯১১ সালে ইয়োরোপ থেকে শেষবারের মতো ভারতে ফেরার সময় জাহাজে নিবেদিতার সঙ্গে মিসেস স্ল্যাকের পরিচয় হয়। নিবেদিতা মিসেস স্ল্যাককে স্বামীজির বিষয়ে অনেক কথা বলেন। স্বামীজির কথা শুনে আবেগতাড়িত মিসেস স্ল্যাকও অনেক কথা বলেন নিবেদিতাকে। ওই কথা প্রসঙ্গে কর্নেলিয়া সোরাবজির প্রকৃত পরিচয়টিও মিসেস স্ল্যাক জানিয়ে দেন নিবেদিতাকে। ১৯১১-র ২ এপ্রিল নিবেদিতা জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন, 'The end of it was that I told my nice women who I was, and all about our life—whereupon she becomes positively hungry to hear about Swamiji, and the whole thing. The last few days we have had an hour each day, then she seems to retire and think about it, like Miss Longfellow, and then back again, with more Qusetions. I really had to do it, because her very first communication lay in telling me about Cornelia Sorabji, and how her employment was under her husband, and I felt so mean to be listening! But she said, she could quite understand my thinking it best to be incog. and so avoiding a position of antagonism to others, which my own name might force upon me. She is called Mrs. Slack.'

কর্নেলিয়ার সম্পর্কে জাহাজে বসে মিসেস স্ল্যাকের কাছ থেকে তথ্য শুনতে খুবই সংকোচ বোধ করছিলেন—একথা চিঠিতেই জানিয়েছেন নিবেদিতা। তবু, এ তথ্য তাঁর জানা একান্তই দরকার ছিল। নিজের নিরাপত্তাকে আরো নিশ্চিত করতেই এসব তথ্য নিবেদিতার জানা দরকার ছিল।

শুধু কর্নেলিয়া সোরাবজি নয়, ভাইসরয় পত্নী লেডি মিন্টোর আচরণও কিন্তু সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল না। লেডি মিন্টোর সঙ্গে নিবেদিতার ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল; কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী বিচার করলে মনে হয়, এই ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগিয়েই লেডি মিন্টোও নিবেদিতা সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ

করেছিলেন এবং কর্নেলিয়া সোরাবজিকেও নিবেদিতার পিছনে চরবৃত্তি করতে সাহায্য করেছিলেন। ১৯১০-এর ২ মার্চ লেডি মিন্টো একরকম গোপনেই নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। লেডি মিন্টোর সঙ্গে একজন ব্যক্তিগত সহকারী ছাড়া কেউই ছিলেন না। এক মার্কিন ভদ্রমহিলা লেডি মিন্টোকে নিবেদিতার বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। নিবেদিতার চিঠিপত্র থেকেই জানা যায় যে, লেডি মিন্টোর সঙ্গে তাঁর সেদিন বেশ কিছুক্ষণ অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা হয়েছিল। ওই আলাপচারিতার সময় লেডি মিন্টো 'বোমার রাজনীতি' নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করেন নিবেদিতাকে। লেডি মিন্টোকে নিয়ে কিছুদিন পর দক্ষিণেশ্বর মন্দির দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনাও করেছিলেন নিবেদিতা। ১৯১০-এর ৩ মার্চ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Yesterday morning a little American woman brought who do you think to call— Lady Minto! The whole thing was private, only an aide to accompany, and she was charming— speaking with such cool courage about her own feeling regarding bombs. I am to take her to Dukineshwar next Tuesday. Till then, the visit is a secret.'

ওই দিনই বোন মে উইলসনকেও একটি চিঠিতে লেডি মিন্টোর আসার সংবাদ জানিয়েছেন নিবেদিতা। লিখেছেন, 'An extraordinany thing happened yesterday which ought for the next few months to relieve us of the constant harrassment of the police. Lady Minto came to see us, in the morning, privately. We had a long intimate talk, and showed her the school. I am to join her again on Tuesday next, and take her incognito, to see the Temple of Dukhineshwar. Perhaps it will be well, however, to hold back this letter, in order to prevent the plan leaking out through the agency of the Post Office. Ever since a bomb was thrown at them, she has to be careful what she does, and you can imagine that I would not like to be the indirect cause of a disaster!'

লেডি মিন্টো তাঁর বাড়িতে আসার ফলে প্রাথমিকভাবে নিবেদিতা একটু উৎফুল্লই হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন এরপর তাঁর প্রতি পুলিশি হয়রানি কমবে। কিন্তু বাস্তবে তা অবশ্য হয়নি। লেডি মিন্টো নিবেদিতার বাড়িতে আসায় আরো একজন

খুশি হয়েছিলেন। তিনি জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্রও ভেবেছিলেন, এর পর পুলিশি ঝামেলায় নিবেদিতাকে আর পড়তে হবে না। ব্রিটিশ প্রশাসনের ওপর তলায় একটি যোগাযোগ গড়ে তুলতেও সেই সময়ে জগদীশচন্দ্র পরামর্শ দিয়েছিলেন নিবেদিতাকে। ১৯১০-এর ৩ মার্চ একটি চিঠিতে (কাকে লিখেছেন জানা যায় না) নিবেদিতা লিখেছেন, 'You will never guess the piecc of news we have for you today. Yesterday, Lady Minto came to see us. She was brought by a little American woman, Mrs. P.—who says her youth was passed in Boston, a sweet little woman married to an Englishman. Evidently very rich, so that her doings attract attention, but with the full American allotment of originality. At any rate this extraordinary thing has happened. One scarcely believes it oneself. B [Bose] is so relieved. The police had been growing dreadfully troublesome and he so wanted us to have official friends.'

লেডি মিন্টোর নিবেদিতার বাড়ি যাওয়া এবং তৎপরবর্তী কিছু ঘটনা কিন্তু কিছু প্রশ্ন এবং সন্দেহেরও উদ্রেক করে। প্রথমত, লেডি মিন্টো এত গোপনে নিবেদিতার বাড়ি গিয়েছিলেন কেন এবং কেনই বা বিষয়টিকে এত গোপন রাখতে চাওয়া হয়েছিল? নিবেদিতার সঙ্গে একান্ত আলোচনার সময় 'বোমার রাজনীতি'-র প্রসঙ্গটি লেডি মিন্টো তুলেছিলেন কেন? তা কি এজন্যই যে এ বিষয়ে নিবেদিতার মতামত বা এই রাজনীতির প্রতি নিবেদিতার সমর্থন কতটা তা তিনি জানতে চাইছিলেন? নিবেদিতার বাড়িতে ঘুরে যাওয়ার পরদিনই লেডি মিন্টো কর্নেলিয়া সোরাবজিকে সঙ্গে নিয়ে বেলুড় মঠে উপস্থিত হন। তিনি যে কর্নেলিয়া সোরাবজিকে নিয়ে বেলুড় মঠে যাবেন তা কিন্তু নিবেদিতা জানতেন না। ১৯১০-এর ১৩ মার্চ র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে লেখা নিবেদিতার চিঠি পড়লেই তা বোঝা যায়। কর্নেলিয়া সোরাবজির সঙ্গে বেলুড় মঠে যাওয়ার বিষয়টি নিবেদিতার কাছে কি গোপন করেছিলেন লেডি মিন্টো? সে কি এই কারণেই যে নিবেদিতার অনুপস্থিতিতে কর্নেলিয়া সোরাবজির চরবৃত্তি করতে সুবিধা হবে? লেডি মিন্টোকে সামনে এগিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসন নিবেদিতার সম্পর্কে খোঁজখবর করার প্রয়াস যদি করেও থাকে, তা অস্বাভাবিক কিন্তু নয়। তাতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই।

আসলে, নিবেদিতার বিরুদ্ধে পুলিশ তখন বেশ কিছু অভিযোগ খাড়া করেছিল। অভিযোগগুলি যে মারাত্মক—তা নিবেদিতাও জানতেন। এইসব অভিযোগের যে-কোনো একটির সূত্র ধরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে—এ

আশঙ্কাও ছিল; যে কারণে, নিবেদিতা সতর্ক ছিলেন। নিবেদিতা এ-ও জানতেন, এইসব অভিযোগের ভিত্তিতে নানাবিধ তথ্য প্রমাণ জোগাড় করতেই তাঁর পিছনে পুলিশের চর লেগেছে। কী কী অভিযোগ ছিল নিবেদিতার বিরুদ্ধে? প্রথমত, তিনি বিপ্লবীদের পত্রিকা 'যুগান্তর'-এর মূল প্রেরণাদাত্রী এবং দ্বিতীয়ত, স্বদেশী ডাকাতির ঘটনায় তিনি জড়িত। ১৯০৯-এর ৩০ সেপ্টেম্বর র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I hear that I am down in the annals of the CID as having been the inspirer of Jugantar— rather a funny accusation, considering that I do not know what it contained, or the people who conducted it! But I do feel honoured—only honours are inconvenient at times!'

তাঁর বিরুদ্ধে যে ডাকাতির অভিযোগ তুলছে পুলিশ সে সম্পর্কে ১৯১০-এর ২৮ এপ্রিল র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Grave news was brought to our friend the other evening that I am put down in the accounts of the Unspoken Wisdom Department as absolutely responsible for inspiring—what? The dacoities, if you please! So I am watched — not in the old crude way, since we saw Halliday and rather enjoyed him—but by a supremely clever man who has orders to travel with me. I wouldn't care to be in his cleverness's shoes, if he is identified in solitude on the side of a steep khud, a week or two hence, in the hills!' যতই লেডি মিন্টো তাঁর বাড়িতে ঘুরে যান না কেন, পুলিশের নজরদারি যে চলছিলই তা নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়। ওই বছর ৬ জুলাই বোন মে-কে লিখেছেন, 'And everyday comes the news of some honourable man or other who is to be put in the dock shortly for organising robbery!-dacoity! I myself have reason to believe that I was named a while ago on the same charge.'

এরপর ২৮ জুলাই র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন, 'I think I told you awhile ago that Denham—Chief of the Detective (or CID) Force—was honouring me by the assumption that—I was the spring of inspiration behind all the dacoities. I don't suppose, now, that any one (even he) really thought this. I Think it only meant that they

would suppress me also, if they could.' ডাকাতির অভিযোগে নিবেদিতাকে ধরতে পুলিশ যে তৎপর হয়ে উঠেছিল এই চিঠিগুলি তার প্রমাণ। বোঝাই যায়, ১৯০৯ সালে কলকাতা ফিরে আসার পর তাঁর কলকাতা বাস খুব একটা নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব ছিল না। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা এবং প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা যা-ই বলুন না কেন, ওই সময়ে বিভিন্ন জনকে লেখা নিবেদিতার চিঠিপত্র পড়ে বোঝা যায়, তিনি যথেষ্ট বিপদের মধ্যেই বাস করছিলেন। এবং পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝেই তাঁর ছদ্মবেশ ধারণের, নাম-পরিচয় গোপনের প্রয়োজন হত। নিবেদিতা ছদ্মবেশ ধারণ করেননি এমন যুক্তির অবতারণা করে মুক্তিপ্রাণা এবং আত্মাপ্রাণা বিষয়টিকে বরং কিছুটা লঘুই করে দিয়েছেন; পরিস্থিতি কিন্তু মোটেই সেরকম সহজ ছিল না। শুধু যে ১৯০৯ সালে নিবেদিতা ছদ্মবেশে কলকাতায় পা রেখেছিলেন, এমন নয়, সারা বুলের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে নিবেদিতা ১৯১০ সালে আবার বিলেত যাত্রা করেন কিছু দিনের জন্য। এই সময়েও নিবেদিতা নাম-পরিচয় গোপন করে বিলেতে গিয়েছিলেন। বোঝাই যায়, পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার কারণেই নাম-পরিচয় গোপন করেছিলেন নিবেদিতা। নিশ্চয়ই সেই সময়েও পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে নিবেদিতাকে নাম-পরিচয় গোপন করে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, সেই সময়ে নিবেদিতা এমন আশঙ্কাও করেছিলেন যে, একবার ভারতের বাইরে গেলে তিনি আর ফিরতে পারবেন না। সারা বুলকে দেখতে পাশ্চাত্যে যাওয়ার পথে ১৯১০ সালের ১৪ অক্টোবর কলম্বো থেকে র‍্যাটক্লিফকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I am travelling incog. as Mrs. Theta Margot, and have got quite used to my new signature!'

ওই চিঠিতেই তিনি আরো লিখেছেন, 'There was another circumstances also, on the Indian side, which I can not explain here, that decided us about the necessity for a prompt move—a clever little plan on the part of some above that would have made me a fool conveniently, without giving me a chance of dying for a cause!'

ওই একই দিনে তিনি জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন, 'Please ask any psychic you like—anyone, but do ask someone! If I am leaving India for the last time, and if I shall ever see the Baim (Jagadishchandra) and work with him side by side again... But oh—

shall I get back! And what is the future?' তবে, নিবেদিতা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভারতে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। যদিও, শেষবার যখন তিনি ভারতে ফিরে আসেন, তাঁর শরীর তখন ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।

শুধু পিছনে পুলিশের চর লাগা নয়; নিবেদিতার কাছে আসা যাবতীয় চিঠিপত্রও পুলিশ পরীক্ষা করে দেখত। তবে, চিঠিপত্র পরীক্ষার বিষয়টি শুরু হয় বেশ আগে— ১৯০২ সাল থেকেই। নিবেদিতা তখন ওকাকুরার সঙ্গে বিপ্লব প্রচেষ্টায় যুক্ত রয়েছেন। তবে, সেই সময়ে নিবেদিতার চিঠিপত্র কীভাবে বা কতটা খুলে দেখত পুলিশ— তা অবশ্য বিশদে জানা যায় না। নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে জানা যায়, পুলিশ তাঁর চিঠিপত্র খুলে দেখার ছাড়পত্র পেয়েছে। ১৯০২ সালের ৩ মার্চ, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'It is so uncomfortable to feel that I can not express myself at all affectionatly or freely because I have received a warning that the police have taken authority to open my letters, and I do not care to write to you for their eyes. The very possibility puts a restraint.'

তবে, নিবেদিতার চিঠিপত্রের ওপর নজরদারির বিষয়টি বৃদ্ধি পায় সম্ভবত ১৯০৯ সাল থেকে। কারণ, এই সময়ের ভিতর ভারতের রাজনীতিতে দ্রুত অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটে গেছে। সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বাংলায়। ব্রিটিশ রাজশক্তির ওপর সন্ত্রাসবাদীরা আঘাত হেনেছে। নিবেদিতাও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন আরো বেশি করে। সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। পুলিশের সন্দেহ এবং নজরদারির তালিকায় ওপর দিকে উঠে এসেছে নিবেদিতার নাম। স্বাভাবিক যে, এই সময় থেকেই তাঁর চিঠিপত্রের ওপর অনেক বেশি নজর রাখা হবে। নিবেদিতার এই সময়ে লেখা চিঠিগুলি পড়লেই আমরা দেখতে পাব— চিঠির বিষয়বস্তু গোপন রাখার জন্য নিবেদিতাকে কতখানি সতর্ক থাকতে হয়েছে। কখনো কখনো সাঙ্কেতিক ভাষা এবং 'কোড' ব্যবহার করেছেন, কখনো কোনো এজেন্টের মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁর ডায়েরি যাতে নিরাপদে থাকে সেজন্য বোন মে উইলসনকে সতর্ক করেছেন, তাঁর চিঠি খুলে পড়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইত্যাদি।

তাঁর চিঠি খুলে পড়ার ঘটনা নিবেদিতা ১৯১০ সালের ২৮ এপ্রিল র‍্যাটক্লিফকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, 'I have such a cut in the side of a letter a week or two back that I sent it to the P M G asking him to order that my letters should be closed again after reading.

He sent me a registered reply and a visitor—and I gathered that my name is on no list of rebels or suspects—but that they are practically powerless to prevent theiving and tampering in trains and at sea. I understand the situation better, but can not say that i am reassured about my correspondence. If you should ever want to send me anything very serious, I should advise a letter—enclosing it sealed—to my agents, asking them to instruct me that it awaited my personal call. They might want stamps enclosed, to reimburse them—but English stamps would do. This is only in case of some extraordinary emergency ever occuring.'

নিজেকে গোপন রাখার জন্য মাঝে মাঝেই যে কোড নম্বর ব্যবহার করতেন তিনি তা-ও জানা যায় নিবেদিতার চিঠি থেকেই। ১৯০৯-এর ১১ মে কলকাতা এসে পৌঁছনোর আগে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন, 'My letters in Calcutta can be addressed to Christine with a 2 in the corner. There is no need for all this. Only we think it best to avoid notice, untill I am found to be already there.'

অর্থাৎ ছদ্মবেশে কলকাতায় এসে পৌঁছনোর আগেই নিবেদিতা চিঠিপত্রের ব্যাপারেও সতর্ক হয়ে যাচ্ছেন। ১৯০৯-এর ১ জুলাই বোনকে লিখছেন নিবেদিতা, 'From this time on, letter will need to be gradually addressed—at first through Himself —then as Christine 2 —preferably as c/o Grindlay, Calcutta. Only because I want to avoid their being read and stolen or lost.'

১৯১০ সালের ৬ জুলাই বোন মে উইলসনকে আর-একটি চিঠিতে লিখছেন, 'Your husband will reccive a communication unsigned. It is, please, to be sent to Mr. Ratcliffe.' অর্থাৎ, র‍্যাটক্লিফকে যে তিনি চিঠি লিখছেন, সেটিও গোপন রাখতে চাইছেন নিবেদিতা। তাঁর ডায়েরিও যাতে পুলিশের হাতে না পড়ে সে ব্যাপারেও গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিলেন তিনি। মে উইলসনকে লেখা চিঠি থেকেই জানা যায়, তাঁর ডায়েরিগুলি গোপনে এবং সযত্নে রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। অনুমান করাই যায়, তাঁর ডায়েরিতে এমন কোনো তথ্য ছিল, যা থেকে সহজেই প্রমাণ পাওয়া যেত কার কার সঙ্গে নিবেদিতার গোপন রাজনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে, এবং কোন কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি

জড়িত। নিবেদিতা হয়তো এই আশঙ্কাই করেছিলেন যে, তাঁর এবং আরো কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ওপর পুলিশি জুলুম নেমে আসতে পারে, যে কারণে বোন মে উইলসনকে তিনি ডায়েরিগুলি সযত্নে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯১০-মে উইলসনকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I am thinking of sending you a few old diaries, to place with my others. I think I shall feel better if such papers are with you before the Mintos go. And if anything should happen, you wd. always know that I wd. rather you searched them than anyone else—unless it were Himself [Dr. Bose] or Xtine.'

আবার, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকেও নিবেদিতা সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তাঁকে লেখা চিঠিতে যেন কোনো রাজনৈতিক কথাবার্তা না থাকে। কারণ, নিবেদিতা জানতেন, তাঁর কাছে আসা চিঠিপত্র পুলিশ নিয়মিত খুলে পড়ে দেখে। সেরকম কোনো চিঠিতে যদি রাজনৈতিক কথাবার্তার উল্লেখ থাকে, তাহলে পুলিশের বুঝতে এবং প্রমাণ করতে অসুবিধা হবে না যে, নিবেদিতা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত। আসলে, নিবেদিতা তখন প্রকাশ্যে কোনোভাবেই তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা দেখতে চাইছিলেন না। ১৯০৪-এর ৩ এপ্রিল জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I am sure you would not speak of politics as you do, if you realise that any detective, reading your letters, would inevitably say, "This lady KNOWS that her correspondent is engaged in political activities— and these must be the more dangerous in that I cannot trace then!" As a matter of fact, I am NOT in politics, but I could not afford to have this idea get abroad! So please never let the word appear!'

নিবেদিতার এই পর্বের চিঠিপত্রগুলি পড়ে একটি বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায় তা হল, রাজনীতির বাইরে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডলের কয়েকজন, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড, সিস্টার ক্রিস্টিন, মে উইলসন এবং জগদীশচন্দ্র বসু নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। নিবেদিতা কী করছেন, বা কাদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে যোগাযোগ গড়ে তুলছেন তা বিস্তারিতই তাঁরা জানতেন। এছাড়াও সাংবাদিক র‍্যাটক্লিফও নিবেদিতার কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তবে, র‍্যাটক্লিফের সঙ্গে নিবেদিতার রাজনীতি বিষয়ক যোগসূত্রটি অবশ্য এঁদের থেকেও গভীর ছিল। বলা যেতে পারে, র‍্যাটক্লিফ ছিলেন রাজনীতি

বিষয়ে নিবেদিতার অন্যতম পরামর্শদাতা এবং শুভানুধ্যায়ী। নিবেদিতার চিঠিপত্র থেকে আরো প্রমাণ পাওয়া যায়, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড, সিস্টার ক্রিস্টিন, মে উইলসন এবং জগদীশচন্দ্রের মতো তাঁর পারিবারিক এবং ব্যক্তিজীবনের ঘনিষ্ঠজনদের তিনি চিঠি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাগজ চলাচলের কাজে ব্যবহার করতেন। ১৯১০-এর ৪ ডিসেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে তিনি লিখেছেন, 'Please ask Xtine to ask Bairn to order his bank to forward to him letters addressed under cover to them.

'That gives us one more chance—and I have realised that the code I gave her will not do for letters. So I mean to make and send her an arbitrary code, perhaps in this letter.'

১৯১০-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি র‍্যাটক্লিফকে তিনি লিখছেন, 'Whenever a new act of terrorism occurs, postal facilities are again energetically impended for a time—so my agents or sister are specially valuable at such peiod.' এর কিছুদিন পর, ২৩ ফেব্রুয়ারিও একটি চিঠিতে র‍্যাটক্লিফকে এজেন্টের মাধ্যমে চিঠি পাঠানোর কথা লিখেছেন নিবেদিতা। লিখেছেন, 'And each time anything happens, small harassments grow more numerous. You know you can always send letters UNDER COVER to agents.' এছাড়াও, মে উইলসনকে লেখা চিঠিতে একটি অস্বাক্ষরিত পত্র র‍্যাটক্লিফকে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দেখা যায়। এ চিঠিটির কথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শুধু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের মাধ্যমেই যে চিঠিপত্র চালাচালি করতেন নিবেদিতা তা নয়, তার থেকেও অভূতপূর্ব কাণ্ডও তিনি ঘটিয়েছিলেন। ব্রিটিশ রাজপরিবারের এক মহিলাকেও তাঁর গোপন চিঠিপত্র চালাচালির কাজে লাগিয়েছিলেন নিবেদিতা। এই মহিলা অন্য কেউ নন, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী অ্যালবার্টা স্টার্জেস। অ্যালবার্টা স্বামীজির স্নেহধন্য এবং অনুগামিনী ছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গেও অ্যালবার্টার পরিচয় হয়েছিল স্বামীজি এবং জোসেফিনের মাধ্যমে। বিবাহসূত্রে অ্যালবার্টা ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য হয়েছিলেন। বিবাহের পর অ্যালবার্টা হয়েছিলেন লেডি অব স্যান্ডউইচ। এই অ্যালবার্টাকেই স্বামীজি ১৮৯৬ সালে লন্ডন থেকে লেখা একটি পত্রে জানিয়েছিলেন, ভারতে ফিরে তিনি প্রাচীন সংস্কারগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন পরিবর্তন আনতে চান। অ্যালবার্টাকে স্বামীজি লিখেছিলেন, 'আমি আমূল পরিবর্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্তন বিরোধী প্রসথসে জেলি

মাছের মতো ঐ বিরাট পিণ্ডটার কিছু করতে পারি কিনা দেখতে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে আরম্ভ করব— একেবারে সম্পূর্ণ নূতন, সরল অথচ সবল— সদ্যোজাত শিশুর মতো নবীন ও সতেজ।... পুরাতন সংস্কারগুলিকে সমর্থন করে করে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি।... জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। যে স্থান ও পাত্রে ভাবরাশি সহজে কার্যে পরিণত হতে পারে, সেই স্থান ও পাত্রই প্রত্যেকের বেছে নেওয়া উচিত। হায়, যদি মাত্র বারো জন সাহসী, উদার, মহৎ, সরলহৃদয় লোক পেতাম।'

অ্যালবার্টার রাজনীতির বিষয়ে উৎসাহ ছিল এমন অনুমান করা যায়। এ অনুমানেরও কারণ নিবেদিতার একটি চিঠি। অ্যালবার্টার রাজনীতি সম্পর্কে উৎসাহের কথা সম্ভবত নিবেদিতাও জানতেন। অ্যালবার্টাই নিবেদিতাকে মাৎসিনির জীবনীর দুটি খণ্ড পাঠান। নিবেদিতা তা বিপ্লবীদের ভিতর বিলি করেছিলেন। এই অ্যালবার্টাকেই নিবেদিতা জরুরি কাগজপত্র এবং চিঠিপত্র চালাচালির কাজে ব্যবহার করেন। তবে, এক্ষেত্রেও নিবেদিতা সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। অ্যালবার্টাকে চিঠিপত্র পাঠানোর সময় ইচ্ছে করেই তাঁর নামোল্লেখ না করে তিনি 'হন্‌' (Hon) লিখতেন। এ প্রসঙ্গে ৫ আগস্ট, ১৯০৯ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I have addressed a letter to Alberta as 'The Hon.'—please tell her this mistake may be necessary some times, in order to pass things safely through.'

অনুমান করাই যায়, ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য, স্বামীজির অনুগামিনী অ্যালবার্টাও নিবেদিতার গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও, নিবেদিতার কাজকর্মে সহায়তা করেছিলেন তিনি। অ্যালবার্টাকে তিনি যে 'কোড' নাম দিয়েছিলেন, তা র‍্যাটক্লিফকেও চিঠিতে জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৯-এর ১ সেপ্টেম্বর র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'I gave Alberta the title of Hon. for this reason, to make it seem absurd.'

১৯০৯-এর ৫ আগস্ট র‍্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে জানা যায় অ্যালবার্টাকে তিনি কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র আদান-প্রদানের কাজে লাগিয়েছিলেন। ওই সময় 'কর্মযোগিন'-এ প্রকাশিত অরবিন্দের একটি খোলা চিঠির প্রতিলিপি তিনি অ্যালবার্টার মাধ্যমে ব্রিটিশ সাংবাদিক স্টেডের কাছে পাঠান। এ বিষয়ে র‍্যাটক্লিফকে তিনি লিখেছেন, 'I am sending one to the Ghost-Seer (স্টেডের ছদ্মনাম, যা নিবেদিতা দিয়েছিলেন) under cover to Alberta. Please find some occasion to tell A. [Alberta] that I know she

is not "the Hon."—but I address her so on the envelope on purpose, for reasons which you will be able to explain.'

শুধু যে চিঠিপত্র খানাতল্লাশির ভিতরই ব্রিটিশ সরকার নিজেকে আটকে রেখেছিল এমন মনে করা ভুল হবে; বরং এই সময়ে পুলিশি দমন-পীড়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। মুরারিপুকুরে বোমার কারখানা আবিষ্কার এবং দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাগজপত্র হাতে আসার পর ব্রিটিশ প্রশাসন, বিশেষ করে লর্ড মিন্টোর মনোভাব কঠোরতম হয়ে ওঠে। কারাগারের ভিতর রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে গুলি করে হত্যা পুলিশকে আরো সন্ত্রস্ত এবং সতর্ক করে তোলে। এইসব ঘটনার পর মিন্টো গুপ্ত সমিতিগুলিকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে বিপ্লবী নেতাদের নির্বাসন দণ্ড দিতেও বদ্ধপরিকর হন। এই উদ্দেশ্যে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ফৌজদারি আইন সংশোধনী বিল পাশ হয়। এই বিলের নিন্দায় নরমপন্থী নেতাদের একাংশও সরব হয়েছিলেন। সরকার কিন্তু এই সব নিন্দায় কর্ণপাত না করে ন-জন বিপ্লবীকে নির্বাসন দণ্ড দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্রের মতো বিপ্লবীরা। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে আপিল করে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড পান। তাঁদের আন্দামানে পাঠানো হয়। নরেন গোঁসাইকে হত্যার জন্য কানাইলাল বসু এবং সত্যেন দত্তের ফাঁসি হয়। ১৯০৯-এর জানুয়ারিতে ঢাকার অনুশীলন সমিতি, বরিশালের স্বদেশবান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি এবং ময়মনসিংহের সুহৃদ ও সাধনা সমিতি বেআইনি ঘোষিত হয়। বলতে গেলে, গুপ্ত সমিতিগুলিকে কার্যত ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল পুলিশ। অরবিন্দ 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় লিখেছেন, 'Government is determined to allow no organisation to exist among the Bengalees.' 'ধর্ম' পত্রিকায় লিখলেন— 'আবার জাগো— বঙ্গবাসী, অনেকদিন ঘুমাইয়া রহিয়াছ; যে নবজাগরণ হইয়াছিল, যে নবপ্রাণ সঞ্চালক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত করিয়াছিল তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ...কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে যেন কোন কার্য না কর।' 'উদ্দাম উত্তেজনার বশে কোনো কাজ' না করার যে উপদেশ অরবিন্দ দিয়েছিলেন, তা সেই সময়ে সন্ত্রাসবাদীরা খুব একটা শুনেছিলেন বলে মনে হয় না।

পুলিশি নিপীড়নের চিত্র পাওয়া যায় নিবেদিতার বেশ কিছু চিঠিতেও। ১৯০৯-এর ৩ নভেম্বর তিনি র‍্যাটক্লিফকে লিখছেন, 'A new series of arrests have been made, within the last few days—on the score of

dacoity—and it seems as if we may be in for a new and prolonged trial on the Alipur scale. Much of it sounds obviously got up, by the police, who are innumerable, and must be fed.

'At the beginning of Oct. 30 secret service men and women were added, here in Darjeeling. I have to refuse many strange visitors.'

এই সময়কালে নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তাতে প্রায়শই পুলিশি অত্যাচারের বিবরণ থাকত। ১৯০৯-'১০ সালে র‍্যাটক্লিফকে লেখা এই চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায় এইসব অত্যাচারের ঘটনায় কতটা বিচলিত বোধ করতেন তিনি। ১৯০৯-এর ২৫ নভেম্বর, ১৯১০-এর ২০ জানুয়ারি, ২ ফেব্রুয়ারি, ১০ ফেব্রুয়ারি, ৬ জুলাই, ১৩ জুলাই, ১৯-২০ জুলাই, ৪ আগস্ট, ১০ আগস্ট, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১১-র ১২ জুন তারিখের চিঠিতে র‍্যাটক্লিফকে পুলিশি নির্যাতনের ভয়াবহতার কথা জানিয়ে সবিস্তারে লিখেছেন নিবেদিতা। ১৯১০-এর ২৮ জুলাই তিনি র‍্যাটক্লিফকে একটি চিঠিতে লিখছেন, 'In one case silver ornaments were carried off by police as told in papers. Now silver ornaments COULD not be fruit of dacoity. Too little value. Were obviously family jewels. It will be years if ever befor those poor people see their family jewels again.

'Within the last week, about 100 weavers in the district of Midnapur have been arrested for weaving a certain song into the borders of dhotis.'

১৯১০-এর ৪ আগস্ট র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখছেন, 'The long arm of the law is going on. But we needn't tell you details. For 25 years after the mutiny, they say, trials were going on N.W.P (North West Province) and people continued to be caught. This is a phase of things that history never tells— but recorded on the memories of nations, like Cromwell in Ireland.'

'মডার্ন রিভিউ'য়ের সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে এমন আশঙ্কাও নিবেদিতা করেছিলেন। ১৯১০-এর ৬ জুলাই র‍্যাটক্লিফকে তাই তিনি লিখছেন, 'Ramananda for instance has reason to fear being brought up for DACOITY!

He says he would be very glad to face a political charge—but as they know that he has piles of other evidence behind the military articles, which would at last be ventilated, thay want to avoid this.'

ওই চিঠিতেই তিনি আরো লিখছেন, 'Aravinda seems to be still uncought, though 5000/- Rupees are now offered. But the country is out of its mind with police regulations. One old woman on a pilgrimage was kept 24 hours in durance vile because she could give the name of her village and tell how (as: change at Lucknow—and 8 miles furthur) to get there, but did not know the name of the district or the head police thana. Of course if I had been there it would not I think have been well for the police—but one of our monks argued for an hour, without effect—and anyway similar things must be happening everywhere.'

ওই বছরই ১৩ জুলাই র‍্যাটক্লিফকে তিনি লিখছেন, 'On Saturday night, came news that the arrest had been definitely determined on — and that it might happen— together with 10 others at anytime within a couple of weeks. A particular informant called Lalit Kumar Chakraborty is shut up within Fort William giving statements suggested by police. Rd's [Ramananda Chattopadhaya] name will probably be brought up on 'East Bengal Dacoity' charge.'

ওই চিঠিতেই আরো লিখছেন, 'I heard last night K.K.M [Krishna Kumar Mitra] and others have determined on meetings— Partition, Swadeshi-etc. They will be broken up and driven into the streets— then speeches— and leader arrested. Of course you know that the real fact is authority are dishonestly using forces entrusted to them for suppression of sedition in order to ruin all known to sympathise with Swadeshi. Scores have been ruined.'

এর কয়েকদিন পরেই আবার র‍্যাটক্লিফকে লিখছেন (জুলাই মাসের ১৯ অথবা ২০ তারিখ), 'We expected to hear R's [Ramananda] arrest. That was

not made, but some decrepit old gentleman of impassioned oratory called Devi Prasanna Roy—said to be 60— Editor of something they want to crush— and arrested on charge of sedition for printing a book by a Mohammedan which is some years old! ...You can see that the Government has thrown the country into a very pretty state of war. We all laugh when we meet but we all know that no man can tell whose turn will be next. Of course I trust we shall continue to laugh even then.'

কারাগারে বিপ্লবীদের থেকে জবানবন্দি আদায়ের জন্য ইলেকট্রিক শক দেওয়া সহ কী ধরনের অত্যাচার চালাত পুলিশ— নিবেদিতা তা-ও তাঁর চিঠিতে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। মুরারিপুকুর বোমার মামলার সরকারি পক্ষের উকিল আশুতোষ বিশ্বাস বিপ্লবীদের হাতে খুন হওয়ার পর কারাগারে আটক চারু বসুর ওপর কীরকম অত্যাচার হয়েছিল তা নিবেদিতার একটি চিঠিতে জানা যায়। ১৯০৯ সালের ১ সেপ্টেম্বরের ওই চিঠিতে র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখছেন, '...It appears moreover that of Bose (Charu) who shot A. Biswas, very very little is known. But Asoke Nundy, who died in consequence of phthisis cought in prison, and Ullaskar, now on appeal, occupied cells very near his, after condemnation, and both stated that he had been tortured in the night, by means of electic shocks, to elicit furthur information. They heard his cries and the conversations. It seems that in order to gain a respite, he would give bogus information with the result that when verification failed the torture was renewed.'

র‍্যাটক্লিফকে লেখা এই পর্যায়ের চিঠিগুলি বিশদে পড়লেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অত্যাচার কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বুঝতে এ-ও অসুবিধা হয় না— সর্বত্র একটি সন্ত্রাসের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল পুলিশ, যার ফলে সর্বত্রই শ্মশানের শান্তি বিরাজ করছিল, যার বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৯১০ সালের ১০ আগস্ট র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'the really grave feature of the present situation is the SILENCE.'

পুলিশি হেনস্থা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন নিবেদিতা একসময়ে কলকাতা ত্যাগ করে সাময়িকভাবে ফরাসি চন্দননগরে আশ্রয় নেবার কথাও চিন্তা

করেন। নিবেদিতার চন্দননগরে বাস করার পরিকল্পনার পিছনে রাজনৈতিক কারণ ছিল— এমনটাই মনে হয়। যে সময়ে নিবেদিতার মনে এ চিন্তা এসেছিল তার কিছু আগেই অরবিন্দ কলকাতা থেকে পালিয়ে ফরাসি চন্দননগরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। এবং তা নিয়েছেন নিবেদিতার পরামর্শেই। বোঝাই যায়, পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে ফরাসি চন্দননগরকে নিরাপদ স্থান মনে করতেন নিবেদিতা। ফরাসি চন্দননগরে পালিয়ে যেতে তিনি যে মনস্থ করেছিলেন তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯০১ সালের ২৮ ডিসেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা একটি পত্রে। ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'S. Sara plans for Switzerland in Sept. and then, if strong enough, on to India in a French Ship—and take a house and boat at Chandernagore. We shall have to take M. Nobel's help and go properly accredited to the French authorities, I under assumed name— and so on. If she is not strong enough, I shall hope to go on alone— but this I trust will not happen. I want to be there, dreadfully— and I know that piles of work are waiting. A new work on Science well afoot.But I am sure that my coming here was in accordance with Swamiji's Will, and that He will also order my return, and the after and before, and all that shall be.'

চন্দননগরে চলে যাওয়ার পরিকল্পনাটি যে মোটামুটি পাকা করে ফেলেছিলেন তিনি তা জানা যায় কিছুদিন পরেই একটি চিঠিতে। ১৯১১-র ১২ জানুয়ারি র‍্যাটক্লিফকে ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, '...Anyway, whether she (Sara Bull) or we, the journey is to be made by French ship— and our stay is to be at Chandernangore. She has most exaggerated ideas about my personal insecurity. But I am quite willing to be tied down to Fr. soil, once reached— so long as I can go on with my writing and my secretarial work effectively... Of conrse, I should be in secular dress and under assumed name.'

ছদ্মবেশে এবং ছদ্মপরিচয়েই যে নিবেদিতা চন্দননগরে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তা চিঠিটি পড়েই বোঝা যায়। ধরা পড়লে পুলিশ তাঁকে আটকে দেবে, চন্দননগর যেতে দেবে না— এমন আশঙ্কা হয়তো নিবেদিতার ছিল। যে কারণে পুরো পরিকল্পনাটি অত্যন্ত গোপন রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। ১৯১১-র ১৮

জানুয়ারি র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে তিনি লিখেছিলেন, 'It will be necessary to make all plans with the utmost secrecy and quiet— in order to reach unnoticed.' নিবেদিতার এই সময়ের চিঠিপত্রগুলি পড়ে এ-ও আন্দাজ করা যায় যে, কলকাতা শহরে পুলিশি নজরদারি এবং পুলিশি হেনস্থার হাত এড়িয়ে চন্দননগরে নিরিবিলিতে বসে নিজের লেখার কাজ করতেই তিনি চাইছিলেন তখন। ওই তারিখে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে যে চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন, তাতে তাঁর পরিকল্পনার আরো কিছু বিশদ আভাস পাওয়া যায়। জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'S. Sara had thought out the whole Scheme of my return. She said I had been so troubled that we were justified in "Asking the courtesies of the French Gorervment"— and then we would settle down at Chandernagore quite openly, and even with some distinction as a literary woman who wished to be simple— etc. etc. etc. This plan I think may still contrive to carry out, or at least by its means to gain a pied a terre for furthur consultation before returning to Bose para. For it, I want introductions in my own name to French officials— but not a word about route or plans, until I reach Chandernagore. The journey I can make under an assumed name.'

চিঠিটি পড়ে বোঝাই যাচ্ছে, চন্দননগরে তিনি কিছুদিনের জন্য বাস করতে চেয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ কোনো পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই কিছুদিন কলকাতা থেকে সরে থাকতে চেয়েছিলেন—এ-ও বোঝা যাচ্ছে। এবং পরে আবার বোসপাড়ার বাড়িতে ফিরে আসার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। তবে, কোন পথে চন্দননগরে তিনি যাবেন তা-ও নিবেদিতা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, এর কয়েকমাস আগেই অরবিন্দ কলকাতা থেকে পালিয়ে ফরাসি চন্দননগরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর নিবেদিতাও কোনো পরিকল্পনা করে ছদ্মপরিচয়ে চন্দননগরে গিয়ে সাময়িকভাবে বাস করতে চাইছেন। এই দুটি ঘটনাকে পাশাপাশি রাখলে এমন মনে হাওয়াই স্বাভাবিক যে, বিশেষ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই নিবেদিতা সাময়িকভাবে চন্দননগরে গিয়ে বসবাস করার পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিকল্পনাটি ঠিক কী ছিল তা অবশ্য জানা যায় না। তবে, এটুকু অনুমান করাই যায় যে, পরিকল্পনাটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে নিবেদিতা তাঁর চন্দননগর যাত্রার কথা অত্যন্ত গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। তবে, যা-ই হোক না কেন, নিবেদিতার

অবশ্য শেষ পর্যন্ত চন্দননগরে যাওয়া হয়নি। কেন যাওয়া হয়নি তার কারণও খুব একটা স্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে, নিবেদিতার ভগ্নস্বাস্থ্য শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে দেয়নি।

চারদিকে যখন চাপা সন্ত্রাস এবং পুলিশি নজরদারি ও হেনস্থার ছবি, তখন অরবিন্দের ওপর যে গোয়েন্দাদের বিশেষ নজর থাকবে এ বলাই বাহুল্য। মুরারিপুকুরে বোমার কারখানা আবিষ্কার এবং অরবিন্দের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার যাবতীয় তথ্যাদি হাতে পাওয়ার পর পুলিশের চোখে অরবিন্দ তখন সবথেকে ক্ষতিকারক ব্যক্তি। যদিও একবছর জেল খেটে অরবিন্দ তখন মুক্তি পেয়ে কলেজ স্কোয়ারে কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাসের সওয়ালের জোরে অরবিন্দ মুক্তি পেলেও সরকারের চোখে তিনি তখনো সন্দেহজনকই ছিলেন। গোয়েন্দাদের শ্যেনদৃষ্টিও তাঁর ওপরে ছিল। মুরারিপুকুর বোমার মামলায় খালাস পেয়ে গেলেও পুলিশ সুযোগের অপেক্ষায় বসে ছিল। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে অরবিন্দের ন্যূনতম যোগসূত্র থাকলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে— একমই ছিল পুলিশের মনোভাব। অরবিন্দের প্রতিটি কাজের ওপর তখন কড়া নজরদারি রাখা হত। ১৯০৯-এর জুলাইয়ের গোড়ায় লন্ডনে কার্জন উইলিকে মদনলাল ধিংড়া গুলি করে হত্যা করার পর কলকাতায় রটে গেল, এবার অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হবে। অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠানোর ভাবনা পুলিশের মাথায় আছে, এমন খবর নিবেদিতার কাছেও ছিল। ১৯০৯ সালের ৩০ জুলাই র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে নিবেদিতা লিখছেন, 'We hear that he [Lt. Governor] is even now considering the question of deporting the Bengali Mazzini— by the 7th of August, I suppose, having received a formal appplication from the police— and this considering his predecessor's history and his victim's popularity. sems a supreme defiances!' অরবিন্দকে যে পুলিশ গ্রেপ্তার করার ছক কষছে, তা নিবেদিতাও জানান অরবিন্দকে। পরবর্তীকালে অরবিন্দ নিজেই সে কথা লিখেছেনও। অরবিন্দ লিখেছেন, 'আমার এই প্রকার এক সাক্ষাতের কালে তিনি আমাকে জানালেন—সরকার আমাকে চালান দেবার মতলব করছে। তিনি চান, আমি যেন গা ঢাকা দিই, কিংবা বৃটিশ ভারত ত্যাগ করি, এবং বাইরে থেকে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাই।' অরবিন্দ অবশ্য সে সময়ে নিবেদিতার এই প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন না। বরং তিনি ভেবেছিলেন, 'কর্মযোগিন'-এ একটি খোলা চিঠি লিখে জানাবেন—সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর বর্তমানে কোনো সম্পর্ক

নেই। এবং এরকম একটি চিঠি লিখলে সরকার তাঁকে অব্যাহতি দেবে। অরবিন্দ লিখেছেন, 'আমি তাঁকে বললাম, ঐ সাজেশন গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তার বদলে কর্মযোগিনে একটা খোলা চিঠি লিখব, যা আমার ধারণা সরকারকে প্রতিনিবৃত্ত করবে। সে কাজ করা হয়েছিল। পরে যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম, তিনি বললেন, আমার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে, এবং আমাকে চালান দেবার বাসনা পরিত্যক্ত।' অরবিন্দের এই লেখা পড়ে মনে হয়, 'কর্মযোগিন'-এ তাঁর লেখা খোলা চিঠিটি খুবই কার্যকর হয়েছিল। এবং তখনকার মতো পুলিশ যে তাঁকে গ্রেপ্তারের পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছিল—তা-ও নিবেদিতাই তাঁকে জানিয়েছিলেন।

অরবিন্দের এই খোলা চিঠিটি ৩০ জুলাই ১৯০৯-এ 'কর্মযোগিন'-এ প্রকাশিত হয়। অরবিন্দ লিখেছিলেন, 'Rumour is strong that a case for my deportation has been submitted to the Government by the Calcutta police, and neither the tranquility of the country nor the scrupulous legality of our procedure is a guarantee against the contingency of the all powerful fiat of the Government watch dogs' silencing scrupules on the part of those who advise at Simla.'

সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর যে আর কোনো যোগাযোগ নেই, ওই খোলা চিঠিতে সে কথাও লিখেছিলেন অরবিন্দ। অরবিন্দ লিখেছিলেন, 'Our ideal of swaraj involves no hatred to any other nation nor of the administration which is now established by law in this country...Our methods are to...evolve a Government of our own for our internal affairs so far as that could be done without disobeying the law or questioning the legal authority of the bureaucratic administration...The Nationalist Party stood for democracy, constitutionalism and progress.'

অরবিন্দের এই খোলা চিঠিটি পড়লে এটি সহজেই অনুমেয় যে, অরবিন্দ নিজে তখন যথেষ্ট নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন এবং যে কোনো উপায়ে গ্রেপ্তারি এড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। তার জন্য প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর সংশ্রব নেই একথা বলতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু, অরবিন্দ যা-ই বলুন না কেন, এই খোলা চিঠি যে সরকারের কাছে অরবিন্দকে নির্দোষ প্রমাণিত করবে এবং পুলিশি হেনস্থাও আর হবে না—নিবেদিতা এরকম সহজ ধারণায় বিশ্বাস করতেন না। বরং,

নিবেদিতার ভয় হয়েছিল, ভারতে অবস্থিত ইংরেজ শাসকরা চেষ্টা করবেন অরবিন্দের এই খোলা চিঠিটি যেন ভারতসচিব লর্ড মর্লের হাতে না পৌঁছয়। বরং, ভারতে অবস্থিত ইংরেজ শাসকরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ভুল বুঝিয়ে অরবিন্দকে নির্বাসনে পাঠানোর বন্দোবস্ত করবেন। এই আশঙ্কা থেকেই নিবেদিতা চেষ্টা করেছিলেন লন্ডনে অবস্থিত তাঁর বন্ধুদের মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে, যাতে অরবিন্দকে আর গ্রেপ্তার করা না হয়। ১৯০৯-এর ৫ আগস্ট র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা একটি পত্রে লেখেন, 'I trust the karma Yogin will reach you this week. I am sending it to the office. The open letter which it contains has been the sensation of the week in that sphere. Copies have been sent I believe to Morley and all journalists. But they may not reach. I am sending one to Ghost-Seer—under cover to Alberta. ...If the writer of the O.L. (open letter) is to be deported, it will probably be within the next 2 days— and you will know before this reaches you. I shall try to send you a 2nd copy of Karma Yogin for use.'

ওই চিঠিতে নিবেদিতা আরো লিখেছেন, 'In the event of A. Gs (Aurobindo Ghose) being deported you will of course understand that the real reason is that when the 9 (nine) leaders were deported, the Govt. felts its own great wisdom, by reason of the sudden lull that came over the country. The moment the Alipore prisoners were released, the re-awakening began to be evident. The moral is, catch the awakener, and put him into confinement. But this process will have to be extended indefinitely. Nothing penal but moral [moral but penal] strength. How long will a Gov. venture to abide by such a principle?'

নিবেদিতার চিঠিপত্র পড়ে মনে হয়, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য 'কর্মযোগিন'-এ লেখা অরবিন্দর খোলা চিঠি সরকারের মন ভেজাতে পারেনি। বরং, সরকার এসবের পরেও অরবিন্দকে সন্দেহের চোখেই দেখেছে এবং তাঁকে গ্রেপ্তারের পরিকল্পনাও করে গিয়েছে। ১৯০৯-এর ৩০ সেপ্টেম্বর র‍্যাটক্লিফকে লেখা একটি চিঠিতেও দেখা যায় অরবিন্দের গ্রেপ্তারের আশঙ্কাই করছেন নিবেদিতা। ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, 'The 16th. of October is drawing near—and the

Government is more or less under its periodic panic. Hitopodesa, a Bengali paper, said to be strictly moderate, is being prosecuted, and the leader of the Nationalists is expecting to be arrested and refused bail for a few weeks.'

মুরারিপুকুর বোমা মামলা থেকে অরবিন্দ অব্যাহতি পাওয়ার পরও ইংরেজ শাসকরা তাঁকে আবার গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন কেন? এ প্রসঙ্গে অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর লেখায় কিছু তথ্য দিয়েছেন। এইসব তথ্য থেকে জানা যায়, অরবিন্দ অব্যাহতি পাওয়ার পর সরকারের দুশ্চিন্তা আরো বাড়ে। সরকার মনে করেছিল, বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অরবিন্দের প্রভাব এবং গোপন মন্ত্রণা রয়েছে, যা সরকারের পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে অমলেশ ত্রিপাঠী বেকার, মিন্টো এবং মর্লের কিছু চিঠিপত্র উদ্ধৃত করেছেন। ১৯১০-এর ১৯ এপ্রিল লেফটেন্যান্ট গভর্নর বেকার মিন্টোকে লেখেন, 'তাঁর (অরবিন্দ) প্রভাব চূড়ান্ত ক্ষতিকর। তিনি নিছক কোনো যুক্তিহীন অন্ধ যন্ত্রবিশেষ নন—তিনি বৈপ্লবিক ভাবধারার সক্রিয় সকারক। অর্ধ-ধর্মোন্মাদের ভাবে পূর্ণ তিনি, যা তাঁর পথে অন্যকে আকর্ষণ করার বিশেষ প্রেরণাশক্তি। বাংলায়, সম্ভবত ভারতবর্ষেও, রাজদ্রোহাত্মক চিন্তাধারার বিস্তারে অন্য যে কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁর ভূমিকাই অধিক বলে আমি মনে করি।' অমলেশ ত্রিপাঠীর লেখা থেকে আরো জানা যাচ্ছে, ১৯১০-এর ৫ মে মর্লে মিন্টোকে একটি চিঠিতে লেখেন, সংবাদপত্রের নিবন্ধকে ভিত্তি করে অরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করা যাবে না। কিন্তু মিন্টো সেই কথায় কর্ণপাত করেননি। বরং ১৯১০-এর ২৬ মে মিন্টো মর্লেকে একটি চিঠি পাঠিয়ে বলেন, মানিকতলা হত্যাকাণ্ডে (শামসুল আলম হত্যাকাণ্ড) অরবিন্দ অন্যতম উস্কানিদাতা, এবং ছাত্রদের উপর তাঁর দুর্ভাগ্যজনক প্রভাব রয়েছে। অরবিন্দকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়ে বেকারকে চিঠিও লেখেন মিন্টো। অবশ্য, অরবিন্দ এর আগেই গোপনে পালিয়ে গিয়ে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু মর্লে, মিন্টো, বেকার প্রমুখের চিঠিপত্রগুলি পড়লেই বোঝা যায়, ফরাসি চন্দননগরে পালিয়ে না গিয়ে তিনি যদি সেই সময় কলকাতায় থাকতেন, তাহলে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে তাঁকে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হত। অরবিন্দকে নির্বাসনে পাঠানোর ব্যাপারে অনুমতি দেওয়ার জন্য যে ভারত সচিব মর্লের ওপর সরকার চাপ দিচ্ছিল সে খবর নিবেদিতার কাছেও ছিল। ১৯০৯-এর ১ ডিসেম্বর র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'The Recalcitrant Leader sends me word that the India Govt. are urging his

deportation on John (Morley). John is said to have ordered release of others. I.G. solemnly warns him of 'responsibility'— and this mild menace causes him to shilly-shally.'

অরবিন্দ ভেবেছিলেন 'কর্মযোগিন'-এ তাঁর প্রথম খোলা চিঠিটি প্রকাশের পর সরকার তাঁর প্রতি নরম মনোভাব প্রদর্শন করবে। কিন্তু সরকার তা করেনি। সরকারের মনোভাবের যে পরিবর্তন হয়নি একথা অরবিন্দও বুঝেছিলেন। বিশেষত নিবেদিতা তাঁকে গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা নিয়ে বারবার সতর্ক করেছিলেন। সরকারের মনোভাবের খুব পরিবর্তন হয়নি বুঝে অরবিন্দ ১৯০৯-এর ২৫ ডিসেম্বর 'কর্মযোগিন'-এ আরো একটি খোলা চিঠি লিখলেন। এই চিঠিতেও অরবিন্দের সুর যথেষ্ট নরম ছিল। তবুও এই চিঠির একটি অংশ সরকারের কাছে রাজদ্রোহকর মনে হয়। নিবেদিতার আশঙ্কা হয়েছিল, এই একটি সূত্র ধরেই অরবিন্দকে আবার গ্রেপ্তার করা হতে পারে। অরবিন্দের ওই খোলা চিঠিটি নিবেদিতা পাশ্চাত্যে তাঁর বন্ধুদের কাছে পাঠান। এবং অরবিন্দের সমর্থনে যেন তাঁরা জনমত গড়ে তোলেন সে প্রচেষ্টাও চালান। নিবেদিতার এ প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সাহায্য করেন র‍্যাটক্লিফ এবং ব্রিটেনের লিবারাল নেতা ফ্রেডরিক ম্যাককারনেস। ম্যাককারনেস স্বদেশী আন্দোলনের ওপর পুলিশি অত্যাচার নিয়ে লেখালেখি করে অরবিন্দের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলারও চেষ্টা করেন। বস্তুত 'কর্মযোগিন'-এ অরবিন্দের প্রথম পত্রটি প্রকাশের সময় থেকেই র‍্যাটক্লিফ এবং ম্যাককারনেস অরবিন্দের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলার কাজে সচেষ্ট ছিলেন। এবং তার ফলে ম্যাককারনেস কিছুটা হলেও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি যে করতে পেরেছিলেন, তা নিবেদিতাও স্বীকার করেছিলেন। ১৯০৯-এর ১ ডিসেম্বরের চিঠিতে র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Mackarness has been the main bulwork against our friends' sudden aviation, so far.' অরবিন্দের এই খোলা চিঠিটি ইংল্যান্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য র‍্যাটক্লিফকেও লিখেছিলেন নিবেদিতা। এই চিঠিটি যাতে রাজদ্রোহকর মনে না হয় তার জন্যই সেটি প্রকাশ করতে নিবেদিতার এই তাগিদ ছিল। ১৯১০-এর ২৮ এপ্রিল নিবেদিতা লিখেছিলেন র‍্যাটক্লিফকে, 'By this time you have perhaps contrived to embody a good deal of the criminal documents in some article— or frankly to republish it— or with some of the Ed's own forcible comments to get it scattered broadcast in Pussy-Steals-The-Cream.' নিবেদিতার কথা রেখেছিলেন

র‍্যাটক্লিফ। ওই সময়ে র‍্যাটক্লিফের উদ্যোগে 'ডেইলি মেল', 'টাইমস', 'ডেইলি নিউজ' প্রভৃতি সংবাদপত্রে অরবিন্দ-সংক্রান্ত যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে কার্যত সরকারের প্রতি কটাক্ষই প্রদর্শিত হয়েছিল। নিবেদিতার উদ্দেশ্য যে কতটা সাধিত হয়েছিল, তা বোঝা যায় আর-একটি ঘটনায়। ওই বছরই ১৪ এপ্রিল র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ব্রিটিশ সংসদে প্রশ্ন তোলেন, অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ জারি করা হয়েছে কেন? কিন্তু এসব সত্ত্বেও সরকারের মনোভাবের যে খুব পরিবর্তন হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায় না।

১৯১০-এর ফেব্রুয়ারি নাগাদ অরবিন্দ কলকাতা থেকে পালিয়ে ফরাসি চন্দননগরে চলে যান। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তারপরেও নিবেদিতা অরবিন্দকে অভিযোগমুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে, অরবিন্দের অন্তর্ধানের পরেও এই প্রচেষ্টা কেন জারি রেখেছিলেন নিবেদিতা? তার কারণ কি এটিই যে, সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটলে অরবিন্দ আবার কলকাতায় ফিরে আসবেন? সেরকম কোনো পরিকল্পনা কি ছিল নিবেদিতা এবং অরবিন্দের? এ সম্পর্কে অবশ্য কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। নিবেদিতা এবং অরবিন্দ দুজনেই এ প্রসঙ্গে ছিলেন নীরব। তবে, এটুকু বলাই যায়, অরবিন্দ সম্পর্কে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অরবিন্দও আর কলকাতায় ফিরে আসেননি।

দশ

মুরারিপুকুর বোমার মামলায় যাঁরা নির্বাসিত হয়েছিলেন, তাঁদের ভিতর ৯ জন নেতা মুক্তি পেলেন ১৯১০-এর ৯ জানুয়ারি। এই নেতাদের মুক্তির খবরে উল্লসিত হয়েছিলেন নিবেদিতা। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'নিবেদিতার সেদিন কী আনন্দ! বিদ্যালয় গৃহদ্বারে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের চিহ্নস্বরূপ পূর্ণকুম্ভ ও কলাগাছ রাখা হইল এবং আনন্দের দিন বলিয়া বিদ্যালয়ে মেয়েদের ছুটি দেওয়া হইল। নির্বাসিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন ছিলেন ব্রাহ্ম প্রচারক, অতিশয় ধর্মভীরু। তাঁহার নির্বাসনে পরিবারস্থ স্ত্রী, পুত্র সকলের দুর্গতির সীমা ছিল না। নিবেদিতার মহৎ প্রাণ ইঁহাদের বেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল, এবং তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তির মুক্তি সংবাদে তাঁহার মনে হইয়াছিল, যেন বহুদিন পরে তাঁহার নিজের পিতা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।' এই আনন্দের পরিচয় পাওয়া যায় নিবেদিতার একটি চিঠিতেও। ১৯১০-এর ১০ জানুয়ারি একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, 'If I could only tell you the joy with which I heard yesterday of the release of the 9 deportees and their return to their families! Especially of one who was a Brahmo preacher [Krishna Kumar Mitra] a humble, brave, God-featuring man, whose wife and children have been utterly smitten down by his removal. We do not know them at all well, but somehow I have had such a strong impression of their suffering that I feel as if my own father were coming home.'

এই মুক্তিপ্রাপ্ত নেতারা ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় ফিরে আসেন। অরবিন্দ নিজে চাঁদপাল ঘাটে উপস্থিত থেকে এই মুক্তিপ্রাপ্ত নেতাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এই বন্দিদের মুক্তির ঘটনায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টো মোটেই খুশি হতে পারেননি। বরং, এ নিয়ে ভারত সচিব মর্লের প্রতি কিছুটা বিরক্তই ছিলেন তিনি। এই ঘটনার পরে মিন্টো বললেন, 'We are now face to face with an anarchical conspiracy waging war against British and Indian Communities alike.'

মিন্টোর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন অরবিন্দ। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১০ 'কর্মযোগিন'-এ অরবিন্দ লিখলেন, 'Anarchism— It is different from terrorism. The Irish Fenians did the same thing as the Indian Terrorists are now practising, but nobdy ever called them Anarchists.'

চন্দননগরে পালিয়ে যাবার মাত্র কয়েকদিন আগে অরবিন্দের এই লেখাটিই প্রমাণ করল ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি তখনও রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য ইতিপূর্বে তিনি 'কর্মযোগিন'-এ যতই নরম সুরে খোলা চিঠি লিখুন না কেন, আইরিশ সিন-ফিন বিপ্লবীদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থনই যেন করে গিয়েছিলেন।

১৯১০-এর জানুয়ারি মাসের গোড়ায় পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট শামসুল আলম আদালতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। মুরারিপুকুর বোমার মামলায় শামসুল আলম ছিলেন সরকার পক্ষের ডান হাত। এই হত্যাকাণ্ডের পর অরবিন্দের কিছু লেখা তাঁর সম্পর্কে সরকারকে একেবারেই ক্ষিপ্ত করে তোলে। শামসুল আলম খুন হওয়ার পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমনিতেই উত্তপ্ত ছিল। তারই ভিতর 'কর্মযোগিন'-এ অরবিন্দ লিখলেন, 'The victim was the righthand man of Mr. Norton in Alipor Bomb Case.' ১ ফেব্রুয়ারি অরবিন্দের 'ধর্ম' পত্রিকায় লেখা হল, 'হত্যাকারী রিভলভার দিয়া পৃষ্ঠদেশে গুলি করে। আলম তৎক্ষণাৎ সটান চিৎ হইয়া পড়িয়া যায় এবং দু'একবার গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া মরিয়া যায়। গুলি খাওয়ার ৩।৪ মিনিট পরে আলম মরিয়া যায়।' ২৬ জানুয়ারি 'কর্মযোগিন'-এ সন্ত্রাসবাদীদের এই কাজকে 'Boldest of the many bold acts' বলে কার্যত প্রশংসাই করে বসলেন অরবিন্দ। লিখলেন, 'Boldest of the many bold acts of violence... They (the terrorists) prefer public places and crowded buildings,— Nasik-London-Calcutta— Goshwami (Naren Gossain) in Jail— these are remarkable features.' গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি যে, আলমকে খুনের পূর্বে

অরবিন্দকে স্পষ্ট জানানো হইয়াছিল এবং তিনিও সম্মতি দিয়াছিলেন।' সরকার এবং উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ শাসকরাও মনে করতেন শামসুল আলম হত্যাকাণ্ডে অরবিন্দই ছিলেন প্রধান মন্ত্রণাদাতা। অরবিন্দ চন্দননগরে প্রস্থানের পরেও ১৯১০ সালের মে মাসে ভাইসরয় লর্ড মিন্টো ভারত সচিব মর্লেকে যে চিঠি লিখেছিলেন (পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে) সেখানেও এই একই অভিযোগ তুলেছিলেন। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীও জানিয়েছেন, অরবিন্দ বরাবরই অন্তরালে থেকে সমস্ত নির্দেশ দিতেন এবং নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করতেন 'কালী' নামে। কাজেই আলম হত্যাকাণ্ডে যদি অরবিন্দের গোপন নির্দেশ থেকেও থাকে তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

শামসুল আলম হত্যাকাণ্ডের পর সরকার যেনতেন প্রকারে অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। অরবিন্দ কারাগারের বাইরে থাকুন, এটা সরকার কখনোই চায়নি। বরং, মুরারিপুকুর বোমার মামলায় তাঁকে খালাস দেওয়া ভুল বলেই মনে করতেন লেফটেনান্ট গভর্নর বেকার। বেকার অরবিন্দ সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'not a mere blind, unreasoning tool, but an active generator of revolutionary sentiment.' ১৯০৮-এর মে মাসেই বেকার লর্ড মিন্টোকে লিখেছিলেন, 'to release Aurobindo is to ensure recrudescene at any time of further spread of evil.' ১৯১০ সাল পর্যন্ত বারবার লর্ড মিন্টো মর্লের কাছে অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের দাবিও জানিয়ে এসেছিলেন। শামসুল আলম হত্যাকাণ্ডের পর অরবিন্দের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা আরো প্রবল হয়ে উঠল।

এইরকম পরিস্থিতিতেই অরবিন্দ কলকাতা ত্যাগ করে পালিয়ে যান চন্দননগরে। ঠিক কোন তারিখে অরবিন্দ চন্দননগরে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তা অবশ্য জানা যায় না। তবে আন্দাজ করা হয় ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক সময়ে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। অরবিন্দের প্রস্থানের কাহিনি যাঁরা বিধৃত করেছেন, তাঁরা জানিয়েছেন নিবেদিতার পরামর্শেই অরবিন্দ পালিয়ে ফরাসি চন্দননগরে গিয়ে আশ্রয় নেন। তবে, অরবিন্দর অন্তর্ধান সম্পর্কে নানারকম মত শোনা যায়। অরবিন্দের এই অন্তর্ধান প্রসঙ্গে লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'যোগীন মা-র ভাগনে একদিন নিবেদিতাকে এসে জানালেন, সরকার অরবিন্দ ঘোষকে নির্বাসনে পাঠাবার মতলব করছেন। বাগবাজারে দেখা করতে এলে নিবেদিতা অরবিন্দকে এ-খবর দিয়ে তাড়াতাড়ি ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যেতে বললেন, নইলে তাঁর কাজে বিঘ্ন ঘটবে। অরবিন্দ বললেন, 'তার দরকার হবে না। 'কর্মযোগিন'-এ একটা খোলা চিঠি ছাপলেই সরকার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' তা-ই হল। শেষ পর্যন্ত অরবিন্দকে চলে যেতেই হল।

হঠাৎ একদিন রামচন্দ্র মজুমদার খবর আনলেন, কাল সকালে ‘কর্মযোগিন’ অফিস খানাতল্লাস হবে, অরবিন্দ গ্রেপ্তার হবেন। আলাপ-আলোচনার আর সময় নেই। বন্ধুদের নানা উত্তেজিত মন্তব্যের মধ্যেই অরবিন্দ সুস্পষ্ট আদেশ শুনতে পেলেন, ‘চন্দননগরে চলে যাও।’ দশ মিনিটের মাঝে বিশ্বস্ত দুটি সঙ্গীকে নিয়ে তিনি গঙ্গার তীরে হাজির হলেন। তারপর সেখান থেকে নৌকায় করে সোজা চন্দননগর। নিবেদিতাকে খবর দেবার তখন সময় ছিল না। পরদিন ‘কর্মযোগিন’ অফিস থেকে একটি লোক এসে বলে গেল, কাগজের ভার নিবেদিতার হাতে দিয়ে অরবিন্দ চলে গেছেন।’

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখছেন, ‘বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের যোগীন মা তাঁহার এক আত্মীয় গোয়েন্দা পুলিশ শশীভূষণ দে-র নিকট শুনিলেন যে অরবিন্দের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। শুনিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি মঠে ফিরিয়া স্বামী সারদানন্দকে এই খবর দিলেন। খোঁজ নিয়া জানা গেল খবর ঠিক। স্বামী সারদানন্দ গণেন মহারাজকে অরবিন্দর নিকট পাঠাইলেন। গণেন মহারাজ দৌড়াইয়া ‘কর্মযোগিন’ অফিসে অরবিন্দর নিকট গেলেন। অরবিন্দ এই সংবাদ শুনিয়া কিছুক্ষণ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিলেন। পরে গণেন মহারাজকে বলিলেন, ‘যদি নিবেদিতা ‘কর্মযোগিন’-এর ভার নেয় তবে আমি চন্দননগর যাইব।’ তিনি তাঁহার শেষ লেখা ‘Open letter to my fellow citizens, my political testament’ লিখিলেন এবং সেই রাত্রেই নিবেদিতার বাড়ি গিয়া দেখাসাক্ষাৎ করিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকা করিয়া চন্দননগর প্রস্থান করিলেন।’ প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণাও লিখেছেন যে, অরবিন্দের গ্রেপ্তারের খবর সর্বপ্রথম যোগীন মা জেনেছিলেন এবং ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজই ওই সংবাদ অরবিন্দর কাছে পৌঁছে দেন।

অরবিন্দ নিজে তাঁর অন্তর্ধান সম্পর্কে অবশ্য পরে বলেছেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে এ সংবাদ গণেন মহারাজ দেননি। দিয়েছিলেন ‘কর্মযোগিন’ পত্রিকার এক কর্মচারী রামচন্দ্র মজুমদার। এ ব্যাপারে নিবেদিতার সঙ্গেও তাঁর কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন অরবিন্দ। অরবিন্দ বলেছেন, ‘দৈব আদেশ’ পেয়েই তিনি চন্দননগর চলে যান। 'Sri Aurobindo on Himself'-এ এ প্রসঙ্গে অরবিন্দর যে বক্তব্য আছে, তা এই রকম, 'The departure in Chandernagore happened later and there was no connection between the two incidents. (দুটি ঘটনা বলতে অরবিন্দ ১৯০৯-এর জুলাই মাসে তাঁর গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা এবং ১৯১০ সালে কলকাতা ত্যাগ বুঝিয়েছেন) 'It was not Ganen Maharaj who informed me of the impending search and arrest, but

a young man on the staff of karmayogin, Ramchandra Mazumder, whose father has been warned that in a day or two the karmayogin office would be searched and myself arrested. There has been many legends spread about on this matter and it was even said that I was to be prosecuted for participation in the murder in the High Court of Shamsul Alam, a prominent member of the C.I.D. and that sister Nivedita sent for me and informed me and we discussed what was to be done and my disappearance was the result. I never heard of any such proposed prosecution and there was no discussion of the kind; the prosecution intended and afterwards started was for sedition only. Sister Nivedita knew nothing of these new happenings till after I reached Chandernagore. I did not go to her house or see her; it is wholly untrue that she and Ganen Maharaj came to see me off at the ghat. There was no time to inform her; for almost immediatly I received a command from above to go to Chandernagore and within ten minutes I was at the ghat, a boat was hailed and I was on my way with two young men to Chanernagore.'

অরবিন্দের ভাষ্য অনুযায়ী কলকাতা ত্যাগের সংবাদ নিবেদিতাকে দেওয়ার মতো সময়ই তিনি পাননি। কারণ, গ্রেপ্তার হতে পারেন এই খবর পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে চন্দননগর চলে যাওয়ার দৈব নির্দেশ আসে। এই নির্দেশ আসার দশ মিনিটের ভিতর তিনি গঙ্গার ঘাটে পৌছোন এবং নৌকায় চেপে চন্দননগরের দিকে যাত্রা করেন।

বিশিষ্ট গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এই প্রসঙ্গে দুজনের মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। শঙ্করীপ্রসাদবাবু জানিয়েছেন অরবিন্দের মাসতুতো ভাই এবং স্বদেশী আন্দোলনের কর্মী সুকুমার মিত্র একটি লিখিত বিবৃতি দিয়েছিলেন তাঁকে। সেই বিবৃতিতে সুকুমার মিত্র বলেছিলেন, 'শ্রী সুকুমার মিত্রের সামনে রাম মজুমদার সকালে এসে অরবিন্দকে বলেন, আপনাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করবে কিংবা নির্বাসন দেবে। সেদিন ১১-১২টার সময় (অরবিন্দ) যথারীতি শ্যামপুকুরে 'কর্মযোগিন' অফিসে যান। সন্ধ্যায় 'কর্মযোগিন' অফিসের দেওয়াল টপকে চলে যান। আহিরীটোলা ঘাটে রাম মজুমদার নৌকা করে দেন। সোজা চন্দননগর যান।'

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখায় সত্যেন্দ্রসুন্দর চক্রবর্তীর দেওয়া বিবরণও পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রসুন্দর অরবিন্দের কলকাতা ত্যাগের ঘটনাটি জানতে পেরেছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর কন্যা মনোরমা দেবীর কাছ থেকে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর ভ্রাতা গিরিজাসুন্দরের ছাপাখানাতেই অরবিন্দের 'কর্মযোগিন' ছাপা হত। সত্যসুন্দর লিখেছেন, 'ভগিনী নিবেদিতা তখন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে বেশ জড়িয়ে পড়েছেন। তিনি প্রায়ই (শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর) শ্যামবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে এসে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নানা বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন। তাঁর পরনে থাকত কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত মোটা কাপড়ের সাদা গাউন, কণ্ঠে মোটা রুদ্রাক্ষের মালা।'

সত্যেন্দ্রসুন্দর তাঁর লেখায় জানিয়েছেন, শামসুল আলম হত্যাকাণ্ডের পর 'কর্মযোগিন'-এ একটি লেখায় সরকারের দমনপীড়নকেই সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ হিসাবে দেখানো হয়। সত্যেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন, 'এই লেখাটি বেরোবার দুই একদিন পরেই ভগিনী নিবেদিতা প্রায় রাত দশটার সময়ে 'কর্মযোগিন' অফিসে হঠাৎ উপস্থিত হলেন। শ্রী অরবিন্দ তখন কাগজের জন্য সম্পাদকীয় লেখায় মগ্ন। ভগিনী নিবেদিতা বললেন, তিনি জানতে পেরেছেন যে, শ্রীঅরবিন্দকে সরকার আবার গ্রেপ্তার করবে। তাঁর পরামর্শ শ্রীঅরবিন্দকে এখুনি কলকাতা ছাড়তে হবে। তিনি ইতিমধ্যে তাঁর যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে এসেছেন। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু যেতে অনিচ্ছুক। তিনি নিবেদিতাকে বললেন যে, তিনি চলে গেলে দেশের কী হবে, কাগজের দেখাশোনা কে করবে? সকলেই তো এখন বন্দী। ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দর ভগিনী শ্রীমতী সরোজিনী গোলদিঘির বাড়ি থেকে সেখানে এলেন এবং জানালেন যে, পুলিশ শ্রীঅরবিন্দকে খুঁজছে। এই কথা শুনে নিবেদিতা কলকাতা ছাড়ার জন্য শ্রী অরবিন্দকে আরও জোর করতে লাগলেন এবং বললেন, যে তাঁর এক মিনিটও থাকা চলবে না। তিনি অরবিন্দকে কথা দিলেন যে, 'কর্মযোগিন' যাতে বন্ধ না হয় তিনি সে চেষ্টা করবেন।'

অরবিন্দ যা-ই বলুন না কেন, পরবর্তীকালে অরবিন্দের ঘনিষ্ঠজনদের বিবরণ থেকে কিন্তু জানা যায়, অরবিন্দের কলকাতা ত্যাগের পিছনে নিবেদিতার একটি কার্যকরী ভূমিকা ছিলই। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দের সহযোগী, বিশিষ্ট সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'আলিপুর বোমার মামলা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া অরবিন্দ যখন 'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম' পত্রদ্বয় প্রকাশ করিতেছিলেন তখন সরকার আবার তাঁহাকে মামলা সোপর্দ করিবার ব্যবস্থা করেন। ঘটনাক্রমে নিবেদিতা তাহা জানিতে পারেন। এবং তাঁহারই পরামর্শে ও

প্ররোচনায় অরবিন্দ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চন্দননগরে গমন করেন। ভগিনী নিবেদিতাই তাঁহার পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সে অর্থ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু দিয়াছিলেন।' আর চন্দননগরে অরবিন্দের আশ্রয়দাতা মতিলাল রায় তাঁর 'জীবনসঙ্গিনী'-তে লিখেছেন— 'তিনি (অরবিন্দ) এইরূপ আত্মগোপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার একান্ত আগ্রহাতিশয্যে তিনি এই পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন।'

এ প্রসঙ্গে আর-একজনের বক্তব্যও উল্লেখ করা দরকার। তিনি সতীশচন্দ্র সরকার (পরবর্তীকালে নির্বাণস্বামী)। শামসুল আলম হত্যাকাণ্ডে সতীশচন্দ্র জড়িত ছিলেন। হত্যাকারী বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত ধরা পড়লেও সতীশচন্দ্র পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় একটি সাক্ষাৎকারে সতীশচন্দ্র বলেন, 'অরবিন্দর এই যাওয়ার পিছনে আরও একটু ইতিহাস আছে। ভগিনী নিবেদিতা ওঁকে এর মধ্যে খবর দিয়েছিলেন— সরকার ওঁকে নির্বাসন পাঠাবার গোপন চক্রান্ত করছে। সুতরাং এখন তাঁর ভারতীয় এলাকা ছেড়ে যাওয়াই মঙ্গল। ইতিমধ্যে শামসুল হত্যার খবরে শীগগিরই নির্বাসনের সম্ভাবনা দেখে উনি সেই মুহূর্তেই মনস্থির করে চন্দননগর চলে যান।'

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'উল্লেখযোগ্য যে, নিবেদিতাই অরবিন্দকে ব্রিটিশ-ভারতীয় পুলিশের নাগালের বাইরে অন্যত্র গিয়ে থাকবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। ...১৯১০ খ্রীস্টাব্দে অরবিন্দকে যখন দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার করার আশঙ্কা দেখা দিল তখন রামচন্দ্র মজুমদার নামক এক বিপ্লবী তরুণকে নিবেদিতার কাছে পাঠানো হল, অরবিন্দের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে উপদেশ নেবার জন্য। নিবেদিতা বলেছিলেন, 'নেতার পক্ষে ঘরে থেকে যেমন কাজ করা সম্ভব, দূরে থেকেও তেমনি করা সম্ভব।' এই উপদেশ পেয়েই অরবিন্দ ফরাসি অধিকৃত ভারতে চলে যান।'

অরবিন্দও স্বয়ং জানিয়েছেন, পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে, এ সংবাদ রামচন্দ্র মজুমদারই তাঁকে জানিয়েছিলেন। এবং রামচন্দ্রই বাগবাজার ঘাটে তাঁকে চন্দননগরগামী নৌকোয় তুলে দিয়েছিলেন। রামচন্দ্র মজুমদার অরবিন্দের এই প্রস্থানপর্ব সম্পর্কে কী বলেছেন? ১৩৫২ সালে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় রামচন্দ্র লিখেছেন, 'আমি জনৈক সি-আই-ডি'র নিকট হইতে সংবাদ পাই যে, শ্রীঅরবিন্দকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে এবং খুব সম্ভব শামসুল আলমের হত্যার মামলায় তাঁহার নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইবে। এই সংবাদ আমরা পূর্বেই আরও দুই স্থান হইতে পাই। সংবাদ পাইয়াই আমি কৃষ্ণকুমারবাবুর বাড়ি ছুটিলাম এবং শ্রীঅরবিন্দকে খবর দিলাম। তিনি ধীরচিত্তে ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া

'কর্মযোগিন' অফিসে আসিলেন। প্রথমে জামিনদার ঠিক করিয়া রাখিবার পরামর্শ হইল। পরে বলিলেন, 'নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।' আমি ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি গেলাম। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল।...যাহা হউক, ভগিনী নিবেদিতাকে সকল ঘটনা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, 'Tell your chief to hide and the hidden chief through intermediary shall do many things'. একদিন অরবিন্দবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, 'Mother Kali through Sister Nivedita ordered me to hide...' এই সংবাদ পাইয়া আমি পত্রিকা অফিসে ফিরিলাম। অরবিন্দবাবু বলিলেন, 'All Right, arrange.' পরে এ সম্বন্ধে সুরেশ (সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী) যাহা লিখিয়াছে তাহা সবই ঠিক। কেবলমাত্র গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিবার পূর্বে বোসপাড়া লেনে অরবিন্দবাবু যে ভগিনী নিবেদিতার বাসায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, এই কথা সে লেখে নাই। বোধহয় নিবেদিতার সঙ্গে তিনি 'কর্মযোগিন' পরিচালনার পরামর্শ করিয়াছিলেন। এই কথাবার্তার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না, নীচে রোয়াকে বসিয়াছিলাম। কাজেই কী কথা হইয়াছিল তাহা জানি না। নিবেদিতার বাসা হইতে আমরা বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে যাই। অরবিন্দবাবু ও বীরেনবাবু বাগবাজারের খড়ো ঘাটে সিঁড়ির উপর বসিলেন। আমি ও মণি নৌকার সন্ধানে হাটখোলা ঘাট পর্যন্ত গেলাম এবং সেখান হইতে নৌকা করিয়া বাগবাজার ঘাটে আসিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিবার পূর্বে অরবিন্দবাবু আমাকে বলিলেন, 'Be rare in your acquaintances. Seal your leaps to rigid secrecy. Don't breathe this to your nearest and dearest.'

নৌকা ছাড়িয়া দিল।'

অরবিন্দের প্রস্থানের প্রতিটি মুহূর্তে রামচন্দ্র মজুমদার ছিলেন তাঁর সঙ্গী এবং সমগ্র ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। কাজেই রামচন্দ্রের বক্তব্যকে সবথেকে গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরতেই হয়। অরবিন্দ যতই 'দৈববাণী'র কথা শোনাতে চান না কেন— রামচন্দ্রের এই বক্তব্যই প্রমাণ করছে অরবিন্দের কলকাতা ত্যাগের পিছনে নিবেদিতার পরামর্শ ছিল। শুধু তা-ই নয়, কলকাতা ত্যাগের পূর্বে অরবিন্দ নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে গিয়ে আলোচনাও করেছিলেন। সেক্ষেত্রে এ প্রশ্ন উঠবে যে, এই ঘটনার বহুদিন পরে পণ্ডিচেরী আশ্রমে বসে অরবিন্দ কেন নিবেদিতার ভূমিকাকে অস্বীকার করলেন এবং সবটাকেই দৈব আজ্ঞা হিসাবে চালাতে চেষ্টা করলেন? সে কি এই কারণেই যে, তাঁর ওপর দৈবপ্রভাব রয়েছে এমনই একটি ধারণার জন্ম দিতে চেয়েছিলেন অরবিন্দ? যদি দিতে চান, তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, হেমচন্দ্র কানুনগোর মতো বিপ্লবীরা অনেক আগেই লক্ষ

করেছিলেন অরবিন্দ নিজেকে একজন 'অবতার' ভাবতে শুরু করেছেন।

অরবিন্দের চন্দননগরে আত্মগোপন করে থাকা সম্পর্কে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'সমস্ত মার্চ মাস অরবিন্দ চন্দননগরে মতিলাল রায়ের বাড়ীতে লুক্কায়িত অবস্থায় ছিলেন এবং সেখান হইতে বাগবাজারে নিবেদিতার সহিত এবং কলেজ স্কোয়ারে কৃষ্ণকুমার মিত্রের পুত্র, তাঁহার মাসতুতো ভাই সুকুমার মিত্রের সহিত লোক পাঠাইয়া যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। ইহা আমরা সুকুমার মিত্রের নিকট শুনিয়াছি। মতিলাল রায় তাঁহার এক কাঠের গুদামে অন্ধকারে অরবিন্দকে লুকাইয়া রাখিতেন। মতিলালের স্ত্রীও ইহা জানিতেন না। তিনি একদিন প্রাতে গামছা পরিয়া কৌতূহলবশতঃ ঐ গুদামঘর খুলিতেই দেখিতে পাইলেন এক ব্যক্তি বসিয়া আছে এবং তাঁহার দিকে "মিটমিট করিয়া চাহিয়া আছে।" মতিলাল রায়ের স্ত্রী আদুল গায়ে ছিলেন, লজ্জায় জিভ কাটিয়া দ্রুত বাহির হইয়া আসিলেন। পরক্ষণেই মতিলাল রায় ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই অরবিন্দ বলিলেন, "Moti, Moti I have seen Kali"। যিনি আলিপুর জেলে বৃক্ষতে বাসুদেব দেখিয়াছিলেন, তিনি মতিলাল রায়ের স্ত্রীতে মা-কালী দেখিলেন। বৃক্ষ যেমন বাসুদেবে রূপান্তরিত হন নাই, মতিলাল রায়ের স্ত্রীও তেমনি মা-কালীতে রূপান্তরিত হন নাই। যে মতিলাল রায়ের স্ত্রী ছিলেন তাহাই রহিয়া গেলেন। অরবিন্দের এই ভ্রমকে রজ্জুতে সর্পভ্রম বলা যায়। মনঃতত্ত্ববিদ্ W. James ইহাকে বলিয়াছেন, "misdirected imagination"। বেদান্ত ইহাকে বলে "অধ্যাস"। যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে তাই দেখা।'

গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন, চন্দননগর থেকে অরবিন্দ নিয়মিত লোক মারফত নিবেদিতা এবং সুকুমার মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন— একথা স্বয়ং সুকুমার মিত্রই তাঁকে বলেছেন। কাজেই এঁকে বিশ্বাসযোগ্য হিসাবেই ধরে নিতে হয়। কিন্তু চন্দননগরে অরবিন্দ আত্মগোপন করে থাকাকালীন নিবেদিতা কি কখনো গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন? এ প্রসঙ্গে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখার অংশবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। মুক্তিপ্রাণাও অনুমান করেছেন, অরবিন্দ চন্দননগরে আত্মগোপন করে থাকার সময়ে অন্তত দু-বার নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে গোপনে দেখা করে এসেছিলেন। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের সঠিক তারিখ আমরা জানিতে পারি নাই। তবে ১৪ই ফেব্রুয়ারী নিবেদিতা চন্দননগরে গমন করেন। ঐদিন সরস্বতী পূজা। বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা ঘটা করিয়া অনুষ্ঠিত হইত, এবং নিবেদিতা ও কৃস্টীন সারাদিন ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু এবৎসর ঐদিন নিবেদিতা বেলা দেড়টায় গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়া নৌকাযোগে চন্দননগর যাত্রা করেন। তখন জোয়ার ছিল। রাত্রি

এগারোটায় তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী পুনরায় তিনি চন্দননগরে গিয়াছিলেন।' মুক্তিপ্রাণা আরো লিখেছেন, 'শ্রীঅরবিন্দের প্রস্থানের পূর্বে নিবেদিতার সহিত দেখা হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। সেজন্যই নিবেদিতা ব্যস্ত হইয়া ১৪ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজার দিন চন্দননগর গিয়াছিলেন। 'কর্মযোগিন' পত্রের পরিচালনা ব্যাপারে পরামর্শ ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দের জন্যও তিনি চিন্তিত ছিলেন, এবং তাঁহার ব্রিটিশ ভারতের বাইরে অবস্থানের সকল ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ ব্যতীত তাঁহার দুইদিন চন্দননগর গমনের অন্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। আমরা কাহারও নিকট শুনিয়াছি, শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাত্রার পাথেয় নিবেদিতা শ্রীযুক্ত জগদীশ বসুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।' ফলত, এমন হওয়াও স্বাভাবিক যে, অরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাত্রার বন্দোবস্ত করতেই নিবেদিতার চন্দননগর যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাঁর এই চন্দননগর যাত্রাটি যে নিবেদিতা অত্যন্ত গোপন রেখেছিলেন তা-ও বোঝা যায়। ওইসময়ে নিবেদিতা যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছেন, তার কোথাও তিনি চন্দননগর যাত্রা নিয়ে একটি কথাও বলেননি। এমনকী, যে দুজনকে তিনি প্রত্যহ চিঠিতে খুঁটিনাটি জানাতেন, এবং যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক পরিকল্পনার সবটুকুই অবহিত ছিলেন— সেই জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং র‍্যাটক্লিফকে লেখা চিঠিতেও এ বিষয়ে একটিও শব্দ খরচ করেননি নিবেদিতা।

অরবিন্দ চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরী চলে যান একেবারেই একা। কোনো আত্মীয়-পরিজন, এমনকী নিজের স্ত্রীকেও সঙ্গে নেননি। এভাবে অরবিন্দের অন্তর্ধান সামাজিকভাবে তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকেও সম্ভবত কিছুটা অস্বস্তিকর পরিবেশের ভিতর ফেলেছিল। একথা জানা যায় সারদা দেবীর শিষ্যা সুধীরা দেবীর (নিবেদিতার প্রয়াণের পর নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা) একটি চিঠি থেকে। সুধীরা দেবী ছিলেন অরবিন্দের পত্নী মৃণালিনী দেবীর শৈশবাবস্থা থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু। অরবিন্দের প্রস্থানের পর সুধীরা দেবী একটি পত্রে মৃণালিনীকে লিখেছিলেন, 'স্বামী পরিত্যক্তা— এই কথাটি আর কখনও উল্লেখ করিও না, আমার মনে ভয়ানক লাগে। যে দেবতা প্রেমময়, যিনি সকলকে ভালোবাসেন, সকলের জন্য যিনি সর্বত্যাগী তিনি তাঁহারই সর্বস্বকে ভালোবাসেন না একথা আমি বলিতে পারি না। বুদ্ধদেব যখন সংসার ত্যাগ করিয়া যান তখন বলিয়াছিলেন যে, গোপাকে বলিও তাহার ভালোবাসাই আমাকে সংসার ত্যাগ করিতে বলিতেছে। আরও বলিও তাহাকে ভালোবাসি বলিয়াই এ জগতকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি, ইত্যাদি। ...সাংসারিক পক্ষে লোকচক্ষে তুমি স্বামী পরিত্যক্তা বটে, কারণ সংসারী স্বামীকে যেরূপ পায় তুমি সেরূপ পাও নাই,

তাই সংসারী লোক তা-ই ভাবিতে পারে। তুমি কখনো তাহা ভাবিতে পার না, কারণ তুমি তো সংসারী নও, তুমি সংসারের অনেক উচ্চে।'

অরবিন্দ কলকাতা ছাড়লেন, কিন্তু 'কর্মযোগিন'-এর দায়িত্ব দিয়ে গেলেন নিবেদিতার ওপর। লিজেল রেঁম লিখছেন, "'কর্মযোগিন'-এর শেষ সংখ্যাগুলো বেরল সম্পূর্ণ নিবেদিতার নিজ দায়িত্বে। তার মধ্যে নিবেদিতা নিজের লেখা প্রবন্ধ অরবিন্দ ঘোষের নাম দিয়ে জুড়ে দিতেন। 'কর্মযোগীর আদর্শ' প্রবন্ধটার শেষ দু'অধ্যায়ও তাঁর লেখা, যোগী অরবিন্দর ভাবধারার যথাযথ সঙ্কলন তাতে। অথচ কেউ সন্দেহমাত্র করেনি। স্বামীজির ভাষণ থেকেও অংশবিশেষ উদ্ধৃত হত।' অরবিন্দ চলে যাওয়ার পর নিবেদিতা কয়েকটি সংখ্যা 'কর্মযোগিন' চালিয়েছিলেন সম্পূর্ণ কৌশলগত কারণে। অরবিন্দ যতক্ষণ না কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছন, ততক্ষণ বিষয়টিকে গোপন রাখতেই চেয়েছিলেন নিবেদিতা। কিন্তু, তবু অরবিন্দের অন্তর্ধান নিয়ে নানারকম রটনা রটল। কেউ বলল, পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে; কেউ বলল, অরবিন্দ সাধনার জন্য হিমালয়ে চলে গেছেন। অরবিন্দর প্রকৃত আশ্রয়স্থল গোপন রাখার জন্য নিবেদিতা 'কর্মযোগিন'-এ লিখেছেন, 'অরবিন্দ এখানেই আছেন। তিনি সম্পূর্ণ নির্জনতার মধ্যে থাকতে চান। কাজেই তাঁর ঠিকানা গোপন রাখা হয়েছে।' কৌশলগত কারণেই এইসব বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা।

অরবিন্দের প্রস্থানের দু-তিন সপ্তাহ পরে ১২ মার্চ 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় নিজের নামে নিবেদিতা লিখলেন, 'I believe in India, one, indissoluble, indivisble. National unity rests on the foundation of common heart, common interest, common love.

'I believe that the force which is expressed in the vedas and the upanishads, in the formation of religions and empires, in the seience of savants and in the meditation of saints is born once more amongst us and has to-day the name of Nationality.

'I believe that present India has taken the plunge from deep roots in her past and that before her rise a glorious future.

'O, Nationality! Come to me! Bring me joy or sorrow, glory or approbrium, but grant that I may belong to thee.'

অরবিন্দর অন্তর্ধানের পরেও 'কর্মযোগিন'-এর ওপর সরকার এবং পুলিশের হেনস্থা অব্যাহত ছিল। ১৯১০-এর ৭ এপ্রিল র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লেখেন,

'Meanwhile, this week the K. Y. [Karma Yogin] has been attacked. There was a Bengali weekly printed at the same office— Dharma. This was stopped unless deposit of Rs. 2000 made. Not made and A. Gh [Aurobinda Ghose] and the printer of K.Y. were to be arrested, on article which I enclose. I trust you can give the article publicity in England. Is it seditious? A. Gh. has not been found. The trial is fixed for the 18th. If the case for the printer could be won, the other warrant would fall through. Meahwhile there should be 2 more issues of K.Y. in any case.'

অরবিন্দ ১৯১০-এর এপ্রিল মাসের প্রথমে পণ্ডিচেরী পৌছন। সেই অবধি নিবেদিতা 'কর্মযোগিন' প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, অরবিন্দের পণ্ডিচেরী পৌছনোর সংবাদ পেয়ে নিবেদিতা আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। এবং ১০ এপ্রিল ১৯১০ তিনি ইংরাজি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের অবস্থানের খবর পাঠিয়ে দেন। লিজেল রেমঁ লিখছেন, ' ২রা এপ্রিল 'কর্মযোগিন'-এর আর একটা সংখ্যা বার হল। এক সপ্তাহ পর নিবেদিতা খবর পেলেন, অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় নিয়েছেন। জনকয়েক অতিবিশ্বস্ত অনুচর অন্য পথে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলেছেন। পরদিন নিবেদিতা স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের সঙ্গে দেশনেতার আসল ঠিকানাটা ইংরেজী কাগজওয়ালাদের জানিয়ে দিলেন।'

অরবিন্দ অন্তর্হিত হবার কয়েকদিন পরেই ভাইসরয় পত্নী লেডি মিন্টো বাগবাজারে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এ প্রসঙ্গটি আগেও একবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অরবিন্দের অন্তর্ধানের কিছুদিনের ভিতরই আচমকা লেডি মিন্টোর নিবেদিতাকে দেখতে আসা যথেষ্ট সন্দেহজনক তো বটেই। যে নিবেদিতাকে পুলিশ ডাকাতির ঘটনায় জড়িত মনে করছে, সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম প্রেরণাদাত্রী বলে ভাবছে এবং যাঁর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ নজর রেখে যাচ্ছে, তাঁর বাড়িতে স্বয়ং ভাইসরয় পত্নীর হাজির হয়ে যাওয়া কৌতূহলেরই জন্ম দেয়। আর সেই সময়ে, যখন অরবিন্দের অন্তর্ধান ঘিরে নানা কাহিনি রটছে এবং এসব সত্ত্বেও কোনোভাবে অরবিন্দকে আটক করার পরিকল্পনা করছে সরকার। তদুপরি, নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের রাজনৈতিক যোগাযোগ সরকারেরও অজানা নয়। ফলে, এরকম সন্দেহ করাই যায় যে, অরবিন্দের অন্তর্ধানের পরেই লেডি মিন্টো যে সরাসরি নিবেদিতার বাড়ি এসে হাজির হচ্ছেন এবং নানাবিধ কথাবার্তার ভিতর রাজনৈতিক প্রসঙ্গও

তুলছেন (এ বিষয়টিও আগে উল্লেখ করা হয়েছে) তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অরবিন্দের অন্তর্ধান এবং লেডি মিন্টোর আগমন সবটাই একটি সূত্রে বাঁধা। মনে রাখতে হবে, এর ঠিক পরদিনই সরকারি চর কর্নেলিয়া সোরাবজিকে সঙ্গে নিয়ে লেডি মিন্টো বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন এবং সেখানেও কর্নেলিয়া নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। তার ভিতর প্রধান ছিল নিবেদিতার সঙ্গে বেলুড় মঠের কী সম্পর্ক ছিল তা জানা।

তবে, এর আগে ১৯০৭ সালে লেডি মিন্টো একবার নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেন। সেই সময়েও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিন্তু উত্তাল ছিল। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তখন ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং নিবেদিতাও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তবে, সেবার লেডি মিন্টো সরাসরি নিবেদিতার বাড়িতে এসে হাজির হওয়ার মতো ঘটনা ঘটাননি। তিনি বিশেষ একজনের মাধ্যমে নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা চালান। ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে এই চেষ্টা চালিয়েছিলেন লেডি মিন্টো। ঘটনাটি এইরকম— স্বামীজির শিষ্যা মেরি হলিয়েস্টার লর্ড মিন্টোর এক ভাইয়ের বাড়িতে গভর্নেস ছিলেন। সেই সূত্রে মিন্টো পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। লেডি মিন্টো ভারতীয় নারীদের সাহায্যার্থে কিছু কাজ করতে চান জেনে মেরি নিবেদিতার সঙ্গে লেডি মিন্টোর যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে উদ্যোগী হন। এ ব্যাপারে নিবেদিতাকে চিঠিও লেখেন মেরি। কিন্তু তখন নিবেদিতা লেডি মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯০৭-এর ১৪ মার্চ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা চিঠিতে সেই অনিচ্ছা প্রকাশও করেন নিবেদিতা। নিবেদিতা লেখেন, 'I have no desire to see Ly. Minto. And do not for a moment imagine that she could do anything. If I did see her however, it must be because she herself had decided that it was desirable, and summoned me frankly to give my opinion. ... And I do not think Ly. Minto will have the requisite courage. I have reason to believe that she made a round about attempt to meet me last week. I of course kept out of it. I say all this, in order to warn you on no account to communicate with anyone here or elsewhere, with the idea of pushing the matter.'

চিঠিটি পড়েই বোঝা যাচ্ছে, লেডি মিন্টো সম্পর্কে নিবেদিতার একটি দ্বিধা ও সংশয় ছিল। নিবেদিতা মনে করেছিলেন, ভারতীয় নারীদের হয়ে লেডি মিন্টো তেমন কোনো কাজ করতে পারবেন না। ১৯১০-এর মার্চ মাসে লেডি মিন্টো কিন্তু

কারো মাধ্যমে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেননি; বরং তিনি কারো সাহায্য না নিয়ে গোপনে নিজেই চলে এসেছেন নিবেদিতার কাছে। বোঝাই যাচ্ছে, নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি মরীয়াই হয়ে উঠেছিলেন। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে, ভাইসরয় মিন্টো আমেদাবাদে সন্ত্রাসবাদীদের ছোঁড়া বোমা থেকে রক্ষা পাওয়ার পর সরকারের সন্দেহের তালিকায় থাকা নিবেদিতাকে যাচাই করতে এসেছিলেন লেডি মিন্টো।

এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে পরে লেডি মিন্টো লেখেন, 'Sister Nivedita lives in the heart of the Native city, in a tiny house in a black alley, and considering the present unrest, I knew I should never be allowed to visit that quarter of the town without special police protection, had it been known that I was going there. As I was leaving, I told her I was the Viceroy's wife, which surprised her greatly.' নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চলে আসার মুহূর্তে তিনি নিজের পরিচয় জানিয়েছিলেন বলে লেডি মিন্টো যে দাবি করেছিলেন, নিবেদিতার চিঠিতে কিন্তু সেরকম প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এ প্রসঙ্গে নিবেদিতার চিঠি, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে মনে হয়, লেডি মিন্টোর হঠাৎ করে আগমনে তিনি অবাক হয়েছিলেন ঠিকই, তবে আগন্তুক যে লেডি মিন্টো তা তিনি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন। আর না জানার কারণও ছিল না। তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীর পরিচয় না জেনেই নিবেদিতা দীর্ঘক্ষণ নানা বিষয়ে, বিশেষত রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন — এরকম মনে হয় না।

লেডি মিন্টো যে শুধু বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িতে এসে সাক্ষাৎ করে গিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়। এরপর তাঁর আমন্ত্রণে নিবেদিতা বড়লাটের বাসভবনে চা পান করতেও যান। এবং লেডি মিন্টোর একান্ত অনুরোধে তাঁকে বাধ্য হয়ে পুলিশ কমিশনার হ্যালিডের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে হয়। ১৯১০ সালের ৬ এপ্রিল সারা বুলকে নিবেদিতা লিখছেন, 'There is a plenty of news, but impossible to discuss in a letter. Ly. Minto, who is a sweet woman, so set her heart on my seeing the Commissioner of Police that I simply had to do so that week. He very thoughtfully asked me to his home instead of to his office. We had a solitary cup of tea with him on his verandah. He was perfectly charming. Of course, one does not know how far he was whole-hearted, but we seemed

to get on beautifully and that so much nicer than if he had told us he thought it disgraceful to live in the Native Quarter. Of course something was due to Her Excellency's Friends.'

১৯১০-এর ৭ এপ্রিল র‍্যাটক্লিফকে লিখছেন, '...to oblige our new and exalted friend—we saw Halliday and had tea with him. He says he knows 'the police are devils, and watching is tommy rot.' But his superiors compel him. This is surprising. Yet the one Question that I banished while I talked with him, but that came again before and after is—"What hand had you in that matter of the Sh. B. murder!" I should like that answered! Wouldn't you?'

নিবেদিতার চিঠিটি পড়েই বোঝা যায় লেডি মিন্টোর অনুরোধে হ্যালিডের সঙ্গে দেখা করলেও খুব একটা স্বইচ্ছায় নিবেদিতা পুলিশ কমিশনারের কাছে যাননি। মনে হয়, পুলিশি ঝামেলা কিছুটা কমাতে লেডি মিন্টোর অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হ্যালিডের কাছে গিয়েছিলেন নিবেদিতা। কিন্তু তাতেও পরবর্তীকালে অবস্থার যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছিল তা কিন্তু নয়। বরং এর পরও নিবেদিতাকে ছদ্মবেশেই ভারতের বাইরে যেতে এবং আসতে হয়েছে। এর পরেও নিবেদিতার পিছনে পুলিশের চর সক্রিয় ছিল। কাজেই মনে হয়, হ্যালিডে যতই নিবেদিতার সঙ্গে চা-পান করুন না কেন, নিবেদিতা তাঁদের সন্দেহভাজনদের তালিকাতেই ছিলেন। লেডি মিন্টোর অনুরোধে নিবেদিতা দেখা করতে এসেছেন জেনেই হ্যালিডেও বাধ্য হয়ে সৌজন্য বজায় রেখেছিলেন।

তবে, প্রাথমিকভাবে যে উদ্দেশ্যেই লেডি মিন্টো নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসুন না কেন— নিবেদিতার ব্যক্তিত্বে শেষ পর্যন্ত লেডি মিন্টো মুগ্ধই হয়েছিলেন। এবং পরবর্তীকালে নিবেদিতার সম্পর্কে শ্রদ্ধাই জ্ঞাপন করেছেন তিনি। নিবেদিতার মৃত্যুর পর ক্রিস্টিনকে লেখা ভাইসরয় পত্নীর একটি চিঠিতে এই শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা যায়। লেডি মিন্টো ওই চিঠিতে লিখেছিলেন, 'it is with very real regret that I read in the newspapers of the sad loss that has been sustained in the death of Sister Nivedita. I cannot resist sending you a few lines of very deep sympathy, and not only for yourself but for all the Indian community for whom she was working. Sister Nivedita had a wonderful personality, and as I look back to the few meetings I had with her with pleasure, and with real admiration

for her enthusiasm and single-minded desire to assist others. The world is the poorer for her loss, and for you her constant companion and helper the blank she leaves must be irrepairable.'

লেডি মিন্টো এবং নিবেদিতার সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, 'লেডি মিন্টো নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি খুবই ভুল করেছিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি তাঁর কাছে নিবেদিতা রিফর্ম এবং মিন্টোর শাসনকালের প্রশংসা করেছিলেন রাজনৈতিক কারণেই।' এটা ঠিক যে, লর্ড মিন্টোর স্বাভাবিক সৌজন্যবোধের প্রশংসা করলেও মিন্টোর শাসনকালের উৎপীড়ন এবং রিফর্মের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে নিবেদিতা সরব ছিলেন। নিবেদিতার বিভিন্ন চিঠিপত্র এবং লেখালেখিই এর প্রমাণ। ১৯১০-এর ১০ আগস্ট র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Lady M. thinks her husband will go down to history as having given India a parliament, but poor thing— it is a toy-parliament.'

ভাইসরয় লর্ড মিন্টো এবং ভারতসচিব জন মর্লে সম্পর্কে নিবেদিতার কী ধারণা ছিল এবং রাজনৈতিকভাবে তাঁদের কীরকম বিরোধিতা নিবেদিতা করেছিলেন — এ প্রসঙ্গটিও এখানে আলোচনা করা দরকার। মিন্টোর পূর্ববর্তী ভাইসরয় কার্জন সম্পর্কে নিবেদিতার ধারণা মোটেই ভালো ছিল না। নিবেদিতার দৃষ্টিতে কার্জন ছিলেন 'নিকৃষ্টতম সাম্রাজ্যবাদী।' কার্জনের সঙ্গে সরাসরি সম্মুখ সমরেই নেমেছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতার সঙ্গে কার্জনের সম্পর্কটি চিরকালীন শত্রুতার সম্পর্কেই পরিণত হয়েছিল। কার্জনের পর ভারতের ভাইসরয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন লর্ড মিন্টো। ভারতে আসার আগেই মিন্টো একজন দক্ষ সেনানায়ক এবং প্রশাসকের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৮৭৯ সালে আফগান যুদ্ধে, ১৮৮২ সালে মিশর অভিযানে, ১৮৮৫ সালে উত্তর পশ্চিম কানাডার বিদ্রোহ দমনে অংশ নিয়েছিলেন লর্ড মিন্টো। কার্জনের পর ১৯০৫ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন মিন্টো। ১৯১০ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। কার্জনের পর এ-হেন মিন্টোকে গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব দিয়ে ভারতে নিয়ে আসার পিছনে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সহজেই বোঝা যায়। কার্জনের সময়েই স্বদেশী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। কংগ্রেসের ভিতর চরমপন্থীদের প্রভাব বাড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ গোড়াতেই নিভিয়ে দেওয়ার জন্য মিন্টোকেই বেছেছিল ব্রিটিশ সরকার। এবং একথাও স্বীকার করলে ভুল হবে না যে, ভাইসরয়

হিসাবে মিন্টো কিন্তু দমন-পীড়নের মাধ্যমে বিপ্লব প্রচেষ্টাকে অনেকটাই অবদমিত করতে পেরেছিলেন।

মিন্টো ভাইসরয় হিসাবে দায়িত্বভার নেওয়ার পরই এদেশে কর্মরত ব্রিটিশ প্রশাসকরা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে হিন্দু-মুসলমান উভয় গোষ্ঠীর যৌথ অংশগ্রহণ আছে। মিন্টো দায়িত্বভার গ্রহণ করেই, স্বদেশী আন্দোলনকে ভেঙে দেওয়ার জন্য একদিকে যেমন বয়কট আন্দোলনের ওপর দমন-পীড়ন শুরু করেছিলেন, তেমনই পূর্বসূরী কার্জনের পথ অনুসরণ করে হিন্দু-মুসলমান বিভেদেরও জন্ম দিয়েছিলেন। মিন্টোর প্ররোচনাতেই ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ এবং প্রিন্স আগা খান মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনেন এবং পূর্ববঙ্গে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমন করতেও মিন্টো অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ করেন। অরবিন্দের মতো নেতাকে নির্বাসন দেওয়ার সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত মিন্টো অটল ছিলেন। যদিও অরবিন্দকে তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেও আর গ্রেপ্তার করতে পারেননি। ভারতসচিব মর্লে কিন্তু মিন্টোর দমননীতির প্রতিবাদ করেছেন। পূর্ববঙ্গের অত্যাচারী লেফটেনান্ট গভর্নর ফুলারকে অপসারণ করতে চেয়েছিলেন মর্লে। কিন্তু মিন্টো তা হতে দেননি। তিলকের কঠোর শাস্তির বিরোধী ছিলেন মর্লে। কিন্তু মিন্টো মর্লের সেই বিরোধিতায় কর্ণপাতই করেননি। বরং, মিন্টো এবং ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ আমলাদের চাপে মর্লেকে অনেক ক্ষেত্রেই পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। এককথায় বলতে গেলে, মিন্টোর শাসনকালের পাঁচবছর ছিল চূড়ান্ত সন্ত্রাসের রাজত্ব। এতটাই সন্ত্রাসের রাজত্ব ছিল যে, ১৯১০-এর ১০ অক্টোবর র‍্যাটক্লিফকে চিঠিতে লিখেছিলেন নিবেদিতা, 'The really grave feature of the present situation is the SILENCE.'

ওই সময়ে নিবেদিতার বিভিন্ন চিঠিপত্রে পুলিশি অত্যারের বীভৎসতার চিত্র পাওয়া যায়। সেইসব চিঠিপত্রের কিছু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, এই মিন্টোর আমলেই নিবেদিতাকে ছদ্মবেশে ভারতে ফিরে আসতে হয়েছিল। ছদ্মবেশে কলকাতা শহরে পরিচয় গোপন করে থাকতে হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, এই মিন্টোর আমলেই নিবেদিতার পিছনে পুলিশের চরেরা সক্রিয় ছিল। ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে নিবেদিতাকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনাও হয়েছিল। এমনকী, এই মিন্টোর আমলেই নিবেদিতাকে কলকাতা থেকে বিলেতেও যেতে হয়েছিল ছদ্মবেশে। বোঝাই যাচ্ছে, মিন্টোর আমলে নিবেদিতা খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না। পুলিশি হেনস্থার মুখেও তাঁকে

পড়তে হয়েছিল তখন। এ-ও সহজেই অনুমেয়, লেডি মিন্টো যতই নিবেদিতার বাড়িতে যান না কেন, মিন্টো-প্রশাসনের চোখে নিবেদিতা সন্দেহভাজনই ছিলেন। এ-ও অনুমেয় যে, মিন্টো সম্পর্কে একেবারে সদয় নিবেদিতা হতে পারেন না। তা হনওনি অবশ্য। মিন্টোর সময় সরকারের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে নিবেদিতা সরব ছিলেন, আন্দোলনেরও নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯০৬ সালের ২৩ এপ্রিল সারা বুলকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Ld. Minto was we believe raging at the boycott.'

১৯০৭-এর ৮ এবং ৯ জুনের চিঠিতে র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখছেন, 'How terrible is the state of things now being initiated! One stands aghast at the weakness of Minto. A sort of mental and moral Armageddon. Two sides ranging for battle, not for cooperation. I can't help thinking that the Civilians themselves are amazed at their own success over the Viceroy.'

তবু, কার্জনের প্রতি নিবেদিতা যতখানি ক্ষুব্ধ, যতখানি বিতৃষ্ণ, ততখানি যেন মিন্টোর প্রতি হতে পারেননি। বরং, নিবেদিতার মনে হয়েছে, কার্জনের কৃতকর্মের দায় মিন্টোকে বহন করতে হয়েছে। ১৯১০-এর ৩১ মার্চ র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Minto has certainly minimised the difficulties of the situation to the utmost. Of course there has been a shocking amount of repressive legislation, but one has always felt that the presence of the Viceroy at the helm of affairs has been an impediment to the speed, and not an accelerator. Minto with his habitual gentleness and courtesy has made the very best of an impossible situation, and the attempt on his life at Ahmedabad seems like an aberration of the national intellect. We have cause to be most thankful that we had a Viceroy this time from Canada, with an instinct for trying to meet the people half-way. The councils are a farce, it is true, and the deportees have been in prison, but you and I know whose fault all these things are. But I dread another coach-and-four Viceroy, such as J's letter points to, another reign of Curzon, with news of fresh assassinatons every day! Save us, if you can! Curzon today would not have escaped with his life, of that we may I think be fairly sure.'

১৯০৯ সালের নভেম্বরে আহমেদাবাদে বোমা ছুঁড়ে মিন্টোকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। কোনোক্রমে মিন্টো প্রাণে বেঁচে যান। লেডি মিন্টো যখন নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন, তখন এ প্রসঙ্গটিও আলোচনায় তোলেন। তাঁর স্বামীর প্রাণনাশের চেষ্টায় আতঙ্কও প্রকাশ করেন লেডি মিন্টো। এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক, লর্ড মিন্টোর ওপর এই আক্রমণের ঘটনায় নিবেদিতার মনোভাব কী–সেটি বোঝাও হয়তো লেডি মিন্টোর উদ্দেশ্য ছিল। লেডি মিন্টো হয়তো বুঝতে চেয়েছিলেন, এ ঘটনায় নিবেদিতার কোনো পরোক্ষ সমর্থন আছে কিনা। কিন্তু মিন্টোর ওপর এই আক্রমণকে নিবেদিতা সমর্থন করেননি। ১৯১০-এর ৩১ মার্চ র‍্যাটক্লিফকে তাই তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, '... the attempt on his life at Ahmedabad seems like an aberration of the national intellect.'

নিবেদিতার চিঠি থেকেই জানা যায়, আহমেদাবাদে তাঁর ওপর এই হামলার ঘটনায় মিন্টো ভীত হয়ে পড়েন এবং ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়া মনস্থ করেন। ১৯১০-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি র‍্যাটক্লিফকে চিঠিতে লিখেছেন নিবেদিতা, 'they say Minto is frightened to death— as well the poor soul may be and will return at once—leaving the Viceregal risks to Baker.'

এর ঠিক আগেই, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখছেন, '... I fear Minto is going back. I fancy the poor man is un-nerved, by all he has passed through— while that fool of Curzon continues to babble! I wonder he doesn't hide his head! Does he think poor little Minto is responsible for the new condition?' নিবেদিতার এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়, যে পরিস্থিতির তখন সৃষ্টি হয়েছিল তার পুরো দায় তিনি মিন্টোর ঘাড়ে চাপাতে চাননি। বরং, কার্জনের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং ঘৃণা তখনও তাঁর অন্তরে ছিল। এবং তিনি মনে করতেন কার্জনের কৃতকর্মের দায় মিন্টোকে সামলাতে হচ্ছে।

মিন্টোর সমসময়েই ভারতসচিব ছিলেন জন মর্লে। মর্লের একটি উদারনৈতিক ভাবমূর্তি ছিল। কার্জন এবং মিন্টোর মতো অত দমন-পীড়নেও মর্লের সায় ছিল না। মর্লে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন; উদারনীতির সমর্থক ছিলেন তিনি, আয়ারল্যাণ্ড বিষয়ক চিফ সেক্রেটারিও হয়েছিলেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত ভারত সচিবের পদে ছিলেন মর্লে। উদারনীতির সমর্থক মর্লে ভারতসচিব হওয়ার পর ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করেন। এ নিয়ে গোপালকৃষ্ণ

গোখলের মতো মডারেট নেতার সঙ্গে তিনি আলোচনাও করেন। মর্লের ধারণা ছিল, ভারতীয়দের কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেওয়া যাবে। মর্লের প্রস্তাব ছিল, যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় জনসংখ্যার অনুপাতে আসন পাবে। কিন্তু মিন্টো বা ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ আধিকারিকরা মর্লের এই সংস্কার নীতি মেনে নেননি। বরং, এতে তাঁরা ক্ষুব্ধই হয়েছিলেন। মর্লের এই সংস্কার নীতির বিরোধিতায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন মিন্টো। তিনি সব প্রদেশের গভর্নরদের সঙ্গে নিয়ে যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থারও বিরোধিতা করেন। পাশাপাশি মুসলিমদের ঢালাও প্রতিশ্রুতি বিলি করেন। মিন্টোর প্ররোচনায় দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী আমির আলির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মর্লের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ক্রমে দেখা গেল মর্লে, মিন্টো এবং ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ আধিকারিকদের সমস্ত দাবিই মেনে নিচ্ছেন। উদারনৈতিক সংস্কারপন্থী মর্লেকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। বরং দেখা গেল মুসলিমরা তাদের দাবির থেকেও অনেক বেশি পেয়ে গেল।

নিবেদিতা কিন্তু মর্লের সম্পর্কে প্রথম থেকেই সন্দিগ্ধ ছিলেন। মুখে যতই সংস্কারের কথা বলুন, মর্লে আদৌ ভারতের পক্ষে কোনো উপকারে আসবেন কিনা তা নিয়েই নিবেদিতার সন্দেহ ছিল। নিবেদিতা মনে করতেন, মর্লে আসলে ভড়ং-এ বিশ্বাসী। নিজেকে উদারনৈতিক দেখানোটা আসলে তাঁর মুখোশ। মিন্টো দমন-পীড়নে বিশ্বাসী হলেও, মর্লের থেকেও মিন্টো অনেক বোধগম্য চরিত্র ছিলেন নিবেদিতার কাছে। মর্লে ভারত সচিবের দায়িত্ব নেবেন স্থির হওয়ার পর জোসেফিন ম্যাকলিয়ড তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা ১৯০৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছিলেন, 'I was much excited at first about your seeing John Morley. Then I remembered how someone had told me that in matters Indian he is utterly reactionary— and would make as bad a Secretary of State as Ld. George Hamilton— or even worse. But I never heard that he was open to conviction. Yet I think I could love him if I knew him for his great work on the Encyclopedites and for his discipleship of the great soul that has gone. As a young man, at least, his must have been an austere and truth seeking mind.' চিঠিটি পড়েই বোঝা যাচ্ছে মর্লে ভারত সচিবের দায়িত্ব গ্রহণের আগে থেকেই নিবেদিতা তাঁর সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ। শুধু তা-ই নয়, তরুণ বয়সের আদর্শনিষ্ঠা আর মর্লের ভিতর নেই—

এমন ধারণাও নিবেদিতা করছেন। মর্লের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারকে কার্যত ভাঁওতাই মনে করতেন নিবেদিতা।

গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় মর্লে সম্পর্কে কয়েকটি লেখা ছদ্মনামে অথবা অস্বাক্ষরিতভাবে নিবেদিতাই লিখেছিলেন। এইরকম তেরোটি লেখার কথা উল্লেখ করেছেন শঙ্করীপ্রসাদবাবু। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর উল্লেখ করা এই লেখাগুলি হল, 'Lala Lajpat Rai Simply Becomes non est. (June 1907. Ed. note), Repression and liberalism (June 1907. Ed note), The Present Situation (June 1908, Unsigned article), Lord Morleys Reform Speech (January 1909, unsigned article), Mussalman Representation (March 1909, Ed note), The Indian Debate in the House of Lords (April 1909. 'By an English Sojourner in England'), Morley Scheme and the Situation (April 1909. Ed note.) Personal or One-man Rule (May 1909. Ed note), Lord Morley's Mixture (May 1909. Ed. note) Macaulay versus Sinha (May 1909. Unsigned article) The Swadeshi and Boycott Movement (Aug 1909, Unsigned article), A Justification of Excessive Moslem Representation (July 1910. Ed note), S.P. Sinha's Resignation (Sept. 1910. Ed note).

১৯০৭ সালে লাজপত রাইকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসন দণ্ড দেওয়ার বিরোধিতা করেন নিবেদিতা। এখানে উল্লেখিত প্রথম দুটি লেখায় এই বিরোধিতা প্রকাশ করে তিনি মর্লের সমালোচনা করেন। শঙ্করীপ্রসাদবাবু নিবেদিতার লেখার যে অনুবাদ করেছেন তার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করছি, 'বিচিত্র ব্যাপার, মর্লের মাপের বৃটিশ রাজনীতিকও বুঝতে অসমর্থ যে, দমননীতি অশান্তির নিরাময় ঘটায় না। তার নিরাময় ঘটে অশান্তির কারণ দূরীকরণে। ইন্ডিয়া অফিস মর্লের উদারনৈতিক খ্যাতির সুনিশ্চিত সমাধি ভবন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা অনেক দিনই এই আশা ছেড়ে দিয়েছি যে, ভারতের জন্য তিনি যোগ্য কিছু করবেন। অবশ্যই তিনি তা করবেন না, যদি না আমরা তাঁকে বাধ্য করতে পারি, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা একথা কদাপি ভাবিনি যে, তিনি ভারতীয় প্রশাসনকে রুশ-জারতন্ত্রী করে তুলবেন।'

মর্লের সমালোচনা করে নিবেদিতা আরো লিখছেন, 'কমনস সভায় লালা লাজপত রায়ের নির্বাসন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে মিঃ মর্লে স্বৈরাচারী শাসকের

পুরাতন ছুতোর মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করে বলেছেন— পার্লামেন্টে এই বিষয়ে কোনো আলোচনা বা এক্ষেত্রে কোনো মতভেদ প্রশাসন-কর্তৃত্বকে দুর্বল করে ফেলবে। অহো রেগুলেশন, যার বলে লালা লাজপত রায়কে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে— অবিলম্বে তা বাতিল করার জন্য কিছু সদস্য দাবি করলে মিঃ মর্লে বলেছেন— ভারত সরকারকে সে-দেশীয় বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো আইনের অস্ত্র থেকে বঞ্চিত না করতে তাঁর সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কেননা 'সেখানে বজ্জাতির পরিমাণ সুবিপুল।' এখন আমরা উদারনৈতিকতার অর্থ বুঝলাম। লিবারাল মানে বড় মাপের টোরি। ...লর্ড মিন্টো একটি অর্ডিনান্স জারি করেছেন, যার সাহায্যে প্রাদেশিক সরকারগুলি নির্ধারিত স্থানে সভাসমিতি করার অধিকার জনসাধারণের কাছ থেকে কেড়ে নেবার অধিকার পেয়েছে। ভালই। মুখোশ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা বৃটিশ শাসনকে তার নিজস্ব রঙে ও আকারে দেখতে পেলাম।'

প্রাথমিকভাবে নিবেদিতা মর্লের সংস্কারনীতিকে কৌশলগত কারণে সমর্থন করার কথা বলেছিলেন। যদিও রাজনৈতিকভাবে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ চরমপন্থীরা মর্লের এই নীতিকে সমর্থন করতে আদৌ রাজি ছিলেন না। নিবেদিতা চেয়েছিলেন মর্লের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে ভারতবিদ্বেষী ব্রিটিশ আমলাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে। ১৯০৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখছেন, 'I wanted the Indian party to declare warmly about the New Scheme. I always doubted the possibility of carrying it out, in the teeth of Ao. — in [Anglo-Indian] opposition— and I thought and still think our wisest and finest attitude would have been one of appreciation and willingness to aid. This would have shown up the opposition to it, in its true light, and have given Morley some valid support. A grudging spirit is no good in politcs, I feel sure, any more than anywhere alse.'

নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, নিবেদিতা কখনোই রক্ষণশীল রাজনৈতিক মনোভাব নিয়ে চলতে চাইতেন না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই কৌশলগত কারণে নরম মনোভাবও প্রকাশ করতেন। এক্ষেত্রে নিবেদিতার ভাবনা একেবারেই ঠিক ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ আমলাদের ভারতবিদ্বেষী চেহারাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। শুধু তা-ই নয়, মর্লে যে এই আমলাদের বিরোধিতার মুখে অনমনীয় থাকার মতো ব্যক্তিত্ব নন, তা-ও প্রমাণ হয়ে গেল।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখছেন, ১৯০৮-এ লেখা The present situation প্রবন্ধে নিবেদিতা মর্লেকে কার্যত ব্যঙ্গ করে লিখলেন, 'অবশ্য আমাদের বর্তমান ভারতসচিব— দি অনারেবল ভাইকাউন্ট মর্লে অব ব্ল্যাকবার্ন—যিনি একদা 'সাধু জন' নামে পরিচিত ছিলেন—তিনি অবশ্যই ভারতে ইংলণ্ডের রাজ্যশাসনের ব্যর্থতার কারণ সন্ধানে প্রয়াসী হবেন না, কিংবা তার প্রতিকারের যথার্থ চেষ্টাও করবেন না। তাঁর কাছে যদি ভারতে বৃটিশ শাসন ব্যর্থকাণ্ড হয় তবু তা সেটলড্ ফ্যাক্ট।' ওই নিবন্ধেই মর্লের মনোভাব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'ওঁরা জার্মানীর লৌহ-রাজকুমার বিসমার্কের মতোই বিশ্বাস করেন, রাজনীতির সঙ্গে অনুভূতির কোনো সম্পর্ক নেই। ওঁরা বিশ্বাস করেন, ভারতের সঙ্গে ওঁদের সম্পর্ক নিছক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণের জন্য তা স্থাপিত, কিংবা সেমুর কী যা বলতে পারেন— 'ভারতে লুণ্ঠনের জন্য' কৃত।'

শঙ্করীপ্রসাদবাবু দেখিয়েছেন ১৯০৯-এ Lord Morleys Reform Speech নিবন্ধে নিবেদিতা দেখালেন এই সংস্কার নীতি থেকে কী পাওয়া যাবে আর কী যাবে না। কী পাওয়া যাবে না—সেদিকেই দেখা গেল পাল্লা ভারি। এই নিবন্ধে কার্জনের অন্যায় শিক্ষানীতি, বিনাবিচারে কারাদণ্ড ও নির্বাসন, সরকারি দমন-পীড়ন, বঙ্গভঙ্গ এসব উল্লেখ করে মর্লের সংস্কার নীতির সীমাবদ্ধতা দেখালেন। মর্লের প্রস্তাবমতো যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থাকে বানচাল করতে ব্রিটিশ আমলাদের প্ররোচনায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর নেতারা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে নেমে পড়েছিলেন। তাঁদের দাবি সীমা ছাড়িয়েছিল। মুসলমান নেতাদের এই অযৌক্তিক দাবির সমালোচনায় 'Mussalman Representation' নিবন্ধে নিবেদিতা লিখছেন, 'কোনো কোনো মুসলমান নেতা ও তাঁদের অনুগামীরা পৃথক মুসলমান প্রতিনিধিত্ব চান।... তার অর্থ, তাঁরা মুসলমান ভারত ও অমুসলমান ভারত—এই দুই ভারত চান--যা আরওঙ্গজীব পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবেননি।' মুসলমান নেতাদের সম্পর্কে নিবেদিতা লিখলেন, 'ওঁরা 'ভেদ ঘটাও—শাসন করো' নীতির প্রয়োগকর্তাদের হাতের যন্ত্র হতে সদাপ্রস্তুত।'

১৯০৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের ওপর আলোচনা শুনতে গিয়েছিলেন নিবেদিতা। ওই সভায় কার্জন এবং মর্লে দুজনেই ভাষণ দেন। কার্জনের সঙ্গে উদারনৈতিক মর্লেকে হাত মেলাতে দেখে বিস্মিতও হন নিবেদিতা। ১৯০৯-এর ৫ মার্চ র‍্যাটক্লিফকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'In what sense has Morley succumbed? I thought the debate against Curzon was the other way— and was

astonished—mutual compliments— and firmness. I see that I ought to read Decentralisation which I imagine. I cannot follow!'

সংসদের এই আলোচনা সভা নিয়ে 'The Indian Debate in the House of Lords' শীর্ষক নিবন্ধটি লেখেন নিবেদিতা। গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে 'ভয়ঙ্কর একটি লেখা— এমন খোলাখুলি আক্রমণ এই কাগজে অল্পই বেরিয়েছে।' কার্জন এবং মর্লেকে ব্যঙ্গ করে লিখলেন, 'লর্ড মর্লে এবং লর্ড কার্জনের বক্তৃতার সর্বাধিক দীপ্ত অংশ সেইগুলি যেখানে তাঁরা পরস্পরকে উচ্চ ও বিস্তারিত প্রশস্তিবাক্য শুনিয়েছেন।' সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতাদের কাছে মর্লের আত্মসমর্পণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'মুসলমানদের যেসব সুবিধা দেওয়া হয়েছে সেগুলি তাদের অজ্ঞতা, অন্ধ গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের হাতের পুতুল হওয়ার পুরস্কার।... লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যে-কোনো সংখ্যায় মুসলমান নেওয়া হোক, ব্যক্তিগতভাবে আমাদের তাতে কোনোই আপত্তি নাই, কিন্তু বজ্জাতির মূল রয়ে গেছে একটি ক্ষেত্রে—মুসলমানরা তাঁদের দেশের শত্রুর হাতে খেলেছেন— সেই শত্রুরা দাবি প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে।... ভারতসচিব মুসলমানদের আন্দোলনের কাছে সত্যই নতিস্বীকার করেছেন একথা ঠিক নয়—তিনি নতিস্বীকার করেছেন টোরী প্রেস ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের কাছে, যারা প্রতিনিধিত্ব প্রশ্নটিকে ব্যবহার করেছে... মুসলমান ও হিন্দুদের সামাজিক শত্রুতাকে বাড়িয়ে তুলতে।'

আর কার্জন সম্পর্কে নিবেদিতা কী লিখলেন? কার্জনকে বরাবরই অত্যাচারী, দাম্ভিক, সাম্রাজ্যবাদী মনে করতেন নিবেদিতা। নিবেদিতার চোখে কার্জন ছিলেন এক ঘৃণিত ব্যক্তি। কার্জন সম্পর্কে সমালোচনায় তিনি বরাবরই কঠোরতম শব্দ ব্যবহার করতেন। নিবেদিতা লিখলেন, 'ইংরাজগণের পৃথিবীশাসনের সামর্থ্য-বিষয়ে এক দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যক্তির নাম লর্ড কার্জন—যিনি ঈশ্বরের জগতে শ্বেত মনুষ্যগণের বিরাট জীবনোদ্দেশ্য সম্বন্ধেও অনুরূপভাবে বিশ্বাসী। হাড়ে-হাড়ে টোরী তিনি, এক নম্বর স্বৈরাচারী। গণতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস নেই এবং মনুষ্য বা জাতির স্বায়ত্তশাসনের নিজস্ব অধিকার নামক 'জাহান্নমের' ধারণার প্রতি কোনো সম্ভ্রম নেই।'

ব্রিটিশ সংসদে বিতর্কে অংশ নিয়ে মর্লের প্রস্তাবের বিপক্ষে বলতে গিয়ে কার্জন বলেছিলেন, 'জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারে ভারতের অগণিত মানুষের কোনোই প্রয়োজন নেই, তাদের প্রয়োজন উত্তম সরকার, এবং... উত্তম সরকার বলতে তারা ইংরাজ সরকারকেই বোঝে। তাদের প্রাণের ধন সেই সরকার যা তাদের লুব্ধ মহাজন ও জমিদারের হাত থেকে রক্ষা করবে, রক্ষা করবে স্থানীয় উকিল ও অন্যান্য মানবদেহী হাঙরদের মুখ থেকে। এই সুখহীন মানুষগুলি মহাজন-জমিদার-

উকিলদের হাতে অসহায় শিকার।' কার্জনের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে নিবেদিতা লিখলেন, 'শেষ বাক্যটিকে পুরো সত্য করবার জন্য ওঁর (কার্জনের) তালিকায় যোগ করা উচিত ছিল—অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ট্যাক্স কালেক্টর, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান চা মালিক এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভাগ্যান্বেষী—যাদের হাত থেকে ভারতীয় জনগণকে রক্ষা করা অবশ্যই দরকার।...এইসকল (অ্যাংলো ইন্ডিয়ান) লোকগুলির তুলনায় লুব্ধ মহাজন বা জমিদার এবং স্থানীয় উকিল কিছুই নয়। কেননা অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা চাতুর্য কৌশলে বহুগুণে অধিক সমৃদ্ধ; তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে প্রচণ্ড শক্তিশালী এক সাম্রাজ্য ও বিরাট এক সভ্যতা; তাদের আয়ত্তে রয়েছে এমন হননের অস্ত্র যা সামান্য সংখ্যাতেও লর্ড বাহাদুরের বক্তৃতায় উল্লিখিত ভারতীয় শ্রেণীগুলির হাতে নেই। হতভাগ্য কুলিদের, বিশেষত চা-বাগানের কুলিদের, হৃদয়বিদারক অবস্থা, রায়তদের অসম্ভব নিষ্পেষক দারিদ্র্য, সরকার কর্তৃক রেলপথে, পূর্তবিভাগে, কলকারখানায় ও অফিসে নিযুক্ত শ্রমিকগণের যৎসামান্য বেতন ও নিদারুণ ঘর্মাক্ত পরিশ্রম যে কাহিনির রচনা করছে, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে—'নরদেহী হাঙর'দের কবল থেকে ভারতীয় জনগণের বৃহৎ অংশকে 'আমরাই কেবল রক্ষা করছি বা করতে পারি।—ভারতের ইংরাজ প্রশাসকদের এই বড়াই কতখানি সমর্থনযোগ্য।'

নিবেদিতা লিখলেন, 'আমার মনে হয় 'নরদেহী হাঙরে'র সংজ্ঞা ও বর্ণনা যদি আমরা লন্ডনের বেকারদের কাছ থেকে এবং তাদের পক্ষ সমর্থক পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্যদের কাছ থেকে লাভ করতে পারি, সেটা বড়োই মনোহারী দাঁড়ায়।...দুর্ভাগ্যবশত আমরা ভারতীয় হাঙরদের সঙ্গে তাদের ইংরেজ প্রতিরূপদের দেহ-মনোগত মস্ত কিছু পার্থক্য দর্শন করতে সমর্থ নই।...অনেক ইংরাজ লর্ড মহাশয় ও জমিদার এই ধারণা করে বসে আছেন — এই পৃথিবীর হতভাগ্য মৎস্যকুল কেবল হাঙরদের জন্য দেহ ধারণ করবে— তাই তো স্বাভাবিক ও বিধিসঙ্গত।'

মর্লের সংস্কার প্রস্তাব যে আদপে সোনার পাথরবাটি, সেটিই বারবার বোঝাতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৯-এর ৩ নভেম্বর র‍্যাটক্লিফকে লিখছেন,

'From yesterday, they say, the Indian people began to have a Vote—that is to say—the voting-list began to be prepared. But no one knows who will be empowered to Vote— on what basis— only it is known that the property qualification for the Mohammedan is about ¼ of that for the Hindu. So a Hindu employer will sometimes have clerks voting while he himself remains

disfranchised. It is not even known whether the sceret ballot will be allowed!!! But gratitude had to be expressed, months ago, for a reform that touches only those who own the value of H 20,000 and M 5,000 rupees.'

'Have you realised that it works out like this? That set 2 or 3 deputed Englishmen to rule an Empire, and it will work out like this, or in a Boer War?'

নিবেদিতা বরাবরই মনে করেছেন, একমাত্র স্বাধীন সরকারই 'উত্তম সরকার' হতে পারে, যে কারণে মর্লে যতই সংস্কারের কথা বলুন না কেন, তা যে কখনো 'উত্তম সরকার'-এর জন্ম দিতে পারবে না তা জানতেন নিবেদিতা। ১৯০৯ সালে Personal or One-man Rule-এ তিনি লিখেছিলেন, 'উত্তম সরকার কদাপি স্বাধীন সরকারের বিকল্প হতে পারে না। ঠিকভাবে বলতে গেলে—যে সরকার স্বাধীন নয় সে কখনো উত্তম সরকার হতে পারে না।' ১৯০৮ সালে লেখা 'The Present Situation' নিবন্ধেও নিবেদিতা বলেছিলেন 'ভারতের এই অপশাসনের একমাত্র প্রতিকার স্বরাজ বা হোমরুল।' স্বাধীনতার প্রশ্নে নিবেদিতা যে কখনোই কোনো আপসে বিশ্বাসী ছিলেন না, তা তাঁর এই লেখাগুলিতে শুধু নয়, এর আগের এবং পরের বহু লেখা এবং বক্তব্যেও প্রমাণিত। যে কারণে স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলনকে অকুণ্ঠ সমর্থনও জানিয়েছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন স্বদেশী এবং বয়কট দেশে গভীরভাবে শিকড় বিস্তার করুক। ১৯০৯-এ 'The Swadeshi and Boycott Movement' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'Let the prayer go out of the heart of every patriotic Indian that success be to the cause of Swadeshi in India, that the Motherland again rise in prosperity and with the esteem and respect of other nations by the skill of her manufacturing sons and daughters. May Swadeshi and Boycott take such a firm root in the land of the holy rishis and sages, whose productions both material and spiritual will excite the admiration of all peoplé of the world, that nothing may be able to uproot them. God of all nations, give strength to the people of India to carry on with vigour the campaign of Swadeshi and Boycott till all their efforts be crowned with success and the formation of a United Indian Nation.'

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ-র নিয়োগের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়েও নিবেদিতা মিন্টো-মর্লের প্রশাসনকে আক্রমণ করেছেন। ভাইসরয় কাউন্সিলে প্রথম ভারতীয় আইন সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। কিন্তু সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের এই নিয়োগকে ভারতে অবস্থিত ইংরেজ আমলা এবং ইংলন্ডের রক্ষণশীল মহল মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের নিয়োগকে বাধা দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তাঁরা ভারত সরকারের প্রথম আইন সদস্য মেকলের সঙ্গে সত্যেন্দ্রপ্রসাদের তুলনা করে সত্যেন্দ্রপ্রসাদকে হেয় করবার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন বারবার। এই পর্বে নিবেদিতা বরাবরই সত্যেন্দ্রপ্রসাদের পক্ষে ছিলেন। এবং সত্যেন্দ্রপ্রসাদের সমর্থনে কলমও ধরেছিলেন। 'Macaulay Versus Sinha' (১৯০৯) এবং 'S.P. Sinha's Resignation' (১৯১০) এই দুটি লেখায় সত্যেন্দ্রপ্রসাদের পক্ষে সরব হয়েছিলেন নিবেদিতা। যে মেকলেকে ব্রিটিশ আমলা এবং রক্ষণশীলরা বড় করে দেখাতে চেয়েছিলেন, সেই মেকলে সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখলেন, 'ভারত সরকারের প্রথম ল' মেম্বার মেকলে ছিলেন এক দুস্থ ভাগ্যান্বেষী—উনি এই দেশে এসেছিলেন 'প্যাগোডা গাছ' নাড়া দিয়ে, এদেশের সন্তানদের খরচে বড়লোক হতে, অথচ দেশীয় মানুষদের প্রাণভরে গালাগালি দিতে ওঁর বিবেকে বাধেনি।'

মেকলে সম্পর্কে এই মন্তব্য করার পিছনে রয়েছে মেকলেরই একটি চিঠি। ওই চিঠি মেকলে তাঁর বোনকে লিখেছিলেন। ওই চিঠিতে মেকলে লিখেছিলেন, উনি লিখে কখনো বছরে দুশো পাউন্ডের বেশি রোজগার করতে পারেননি; অথচ বছরে ওঁর দরকার পাঁচশো পাউন্ড। এইরকম অবস্থায় ভাগ্য অন্বেষণে মেকলে ভারতে আইন সদস্যের পদ নিয়ে এলেন, বছরে দশ হাজার পাউন্ড বেতনে। মেকলে বোনকে লেখেন, 'বছরে পাঁচশো পাউন্ড খরচ করে ভারতে রাজার হালে থাকতে পারব। বাকি মাইনে সুদসহ জমাতে পারব। যখন মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ইংলন্ডে ফিরব তখন দেহে-মনে পুরো শক্তি, তৎসহ ৩০ হাজার পাউন্ডের ঐশ্বর্য।' মেকলের এই চিঠিটি নিবেদিতা তাঁর নিবন্ধে তুলে ধরেন এবং দেখিয়ে দেন মেকলে আসলে অযোগ্য, অর্থলোভী একজন ব্যক্তি-মাত্র। নিবেদিতা এ-ও দেখিয়ে দেন যে, ভারতীয় রীতি-নীতি, জীবনযাত্রা সম্পর্কে মেকলে ছিলেন একেবারেই অনভিজ্ঞ অথচ আইন সদস্য হিসাবে ওই সকল বিষয়গুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যিক ছিল। মেকলের নিয়োগ যে কতটা অনৈতিক হয়েছে তা-ও দেখিয়ে দেন নিবেদিতা। মেকলের সমালোচনা করে নিবেদিতা লেখেন, 'এদেশের বর্তমান বিক্ষোভের উৎপত্তিতে মেকলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দান প্রচুর। যে কোনো ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে চূড়ান্ত

ঘৃণা তিনি পোষণ করেছেন। তাঁর শিক্ষা প্রস্তাব এমনভাবে লিখিত হয়েছে, যা ভারতীয়দের অনুভূতির উপর প্রচণ্ড অত্যাচার। এই সুবৃহৎ উপমহাদেশের কোনো ভাষার বিষয়েই যাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না, যিনি প্রাচীন ভারতের সাহিত্যের বিষয়ে জানবার কোনো ইচ্ছাই বোধ করেননি—সেই তিনি ঐ সকলের সম্বন্ধে ঘৃণাপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানাবার মতো ঔদ্ধত্য দেখালেন!!! যেভাবে তিনি উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়ের সুখে বাঙালিদের কুৎসা করেছেন— বাংলার মানুষ তা কদাপি ভুলতে পারেনি। যদি মেকলের ঐসব গালাগালির কথাগুলি প্রতিটি বাঙালির বুকে বিঁধে গিয়ে মেকলের শ্রেণিভুক্ত মানুষদের সম্বন্ধে বাঙালিদের হতশ্রদ্ধ করে ফেলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।' মেকলের এই সমালোচনা করার পাশাপাশি সত্যেন্দ্রপ্রসাদের ভূয়সী প্রশংসা করে নিবেদিতা লিখলেন, '(এস পি সিংহ) বৎসরে তিন লক্ষ টাকারও বেশি আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে ঐ পদ নিয়েছেন, যে অর্থ পরিমাণ ভাইসরয়ের মাহিনার চেয়েও বেশি।' কিন্তু ইংরেজ আমলারা যে সত্যেন্দ্রপ্রসাদকে কখনোই কাজ করতে দেবেন না, এ বিষয়েও নিবেদিতা নিঃসংশয় ছিলেন। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'এখন যেহেতু একজন ভারতীয় ভদ্রলোক আইন-সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন, এক্ষেত্রে তাঁকে শাসন পরিষদের অধিবেশন ও আলোচনা থেকে কৌশলে বাদ দিতে পারা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক কাজ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ব্যুরোক্র্যাটদের কাছে আর কিছু থাকতে পারে না।'

নিবেদিতার এই আশঙ্কা কিছু অমূলক ছিল না। ব্রিটিশ আমলারা সত্যেন্দ্রপ্রসাদের কাজে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁকে না জানিয়েই নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছিল। এমতাবস্থায় সত্যেন্দ্রপ্রসাদ ভাইসরয় কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯১০-এর ৬ জুলাই নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন, 'P.C.[S.P] Sinha is going to resign. Of course this is a very VERY confidential. He finds that he is not in their secrets, after all. Things are done over his head, and without reference to him, and he is socially isolated. He is cut off from his own people, being at Simla and they have nothing to do with him.'

ওই বছরই ১০ আগস্ট নিবেদিতা আবার র‍্যাটক্লিফকে লিখলেন, 'You speak of the way in which Government has been modified by the Reform sch. Say rather the way in which it might seem to have been modified or theoritically modified. Personally, I don't believe it has been altered in the least. Fortunately, I have given you all the news

I have heard from time to time — and you know that SPS [S.P. Sinha] (I believe I called him 'PCS' once!) find himself left out of things. Any strong committee can easily do this, and reduce a single number to impotence, by unscrupulous use of its social inter-relations. How much worse it will be when SPS has resigned and ASHU is in his place.'

ব্রিটিশ আমলাদের বিরোধিতায় ক্ষুব্ধ সত্যেন্দ্রপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত পদত্যাগই করেন। সত্যেন্দ্রপ্রসাদের পদত্যাগের পর ব্রিটিশ শাসকদের তোষামোদকারী কিছু সংবাদপত্র কটাক্ষ করে বলেছিল, আর্থিক কারণেই সত্যেন্দ্রপ্রসাদ পদত্যাগ করেছেন। এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে ১৯১০-এর সেপ্টেম্বরে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় নিবেদিতা লিখলেন, 'এইসকল উচ্চভাবসম্পন্ন সাংবাদিকদের মাথায় কি এটা আসেনি যে, পূর্বোক্ত (ইংরাজ) ক্যাবিনেট মিনিস্টারদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের এক দশমাংশের অধিকারী মিঃ এস পি সিনহা ছিলেন না? আমাদের তো মনে হয়, কোনো ব্যক্তি তামাশার জন্য রাজকীয় আয় ত্যাগ করতে বাধ্য নন, কেননা তা করার মধ্যে কোনো গুণের পরিচয় নেই।' এই নিবন্ধেই নিবেদিতা লিখলেন, 'In spite of an 'authoritative' contradiction, most people seem still inclined to think that there may be something in the allegation of the correspondent of the Manchester Guardian that Mr. Sinha has been obliged to recognise that he can not expect to enter the inner circle of the Executive Council of the Government of India.

'Our own guess is that Mr. S.P. Sinha has been obliged to recognise that his usefulness to this country in his present position has not been and cannot under present circumstances be at all commensurate with to the sacrifice he has made. It may also be that for some reason or other he feels like a fish out of water. We are not thought-readers, nor are we in the confidence of Mr. Sinha; but when a guessing competition is on, why should we have not our chance.' সত্যেন্দ্রপ্রসাদের পদত্যাগের পিছনে আসল কারণটি এইভাবেই সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। ব্রিটিশ আমলাদের ঘৃণ্য এবং সংকীর্ণ রাজনীতিটিও এইভাবে প্রকাশ্য করে দিয়েছিলেন তিনি। নিবেদিতার এই লেখাটি পড়ে আরো একটি বিষয়ও বেশ পরিষ্কার হচ্ছে: তা হল, ব্যক্তিগতভাবে তিনি

সত্যেন্দ্রপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ না হলেও ব্রিটিশ আমলাদের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন। একজন ভারতীয়ের প্রতি ব্রিটিশ আমলাদের এই হীন মনোভাব নিবেদিতা মেনে নেননি। নিবেদিতার এই লেখাপত্র পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না, অরবিন্দ এবং বিপ্লববাদে বিশ্বাসী অন্যান্যদের সঙ্গে নানাবিধ আলোচনা এবং পরিকল্পনার ভিতরই নিবেদিতা সীমাবদ্ধ ছিলেন না। বরং, ভারতে ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে নিবেদিতার বিদ্রোহ আরো নানাভাবে ফুটে বেরিয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিয়মিত পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে ব্রিটিশ অপশাসনের চরিত্রটি উদ্ঘাটন করা। 'মডার্ন রিভিউ'য়ে প্রকাশিত লেখাগুলিতে দেখা যাচ্ছে, বিদেশে অবস্থান কালেও ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে তিনি কলম বন্ধ করেননি। বরং, তখনও লেখালেখির মাধ্যমে নিজের প্রতিবাদ জারি রেখেছেন।

তবে, মর্লের সংস্কার কর্মসূচিকে অন্তঃসারশূন্য মনে করলেও, বা মর্লের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হলেও, ১৯১০-এ ব্রিটেনের নির্বাচনে মর্লের জয়ই চেয়েছিলেন নিবেদিতা। কারণ, মর্লে ছিলেন লিবারাল। নিবেদিতা মনে করেছিলেন, কনজারভেটিভরা ক্ষমতায় এলে দমন-পীড়ন আরো বাড়বে। ১৯১০-এর ২০ জানুয়ারি র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'We may pray for the return of the Liberals, for the fall of Morley will be the signal for wholesale deportations.' তবে, নিবেদিতার এরকম একটি ধারণার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ কিন্তু পাওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে, নিবেদিতা যে সময়ে এই কথা বলেছেন তখন লিবারালদের শাসনে ভারতে দমন-পীড়ন চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল। মনে হয়, ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের মানসিকভাবে বিরোধী নিবেদিতার এক্ষেত্রে 'দুই খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভালো'-কে বেছে নেওয়ার একটা মানসিকতা কাজ করেছিল।

কার্জন এবং মিন্টো ছাড়াও আরো এক ভাইসরয়কে নিবেদিতা পেয়েছিলেন। তিনি চার্লস হার্ডিঞ্জ। তবে, হার্ডিঞ্জকে বেশিদিন পাননি নিবেদিতা। হার্ডিঞ্জ ভাইসরয়ের দায়িত্বগ্রহণ করার পর খুব বেশি দিন বাঁচেননি নিবেদিতা। হার্ডিঞ্জ ছিলেন কনজারভেটিভ। ভারতে ভাইসরয় হয়ে আসার আগে তিনি রাশিয়ায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে আন্ডার সেক্রেটারির মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এসেছিলেন। তবে, লর্ড মিন্টোর পর লর্ড কিচনারের ভাইসরয় হয়ে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিচনার ভাইসরয় হয়ে আসতে পারেন শুনে আশঙ্কিত হয়েছিলেন নিবেদিতা। কারণ, কিচনার ছিলেন উগ্র এবং কঠোর রাজপুরুষ। তিনি ভাইসরয়ের দায়িত্ব নিয়ে এলে অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়বে বলেই মনে

করেছিলেন নিবেদিতা। তবে, শেষপর্যন্ত কিচনার ভাইসরয় না হওয়ায় স্বস্তি পেয়েছিলেন নিবেদিতা। ১৯১০-এর ৬ জুলাই বোন মেরি উইলসনকে নিবেদিতা লিখছেন, 'I am glad Kitchener is not to be the next Viceroy. X (Christine) used to say she would give him a fort-night to live if he came!'

কিন্তু হার্ডিঞ্জ সম্পর্কেও নিবেদিতা প্রাথমিকভাবে আশঙ্কিতই ছিলেন। কারণ, হার্ডিঞ্জ ছিলেন কনজারভেটিভ। নিবেদিতার ধারণা হয়েছিল যে, হার্ডিঞ্জ দমন-পীড়ন বাড়িয়ে দেবেন এবং হার্ডিঞ্জের আমলে পুলিশের গোয়েন্দাগিরি আরো বাড়বে। ১৯১০-এর ১৯-২০ জুলাই র‍্যাটক্লিফকে লিখছেন নিবেদিতা, 'Hardinge's face in the papers looks like that of a man who would increase all this. What an iron-set, couch and four physiognomy! He is sure to use it against the people instead of the officials.'

১৯১০-এর ২৪ অক্টোবর শ্রীমতী র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখছেন, 'I read an article by Max lately that just shows what will happen under Hardinge! The Civil Service will ride rampant! Minto— with all the catastrophy that have happened under him—has been an angel.'

গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, 'লেডি মিন্টোর সঙ্গে পরিচয়ের সুফল দেখে নিবেদিতা সম্ভাব্য বিপদের প্রতিরোধে হার্ডিঞ্জের সঙ্গে আলাপের কথাও ভেবেছিলেন।' তবে, শেষ পর্যন্ত সেই আলাপ অবশ্য হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার্ডিঞ্জ সম্পর্কে নিবেদিতার ধারণার বদল হয়েছিল। নিবেদিতা লক্ষ করেছিলেন, তাঁর দেখা আগের দুই ভাইসরয় কার্জন এবং মিন্টোর থেকে হার্ডিঞ্জের মূলগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। বরং, তিনি হার্ডিঞ্জ সম্পর্কে যে আশঙ্কা করেছিলেন, বাস্তবে তা ঘটছে না। হার্ডিঞ্জ শুধুই কার্জন বা মিন্টোর মতো কঠোর দমন-পীড়নের নীতি নিয়ে ভারতে পা রাখেননি। বরং, হার্ডিঞ্জ ছিলেন এমন একজন ভাইসরয় যিনি কঠোর হস্তে দুর্নীতিপরায়ণ, অসৎ আমলাদের শায়েস্তা করেছিলেন। যেসব ব্রিটিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে হার্ডিঞ্জ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তাঁদের ভিতর লেফটেন্যান্ট গভর্নর থেকে পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার রাজকর্মচারীরাও ছিলেন। হার্ডিঞ্জ যে অসৎ, দুর্নীতি পরায়ণ ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের প্রতি চোখ বুজে থাকেননি— এটাই ভালো লেগেছিল নিবেদিতার। ১৯১১-র ৬ জুলাই র‍্যাটক্লিফকে একটা চিঠিতে লিখছেন নিবেদিতা, 'Poor Hardinge! It's all very well to try to cleanse the Augean stables on your first arrival. Even

Herakles however would fail to keep such energy for 5 years running—and he is putting his hand into a hornet's nest. I much fear that corruption we have always with us, and shall continue to have.'

দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ কমিশনার হ্যালিডের কীর্তিকলাপ কীরকম এ চিঠিতে তা-ও উল্লেখ করেছেন নিবেদিতা। লিখছেন, 'The new Viceroy is a wonderful person. Reputations crumble in his hands. Baker is going— Slack trembling— Halliday gone to Shimla under arrest... A 10,000 rupee tiara of a native Jeweller was exposed for sale at Hamilton's and traced to Halliday. Looted in the recent riots!!! Discovered by Viceroy. H [alliday] only not prosecuted because poor jeweller preferred loss to a police-vendetta, and refused to identify. On top of this, Chief Justice found his house surrounded by detectives, and wired to Sec. of State. Halliday was asked to explain— and said he had many Indian visitors and might be talking sedition!!! This was too much, and he has had to go to Simla with escort of 4.'

লেফটেন্যান্ট গভর্নর বেকারের বিরুদ্ধেও হার্ডিঞ্জ কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বেকার সম্পর্কে নিবেদিতা এই চিঠিতে লিখেছেন, 'Baker is said to have drunk freely and behaved too amorously to the Mahar [ani] of Burdwan at a State dance. If so, it's just like that cad to report, instead of fighting a duel! Ugh, I hate a man who doesn't know when to commit murder. Besides this, it is whispered that he also shared loot.'

এই ব্রিটিশ রাজপুরুষদের অপরিসীম দুর্নীতি সম্পর্কে নিবেদিতা এর অনেক আগে থেকেই সরব ছিলেন। ১৯১০ সালের ১ সেপ্টেম্বর র‍্যাটক্লিফকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'You can have no idea of the amount of corruption which goes doubtless by the name of commissions percentages and so on, amongst people known to yourself! It used to be difficult to imagine the bribe taker; I find myself tempted now to count up the honest!'

ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা কতখানি দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন সে সম্পর্কে আরো বহু তথ্য জানা যায় নিবেদিতার বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে। মুরারিপুকুর বোমার মামলায় সরকারি পক্ষের প্রধান কৌসুলি ছিলেন নর্টন। সেই নর্টন আসলে কীধরনের মানুষ ছিলেন তা উদ্ঘাটন করেছিলেন নিবেদিতা। শঙ্করীপ্রসাদ বসু এক্ষেত্রে নিবেদিতার একটি পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। শঙ্করীপ্রসাদবাবুর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী চিঠিটি ১৯০৯-এর ৩০ জানুয়ারি লেখা। যদিও নিবেদিতার চিঠিপত্রের যে সংগ্রহ শঙ্করীপ্রসাদবাবুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে ৩০ জানুয়ারি ১৯০৯-এ এরকম কোনো চিঠি দেখা যাচ্ছে না। সন্দেহ হয়, চিঠির তারিখটি শঙ্করীপ্রসাদবাবু ভুল করছেন। যে চিঠিটির তিনি উল্লেখ করছেন সেটি এই, 'তোমাকে জানাতে চাই, বলা হচ্ছে যে, নর্টন পুরো আহাম্মক, তার আইনজ্ঞান সামান্যই বা কিছুই নেই—উপস্থিত বুদ্ধিও নেই, আইন কৌশলও অনায়ত্ত। মামলা চলা-কালে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল যে, সরকারপক্ষে আসল খুঁটি (আশুতোষ) বিশ্বাস; বিশ্বাস না থাকলে মামলা ভেঙে যাবে। তাছাড়া নর্টনের পত্নীকে গর্ব করে বলতে শোনা গেছে— যদি মামলা আর মাস দুই চলে তাহলে তার একটা মোটরগাড়ি হয়ে যাবে। সুতরাং, বুঝতে পারছ, বাইরে থেকে যা দেখা যায়, ব্যাপার সর্বদা আসলে তা নয়। ইতিমধ্যে নর্টন যে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছে তা জুয়াখেলায় নষ্ট — এইরকমই শোনা যাচ্ছে।'

উচ্চপর্যায়ের রাজকর্মচারীরা কীভাবে ঘুষ নিয়ে অসৎ কাজ করতেন, তার আর-একটি বিবরণ পাই নিবেদিতার ১৯০৯ সালের ১ সেপ্টেম্বরের লেখা চিঠিতে। র‍্যাটক্লিফকে তিনি লিখছেন, 'I reopen this, to say that one piece of unwritten history is that The Aged Fox took bribes to the last. A list was drawn up for the Midnapore trial they say, which included another Rajah besides Narajole— but his name mysteriously disappeared later, and 40,000 rupees changed hands, in 5-rupee notes, to avoid tracing!!! Narajole it is said refused to come to terms and so was arrested— but threatened exposure and then was released, or at least more gently treated.'

হার্ডিঞ্জ যে সমস্ত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম স্ল্যাক। স্ল্যাক ছিলেন ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য। ১৯১১ সালের ৬ জুলাইয়ের চিঠিতে এই স্ল্যাক সম্পর্কে নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে লিখেছেন, 'There is rumoured to be an awful case re. Dumraon Raj. in which Slack

swore to adoption of infant when Maharani already dead and 2 lakhs were promised to Fraser— but only 5000 paid, and rest shared out between Slack and coadjutors.'

আর-এক জনের বিরুদ্ধেও হার্ডিঞ্জ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি লেফটেন্যান্ট গভর্নর হেয়ার। হেয়ার সম্পর্কে ১৯০৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর র‍্যাটক্লিফকে লিখছেন নিবেদিতা, 'But Hare is said to be a drunkard who livs away from his wife, and is absolutely under the thumbs of a coterie of 3 Englishmen, whose 'brothers in law' are well provided for—while all the rest of the civil Service howls.'

নিবেদিতার এই চিঠিপত্রগুলি থেকে পরিষ্কার যে, সেই সময়ে ভারতে কর্মরত ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অনেকে কী পরিমাণে দুর্নীতি এবং ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিলেন। এঁদের বিরুদ্ধে হার্ডিঞ্জ ব্যবস্থা নেওয়ায় স্বাভাবিকভাবে নিবেদিতার কাছে ধন্যবাদার্হ হয়েছিলেন তিনি। আর-একটি বড় কাজ হার্ডিঞ্জ তাঁর শাসনকালে করেছিলেন। তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড ক্রিউইয়ের মতো হার্ডিঞ্জও অনুভব করেছিলেন কার্জনের বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত ভারতে সন্ত্রাসবাদী এবং গুপ্ত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে সহায়ক হয়েছে। এই উপলব্ধির পর হার্ডিঞ্জ বাংলা ভাগ রোধ করতে উদ্যোগী হন। এবং তা রোধ করেনও। তবে, নিবেদিতা অবশ্য হার্ডিঞ্জের এই কাজ দেখে যেতে পারেননি। বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন যে নিবেদিতা, বাংলাভাগ রোধ হওয়ার আগে তাঁর প্রয়াণ হয়েছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যাবতীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে নিবেদিতার প্রবল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বরাবরই গর্জে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে তিনি ভারতবাসীকে আত্মোৎসর্গের ডাকও দিয়েছিলেন। আর এই ডাক দিতে গিয়ে ভারতকে তিনি তাঁর আপন দেশ বলেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে শুধু নয়, ভারতীয় সত্তার সঙ্গেও এইভাবে নিজেকে একান্ত করে নেওয়া, যেমন নিবেদিতা করেছিলেন--তা, অন্তত একজন বিদেশিনির পক্ষে, ছিল বিরল। নিবেদিতার সমসাময়িক বা তাঁর পূর্বে এবং পরেও, অন্য কোনো বিদেশিনি ভারতীয় সত্তার সঙ্গে নিজেকে এতটা একান্ত করে তুলতে পারেননি। ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং জাতীয় সত্তার সঙ্গে কতটা একান্ত নিবেদিতা হয়েছিলেন, তা বুঝতে পারা যায় তাঁর 'দ্য কল টু ন্যাশনালিটি' প্রবন্ধটি পড়লে। এই প্রবন্ধে নিবেদিতা লিখছেন, 'Age succeeds age in India, and ever the voice of the Mother Calls upon Her Children to worship Her will new

offerings, with renewal of their own greatness. Today She cries for the offering of Nationality. Today She asks, as a household Mother of the strong men whom she has borne and bred, that we show to Her, not gentleness and submission, but mainly strength and invincible might. Today She would that we play before Her with the sword. Today She would find Herself the Mother of a hero-clan. Today does She cry once more the She is an hungered, and only by the lives and blood of the crowned kings of men, can Her citadel be saved.'

আরো লিখছেন, 'Behold beneath the pall the stirring and struggle of the long dead. The hour trembles. The evening itself waits hushed and awestruck. Long vanished nations moan and cry in their age-old slumber. About us on every hand are heard the voices of the past— "Arise! Arise!"

'Hush! in this garden of the dead, the last long rays of sunset are about to flash up into the first of dawn. Already, the night is over. Already our mourning is accomplished. Day is at hand. A new age opens, and from the lips of the Mother Herself we hear pronounced to all Her People, the Vedic Benediction of the king :

"Let not thy kingdom fall away,
Be steady here full not away,
Be like a mountain unremoved—
stand steadfast here as Indra's self.
And hold the kingship in thy grasp."

'That the People be sovereign, that the People prevail,—this is the cry of the Nationality.'

এগারো

১৯১০-এর মাঝামাঝি সময়ে জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুর সঙ্গে হিমালয় যাত্রা করলেন নিবেদিতা। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'নিবেদিতাও হিমালয়ের ডাক শুনেছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মজীবন তখনও বসুদের সঙ্গে জড়িত, নিজের কোনও পরিকল্পনাই নাই। শেষ পর্যন্ত গ্রীষ্মের ছুটিতে পাহাড়ে যাওয়ার প্রস্তাবটি জগদীশ বসুই করলেন। মে-র প্রথমে স্ত্রী আর ভাইপোকে নিয়ে তাঁরা রওনা হবেন। হিমালয়ের মহাতীর্থ কেদারনাথ আর বদরিনাথের পথে যাবেন সবাই। ব্রাহ্ম সমাজের লোক যে হিন্দুর তীর্থে যাওয়া নিয়ে সমালোচনা করবে, তা জগদীশ বসু ভাল করেই জানতেন। কিন্তু এ-যাত্রায় তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্য আর নৃবিদ্যার উপাদান সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন। স্থির হল, নিবেদিতা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে অভিযানের আসল উদ্দেশ্যটা গোপন রাখবেন।'

লিজেল রেমঁর লেখার এই অংশের একটি বাক্য সংশয়ের জন্ম দেয়। রেমঁ লিখছেন, 'ব্রাহ্ম সমাজের লোক হিন্দুর তীর্থে যাওয়া নিয়ে সমালোচনা করবে।' তার কিছু পরেই লিখছেন, 'নিবেদিতা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে অভিযানের আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখবেন।' তাহলে আসল উদ্দেশ্য কি এটাই ছিল যে, ব্রাহ্ম জগদীশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত নিবেদিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দু তীর্থক্ষেত্রে যেতে আগ্রহী হয়েছিলেন? নিবেদিতার সংস্পর্শে ব্রাহ্ম জগদীশচন্দ্রের ধর্মভাবনায় কিছু পরিবর্তন এসেছিল কি? মনে রাখতে হবে, এর আগে ১৯০৯ সালের আগস্ট মাসে অবলা বসু নিবেদিতার সঙ্গে সারদা দেবীকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন।

১৯১০-এর মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র, অরবিন্দমোহন বসু এবং নিবেদিতা হিমালয়ের পথে রওনা দিয়েছিলেন। যাত্রাপথে প্রথমে তাঁরা

পৌঁছলেন হরিদ্বার। কনখল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্বামী কল্যাণানন্দ তাঁদের কেদার-বদরি দর্শনের ব্যবস্থা করলেন। হরিদ্বার থেকে একজন অভিজ্ঞ পাণ্ডা সঙ্গে নিলেন তাঁরা। ১৭ মে পৌঁছলেন হৃষিকেশ। সেখান থেকে কেদার-বদরির উদ্দেশে যাত্রা শুরু হল। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'তীর্থযাত্রীর দল রওনা হল। মেয়েরা পাল্কিতে, আচার্য বসু আর তাঁর ভাইপো অরবিন্দ চললেন ঘোড়ার পিঠে। পাঁচদিন পরে শ্রীনগর পৌঁছলেন সবাই। তারপরই বিপদসঙ্কুল পার্বত্য পথের চড়াই-উতরাই।... সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে সকালবেলা নিবেদিতা পায়ে হেঁটেই চলেন। তাদের মন্ত্রধ্বনিতে নিবেদিতার প্রার্থনা সহজ হয়, সুন্দর হয়। কেদারনাথের পাহাড়ে পাহাড়ে শিবস্তোত্রের সুর বেজে ওঠে। অদ্ভুত সে স্তোত্রের ধ্বনি গাম্ভীর্য। মনে হয় যেন নেহাইয়ের 'পরে হাতুড়ির ঘায়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সবলের প্রতিস্পর্ধা, উড়ে যাচ্ছে দুর্বলের ভীরুতা।'

১৯১০-এর ২৫ মে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'This journey is a real pilgrimage. We have used all kinds of shelters, and only 3 nights had duk bunglows! So you can imagine! The Boses are quite wonderful. So pleased and making the best of things, and interested in the religious life.

'But these hot river valleys are not without their dangers.

'Yesterday however we reached the pines, and though today we have dropped back into a socket amongst the hills, I am hoping that from tomorrow morning onwards, we may keep along the heights.'

নিবেদিতার এই চিঠিতেও একটি কথা লক্ষ্যণীয়। বসু দম্পতি সম্পর্কে নিবেদিতা লিখেছেন, '...and interested in religious life.' এর পরে এমন সন্দেহ জাগাই স্বাভাবিক যে, তাহলে কি সত্যিই জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসু হিন্দুধর্ম এবং তার আচার-আচরণ সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিলেন? লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'জগদীশ বসুর ভাইপো মন্ত্রমুগ্ধের মত নিবেদিতাকে চেয়ে দেখেন। কলকাতায় যে নিবেদিতাকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে এঁর কত তফাত। কোনটা তাঁর স্বরূপ? চটিতে বিশ্রামকালে কাকার সঙ্গে বিজ্ঞানালোচনা করেন, কত কূটপ্রশ্ন তোলেন। আবার বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় মগ্ন হয়ে যান দুজন। এদিকে আরামের আয়োজন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে ভাবছেন, বসুরও তদারক করছেন। কিন্তু কতক্ষণের জন্য? আসলে এসব কোন-কিছুতেই তাঁর মন নাই।'

এই কেদার-বদরি যাত্রার একটি বিস্তৃত বিবরণ নিবেদিতা দিয়েছিলেন বোন মেরি উইলসনকে। ১৯১০-এর ১২ জানুয়ারি একটি চিঠিতে তাঁকে তিনি লিখেছিলেন, '...You cannot imagine what this journey has been like. It has taken all our strength, and for the last 7 or 8 days poor Mrs. Bose has been ill...We started from a lovely little old city called Hardwar and followed the pilgrims road into the mountains. Frist we were to visit kedarnath, and that part of our journey is done. It was the hardest. Now we are again nearing the snows at Badri Narayn.

'As first we went by a road where there was no provision whatever for Europeans or people of their ideas. Night after night we spent at the caravan serais, like those of Bethlehem—and in our last such experience we were the guests of a neighbouring monastery, and so, as a very distinguished attention, a horse was turned out of his stable, to make a bathroom, for Mrs. Bose and me! But when I came an hour or two later for some extra handwashing, the horse was comfortably back again, and I am afraid I nearly cried! So you see how easily Joseph and Mary might be put into the stables when they found no room in the inn! All this part of our journey was so unthinkably primitive! But now we are on the military road to Thibet, and we have comfortable appointments at each stage.

'...The most wonderful scenary, however, all the way, and places of extraordinary historical interest--it has been well worth it all. At present we are going day after day through great purple gorges, with occasional scanty pine woods, and no other timbering. The mountains are steep and sombre, like the coast of the North of Ireland, or Cumberland. Oh it is wonderful, like some land of the Gods!'

ওই একইদিনে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, 'We are on the way to Badri Nath. The scenery is wonderful, but

the inconveniences of pilgrimage are many— and Mrs. Bose has fallen ill. Still, we go on and on, the great memory of Amarnath ever in my mind.' জোসেফিনকে লেখা এই চিঠিটি পড়লে মনে হয়, কেদার-বদরির পাহাড়ি পথে চলার সময়ে বারেবারেই নিবেদিতার মনে পড়েছিল স্বামীজির সঙ্গে অমরনাথ যাত্রার স্মৃতি। সেই স্মৃতি নিবেদিতাকে কি ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল তখন?

৩০ মে কেদারনাথ দর্শন করে, ১৩ জুন তাঁরা পৌঁছেছিলেন বদরিনাথে। বদরিনাথে মঙ্গল আরতি দর্শন করতে নিবেদিতাকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। যদিও কেদারনাথে নিবেদিতা মন্দিরে ঢুকেছিলেন। বদরিনাথে মন্দিরে ঢুকতে না পেরে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন নিবেদিতা। তবে, কোনো প্রতিবাদ এ-নিয়ে করেননি তিনি। লিজেল রেমঁ নিবেদিতার কেদারনাথ দর্শনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'একটা সোমবারে কেদারনাথে পৌঁছবার জন্য জগদীশচন্দ্র বসু আর নিবেদিতা প্রাণান্তিক চেষ্টা করেন। পৌঁছলেন বিকালে। মন্দির তখন বন্ধ, সন্ধ্যারতির সময় খুলবে। পাহাড়ের মধ্যে পাখির বাসার মতো ছোট্ট গ্রামটি। একটি মাত্র রাস্তা তার। ভিড় করে যাত্রীরা সেখানে সন্ধ্যার অপেক্ষায় বসে থাকে। গোধূলির আকাশে তারা ফুটে ওঠে, পাহাড়ের চূড়ায় বরফ ঝকঝক করে। হঠাৎ ঠেলাঠেলি ছুটাছুটি করে মন্দিরের দিকে ছুটল সবাই। ঘণ্টা বেজে উঠেছে। উন্মত্ত জয়ধ্বনি ওঠে, 'জয় কেদারনাথ স্বামী কী জয়।' চেঁচামেচি করে সবাই সামনে এগিয়ে চলে। ভিড়ের ধাক্কায় কখন নিবেদিতা রাতের আঁধার থেকে এসে ঢুকলেন অন্ধকার মন্দিরগর্ভে।

'কিছুই দেখতে পান না সে অন্ধকারে। ঘামে-ভেজা মানুষগুলো ঠেসাঠেসি দাঁড়িয়ে ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলছে, এইটুকু কেবল অনুভব করেন। একটু দূরে পাথরের উপর টপ টপ করে জল পড়ছে শুনতে পান। এখানে-ওখানে বাতি জ্বলছে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে। নিজেকে লুটিয়ে দেবার উজাড় করে দেবার একটা আকুতি আর প্রার্থনায় ব্যাকুল আবেগ উথলে উঠছে কেবল।

'স্তব্ধচিত্তে নিবেদিতা দাঁড়িয়ে থাকেন নিথর হয়ে। কতক্ষণ গেল এমনিভাবে। কান পেতে শোনেন নিজের বুকের উদ্দাম স্পন্দন। ঐ শিবশূল উৎখাত করছে জড়পিণ্ডটাকে, অবিরাম হানায় ভেঙে পড়ছে তাঁর দেহের কাঠামোটা। তালে-তালে উঠছে অনাহত ধ্বনি 'হংসঃ হংসঃ'। অমনি শ্বাসের ছন্দস্পন্দে উচ্চারিত হচ্ছে 'শিবোহহ্‌ম শিবোহহ্‌ম।' মহামরণের তুহিনে অন্তর জমাট বেঁধে গেল তাঁর। তারপর জ্বলে উঠল বহ্নিজ্বালা। সর্বাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন নিবেদিতা।'

পরবর্তীকালে কেদারনাথ দর্শনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে নিবেদিতা তাঁর 'A pilgrim's Diary'-তে লিখেছেন, 'It was one of the sights of a lifetime, to stand there, in the black darkness at the top of the steps, and watch the pilgrims streaming in. It seemed as if all India lay stretched before one, and Kedar Nath were its apex, while from all parts everywhere, by every road, one could see the people streaming onward, battling forward, climbing their way up— all for what? For nothing else than to touch God.'

কেদারনাথ-বদরিনাথ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি নিবেদিতা ধারাবাহিকভাবে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় লিখেছিলেন। 'The Northern Tirtha, A Pilgrim's Diary' নামে তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। নিবেদিতার প্রয়াণের পর এটি বই হিসাবে প্রকাশিত হয়।

কেদার-বদরির যাত্রাপথের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিবেদিতা তখন তাঁর যে সমস্ত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা তুলে ধরেছেন। এক তীর্থযাত্রী মহিলার কথা উল্লেখ করে নিবেদিতা লিখেছেন, 'She was a little old woman, and we caught her just as she had stepped out of her prim little shoes, placed neatly behind her, and with one rapt look, prostrated herself. Two people who were coming forward drew back at this, that she might not know herself interrupted, and then as again we stepped forward and came face to face with her, we saw that for the moment she was lost in the world of her own reverence...It was a sudden glimpse of the snow mountains to which she had paid involuntary homage.'

কেদার-বদরি যাত্রাপথের দুর্গম রাস্তার বর্ণনা দিতে গিয়ে নিবেদিতা লিখেছেন, 'We much regretted that we had not insisted on waiting at kund Chalty till the cool of the day, so hard and arid in the climb, in the fierce noon-sun, between it and Gupta Kashi... The road, on this final day, is terrible, especially the last four miles of steep ascent...as hard as life itself, in very truth.'

এই দুর্গম রাস্তায় কোনো কোনো তীর্থযাত্রীর অদম্য উৎসাহ নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল। তারও বর্ণনা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। লিখেছেন, 'Climbing over

some peculiarly difficult boulders in the dry bed of torrent, we met two old women, both almost blind, and bent almost double with age and infirmity. They were coming back from Badri Narayan. The place was terrible, and as we came up to them, one of them stumbled. But to an ejaculation of concern, they replied, between themselves, with an air of triumph at their gaiety, 'What! Is not Narayan [God] leading? And since He has given Darshana, what does this matter?'

তাঁর এই কেদার-বদরি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদেরও শুনিয়েছিলেন। সরলাবালা সরকার তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, নিবেদিতা দুজন অতিবৃদ্ধা তীর্থযাত্রীর কথা শুনিয়েছিলেন। একজনকে তিনি দেখেছিলেন অলকানন্দার বরফশীতল জলে স্নান করে সূর্য প্রণাম করতে। কী সুন্দর যে লাগছিল সেই বৃদ্ধাকে— নিবেদিতা বলেছিলেন ছাত্রীদের; আর-একজন বৃদ্ধাকে তিনি দেখেছিলেন বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে। নিবেদিতার আশঙ্কা হয়েছিল ওই বৃদ্ধা পড়ে যেতে পারেন। তিনি তাঁকে সাহায্য করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বৃদ্ধা কোনো উত্তর না দিয়ে একটি মধুর হাসি উপহার দিয়েছিলেন নিবেদিতাকে। সে হাসি যে কী নির্মল— নিবেদিতা বলেছিলেন ছাত্রীদের। কেদার-বদরি পরিভ্রমণ করে জুন মাসের ২৯ তারিখ সমতলে নেমে আসেন নিবেদিতা এবং বসু দম্পতি। ২৯ জুন, ১৯১০, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'Just a hurried line, while the rain prevents our starting for the railway. Our wonderful pilgrimage is over. Swamiji would have liked us to make it. Who knows what waits us tomorrow. But this is an immortal treasure, and it has been so protected and blessed that even Bairn has stood it. We go down well. What a relif!'

নিবেদিতার চিঠি থেকেই জানা যায়, তাঁদের কেদার-বদরি ভ্রমণের মোট সময়সীমা ছিল ৪৮ দিন। তার ভিতর ৪২ দিনই তাঁরা পাহাড়ি পথে হেঁটেছেন। ৬ জুলাই, ১৯১০ মেরি উইলসনকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Oh, I was so relieved when we got the Man of Science [Dr. Bose] back to Calcutta alive and sound!! Poor BO [Mrs. Abala Bose] was the only one who had suffered seriously— and she was well again. Forty two marches

in all, we did, and spent 6 days without marching, a total of 48 days.'

কেদার-বদরি থেকে ফিরে আসার পরই নিবেদিতা সংবাদ পেলেন সারা বুল গুরুতর অসুস্থ। শ্রীমতী বুল একাধারে ছিলেন নিবেদিতার অভিভাবক এবং বন্ধু। মাতৃস্নেহে নিবেদিতাকে আগলে রাখতেন তিনি। নিবেদিতার সমস্ত কাজে তাঁর যেমন মানসিক সমর্থন ছিল, তেমনই নিবেদিতার কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে তার জন্য সর্বদা আর্থিক সহায়তাও করে যেতেন শ্রীমতী বুল। নিবেদিতার স্কুলটি প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতী বুলের অর্থসাহায্যেই চলত। কলকাতায় ক্রিস্টিনের খরচ-খরচাও শ্রীমতী বুলই পাঠাতেন। এছাড়াও, এই সময়ে কলকাতায় জগদীশচন্দ্র নিজস্ব একটি গবেষণাশালা প্রতিষ্ঠায় (পরে যা বোস ইন্সটিটিউটে রূপ পায়) উদ্যোগী হয়েছিলেন; এ ব্যাপারে নিবেদিতারও উৎসাহ কিছু কম ছিল না; এই কাজেও সারা বুলের সাহায্যের প্রত্যাশী ছিলেন নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্রের একটি জীবনীও এই সময়ে প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়ে পড়েন নিবেদিতা। ফলে, সারা বুলের অসুস্থতার সংবাদ এসে পৌঁছোনোয় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ১৯১০-এর ২৯ সেপ্টেম্বর সারা বুলকে একটি পত্রে তিনি লেখেন, 'My wonderful 12 years is drawing to a close, and I feel that in November when the Mintos go, I shall enter on a very dark period which I dread more for his (Dr. Bose's) sake than for anything else. I have still 2 years left, but no more. And this will probably be 2 years of decline, instead of ascent of fortune. But if only he weathers the storm safely. If only his heart is not torn to pieces. I know how sweetly and surely he can adjust himself to the eternal necessities and to sorrow that is grand and severe. If the sacrifice is great enough, he can always bear it. And you must get well that he may be able to come and sit beside you in the gloaming with your silence and peace and your love all about him.

'I am so afraid that I shall not be there to write his (Dr. Bose's) life. But I know you will leave a special legacy of 100 to S.K.R (S.K.Ratcliffe) or to N (Navinson) for this purpose, not to pay expenses, but to pay for time. The life can easily be published in India and at Indian cost. And my papers will be at their disposal.'

নিবেদিতা অবশ্য শেষ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের জীবনীটি লিখে যেতে পারেননি। কিন্তু সারা বুল তাঁর উইলে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করে গিয়েছিলেন। এবং ১৯২০ সালে প্যাট্রিক গেডিজ-এর 'Life and Work of Sir J.C. Bose' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয়। নিবেদিতার এই চিঠিতে আর-একটি বিষয়ও যথেষ্ট লক্ষণীয়। নিবেদিতা এই চিঠিতে লিখছেন,'My wonderful 12 years is drawing to a close...' আরো লিখছেন, 'I am so afraid that I shall not be there to write his life.' চিঠির এই পংক্তি দুটি পড়লে মনে এই সন্দেহই হয় যে, তাহলে কি নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর জীবনদীপটি নিভে আসছে। এ প্রসঙ্গে ১৯০৪ সালে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা নিবেদিতার আর -একটি চিঠিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Do you remember how Cheiro foretold that I would die between the forty second and forty fourth years? I am now thirty six. So I suppose I shall see this cycle too. I fancy I shall die in 1912.' যুক্তি বা তর্ক দিয়ে এর হয়তো ব্যাখ্যা মিলবে না, কিন্তু ১৯১১ সালে নিবেদিতা যখন মারা যান, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৩।

আরো-একটি সংকটও এই সময়কালে নিবেদিতার জীবনে ঘনিয়ে এল। সিস্টার ক্রিস্টিন, স্কুল পরিচালনার কাজে নিবেদিতা যাঁর ওপর সবথেকে বেশি নির্ভর করতেন, তিনি ১৯১০-এর এপ্রিল মাসে কিছুদিনের জন্য আমেরিকা চলে গেলেন। ১৯১১ সালের গোড়ার দিকে ক্রিস্টিন কলকাতা ফিরে এসেছিলেন বটে, কিন্তু কয়েকদিন কলকাতায় কাটিয়ে তিনি নিবেদিতা স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে চলে গেলেন মায়াবতী আশ্রমে। ঠিক কী কারণে ক্রিস্টিন স্কুল ছেড়েছিলেন এবং কী কারণে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়েছিল তা জানা যায় না; তবে, অনুমান করা হয়, নিবেদিতার একরোখা মনোভাবের জন্যই হয়তো ক্রিস্টিনের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়েছিল, এবং ক্রিস্টিন নিজেকে স্কুলের কাজ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ক্রিস্টিনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ে আরো-একজন স্কুলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন — তিনি সুধীরা দেবী। সুধীরা ক্রিস্টিনের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। নিবেদিতা স্কুলে সর্বকাজে তিনি ক্রিস্টিনের সহকারী ছিলেন। বলতে গেলে, নিবেদিতার অনুপস্থিতিতে ক্রিস্টিন এবং সুধীরা দেবীই স্কুলটি চালাতেন। এই দুজনই স্কুল ছেড়ে চলে যাওয়ায় নিবেদিতা সত্যই সংকটে পড়লেন। ১৯১১ সালে পুজোর ছুটিতে দার্জিলিং যাওয়ার আগে নিবেদিতা সুধীরাদেবীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে তাঁকে স্কুলের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন সুধীরা দেবী।

জানিয়ে দেন, তিনি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদান করবেন। কিন্তু ক্রিস্টিন বা সুধীরাদেবী কেউই ভাবতে পারেননি, নিবেদিতার জীবন অন্তিম পর্বে পৌঁছেছে। নিবেদিতার মৃত্যুর পর অবশ্য দুজনেই অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসে স্কুলের পরিচালনভার হাতে নিয়েছিলেন।

লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'প্রথমেই তাঁর স্কুল। কাজে ওখানকার সঙ্গে তাঁর যোগ নাই, কদাচিৎ একটা পাঠ দেন মেয়েদের। কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে নিবেদিতাই স্কুলটির অবলম্বন। টাকার অভাবে ১৯০৯ সালে চার মাসেরও বেশি স্কুল বন্ধ ছিল, ১৯১০ সনে ছিল পাঁচ মাস। ক্রিস্টিনকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা আমেরিকায় ডেকে নিয়ে গেছেন, কবে ফিরবেন ঠিক নাই। একটা সংকট কাল। নিবেদিতা ঠিক করলেন, প্রথম দফায় যে ব্রহ্মচারিণীদের তিনি নিজে তৈরি করেছিলেন, তাদেরই হাতে স্কুলটি একেবারে ছেড়ে দেবেন।

'প্রথমটা একটু টালমাটাল গেল। কিন্তু সন্তোষিণীর হাতে পড়ে দেখতে-দেখতে স্কুলটিতে হিন্দুজীবনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠল, দ্রুত উন্নতি দেখা দিল। ক্রিস্টিন ফিরে আসবার আগেই স্কুলটি স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে গেল। নিবেদিতার আর কোনও দায় রইল না, প্রতিষ্ঠাত্রীরূপে তাঁর নামটাই শুধু রইল। অন্যান্য ব্রহ্মচারিণীরাও কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনের কথা আলোচনা করতে লাগল।

'এই হস্তান্তরের ব্যাপারটি নিবেদিতার জীবনের সবচেয়ে করুণ অধ্যায়। লোকের অজানাও বটে। বোর্ডিং-স্কুল করবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না তাঁর, কিন্তু ঘটনাচক্রে অন্যরকম হয়ে গেল। ছাত্রীদের মধ্যে যে ক'টি বালবিধবা ছিল, তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন তিনি। একবার বাড়ি ছেড়ে গেলে সামাজিক প্রথানুযায়ী সে মেয়েকে পরিবারের লোকেরা আর গ্রহণ করে না। এটা জানতেন বলে নিবেদিতা মাত্র গুটিকয় মেয়ের ভার নিয়েছিলেন। কারণ তাদের দায়টা সম্পূর্ণই তাঁর উপর বর্তাবে।

'...ভিতর-আঙিনার ধারে একটি ছোট ঘরে নিবেদিতা যেদিন তাদের ঠাঁই দিলেন, সেইদিনই 'মাতৃমন্দিরে'র প্রতিষ্ঠা হল। হিন্দু মেয়েদের মধ্যে সন্তোষিণীই প্রথম নিবেদিতার আদর্শে জীবন উৎসর্গ করেছিল। তার সতর্ক প্রহরায় এইসব মেয়ে নিষ্ঠাপূত পবিত্র জীবন কাটাতে লাগল। কঠিন নিয়ম-সংযমে বিধবাদের সন্ন্যাসিনীর মত গড়ে তুলতে হবে। ওদের চেয়েও দুর্ভাগিনী যারা, তাদের সাহায্য করবার জন্য তৈরি থাকে যেন ওরা। সারদা দেবী বাগবাজারে থাকলে সপ্তাহে দু-একবার ওরা ধর্মোপদেশ নেবার জন্য তাঁর কাছে যায়। কখনও-কখনও নিবেদিতাও সঙ্গে যেতেন। সে সময় তিনি গেরুয়া পরতেন।'

এই সময়ে নিবেদিতা আরো-একটি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। স্বামীজি ইংল্যান্ডে থাকাকালীন 'রাজযোগ' ছাড়াও আরো বহু লেখার খসড়া করে গিয়েছিলেন। এছাড়া স্বামীজির বহু ভাষণ গুডউইন শর্টহ্যান্ডে লিখে রেখেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিবেদিতাও স্বামীজির এইসব রচনা ও ভাষণ সম্পাদনা ও সংকলনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। স্বামীজির 'কর্মযোগ'-এর কাজ শেষ করে 'জ্ঞানযোগ' বিষয়ক লেখার সম্পাদনা তখন করছিলেন নিবেদিতা। স্বামীজির একটি জীবনীগ্রন্থও লেখার মনস্থ করেছিলেন তিনি। এজন্য তিনি ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা থেকে পাওয়া স্বামীজির চিঠিপত্রাদি এবং স্বামীজির অনুগামীদের স্মৃতিচারণাও সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু, সে সবই নিবেদিতা শেষ পর্যন্ত তুলে দিয়েছিলেন মিশনের হাতে। লিজেল রেমঁর লেখা থেকে জানতে পারা যায়, ১৯০৯ সালের ২৪ আগস্ট একটি চিঠিতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' সম্পাদনা করার জন্য মাস্টারমশাই (শ্রীম) নিবেদিতাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু নিবেদিতা সে অনুরোধও ফিরিয়ে দেন। রেমঁ লিখেছেন, 'বৈরাগ্যের তীব্র সংবেগে নিজের সব সাধ বিসর্জন দিলেন নিবেদিতা।' কিন্তু এ প্রশ্ন সত্যিই মনে জাগে যে, ওই সময় থেকেই নিবেদিতা সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে আনছিলেন কেন? তাঁর আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মতো তিনিও কি বুঝতে পারছিলেন, তাঁর কাজ এবার শেষ হয়ে এসেছে। স্বামীজিও তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এভাবে নিজেকে সবকিছু থেকেই বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন।

ওই বছরই পুজোর ছুটিতে নিবেদিতা বসু দম্পতির সঙ্গে ছুটি কাটাতে দার্জিলিং গেলেন। দার্জিলিংয়ে থাকাকালীনই তারবার্তা পেলেন সারা বুল গুরুতর অসুস্থ; তিনি চাইছেন, এই সময়টুকু নিবেদিতা যেন তাঁর পাশে এসে থাকেন। শ্রীমতী বুলের এই অনুরোধে কাতর হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। চঞ্চল হয়ে উঠল তাঁর মন। কালক্ষেপ না করে আমেরিকার দিকে রওয়ানা দিলেন তিনি। কিছুদিন আগেই বিলেত ঘুরে এসেছিলেন নিবেদিতা। তাঁর ইচ্ছা ছিল আর চট করে ভারত ছেড়ে যাবেন না; কিন্তু শ্রীমতী বুলের অসুস্থতা সব কিছু ওলটপালট করে দিল। ১৫ নভেম্বর বোস্টনে সারা বুলের কাছে এসে পৌঁছলেন নিবেদিতা। নিবেদিতার জীবনীকার বারবারা ফক্স লিখেছেন, 'Mrs. Bull had changed into a frightened woman who would hardly allow Nivedita to leave her bedside. The 'steady mother' now clung to Nivedita, who saw that the one thing she needed above all else was to reach back into the great days with Vivekananda, and find again the quiet

wisdom and inner certainty she had known them. So she sat by the bed, talking to her of all the beloved places: Belur, Almora, Kashmir, Calcutta. They lived again the greatness of those early times.'

সারা বুলের শারীরিক অবস্থা নিয়ে এর কিছুদিন আগে থেকেই যে আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন নিবেদিতা তা বোঝা যায় তাঁর লেখা চিঠিপত্রেও। ১৯১০-এর ১১ জানুয়ারি ড. চেইনিকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Mrs. Ole Bull is at her home in Cambridge, Mass. and writes that she is spending a very cosy winter by her own fireside, but I fear that her health is over frail, or she would not be contended with the luxury of this peace and quiet.'

ওই বছরই ১৭ মার্চ ওলি বুল সম্পর্কে আরো উদ্বিগ্ন হয়ে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে তিনি লিখেছেন, 'S. Sara's letters have been omnious for some time, and at last Bairn wired. The answer is "Gaining Satisfactorily", but of course we do not know whether she has been through some dreadful operation or not. It seems like it. If so, what a comfort that she has had her own comfortable home to recover in. Indeed, in any case what a good thing! If she had been here, how terrible the responsibility would have been!'

১৯১০-এর ২৫ মে আবার জোসেফিনকে লিখছেন, 'I am really very very anxious about S. Sara....But I do hope S. Sara is NOT so seriously ill.'

এরপরেই ৭ জুলাইয়ের পত্রে আবার জোসেফিনকে লিখছেন, 'Why do you say 'the end of S.Sara's life'? I do hope you don't think she is going to die!'

এই আশঙ্কা এবং উদ্বেগের ভিতরও নিবেদিতা বিশ্বাস করেছেন, সারা বুল আরো অনেকদিন বাঁচবেন। এবং সেই বিশ্বাস থেকেই ৪ আগস্ট ১৯১০-এর চিঠিতে জোসেফিনকে নিবেদিতা লিখছেন, 'How I trust, too, that S. Sara has many many years before her! Poor poor S. Sara! I wd. not for anything have her die. How much one loves people, underneath the surface-tossing of the waves!'

এমনকী, ১৯১০-এ পুজোর ছুটি কাটাতে দার্জিলিং যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিবেদিতা এমনই আশা করেছিলেন যে, যতই অসুস্থ হোন না কেন, শেষ অবধি সারা বুল সুস্থই হয়ে উঠবেন। দার্জিলিং যাত্রার এক সপ্তাহ আগে একটি চিঠিতে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'One feels a little more hopeful about S. Sara. She seems better.'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিবেদিতার আশা সফল হল না। সারা বুল সত্যিই গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবং নিবেদিতাকে ছুটে আসতে হয় তাঁর কাছে। অসুস্থ সারা বুলের শয্যাপার্শ্বে পৌঁছে অবশ্য নিবেদিতাকে মানসিকভাবে অনেক আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। সবথেকে বড় আঘাতটি এসেছিল সারা বুলের কন্যা ওলিয়ার কাছ থেকে। ওলিয়া মাঝে মাঝেই মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। তবু, ওলিয়া নিবেদিতাকে পছন্দই করতেন। সারা বুল যখন অসুস্থ হন তখন ওলিয়া তাঁর কাছে থাকতেন না। শ্রীমতী বুল ওলিয়াকে তখন ত্যাজ্য কন্যা ঘোষণা করেছেন। সারা বুলের গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ওলিয়া এবং শ্রীমতী বুলের ভাই মি. থর্প বোস্টন এসে পৌঁছোন। কিন্তু নিবেদিতাকে দেখেই ওলিয়া সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন। ওলিয়ার ধারণা হয়, নিবেদিতা শ্রীমতী বুলের টাকাপয়সা ভারতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। ফলে ওলিয়া দুর্ব্যবহার শুরু করেন নিবেদিতার সঙ্গে। ওলিয়ার এই আচরণ নিবেদিতাকে ব্যথিত করে তোলে। কিন্তু সেই সময়ে শ্রীমতী বুলকে ফেলে রেখে ভারতে ফিরে আসার উপায়ও নিবেদিতার ছিল না। কারণ, সেই রোগগ্রস্ত অবস্থায় শ্রীমতী বুল সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে ছিলেন নিবেদিতার ওপর।

আর-একটি বিষয়ও নিবেদিতাকে বিষণ্ণ করেছিল। তা হল, অসুস্থ সারা বুলের মানসিক পরিবর্তন। শ্রীমতী বুলের এই মানসিক পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় নিবেদিতার লেখা থেকে। স্বামীজির 'ধীরামাতা', নিবেদিতা যাঁকে বলতেন 'সেন্ট সারা,' সেই তাঁকে ডাকিনিতন্ত্রে বিশ্বাসী এক অহমিকাসর্বস্ব নারী রূপে দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন নিবেদিতা। কন্যা ওলিয়াকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন তিনি। জগদীশচন্দ্র, যাঁকে তিনি পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকেও দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রিস্টিনকেও কাছে রাখতে চাননি। কোনো একজন, তাঁর নাম জানা যায় না, তাঁর প্রভাবে নানারকম অশরীরী আত্মায় বিশ্বাসীও হয়ে পড়েছিলেন এ সময়। সারা বুলের এই মানসিক পরিবর্তন মেনে নেওয়া নিবেদিতার পক্ষে সত্যিই কষ্টকর ছিল। কাজেই নিবেদিতার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল, সেবা-শুশ্রূষায় আবার শ্রীমতী বুলকে পুরোনো মানসিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা, সারা বুলের ভিতর আবার সেই পুরোনো মাতৃত্ববোধকে জাগিয়ে তোলা।

লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'সেই একগুঁয়ে সারা বুল, স্বামীজি যাঁকে মা বলে ডেকেছিলেন, আজ নিজের জীবন আর অর্থ-সম্পদকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে আছেন। কাউকে তিনি আর বিশ্বাস করেন না। চোখে তাঁর আতঙ্কের ছায়া। নিবেদিতাকে দেখেই সে দৃষ্টিতে করুণ মিনতি ফুটে উঠল। প্রাণপণে তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন মিসেস বুল। দিন রাত নিবেদিতাকে তাঁর চাই— চাই তাঁর মমতা, তাঁর প্রশান্তি। সে মহীয়সী ধীরা মাতা আর নাই। তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত অন্তর আজ সব আলো সব ঔদার্য আর সব শুভেচ্ছা ভুলে কোথায় হারিয়ে গেছে যেন। বিকারের ঘোরে শুধু দুটি মুখের স্মৃতি বিহ্বল করছে তাঁকে— তাড়িয়ে দেওয়া মেয়ে ওলিয়া আর পালিয়ে যাওয়া ছেলে জগদীশ বসু। একজন এসে আর একজনকে আড়াল করে, কখনও বা একাকার হয়ে যায় দুটি মুখ। পাগল করে তোলে তাঁকে। আত্মরতির মোহে মা ভুলে গেছেন কেমন করে সন্তানদের ভালবাসতে হয়, তাঁর আসক্তিই পর করে দিয়েছে তাদের।

'এই করুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে নিবেদিতা এসে পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর চেষ্টায় ধীরা মাতার নীরস চিত্তে আবার একটু স্নেহসঞ্চার হল, সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যও ভাল হল খানিকটা। নিবেদিতা কাছে বসে ধ্যান করেন, রোগিণী কিছুক্ষণের জন্য ফিরে পান তাঁর সাধনজীবনের আলো, স্বামীজির সেই স্মৃতি, সেই আত্মত্যাগের আনন্দ।'

শ্রীমতী বুলের এই সময়কার শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় নিবেদিতার চিঠিপত্রে। ১৯১০-এর ৪ ডিসেম্বর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে তিনি লিখছেন, 'S. Sara is, I think, better. There is a good deal of diabolist belief amongst psychics in this 20th Century in America! It is sometimes difficult to keep one's mind clear. Doing so, as far as one is able, I think she will recover steadily. She is in some ways of course intensely difficult. Never have I seen greater exactingness. Yet it has its limits—and she responds wonderfully to higher interests, once the body is provided for. Perhaps her worst fault is self will, which makes her constantly expend her force instead of saving it for recovery. This is of course not ideal—but there is no course but patience—and I am intensely grateful for my freedom from actual service and her rooted idea that my time is dedicated. This gives me a maximum of freshness and sweetness with wh. to approach her.'

এরপর ৭ ডিসেম্বর জোসেফিনকে আবার তিনি লিখছেন, 'It is not yet dawn and the world is covered with snow. I have lain long since my tea came, praying that we may ALL keep one little place—a secret between one soul and God, where we can meet with HIM and grow—univaded and untouched by influences or hypnotisms. I know that this is a right demand, because Swamiji was filled with it, and made it about HIS whole individuality. He held friendly parley so to speak, and loving relations, with so many, outside that area, from across His frontiers and looking over theirs— but He was absolutely intolerant of the last step that would have intruded for an instant on either—and this untouchedness of the inner areas was what He called their and His Freedom.

'And is this Freedom, dear Yum—which however small in extent, may we keep intact!—may we learn to distinguish with a growing clearness, between the Real and the Unreal! Even in our wordly relations, some things are more real than others, you know!... (Pages missing)

'...Let no one touch this who does not believe in prayer. But those who do—Geo. and Alberta, Spence—anyone—let them pray for S. Sara that in grave danger she may learn to be herself, and discriminate between the Real and the Unreal.

'Don't tell them anything. This is all between you and the Bairn and Christin and myself. (Pages missing)

'And please pray for me, pray, all of you, that I may be made loving, patient, SILENT of an intense reserve. Oh Yum—I am so frightened! But bless you Dear—I know these

(Pages missing)

'Love, patience, reserve. Don't forget my need of these!'

নিবেদিতার চিঠিটি থেকে আরো-একটি বিষয়ও জানা যাচ্ছে। শ্রীমতী বুলের এই মানসিক অবস্থার কথা কেউ জানুক এটা নিবেদিতা চান না। বিষয়টি শুধু তাঁর, জোসেফিন ম্যাকলিয়ড, জগদীশচন্দ্র বসু এবং ক্রিস্টিনের ভিতর সীমাবদ্ধ থাক

—এটিই তিনি চেয়েছিলেন। ১৯১০ সালের ১৯ ডিসেম্বরের চিঠিতে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'I suppose I have really made a tempest in a tea cup about S. Sara's queer notions and Mrs. Briggs' influence. The whole world is a criss-cross of psychic desires and intentions, and we wade knee-deep through it. I think there is perhaps a certain truth in it, and yet it is not so important as I felt it, while I was writing to you. Mrs. Hellyer's view is just, too. And the actual danger of death or insanity is probably non-existent. I want to be sane. At the same time, the experience was a very real one and the horror over whelming. The net result is an echo of Swamiji "Give up this Maya! Seek to reach Mukti!" Let them settle it as they will—let psychic influences fight it out amongst them. There is only one salvation, and that is Mukti.'

নিবেদিতার সেবাযত্ন এবং সাহচর্যে শ্রীমতী বুল মানসিকভাবে কিছুটা সুস্থও হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বায়ুপরিবর্তনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'কয়েক সপ্তাহ পরে এখন-তখন অবস্থাটা কেটে গেল, বায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা হল। কিন্তু ধীরা মাতা ফিরে এলেও স্বাস্থ্য আর ফিরল না। নিবেদিতা এই সুযোগে ওলিয়াকে মায়ের বুকে ফিরিয়ে আনলেন, জগদীশ বসুকে মনে করিয়ে দিলেন আবার।' ওই সময়ে সারদা দেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন নিবেদিতা, সেখানেও সারা বুলের কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীমতী বুলের জন্য ওই চিঠিতে সারদা দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন নিবেদিতা। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই চিঠিটি বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। এখানে অংশবিশেষ উল্লেখ করা হল। ১৯১০-এর ১১ ডিসেম্বর সারদা দেবীকে নিবেদিতা লিখছেন, 'This morning—early, I went to the church— to pray for Sara. All the people there were thinking of Mary, the Mother of Jesus, and suddenly I thought of you. Your dear face, and your loving look, and your white Sari and your bracelets. It was all there. And it seemed to me that yours was the Presence that was to soothe and bless poor S. Sara's sick-room...

'Do send to poor S. Sara the mantle of your peace. Isn't your thought, now and then, of the high calm that neither loves nor

hates? Isn't that the sweet benediction that trembles in God, like the dew-drop on the lotus-leaf, and touches not the world?'

তাঁর সাহচর্যে যে শ্রীমতী বুল কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে বিভিন্ন চিঠিতে সেকথাও জানিয়েছিলেন নিবেদিতা। ১৯১০-এর ২৬ ডিসেম্বর জোসেফিনকে তিনি লিখছেন, 'S. Sara is certainly improving, however, slowly—and perhaps one can see things more truely. Also she has sometimes spoken confidingly to me about people—and there is a direction in which I feel the need of tact and invitingness as much as a wise second wife receiving confidences about the first! The idea under which I first wrote to you, seems monstrous, I know—in its monstrous aspects, it is probably untrue. Yet the response to love and simplicity is very marked—and—my diagnosis was not altogether untrue. At least it was true enough to justify Mrs. Walden's warnings.'

সারা বুলের মানসিক অবস্থাও যে তিনি আগের অবস্থাতে অনেকটাই ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন, এই চিঠিতে জোসেফিনকে তা-ও লিখেছেন নিবেদিতা। লিখেছেন, 'The beloved Mrs. Hellyer said 'Get her to give money, while living, and break this bondage!' And that is precisely the direction in which I have been able to put in a stroke or two.

'...Then I remember the extraordinary vanity—the credulity and belief in witchcraft—the spirit of criticism and condemnation—and the keeping Christine away, in the Summer—a good thing for Christine may be, still—an inexplicable responsibility.

এই চিঠিতেই দেখতে পাই শ্রীমতী বুলের জন্য কী আকুল আর্তি নিবেদিতার! শ্রীমতী বুলের প্রতি কী অসম্ভব ভালোবাসা তাঁর! ঠিক যেন এক মা ও মেয়ের সম্পর্ক। নিবেদিতা লিখছেন, 'Well, do pray for S. Sara, and do love her, and do have faith in her, and turn the currents of Universe towards her, and see her through Swamiji and Sri Ramakrishna—or couple the thought of the Holy Mother with her. These are the only things that I know of that I dare apply to the querulous

peremptory needs of this lonely soul! And yet she does love, and she does long for love! It is sad! I would help her to do anything, right or wrong, if only I were sure of its being genuinely her own wish!'

নিবেদিতার সেবাযত্ন এবং সাহচর্যে সারা বুল কতটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন তা বোঝা যায় যখন তিনি সুইজারল্যান্ডে এমনকী ভারতে আসারও পরিকল্পনা করছিলেন। ২৮ ডিসেম্বর, ১৯১০, নিবেদিতা জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখছেন, 'S. Sara plans for Switzerland in Sept. and then, if strong enough, on to India in a French ship—and take a house and boat at Chandernagore...

'About S. Sara. I am only praying—no 'treating'! —no 'holding thoughts!'—and I am praying only for Love—Love in and around—Love above—and below—Love given and received and REALISED. Oh Tide of infinite Loving, flood out all our harbours! Loose the mooring of Our Ships! Thats all. Everything else, as far as she is concerned, may take care of itself. She needs the franchise of her own great nature, love love love without a thought of self—and of late years, somehow she had lost the key.'

১৯১১-র ইংরেজি নববর্ষের দিন নিবেদিতা জোসেফিনকে লিখছেন, 'Oh yum, only a soul that was really great and enlightened could have responded like this! Of course the cruel moments will come—but they will be less in future, I believe, and with health restored, will disappear. Let us go back, quietly at first, afterwards explicitly, perhaps, to the old beautiful relationships of the year in Kashmir. That same passion for motherhood that is incarnate as Olea, dwells also in S. Sara. Only hers is to find the Spiritual fulfilment—for Swamiji to her is to be the Holy Child. I don't think she sees it, but we can, and recognise her so, in our hearts!'

ওই দিন রাতেই আবার জোসেফিনকে জানাচ্ছেন, 'She is much better. I have left her—after the whole day—10AM to 8 PM—together, for the night!'

কিন্তু নিবেদিতার এই সাহচর্য, এই শুশ্রূষাও শেষ পর্যন্ত সারা বুলকে ধরে রাখতে পারেনি। মাঝখানে একটু ভালো হয়ে উঠলেও ১৯১১-র শুরুতেই আবার বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ১৯১১-র ১৮ জানুয়ারি ভোরবেলায় প্রয়াত হন শ্রীমতী বুল। শ্রীমতী বুলের শেষ সময়টুকুর সংবাদ জানাতে গিয়ে ওইদিন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখছেন, '...She had such a bright day yesterday! It was the last flicker before the end. At 5 this morning, 3 little moons gave the signal, and we all stood round her till she died, at 8. Mr. Thorp, Olea and the doctor, were all here. Before they come, and while she may still have been conscious, I chanted "Hari Om! Ramakrishna ! Peace!" At the end, we said the great Benediction, while the soul went out.

'Thank God! All was right—and I know she went into the presence of Swamiji—straight. Yesterday she said, in a confused way that I hadn't yet put back Swamiji over my desk. "The brass one" she said. Then I knew she meant the Buddha. "I have not seen that again, yet!" she said— and I answered " No Darling! You shall see it tomorrow morning!" I could not have answered differently, for I was doing something for her— anyway— and it satisfied her. She was so tired! —and now she sees!—Swami as the Buddha!'

স্বামীজির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর নিবেদিতার জীবনে দুই নারী খুব সম্মানের জায়গা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। একজন জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং অপরজন সারা বুল। দুজনেই নিবেদিতাকে আপন করে নিয়েছিলেন এবং গভীরভাবে ভালোবাসতেন। সারা বুল নিবেদিতাকে সন্তানবৎ স্নেহ করতেন। আর জোসেফিন ম্যাকলিয়ড নিবেদিতাকে নিজের ভগ্নীর মতো সাহচর্য দিয়ে গিয়েছিলেন। নিবেদিতার কর্মকাণ্ডে এই দুজনেরই যথেষ্ট অবদান ছিল। নিবেদিতা বিভিন্ন সময়ে সারা বুলের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। নিবেদিতাকে স্কুল চালানোর জন্য সারা বুল প্রথম থেকেই মাসিক দুশো টাকা করে আর্থিক সাহায্য করতেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখা থেকে জানা যায়, শ্রীমতী বুলের ভাই মি. থর্পও বহুদিন পর্যন্ত নিবেদিতার স্কুলের জন্য অর্থসাহায্য পাঠাতেন। এমনকী নিবেদিতার মৃত্যুর পরও সেই সাহায্য আসত। নিবেদিতা স্কুলের ১৯১৯-'২২ এই সময়কালের রিপোর্টে বলা

হয়েছে, এই টাকায় স্কুলের অধিকাংশ খরচ নির্বাহ হয়ে থাকে। নিবেদিতাই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সারা বুলের পরিচয় ঘটিয়ে দেন। নিবেদিতার আগ্রহেই সারা বুল জগদীশচন্দ্রকে বিজ্ঞান সাধনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য করেন। সেদিক দিয়ে দেখলে, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রেও সারা বুলের অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

নিবেদিতার বোন মে উইলসন স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন, শ্রীমতী বুল নিবেদিতার অন্তর্জীবনের রূপ জানতেন। মে উইলসন স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'শ্রীমতী বুলের সঙ্গে মিলে নিবেদিতা নিজের পোষাকের ধরন নির্বাচন করেছিল। আমেরিকায় বন্ধুদের খুশী করবার জন্য তাকে সিল্কের পোষাক পরতে হয়েছিল। তাঁরা চাইতেন সে ভালো পরিচ্ছদে ভূষিত হোক। তাঁরাই তাকে সবকিছু দিয়েছিলেন।'

মে উইলসনের স্মৃতিচারণ থেকেই জানা যায়, নিবেদিতাকে কে বেশি ভালোবাসেন এবং নিবেদিতা কার বেশি ঘনিষ্ঠ, তা নিয়ে সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের মধ্যে চাপা ঈর্ষা আর প্রতিযোগিতা ছিল। মে উইলসন বলেছেন, 'মিসেস ওলি বুল ও ট্যান্টিন (জোসেফিন ম্যাকলিয়ড) পরস্পর সামাজিকভাবে বন্ধু; তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল না। উভয়েই অপর দিকে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ। নিবেদিতাকে নিয়ে দুজনের মধ্যে ঈর্ষা ছিল।' জোসেফিন ম্যাকলিয়ডও ছিলেন আমেরিকার অত্যন্ত ধনী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা। মে উইলসন লিখেছেন, 'মিসেস লেগেট ও তাঁর বোন ট্যান্টিন প্রভাব বিস্তার করতে, চেহারা ও পোষাক পরিচ্ছদে মহিমা বজায় রাখতে চাইতেন। পোষাকাদির ব্যাপারে তাঁরা নিবেদিতার উপর জোর খাটাতেন। নিবেদিতার চেহারা ভারী, দৃঢ়, পরিচ্ছদের ব্যাপারে তার খুবই অবহেলা। রাজ্ঞীর মতো মিসেস লেগেটের মহিমা, দুই পৃথিবীতে (আমেরিকা ও ইউরোপ) তাঁর বিচরণ।'

তাঁকে কেন্দ্র করে সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের ভিতর মনোমালিন্য হতে পারে, এ আশঙ্কা নিবেদিতাও করেছিলেন। কারণ, নিবেদিতার ওপর এই দুজনেরই দাবি ছিল অসীম। সেখানে অন্য কারোকে ভাগ বসাতে দিতে সারা বুল বা জোসেফিন ম্যাকলিয়ড কেউই চাইতেন না। ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই একটি পত্রে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, '...the only thing I dread is that two people whom I love as I do you and S. Sara will form different ideals and urge other duties on me.'

১৯০৫ সালের ২৪ আগস্ট সারা বুলকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে ধারণা করা যায় যে, শ্রীমতী বুলের সঙ্গে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের মনান্তরও হয়েছিল। সারা বুলকে ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখছেন, '...there would be no ideals and no followers of ideals in this world— unless LOVE come first. So I am quite sure that common human affection for you will bring Yum to your door— and I do hope you will take a rest and holiday from ideals, and just yield yourself upto loving and being loved by her. I do not really know that we have any right to identify ourselves with ideals, unless it be after we are dread. Are we worthy of so high an apostolate? Or are we not likely by our insistence and aggression, to make the ideal itself repulsive? Do believe that when life is simple and spontaneous, dear S. Sara, much much love is yours, of which you are intended to have the joy and comfort. You deserve it. You ought not to be lonely—because you are so noble and unselfish. But one little mistake of disposition or temper or tact constantly repeated, does more to divide hearts than a crime could do.'

জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে সারা বুলের এই মনান্তর সম্ভবত দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। শ্রীমতী বুল এবং জোসেফিনকে নিবেদিতা যে একই সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের উচ্চাসনে স্থান দিয়েছিলেন, তা বোঝা যায় নিবেদিতার আরো কিছু চিঠিতে। ১৮৯৮-এর ৫ জুন এরিক হ্যামন্ডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, '...Mrs. Bull is the incarnation of loving—no, love—full sanctity— and Miss Macleod of fire and courage—'

এটা সহজেই অনুমেয় যে, সারা বুলের মৃত্যুতে নিবেদিতার শুধু যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল তা-ই নয়, গভীর শোকেরও সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর হৃদয়ে। কিন্তু এরপরে নিবেদিতার ওপর যে আঘাত নেমে আসে, তা তাঁকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে সম্পূর্ণই বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। আর এই আঘাত এসেছিল শ্রীমতী বুলের কন্যা ওলিয়ার কাছ থেকে। শ্রীমতী বুলের পারিবারিক জীবন খুব সুখের ছিল না। শ্রীমতী বুল ছিলেন আদর্শবাদী, কল্পনাবিশ্বাসী মহিলা। সংগীতপ্রিয়তার জন্য পারিবারিক অনুশাসন অগ্রাহ্য করেই যৌবনকালে তাঁর থেকে বয়সে অনেক বড়, বিশিষ্ট বেহালা বাদক ওলি বুলকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁদের একটি কন্যাও হয়েছিল—ওলিয়া।

কিন্তু ওলিয়া মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ কখনোই ছিলেন না। বিবাহসূত্রে সারা বুল প্রচুর অর্থের অধিকারিণী হলেও পারিবারিক জীবনের কারণে মানসিকভাবে কার্যত নিঃসঙ্গই ছিলেন। সারা বুলের এই মানসিক অবস্থার কথা স্বামীজি জানতেন। সারা বুলের কন্যা ওলিয়া স্বামীজির বিশেষ স্নেহও পেয়েছিলেন। নিবেদিতাও সারা বুলের এই যন্ত্রণা এবং একাকিত্বের কথা জানতেন। যে কারণে বরাবরই সারা বুলকে মানসিক সাহচর্য দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন তিনি। বারবার সান্ত্বনা দিয়ে সারা বুলের বেদনা লাঘব করতে চেয়েছেন। ১৯০৫-এর ৩১ অক্টোবর সারা বুলকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Never forget that great tenderness that dwells in Swamiji's Heart for both Olea and you. He spoke, in that last hour with me, of all that you had sacrificed, to accompany your Hasband so faithfully.'

আর-একটি চিঠিতে (২২ জানুয়ারি, ১৯০৬) সারা বুলকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, '...I know that your pain of distance and spiritual aloneness is very great. And I know that it would, that it must, be so. I knew it even where you were happiest, and most hopeful. For one always sees that those who are called to do world-work are not allowed to be happy in their private life, lest they should rest in it. Do you know what I think? I think if you can only accept this, quitely and serenely, and set yourself to the other tasks, Olea's life will be prolonged, and may even be made happy.'

সারা বুল এবং জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের জীবন নিবেদিতার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। নিবেদিতার দুঃখে এঁরা যেমন বিচলিত হতেন, তেমনই নিবেদিতার সাফল্যেও এঁরা আনন্দিত হতেন অধিক। নিবেদিতাও তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষণকেই এই দুজনের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন। স্বামীজির পর এই দুজনকেই তাঁর পরম আশ্রয়স্থল বলে মনে করতেন নিবেদিতা। তাঁর কাজের জন্য জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং সারা বুলের কাছ থেকে অর্থসাহায্য নেওয়ার বিষয়ে নিবেদিতার কোনো সঙ্কোচ ছিল না। নিবেদিতা মনে করতেন, স্বামীজি তাঁকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন আর এঁদের দুজনের ওপর দিয়ে গেছেন সেই কাজকে বাস্তবায়িত করতে অর্থ জোগানোর দায়িত্ব। কিন্তু সারা বুলের মৃত্যুর পর নিবেদিতাকে এক দুঃসহ আঘাত এবং কুৎসার ভিতর দিয়ে যেতে হল। আঘাতটা এল সারা বুলের কন্যা ওলিয়ার দিক থেকে। সারা বুল তাঁর উইলে

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণা এবং ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে নিবেদিতার কাজের জন্য অনেক টাকা বরাদ্দ করে গিয়েছিলেন। ওলিয়া এমনিতেই কিছুটা মানসিক বিকারগ্রস্ত ছিলেন; তার ওপর এই উইলের কথা জানায় খেপে উঠলেন। সারা বুলের অর্থ কেন জগদীশচন্দ্রের গবেষণা এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য নিবেদিতা ভারতে নিয়ে যাবেন— সে প্রশ্ন তুললেন ওলিয়া। ওলিয়াকে মন্ত্রণা এবং নিবেদিতার বিরুদ্ধে উসকে দেওয়ার জন্য কিছু লোকও জুটে গেল। ওলিয়া নিবেদিতার বিরুদ্ধে অকথ্য কুৎসা রটনা শুরু করে দিলেন। সারা বুলের চিকিৎসার জন্য ভারত থেকে কিছু কবিরাজী ওষুধ নিয়ে গিয়েছিলেন নিবেদিতা। ওলিয়া এবং তাঁর মন্ত্রণাদাতারা রটিয়ে দিলেন, নিবেদিতা সারা বুলকে বিষ খাইয়েছেন। এসব ঘটনার জন্য নিবেদিতা একেবারেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। ওলিয়ার এই আঘাত তাঁকে মানসিকভাবে পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে দিল। নিবেদিতার মন আরো বিষাদগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল আর-একটি কারণে। কুৎসা রটাতে গিয়ে ওলিয়া এবং তাঁর মন্ত্রণাদাতারা স্বামী বিবেকানন্দের নামও টেনে এনেছিলেন।

লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'ওলিয়ার প্রচুর টাকাকড়ি থাকলেও তখন তেমন বেশি কিছু হাতে ছিল না। যেসব দানের ব্যবস্থা করে পরম তৃপ্তিতে মা চোখ বুজেছেন, মেয়ে চাইল সেগুলো নষ্ট করতে। হিংস্র উন্মত্ততায় নানাদিক থেকে নিবেদিতাকে কেবলই ছোবল দিতে লাগল।

'প্রত্যাঘাত করেননি নিবেদিতা। সে-দুঃসময়ে তাঁর কি এনিয়ে ঝগড়া করার কথা? কিছুই বললেন না তিনি। কিন্তু মিসেস বুলের হতবুদ্ধি আত্মীয়-স্বজনরা নিবেদিতাকেই আশ্রয় করলেন। তাঁদের বাঁচাবার জন্য নিবেদিতাকে স্বপক্ষ সমর্থন করতে হল। কে তাঁর বিপক্ষে? কি বলবেন তিনি?

'হঠাৎ সব বুঝতে পারলেন নিবেদিতা। শিব! শিব! কোন কালীদহ হতে বিষয়-বিষের জ্বালা ঢালতে এ কালনাগ ফুঁসে উঠেছে, নিবেদিতা তা বুঝলেন। মেয়েকে মুমূর্ষু মায়ের শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়ে এনে, ধর্মছেলের নষ্টস্মৃতি রোগিণীর মনে জাগিয়ে তুলে তিনিই তো একে ডেকে এনেছেন। কর্মজীবনে জগদীশ বসুর সাফল্য ঘটবে, এই ছিল নিবেদিতার সবচেয়ে বড় গর্ব আর সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। সেজন্য টাকা যোগাড় করবার একটা দুর্দম ইচ্ছা পেয়ে বসেছিল তাঁকে। তারই এই শাস্তি।

'মুহূর্তে নিবেদিতা নিজের মধ্যে গুটিয়ে এলেন। যে-অপশক্তি তাঁকে আশ্রয় করেছে, তাকে নির্জিত করে জীর্ণ করলেন। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে মরে গেল সে। নিবেদিতা অকূল আবেগে বলে ওঠেন, 'গরলাশান হে নীলকণ্ঠ, আমাকে

তোমার করে নাও। তোমার মাঝে থাকলে কোথায় পাপ, কোথায় বা পুণ্য। বিশ্বের সমগ্রতায় এই-যে আলোছায়ার দ্বন্দ্ব, আমায় তার সাক্ষী কর। আর কাজ নয়। শুধু নিঃশব্দে তোমার আলো ছড়িয়ে দেওয়া। আর কিছু না...'

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'তাঁহার (নিবেদিতার) পত্রগুলি পাঠে মনে হয়, একটা কিছু গোলমাল হইয়াছিল এবং ওলিয়ার অস্বাভাবিক আচরণে তিনি আতঙ্কিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাহার সহিত এক বাড়ীতে অবস্থান যুক্তিযুক্ত নহে, মনে করিয়া তিনি স্যারার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া বস্টনে অন্যত্র মিস অ্যালিস লংফেলোর সহিত কয়েকদিন অবস্থান করেন। অন্তর হইতে তিনি কেবলই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি কি ঐশ্বর্যের প্রার্থী? না, তিনি তো স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়াছেন। কিন্তু কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন। শীঘ্রই মিসেস বুলের উইল প্রকাশ হইবার পর জানা গেল, ওলিয়া উহার বিরোধিতা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমস্ত ব্যাপারটাই অপ্রত্যাশিত। নিবেদিতা মিঃ ই.জি. থর্পের উপর সব ভার অর্পণ করিয়া ইংলণ্ড যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি যেন ধীর, স্থির, অবিচলিত থাকিতে পারেন। যাহা সত্য, তাহাই হউক। শিব। শিব।'

এই সময়ে নিবেদিতাকে যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন, এই ঘটনা শুধু মানসিকভাবে নয়, শারীরিকভাবেও তাঁকে শেষ করে দিয়ে গিয়েছিল। এই কথা নিবেদিতার বোনও বলেছিলেন। নিবেদিতার বোন মে উইলসন বলেছেন—এই সময় নিবেদিতা যেন একেবারেই বুড়িয়ে গিয়েছিলেন। এক লাফে তাঁর বয়স দশবছর বেড়ে গিয়েছিল। মে উইলসন স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন, '১৯১১ সালের গ্রীষ্মকালের ধাক্কাই (সারা বুলের উইল নিয়ে মামলা) তাকে কার্যত মেরে ফেলেছিল। ট্যান্টিন (জ্যোসেফিন ম্যাকলিয়ড) সমস্ত পত্রপত্রিকার কর্তিত অংশ (মামলা সংক্রান্ত সংবাদ) পাঠাতেন। পরে এর জন্য তিনি আক্ষেপ করেন। নিবেদিতা মরমে মরে গিয়েছিল; ও নিজের রোগ গোপন করে রাখে। সকল বন্ধুকে শীতকালে তার সঙ্গে দেখা করে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করে, কিন্তু কেউ আসতে পারেনি। বন্ধুদের কাছে মনপ্রাণ খুলে ধরা প্রয়োজন হয়েছিল। স্বামীজির কথা আবার তার মনে গভীরভাবে এসেছিল। বসু তাকে প্রয়োজনীয় বোঝাপড়া দেখাননি।

'বোস্টনের প্রতিকৃতিতে যাকে (নিবেদিতাকে) দেখা যাচ্ছে, তা জীবনের শেষ পর্যায়ে এক ভাঙা নারীর চেহারা। তার পূর্ব পর্যন্ত আলোকরূপিণী এক নারী ছিল, যেন হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেছে। তাই বলে তার শক্তি নিঃশেষিত নয়—ওটা সংকটকালের ছবি— সহসা বুড়িয়ে যাওয়া এক নারীর।'

মে উইলসনের স্মৃতিচারণার এই অংশটুকু পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না, ওলিয়ার আচরণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নিবেদিতা তখন কারো আশ্রয় এবং সাহচর্য চেয়েছেন। কিন্তু মুখ ফুটে তাঁর মনের বেদনার কথা কাউকে বলতে পারেননি। এই সংকটকালেও স্বামীজিই শেষ পর্যন্ত তাঁর আশ্রয়স্থল হয়েছিলেন। নিজের আচার্যের কথা বারবার মনে পড়েছিল নিবেদিতার। মে উইলসনের স্মৃতিচারণার অংশবিশেষ পড়ে আরো একটি ধারণা মনে আসে যে, যে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান গবেষণার টাকার জোগাড় করতে গিয়ে সারা বুলের কন্যার কুৎসার মুখে পড়তে হয়েছিল নিবেদিতাকে, এই মানসিক বিপর্যয়ের সময় জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকেও যথাযথ সাহচর্য পাননি তিনি।

ওলিয়ার এই আচরণ কিন্তু সারা বুলের অন্যান্য আত্মীয়দের পীড়িত করেছিল। তাঁরা নিবেদিতার প্রতিই সহানুভূতিশীল ছিলেন। এমনকী সারা বুলের ভাই মি. থর্পই নিবেদিতার হয়ে এই মামলার দেখাশোনা করেছিলেন। ওলিয়ার আচরণে নিবেদিতা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও এই মামলা থেকে দুটি কারণে নিজেকে সরি নিতে চাননি। প্রথমত, ওলিয়ার কুৎসা তাঁর নৈতিক চরিত্রকে আঘাত করে কাজেই, নিবেদিতা চেয়েছিলেন, যতই কষ্টদায়ক হোক, এই মামলার ভিতর দি নিজের নৈতিক এবং চারিত্রিক সততাকে প্রতিষ্ঠা করবেন তিনি। দ্বিতীয়ত, নিবেদিত স্কুলটি চলত সারা বুলের অর্থসাহায্যে। নিবেদিতা জানতেন, যদি কোনো কারণে সেই অর্থসাহায্য বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে স্কুলটিও তাঁকে বন্ধ করে দিতে হবে। এই কারণেই উইলের মামলায় নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করে স্কুলের জন্য সারা বুলের দান আদায় করে আনতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নিবেদিতার মৃত্যুর পরও এই স্কুলের জন্য নিয়মিত অর্থসাহায্য পাঠিয়ে গেছেন সারা বুলের ভাই মি. থর্প।

১৯১১-র ২৯ মার্চ একটি চিঠিতে নিবেদিতা জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লিখেছেন, যে পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হবে, তিনি শান্তভাবে এবং সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করবেন। ব্যাপারটা নিরানন্দময় হলেও তাঁকে তা সহ্য করতেই হবে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'I have decided that the only thing I can do, in face of the ordeal through which I am to be put, is to be plucky and cool, and refuse to admit that I particularly mind. I have written to Mr. T [Thorp] that if I am necessary, I hope they will let you do duty instead, as I fancy my moods would only embarass the case. And I have written to Mr. Parkar to ask him

to protect certain confidential business discussions that I must have held with S. Sara at certain periods, and beyond that, I have nothing to say. Let things take their course. It will of course be unpleasent, but it must be borne—and can be. It was Swamiji who showed me this—and I saw a strange thing. Look through the Trial of Christ. You will notice all through that when the whole world had put Him on His trial, He was really trying the world! There's steadiness for you! Such is the strength of the Avatar. The whole of life and the depths of its anguish all seem to be necessary, to make one understand a little of the simple attitudes one saw in Him! I don't think we need refer to it furthur, and I don't want to know ANYTHING, though I can stand it, if required. Siva! Siva!'

কিন্তু নিবেদিতা যতই বলুন না কেন স্থির এবং অবিচলিত চিত্তে তিনি সবরকম আক্রমণের মুখোমুখি হবেন— তা কি হতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত? ওলিয়ার আচরণ এবং সারা বুলের উইলকে কেন্দ্র করে এই মামলা তাঁকে ভিতরে ভিতরে সব সময়ই যন্ত্রণা দিত। এতটাই দিত যে, শেষ পর্যন্ত এই মামলা-সংক্রান্ত কোনো সংবাদ শুনলেই তিনি মানসিকভাবে পীড়িত হয়ে পড়তেন। তাঁর মন এবং শরীরের ওপর চাপ পড়ত। আগেই উল্লেখ করেছি যে, মে উইলসনের স্মৃতিচারণাতেই রয়েছে, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডের কাছ থেকে এই মামলা-সংক্রান্ত খবরের কাগজে প্রকাশিত খবরের বিভিন্ন কাটিং যখন তাঁর কাছে আসত, তখন কতটা মানসিক ধাক্কা পেতেন নিবেদিতা। ১৯১১-র ৪ জুলাই জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে তিনি লিখেছেন, 'I am not always strong. I have terrible moments when I face the paper clippings... But don't send me other peoples' letters! Each reference is an added pain.'

এই কঠিন সময়ের ভিতরই আরো-একটি দুঃসংবাদ পেলেন নিবেদিতা— ১৮ ফেব্রুয়ারি স্বামী সদানন্দ কলকাতায় দেহত্যাগ করেছেন। স্বামীজির আহ্বানে প্রথমবার ভারতে পদার্পণ করার সময় থেকেই সদানন্দ ছিলেন নিবেদিতার সহযোগী, সহচর। কঠিন সময়ের ভিতরও সদানন্দ নিবেদিতার পাশে থেকে তাঁর সর্বকাজে সর্বরকম সহায়তা করে গিয়েছেন। নিবেদিতার স্কুল চালু করা এবং সেখানে ছাত্রী সংগ্রহ করে আনায় সদানন্দের যে এক বিরাট ভূমিকা ছিল— তা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে। এক অর্থে বলতে গেলে সদানন্দ

ছিলেন নিবেদিতার পরম অবলম্বন। সদানন্দের মৃত্যু সংবাদ যে নিবেদিতাকে মানসিকভাবে আরো বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তা বলাই বাহুল্য। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'নিবেদিতা চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। স্বামী সদানন্দ তাঁহার পরম আত্মীয়। স্বামীজির দেহত্যাগের পর হইতে তিনিই কতকটা তাঁহার স্থান পূরণ করিয়াছিলেন। গত বৎসর অসুস্থ হইয়া আসিলে নিবেদিতাই তাঁহার থাকিবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীর অতি নিকটে একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। নিবেদিতা বহু সময় তাঁহার পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। অবসরমত তাঁহার নিকট গিয়া বসিয়া নানা কথাবার্তা বলিতেন। মিসেস বুলের কঠিন পীড়া সম্বন্ধে টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি দার্জিলিং হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য-গমন স্বামী সদানন্দ অবহিত ছিলেন না। দার্জিলিং যাইবার পূর্বে যখন তিনি স্বামী সদানন্দের নিকট বিদায় লইতে গিয়াছিলেন, তখন কি একবারও ভাবিয়াছিলেন, ইহাই শেষ সাক্ষাৎ। এক এক করিয়া অনেক কথা মনে পড়িল। প্লেগকার্যে তিনি সদানন্দের কী উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছেন: বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা, কাশী সর্বত্র তাঁহার বক্তৃতা সফরে সদানন্দই ছিলেন সঙ্গী। তাঁহার সমস্ত কার্যে সদানন্দের আন্তরিক সমর্থন তাঁহাকে কত আশ্বাস দিয়াছে! নিবেদিতার প্রতি তাঁহার কী অগাধ স্নেহ, বিশ্বাস! 'The Master as I saw Him' প্রকাশ হইলে সদানন্দের কত আনন্দ। সব শেষ। নিবেদিতা যেন ধীরে ধীরে মৃত্যুর পদধ্বনি নিজের অন্তরেও শুনিতে পাইলেন। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না, কারণ তিনি জানিয়াছেন, মৃত্যুর অর্থ এক অনন্ত সত্ত্বায় নিজের সত্ত্বার বিলুপ্তি।'

সত্যিই কি নিবেদিতা মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন? নিবেদিতার বোন মে উইলসনের স্মৃতিচারণা থেকে জানতে পারি, নিবেদিতা নিজের অসুস্থতা গোপন করে রেখেছিলেন। এমনকী, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে, ১৯১১-র ৩ অক্টোবর, বাড়িতে যে চিঠিটি লিখেছিলেন নিবেদিতা, তাতেও নিজের গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ দেননি। ওই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Himself's [Dr. Bose's] letter may alarm you. No need. Everyone in the house caught a cold on arrival— and when all had finished. I took a bad attack of dysentry— the complaint characteristic of the Hills.' নিবেদিতার এই পত্রটি পড়লে মনে হয়, জগদীশচন্দ্র সম্ভবত নিবেদিতার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ তাঁর পরিবার-পরিজনকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরিবারের সদস্যরা যাতে চিন্তিত না হন, তার জন্যই নিবেদিতা অসুস্থতার বিষয়টিকে লঘু করে দিতে চেয়ে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। কিন্তু, এরই পাশাপাশি দেখা যাবে, নিবেদিতার ভিতর

যেন সবকিছু থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। সারা বুল এবং স্বামী সদানন্দের মৃত্যু নিঃসন্দেহে নিবেদিতাকে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। নিবেদিতার কি মনে হয়েছিল, তাঁর আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ একে একে তাঁর ভালোবাসার লোকদের সরিয়ে নিচ্ছেন? নিবেদিতা কি বুঝতে পারছিলেন তাঁরও জীবনকালটি ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে? এদিক দিয়েও আচার্য বিবেকানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার কত মিল! স্বামীজিও প্রয়াণের আগে নিজেকে সবকিছু থেকে বিযুক্ত করে নিয়েছিলেন। শান্তভাবে অপেক্ষা করছিলেন শেষ সময়টির জন্য। মৃত্যুকে গ্রহণও করেছিলেন খুব শান্ত এবং সমাহিত চিত্তে। সারা বুলের প্রয়াণের পর থেকে নিবেদিতার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সময়কালকে যদি বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, নিবেদিতাও যেন শান্ত সমাহিত চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার জন্যই বসে আছেন। ওই সময়ে নিবেদিতার চিঠিপত্রেও তাঁর এই মানসিকতার ছায়া পড়েছে। সারা বুলের মৃত্যুর পর যখন ভারতে ফিরে আসছেন নিবেদিতা, সেই সময়ে, ১৯১১-র ২৪ মার্চ, জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে তিনি লিখেছেন, 'And I could break down and cry like a child, at being alone! There's strength for you! Give my love to everything and everyone—but especially to the S.K.R.s—and, if you should be writing there, to May. I'm just going to trust-trust-trust-and be silent. Isn't it true that only 20 years of solitude in a cave, could wipe out all these impressions of nervous attachment, and make one really free and self-sufficient? But even then, it would not be so, unless in that solitude, one had plunged all the time into Brahman! In that infinite realisation, one could be ever blissful.'

এরপর কলকাতায় ফিরে ১৬ আগস্ট জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে আবার লিখছেন, 'Oh Yum, I would be glad to die. Life has in many ways been such a failure, and I can not feel that I am really essential to the Women's Education—and yet, as long as I live, and we are not rich enough to separate, I have to be counted! Everything would it seems to me go better, if I could be left out! Only one or two books remain, that I certainly ought to write. Even of them, the Bairn's Life can be far better written by S.K.R [S.K. Ratcliffe]. History—a few studies—and Education—these are the subjects on

which I still have something to say, and the Bairns to help through one more phase in science. And then—all might— well end. And I wish it would. I dread outliving everyone I care for. Of course it would be different if one could realise the golden aspirations of 1898— and live in a cell. But even then— and it seems impossible to attain, nor does one seem commonly worthy of the chance— one could write no more and teach no more!'

কেন নিবেদিতা তাঁর চিঠিতে লিখছেন 'And then—all might well end?' সব কাজ শেষ করে বিদায়ের সুর বাজছে কি তাঁর কণ্ঠে? এই বিদায়ের সুর আরো বেশি করে ধরা পড়েছে ১৯১১-র ৫ সেপ্টেম্বর অ্যালিস লংফেলোকে লেখা চিঠিতে। নিবেদিতা লিখেছেন, 'It is now the exact moment of 'Candle light'— my lamp has this instant been brought to me—and the sounding of conch-shells and gongs is begining all round for the evening worship. This is the moment for prostrating oneself before holy persons or holy things. Oh what sweet memories crowd upon one, for those last 13 years! How wonderfully full and deep is the wave that overwhelms the soul at twilight! "Beyond life and death" as Swamiji always insisted. He was never contented to say either word alone. One has need of realising that these days—for death is taking so many so many of those one has known and loved.

'...when one thinks of these things—what a bondage and what a darkness the body seems! How it blinds as well as fetters, us! We cannot express what we would. That is so true. But unless we have reached to where the great souls are!—We can not even feel it, cannot fathom our own hearts! Isn't that a terrible thought? And yet it is a mere commonplace of fact.

'An old Irish Saga makes one of the heroes say: "What's the good of living? Our servants can do that for us! There's nothing worth possessing but the Infinite, and only the dead possess that!" But I don't think all the dead posses it! Else why should not all

the living realize it too? The Infinite Fact is one, whether we—living or dead—as we call it—stand in one place or the other, to realize it.'

চিঠিটি নিবেদিতা শেষ করছেন এভাবে, 'Swamiji would say, there could indeed be no conduct if life without standards. But by the severe self-discipline of all these standards, we acquire power to turn away from life and realize the Oneness that embraces all phenomena. Then comes non-discrimination when praise and blame are the same—heat and cold the same. In other words, as long as we are selfish, our standards restrain our selfishness. But when all selfishness is gone, there will be no need of standards—because no temptation can appeal to us. Desire will be cut away at the root. We shall like good things for ourselves, not a whit better than good things for others—this is non-discrimination.

'Oh how selfish we are now!'

সারা বুলের মৃত্যুর পর নিবেদিতা আর বেশিদিন আমেরিকায় থাকেননি। তাড়াতাড়ি ভারতে ফিরে আসার ব্যবস্থা করেন তিনি। সারা বুলের ভাই মি. থর্পকে তাঁর হয়ে মামলা দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে নিবেদিতা লন্ডনে চলে আসেন। তাঁর লন্ডনে আসার খবর পেয়ে অনেক পুরনো বন্ধুই দেখা করতে আসেন। এঁদের ভিতর ছিলেন র‍্যাটক্লিফ, নেভিনসন, অধ্যাপক চেইনি প্রমুখ। এ দেখা-সাক্ষাৎ হয়তো দৈব নির্দেশিতই ছিল। কেউই তখনো জানতেন না নিবেদিতার সঙ্গে এটিই তাঁদের শেষ সাক্ষাৎকার। লন্ডনে কিছুদিন কাটিয়ে তিনি এলেন প্যারিসে। প্যারিসে জোসেফিন ম্যাকলিয়ড এবং শ্রীমতী লেগেট নিবেদিতার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। জোসেফিনের সঙ্গে প্যারিসে কয়েকটা দিন কাটালেন নিবেদিতা। জোসেফিনের সান্নিধ্য তাঁকে কিছুটা মানসিক শান্তিও দিল। দুই অভিন্নহৃদয় বান্ধবীর সেটাই ছিল শেষ সাক্ষাৎ। জোসেফিনও জানতেন না, নিবেদিতা তাঁর কাছে চিরবিদায় নিতে এসেছেন। জোসেফিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ২৩ মার্চ ভারতগামী জাহাজে উঠলেন নিবেদিতা। ৭ এপ্রিল জোসেফিনকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Dawn is breaking over Bombay harbour. The island-hills rise out of the water shrouded in night-greyness, which they are gradually putting off. And the smell of the hot sunbaked soil comes across the

water—and across the little boats with their swallow sails. And it is India —India at last.'

লিজেল রেমঁ লিখছেন, '১৯১১ সন ৭ই এপ্রিল, সকাল ছ'টা। নিবেদিতা শেষবারের মত ভারতে পৌছলেন। বম্বে বন্দরে ভোর হচ্ছে। জলের মধ্যে থেকে পাহাড়ী দ্বীপগুলো মাথা তুলেছে। আবছা আলোয় সব ধূসর। সে ধূসরতাও ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকে ভাসছে পালতোলা ছোট্ট ডিঙি নৌকা। তাদের উপর দিয়ে রোদে-পোড়া গরম মাটির একটা গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে।

'এই আমার ভারতবর্ষ। এসে পৌছলাম শেষ পর্যন্ত...' ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়েছেন এমনি মনে হয় নিবেদিতার।'

আর ওলিয়া? যাঁর মানসিক অত্যাচারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন নিবেদিতা, নিবেদিতার ঘনিষ্ঠজনেরা যাঁকে দায়ী করেছিলেন নিবেদিতার অকালে চলে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে, কী হল সেই ওলিয়ার? নিবেদিতা এপ্রিল মাসে ভারতে পৌছনোর দু মাস পরে খবর এল সারা বুলের উইলের মামলায় ওলিয়ার পরাজয় হয়েছে এবং ১৮ জুলাই ১৯১১ ওলিয়ার মৃত্যু হয়েছে। লিজেল রেমঁ লিখেছেন ওলিয়া আত্মহত্যা করেছিলেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে অবলা বসুর একটি চিঠি অন্য কথা বলছে। অধ্যাপক মনমোহন ঘোষের কন্যা লতিকা ঘোষকে একটি চিঠিতে অবলা বসু লেখেন, 'নিবেদিতা তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে মিসেস্ ওলে বুলকে দেখিতে আমেরিকা গমন করেন। মিসেস্ ওলে বুল পেটের যন্ত্রণায় (খুব সম্ভবতঃ ক্যান্সার রোগে) অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাত্রা করিবার পূর্বে নিবেদিতা ডাঃ নীলরতন সরকারের নিকট হইতে বেলের মোরব্বা মিসেস্ ওলে বুলের জন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। নিবেদিতার উপস্থিতকালেই মিসেস্ ওলে বুলের মৃত্যু হয়। মিসেস্ ওলে বুল তাঁহার উইলে রামকৃষ্ণ মিশনকে অনেক টাকা দান করিয়া যান। মিসেস্ ওলে বুলের কন্যা (ওলিয়া) রামকৃষ্ণ মিশনকে এত টাকা দেওয়ার জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, নিবেদিতা তাঁহার মাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছেন। এবং নিবেদিতার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মোকদ্দমা করিবে বলিয়া শাসাইল। নিবেদিতা নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার হইতেন, যদি না মিসেস্ ওলে বুলের ভ্রাতা ও তাঁহার পত্নী নিবেদিতাকে লুকাইয়া রাখিয়া গোপনে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিতেন। শোনা যায়, পরে মিসেস্ ওলে বুলের কন্যা তাহার ব্যবহারের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু নিবেদিতা এই আঘাতে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া পড়ায় তাঁহার শরীর ও মন সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার ছয় মাস পর মিসেস্ ওলে বুলের কন্যার রাজযক্ষ্মায় (গ্যালপিং থাইসিস) মৃত্যু হয়। এই সংবাদ পাইয়া নিবেদিতার শরীর আরো ভাঙ্গিয়া যায়।

অবলা বসুর এই চিঠিটির উল্লেখ করেছেন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, তাঁর 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে। তবে ওলিয়া আত্মহত্যা করেছিলেন, নাকি যক্ষ্মায় মারা গিয়েছিলেন, তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। অবলা বসুর চিঠিটি পড়ে আরো জানা যায়, ওলিয়ার মৃত্যুও নিবেদিতাকে যথেষ্ট পীড়িত করেছিল। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা, ওলিয়া তাঁর বিরুদ্ধে যতই বিষোদ্গার করুন না কেন, স্বামীজির মতো নিবেদিতাও সারা বুলের এই মানসিক ভারসাম্যহীন কন্যাটিকে স্নেহের চোখেই দেখতেন। দেখতেন বলেই, সারা বুলের শেষ সময়ে ওলিয়াকে ডেকে এনে মাতা-কন্যার মিলন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। স্নেহ করতেন বলেই ওলিয়ার আচরণ তাঁকে এতখানি ব্যথিত করেছিল যে, মানসিক এবং শারীরিক দুদিক থেকেই তিনি নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

১৯১১-র এপ্রিল মাসে যে নিবেদিতা লন্ডন থেকে শেষবারের মতো কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলেন, তিনি ১৮৯৮ সালের মার্গারেট নোব্‌ল নন; বরং, ১৯১১-র এপ্রিলে কলকাতায় পা রেখেছিলেন যে নিবেদিতা তিনি ক্লান্ত, বিষণ্ণ, ভেঙে পড়া এক নারী।

বারো

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে শেষবারের মতো কলকাতায় ফিরে আসার পর নিবেদিতার দিনগুলি কীভাবে কেটেছিল? লিজেল রেমঁর লেখা থেকে জানা যায়, ক্রমশ সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে আনছিলেন নিবেদিতা। অন্তরালেই তাঁর দিনগুলি এই সময়ে কাটছিল। রেমঁ লিখেছেন, 'রুদ্ধদ্বারের আড়ালে একা নিবেদিতার দিন কাটে। সংবাদপত্রে নিবন্ধ রচনার কাজে আর হাতে দেননি। কাজে-কাজেই এত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন যে পুরাপুরি খেতে পেতেন কিনা সন্দেহ। বাইরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, কোথাও আর নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না। আর যেন কোনো কর্তব্যই তাঁর অবশিষ্ট নাই। বাইরের ধরণ-ধারণ দেখে মনে হত, তাঁর সব পরিকল্পনা দেউলিয়া হয়ে গেছে। যারা ভিতরের কথা জানত না, তারা অনেকেই নিবেদিতাকে করুণার চোখে দেখত। 'খোকা'কে সাহায্য করা আর ঠাকুর-দেবতাদের সম্বন্ধে দু'-একটা গল্প লেখা ছাড়া আর সব কাজ নিবেদিতা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

'ঠাকুর-দেবতারা আসেন। নিবেদিতা ভক্তিভরে তাঁদের আসন পেতে দেন। অনেকক্ষণ তাঁদের আলাপ চলে। নিবেদিতা লিখে রেখেছেন সেসব। যে ঠাকুর যে ফুল ভালবাসেন, তাঁর জন্য তা-ই কিনে আনেন। বিশেষ করে সাদা ধুতুরা এনে দেন শিবের পায়ে। সূর্য-তারা নিয়ে, ভোরবেলার গোলাপী কুয়াশা আর গোধূলির কবোষ্ণ নীহারকণা নিয়ে খেলে বেড়ান গৌরী, উমা, শঙ্করী। জানালার খড়খড়ি নামিয়ে রাখেন নিবেদিতা, ঠাকুরদের অসুবিধা না হয় যাতে। প্রত্যেকটি মুহূর্তই স্বচ্ছ প্রশান্তিতে ঝলমল, সুন্দর পবিত্র ঐশ্বর্য যেন উপচে পড়ছে।

'...ঘর থেকে সব ছবি সরিয়ে ফেলেছিলেন। হৃদয় তাঁর শূন্য, নির্মম, নিরাবরণ। আর কি তাকে ভরে তোলবার দরকার আছে? দেবতাকে পাওয়ার তৃষ্ণাও যে আর

নাই। অনন্তের সৌষম্যে নিবেদিতা আত্মহারা, অবিচল প্রশান্তি নিয়ে চেয়ে আছেন শুধু।' রেমঁ-র এই লেখা পড়লে মনে হয়, নিবেদিতা যেন তখন মানসিকভাবেই সবকিছু থেকে বিযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এই সময়ে নিবেদিতার লেখা তিনটি পড়লেও এই একই কথা মনে হয়। সমস্ত বন্ধন থেকে নিবেদিতা যে তখন নিজেকে মুক্ত করতে চাইছেন— এই তিনটি লেখাই তার প্রমাণ। এর কারণ হয়তো নিবেদিতার শারীরিক অসুস্থতা। সারা বুলের মৃত্যুর পর নিবেদিতার শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়েছিল। তাঁর এই অসুস্থতার খবর নিবেদিতা বন্ধুদের বা আত্মীয়-পরিজনদের সেভাবে জানাননি। কিন্তু শরীর যে তাঁর শেষ হয়ে আসছে— তা হয়তো নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন। ওই সময়ে নিবেদিতার তিনটি লেখা 'The Beloved', 'Play' এবং 'Death'-এ তাঁর এই অন্তর্লীন অবস্থার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এই তিনটি লেখাই নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্রের ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

'Play' শীর্ষক লেখাটিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'The ideals of play-ground overflow into life itself. 'No gain but honour' becomes everywhere the watchword of the noblest lives. And the ideal itself crystalises to its own soul and essence; honour is conceived of, but as innermost honour, something that is to mantle us secretly, in the hour of prayer,—a light burning within the oratory, and lighting up the image,—a secret between ourselves and God.'

'The Beloved'-এ লিখেছেন, 'Let me ever remember that the thirst for God is the whole meaning of life. My beloved is the Beloved, only looking through this window. Only knocking at this door. The Beloved has no wants, yet He clothes Himself in human need, that I may serve Him. He has no hunger, yet He comes asking, that I may give. He calls upon me, that I may open and give Him shelter. He knows weariness, only that I may afford rest. He comes in the fashion, of a beggar, that I may bestow. Beloved, O Beloved, all mine is thine. Yea, I am all thine. Destroy thou me utterly, and stand thou in my stead!'

নিবেদিতার এই লেখাগুলি পড়লে মনে হয়, জাগতিক সমস্ত বিষয় থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার জন্যই যেন অপেক্ষা

করছিলেন তিনি। এদিক দিয়েও তাঁর আচার্য বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য। স্বামীজিও মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকেই, বিশেষ করে অমরনাথ ঘুরে আসার পর থেকেই, নিজেকে 'মা'-এর কাছে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন।

'Death' শীর্ষক লেখাটিতে নিবেদিতা লিখেছেন, 'I thought last night that interfused with all this world of matter, penetrating it through and through, there may be another, call it meditation, or mind, or what one will, and perhaps that is what death means. Not to change one's place—for since this is not matter, it can have no place— but to sink deeper and deeper into that condition of being more and more diverted of the imagination of body. So that our dead are close to us physically, if it comforts us to think so of them, and yet one with all vastness, one with uttermost freedom and bliss.

'And so I thought of the universal as mingled in this way with the finite, and we standing here on the borderline between the two, commanded to win for ourselves the franchise of both— the Infinite in the finite. I am thinking more and more that Death means just a withdrawal into meditation, the sinking of the stone into the well of its own being. There is the beginning before death, in the long hours of quienscence, when the mind hangs suspended in the characteristic thought of its life, in that thought which is the residuum of all its thoughts and acts and experiences. Already in these hours the soul is discarnating, and the new life has commenced.

'I Wonder if it would be possible so to resolve one's whole life into love and blessing, without one single ripple of a contrary impulse that one might be wrapt away in that last hour and for evermore into one great thought; so that in eternity at least one might be delivered from thought of self, and know oneself only as a brooding presence of peace and benediction for all the need and suffering of the world.'

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'সময় সময় বিষণ্ণতায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত। হায়! কত কাজ অসমাপ্ত পড়িয়া রহিল। কৃতকর্মের পরিমাণ কত ক্ষুদ্র! স্বামিজীর অর্পিত কর্মের কতটুকু তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন? তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী মেয়েদের আশ্রম বা ছাত্রীনিবাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত। তাঁহার কত আগ্রহ ছিল, শ্রীযুক্ত বসুর বিজ্ঞান গবেষণায়, ল্যাবরেটরী-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবেন। ভারতীয় শিল্পকলার পুনরভ্যুদয় সবে আরম্ভ হইয়াছে। নবীন শিল্পিগণকে সাহায্য ও উৎসাহ দান কত প্রয়োজন। তাঁহার রচনাবলীর অধিকাংশই অপ্রকাশিত। দেশ এখনও স্বাধীন হয় নাই; জাতীয়তার পুনরুত্থানে কত কী করিবার ছিল। কিন্তু কে যেন পরক্ষণে তাঁহার অন্তর হইতে বলিয়া উঠিত, 'জগতের বোঝা বহন করবার তুমি কে? তোমার নিজের কাজ করে যাও, অপরের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। নিজের কাজ আগে শেষ কর।' ধীরে ধীরে অন্তরের অন্তরালে এক গভীর প্রশান্তি তিনি অনুভব করিতেন। জীবনের শেষ কথা আত্মসমর্পণ। যে দেবতার চরণে একদা তিনি নিবেদিত হইয়াছিলেন, সেই জীবন-দেবতার আহ্বান তিনি যেন শুনিতে পাইতেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়া সেই বাঞ্ছিত দেবতার সহিত মিলন। সেই জীবন দেবতার জন্য, ঈশ্বরের জন্য গভীর ব্যাকুলতাই কি জীবনের অর্থ নয়?'

নিবেদিতা এর আগে জ্যোতিষী কিরোকে দিয়ে ভবিষ্যৎ গণনা করিয়েছিলেন। কিরো ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, ৪২ থেকে ৪৯ বছর বয়সের ভিতর নিবেদিতার মৃত্যু হবে। ১৯০৪ সালের ১৭ মার্চ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'Do you remember that how Chiro foretold that I would die between the 42nd and 49th years? I am now 36. So I suppose I shall see this cycle through. I fancy I shall die in 1912.' নিবেদিতার ধারণা হয়েছিল তিনি ১৯১২ সাল অবধি বাঁচবেন। ১৯১১ সালে নিবেদিতার বয়স হয়েছিল ৪৩। কিরোর ভবিষ্যৎবাণী যে এত তাড়াতাড়ি ফলে যাবে, বোধকরি, তখনও তা কেউ আন্দাজ করতে পারেনি।

এপ্রিল মাসে নিবেদিতা যখন কলকাতায় ফেরেন, সেই সময়ে সারদা দেবী কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় ছিলেন। ১৭ মে সারদা দেবী জয়রামবাটি ফিরে যান। এই সময়টুকুতে নিবেদিতা মাঝে মাঝেই সারদা দেবীর কাছে যেতেন। সারা বুলের অন্তিম সময়ের বিবরণও তিনি দিয়েছিলেন সারদা দেবীকে। ওই বছরেরই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বেলুড় মঠে যান নিবেদিতা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী

তুরীয়ানন্দের সঙ্গে অনেকক্ষণ একান্তে আলাপ-আলোচনা করেন। মঠে স্বামীজির ঘরটিতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ নীরবে বসে থাকেন। বেলুড় মঠে এটিই তাঁর শেষ আসা।

সারা বুলের উইলের মামলাটির ভবিষ্যৎ নিয়েও নিবেদিতা এই সময়ে যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। কারণ, সারা বুলের অর্থের ওপর নির্ভর করেই নিবেদিতার স্কুলটি চলত। সারা বুল জীবিতাবস্থাতেই নিবেদিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর উইলে তিনি কয়েক হাজার পাউন্ড রেখে যাবেন এবং নিবেদিতার ইচ্ছানুযায়ীই তা ভারতের উন্নতিকল্পে কোনো ভালো কাজে ব্যয় করা হবে। সারা বুলের এই প্রস্তাব পাওয়ার পর নিবেদিতা ১৯০৬ সালের ১৬ জুলাই সারা বুলকে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি জানান, সারা বুলের প্রতিশ্রুত অর্থ কোন কোন খাতে তিনি ব্যয় করতে চান। নিবেদিতা তিনটি খাতে ওই অর্থ বরাদ্দ করার কথা ভেবেছিলেন। প্রথমত, স্কুল চালাবার জন্য তাঁর সঞ্চিত অর্থ থেকে ১০০০ পাউন্ড, স্বামীজি-সংক্রান্ত তাঁর পুস্তক এবং তাঁর লেখা অন্যান্য পুস্তকসমূহ থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং সারা বুলের প্রতিশ্রুত ২০০০ পাউন্ড। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে আগ্রহী নিবেদিতা চেয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পকলা প্রতিযোগিতার জন্য ১০০০ পাউন্ড নির্দিষ্ট রাখতে। তার সুদ বাবদ প্রাপ্য অর্থ থেকে প্রতিবছর কোনো ভারতীয় শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হবে। এবং তৃতীয়ত, অবশ্যই জগদীশচন্দ্র বসু। নিবেদিতা চেয়েছিলেন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার জন্য ৩০০০ পাউন্ড বরাদ্দ থাকবে এবং জগদীশচন্দ্র তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী সেই অর্থ খরচ করবেন। নিবেদিতা তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন, 'To Christine, for the work: £ 1000 plus my share of Swamiji's works, plus my books, plus £ 2000 from the bequest if it vevr comes into my hands. And my bequest furthur.

'To the Nation: to be settled by a Committee of say three French and American artists, a prize of the interest of £ 1000, for the best cartoon of Indian History—in Oriental style—by an Indian artist, man or woman.

'To Science: the remaining £ 3000 of the bequest. This is to be at the disposal of my friend and to be used preferably for two I shall name. But according to the best of his ability for Indian Science. I would have been glad to remember Ireland. But that is not my business. If christine wishes— she might set aside a small sum for that.'

সারা বুলের মৃত্যুর পর তাঁর এই দানশীলতার কথা নিবেদিতা উল্লেখ করেছেন সারা বুলের স্মরণে একটি লেখায়। নিবেদিতা লিখেছেন, 'In America today universities, research organizations, and educational experiments, have often in a similar way, to remember the sympathy and understanding, as well as the means extended to them at essential moments, pre-eminently by women. Amongst those who gave, Mrs. Ole Bull was a lavish giver. Her gifts were hidden, constant, guided by a sense of justice that never forgot the rights of those who belonged to her and undeniably based on personal economics...

'...Her charity reached out to large things as well as small, but always with an equal hiddenness, alway with the same care for the personality at the centre of the need. "Sattvic charity, the highest charity," says that Hindu Gita "is extended to the right person, in the right place and at the proper time." And says the Christian scripture, "He that giveth, let him do it with simplicity."

সারা বুলের মামলার ফলাফল সম্পর্কে নিবেদিতা এই কারণেই চিন্তিত ছিলেন যে, তিনি জানতেন, উইলে সারা বুল তাঁর কাজের জন্য যে অর্থবরাদ্দ করে গিয়েছেন, তা কোনো কারণে না পেলে মেয়েদের স্কুল চালানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে। অথচ উইলে তাঁর জন্য বরাদ্দ অর্থ তো দূরের কথা, সারা বুলের কন্যা ওলিয়া এক হাজার পাউন্ডও নিবেদিতাকে দিতে রাজি ছিলেন না। অবশ্য লেডি মিন্টোর সঙ্গে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের কারণে স্কুলের জন্য সরকারি অর্থসাহায্য পাওয়া নিবেদিতার পক্ষে খুব অসম্ভব ছিল না। সেই অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব লেডি মিন্টোর পক্ষ থেকে এসেছিলও। কিন্তু নিবেদিতা দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। নিবেদিতা চাননি ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় তাঁর স্কুল চলুক। বিশেষ করে সেই সরকারের বিরুদ্ধে যখন তিনি স্বাধীনতার আন্দোলন করছেন। নিবেদিতার এই ইচ্ছাকে সম্মান জানাতেই তাঁর মৃত্যুর পরও দেশ স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত নিবেদিতা স্কুল কোনো সরকারি সাহায্য গ্রহণ করেনি। জুলাই মাস অবধি নিবেদিতাকে স্কুল চালানোর অর্থ জোগাড়ের জন্য দুশ্চিন্তার ভিতর দিন কাটাতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মামলায় ওলিয়া হেরে যান এবং সারা বুলের ভ্রাতা

নিবেদিতাকে জানান, নিবেদিতার কাজ চালানোর জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। এই সংবাদে নিবেদিতা অনেকটাই আশ্বস্ত হন।

কিন্তু এই বছরই স্বামী সদানন্দ ছাড়াও আরো দুজনের মৃত্যু নিবেদিতাকে আরো বিষণ্ণ করে তুলেছিল। এঁরা হলেন স্বামীজির মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। স্বামী সদানন্দ মারা গিয়েছিলেন নিবেদিতা আমেরিকায় থাকাকালীন। ভুবনেশ্বরী দেবী এবং রামকৃষ্ণানন্দ মারা গেলেন নিবেদিতা কলকাতায় ফেরার পর। ২৫ জুলাই ভুবনেশ্বরী দেবী মারা গেলেন। তার একমাসের ভিতরই, ২১ আগস্ট মারা গেলেন রামকৃষ্ণানন্দ। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'ওদিকে অধ্যাত্মজীবনে যাঁদের পরে নির্ভর ছিল, একে-একে সবাই তাঁরা সরে গেলেন। স্বামী সদানন্দ মারা গেলেন ফেব্রুয়ারিতে। স্বামীজির মা ছিলেন, মমতা আর সেবা দিয়ে বৃদ্ধার শেষের কটা দিন নিবেদিতা শান্তিতে ভরে দিয়েছেন — এবার তিনিও গেলেন। পাশের বাড়িতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মুমূর্ষু। নিবেদিতা ভালবাসতেন তাঁকে।

'হঠাৎ যেন নিজেকে জরাজীর্ণ অথর্ব মনে হয়, গঙ্গার ঘাটে সন্ন্যাসীর শবানুগমন করবার সামর্থ্য পান না। শ্মশানযাত্রীরা চলে যাওয়ার পরও বহুক্ষণ বরানগর পুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন। অবশেষে অস্তসূর্যের রক্তআভার সঙ্গে চিতাবহ্নির লেলিহান শিখা চোখে পড়ল নিবেদিতার। অমনই আগুন জ্বলছে তাঁর অন্তরে। জ্বলছে প্রজ্ঞাপারমিতার অনির্বাণ দাহ।'

কলকাতায় ফিরে আসার পর নিবেদিতা প্রায়ই ভুবনেশ্বরী দেবীকে দেখতে যেতেন। স্বামীজির ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সেই সময়ে বিদেশে। নিবেদিতা ভূপেন্দ্রনাথকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি ভুবনেশ্বরী দেবীকে দেখবেন। সেই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন নিবেদিতা। ভুবনেশ্বরী দেবীর শেষ সময়টিতেও শয্যাপার্শ্বে তিনি উপস্থিত ছিলেন। শ্মাশান পর্যন্ত মৃতার অনুগমনও করেন তিনি। শ্মশানে বসেই ভূপেন্দ্রনাথকে সমবেদনা জানিয়ে একটি পত্র লিখেছিলেন।

রামকৃষ্ণানন্দ মারা যাওয়ার দিন ২১ আগস্ট ১৯১১-তে একটি চিঠিতে নিবেদিতা জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে ওই দিনটির কথা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছিলেন। নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'How fast Swamiji is gathering them in! Swami Ramakrishnananda is gone! At 1 today when his rice was ready, and he had had a good morning of normal temperature, and eating this and that, fruit and what not, they thought he was sleeping for a few minutes and suddenly found

that he was dead! What peace! There was no sign of struggle on that wonderful face, so full of strength, when I went to take my leave—at ½ past 3.

'Then I was fortunate enough to be able to send flowers—and about ½ past 5 they sent for me to follow the body to the Ganges side. I went upto a bridge, on the way to Baranagore, and then, being too old for those miles of walking, I turned back, and came home alone. He was being carried, with chanting, on the shoulders of the boys, to Baranagore, there, if possible, to take him to the Math— but if not, to burn him at the Ghat where Sri Ramakrishna was burned—and close to which he lived so many many years, in the Baranagore Math, when he was the very roof-tree of the Order. A perfect life! And Ended! Ah, that is triumph!

'I stood and watched the dead out of sight, before I turned. He was going once more, I thought—what a blessed pilgrimage! —along that road where they all went as boys, to see their Master. And so he, who swept the circle of the South, completes it to the very inch by this return to the Place of vows. It is dark now, and the evensong bells are sounding in all directions, and the air about here is heavy with chants. But I am thinking of the red flames in the Burning [Pages Missing]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উদ্বোধনের বাড়িতে দেহত্যাগ করেছিলেন। স্বামীজির যে কজন গুরুভ্রাতার সঙ্গে নিবেদিতার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। স্বামীজির প্রয়াণের পর তাঁর জীবনী রচনার জন্য নিবেদিতাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণানন্দ। নিবেদিতা যখন বক্তৃতা সফরে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন, তখন রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্বে ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে বক্তৃতা সফরেও রামকৃষ্ণানন্দ অশেষ সাহায্য করেছিলেন। সারা বুলের মৃত্যুর পর কলকাতায় ফিরে এসে অসুস্থ রামকৃষ্ণানন্দকে দেখতে প্রায়ই উদ্বোধন বাড়িতে যেতেন নিবেদিতা।

এই সব ঘটনার পাশাপাশি, সারা বুলের মৃত্যুর পর কলকাতায় ফিরে এসে আর-একটি ঘটনাও তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। আগেই উল্লেখ করেছি,

সিস্টার ক্রিস্টিন নিবেদিতা স্কুলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। কী কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন তা জানা যায় না; আন্দাজ করা হয়, কোনো একটি কারণে মতানৈক্য হয়েছিল নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'নিবেদিতা এবং কৃস্টীনের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। সুখে দুঃখে উভয়ে মিলিয়া বহুদিন একসঙ্গে কাজ করিয়াছেন। সেই প্রীতির সম্পর্ক সহসা কেন ছিন্ন হইল, কী সূত্রে তাঁহাদের মধ্যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিল, তাহা আমাদের অজ্ঞাত।' ক্রিস্টিন ১৯১০ সালে ব্যক্তিগত কারণে বেশ কিছুদিনের জন্য আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। সম্ভবত ওই সময় থেকেই নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছিল এবং তিনি নিজেকে নিবেদিতা স্কুল থেকে সরিয়ে নেবার কথা ভাবছিলেন। ১৯১১ সালের গোড়ায় ক্রিস্টিন কলকাতা ফিরে আসেন; কিন্তু কিছুদিন কলকাতায় থাকার পরই তিনি এফ জে আলেকজান্ডারকে সঙ্গে নিয়ে মায়াবতী চলে যান। ১৯১১-র ২০ আগস্ট জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে জানা যায় ১৯ এপ্রিল ক্রিস্টিন মায়াবতীর দিকে রওয়ানা দিয়েছেন। এর কিছুদিন পরেই, গ্রীষ্মকালে জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুর সঙ্গে নিবেদিতাও মায়াবতী আশ্রমে ছুটি কাটাতে যান। এই মায়াবতী আশ্রমে অবস্থানকালেই ক্রিস্টিনের পক্ষ থেকে চরম আঘাতটি এসেছিল। মায়াবতীতেই ক্রিস্টিন নিবেদিতাকে জানিয়ে দেন, তিনি আর নিবেদিতা স্কুলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী নন। এখন থেকে তিনি অবলা বসুর ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষায়তনে পড়াবেন। শুধু তা-ই নয়, ক্রিস্টিন নিবেদিতাকে এ-ও জানিয়ে দেন যে, তিনি আর বোসপাড়া লেনের বাড়িতেও ফিরবেন না। ক্রিস্টিনের এই ব্যবহারে খুবই ভেঙে পড়েন নিবেদিতা। কারণ, স্কুল চালানোর বিষয়ে ক্রিস্টিনের ওপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন। তবে, দুঃখ পেলেও প্রকাশ্যে এ নিয়ে ক্রিস্টিনের এই আচরণের বিরুদ্ধে কখনো কিছু বলেননি নিবেদিতা। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'স্বামিজীর অভীপ্সিত নারীজাতির শিক্ষাকার্যে কৃস্টীনের সাহায্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি বিস্মৃত হন নাই। তিনি অকৃতজ্ঞ নহেন, এবং একথাও তিনি দৃঢ় ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, কৃস্টীনের উপরই তাঁহার আরব্ধ কার্যের ভার অর্পণ করিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার কেবলই মনে হইত, তিনি যদি চলিয়া যাইতে পারেন, কৃস্টীনের পরিচালনায় বিদ্যালয়ের কার্য সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে চলিবে। নিবেদিতার জীবিতকালে কৃস্টীন আর বোসপাড়া লেনে ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া কৃস্টীন দার্জিলিং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ আসে।'

নিবেদিতার মৃত্যুর পর ক্রিস্টিন যে কতখানি অনুতপ্ত হয়েছিলেন, তা বোঝা যায় ১৯১১-র ১৬ অক্টোবর জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা ক্রিস্টিনের একটি চিঠিতে। ক্রিস্টিন লিখেছেন, 'Oh Yum, dear Yum— isn't this terrible, terrible! I don't know what to do, I feel so bad.

'It never occured to me that such a thing could happen. She was always the strong one while I was always collapsing in Calcutta. I am so utterly unhappy to think that I left her to struggle with the work alone during these terrible summer months in Calcutta. There is always so much to do in 17 Bosepara and some of the work is so trying. The thing that killed her was the Will case. There is no doubt whatever about that. When I begged her to stay here a month or two longer just before she left, she said that she could not bear to solitude, that she must be active and surrounded by people to keep from thinking. So I did not urge it. She looked so ill then that I was very anxious— until the trial ended. After that I thought the danger was over.

'You probably know all details—that she went to Darjeeling with the Boses to spend their Puja holidays and became ill with dysentery almost immediately. The Boses engaged the best doctors and nurses and did all that could be done. When the telegram came that she was seriously ill, I sent for coolies, packed and was ready to start when the second one came. Mrs. Sevier says that I am to stay here with her now, but I don't know what to do.'

সারা বুলের উইলের মামলাই যে নিবেদিতার মৃত্যুর অন্যতম কারণ—ক্রিস্টিনও সেরকমই মনে করতেন। চিঠিতে সে কথাই ক্রিস্টিন লিখেছিলেন জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে। মায়াবতীতে নিবেদিতাকে দেখে ক্রিস্টিনেরও মনে হয়েছিল, তিনি ভীষণই অসুস্থ। সারা বুলের মৃত্যুর পর নিবেদিতার শরীর স্বাস্থ্যও যে খুব দ্রুত ভেঙে পড়ছিল, তা নিবেদিতার বোন মে উইলসন, ক্রিস্টিন এবং সেই সময়ে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের কথাবার্তাতেই পরিষ্কার। নিবেদিতার শরীরের অবস্থা দেখে ক্রিস্টিন নিবেদিতাকে আরো দু-একমাস মায়াবতীতে থেকে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা রাজি হননি। তিনি ওই সময়ে

নির্জনতার ভিতর থাকতে চাননি। বরং কলকাতায় ফিরে এসে কাজের ভিতর এবং লোকজনের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলেন। নির্জনে একা থাকলেই দুশ্চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসবে—এমন আশঙ্কাই নিবেদিতার হয়েছিল—ক্রিস্টিনের চিঠি থেকে এ তথ্যও জানা যাচ্ছে। এতেই বোঝা যায়, মানসিকভাবে কতখানি বিপর্যস্ত নিবেদিতা হয়ে পড়েছিলেন সেই সময়ে।

শুধু ক্রিস্টিন নয়; আঘাত এসেছিল সুধীরা দেবীর কাছ থেকেও। ক্রিস্টিন স্কুল ছেড়ে যাওয়ায় অসহায় নিবেদিতা মনে করেছিলেন সুধীরা দেবী স্কুলের হাল ধরবেন। কিন্তু ক্রিস্টিন স্কুল ছেড়ে দেওয়ার পরই সুধীরা দেবীও স্কুলে যাওয়া বন্ধ করলেন। সুধীরা দেবী বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন ক্রিস্টিনের। অনুমান করা হয়, যে কারণে ক্রিস্টিনের সঙ্গে মতানৈক্য হয়েছিল নিবেদিতার, সেই কারণেই সুধীরা দেবীর সঙ্গেও তাঁর মতানৈক্য হয়েছিল। তবে, ক্রিস্টিনের সঙ্গে সঙ্গে সুধীরা দেবীও চলে যান স্কুল ছেড়ে—যেটা নিবেদিতা একেবারেই চাইছিলেন না। এই দুজন চলে গেলে স্কুলের দৈনন্দিন কাজ চালানোই যে অসম্ভব হয়ে পড়বে—তা জানতেন নিবেদিতা। রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কার্যকলাপের জন্য নিবেদিতা সেভাবে স্কুলের দৈনন্দিন কাজকর্মের দিকে নজর দিতে পারতেন না; ক্রিস্টিন এবং সুধীরা দেবীই স্কুলের সবকিছু দেখাশোনা করতেন। সুধীরা দেবী স্কুলে আসা বন্ধ করার পর নিবেদিতা নিজে তাঁর বাড়িতে যান এবং তাঁকে স্কুলের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। সুধীরা দেবী নিবেদিতার সে অনুরোধ সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নিবেদিতাকে সুধীরা দেবী জানিয়ে দেন, তিনিও, ক্রিস্টিনের মতোই, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষায়তনে যোগদান করবেন। তবে, নিবেদিতার মৃত্যুর পর সুধীরা দেবীও যথেষ্ট অনুতপ্ত হয়েছিলেন। ক্রিস্টিনের মতো তিনিও আবার ফিরে আসেন নিবেদিতা স্কুলে। নিবেদিতা-পরবর্তী সময়ে এই স্কুলকে প্রতিষ্ঠিত করতে ক্রিস্টিনের পাশাপাশি তাঁরও অবদান ছিল অসামান্য।

যতই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ুন, যতই স্কুল চালানো নিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হোন—ক্রিস্টিনের চলে যাওয়াকে কখনোই সমালোচনায় বিদ্ধ করতে চাননি নিবেদিতা। বরং, চেয়েছেন ক্রিস্টিনের অভিজ্ঞতা আরো সমৃদ্ধ হোক। এমনকী, শনি-রবিবারগুলি ক্রিস্টিনের সঙ্গে একত্রে কাটাতেও চেয়েছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন, স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেও, বোসপাড়া লেনের বাড়িতে ক্রিস্টিন তাঁর সঙ্গেই থাকুন। ১৯১১-র ৩১ আগস্ট জোসেফিন ম্যাক্লিয়ডকে নিবেদিতা লিখেছেন, 'Christine has decided to go to Brahmo School for a year, as trainer of a class of teachers there, and Head of the lower school.

In that capacity she will earn money. Not for that reason at all, but for fifty others, I am delighted at her decision. I feel sure that through it, she will gain the breadth and experience and independence that I felt she much needed. She will continue to have her home here—and, I trust, to spend week-ends here, and holidays. Hawing had this experience she will be more of a personality, and more competent to engineer things, through the future that stretches ahead.'

১৯১১-র গ্রীষ্মাবকাশে বসু-দম্পতির সঙ্গে একমাস মায়াবতীতে ছিলেন নিবেদিতা। মায়াবতী যাত্রার আগের দিন সারদা দেবীর সঙ্গে দেখাও করে আসেন। সারদা দেবীর সঙ্গে এটিই ছিল নিবেদিতার শেষ সাক্ষাৎ। মায়াবতী থেকে নিবেদিতা যখন কলকাতায় ফেরেন, তখন সারদা দেবী জয়রামবাটি ফিরে গেছেন। মায়াবতীতে জগদীশচন্দ্রের লেখালেখির কাজে সহায়তা এবং নিজের লেখালেখির কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন নিবেদিতা। ওই সময়ে মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রমের সন্ন্যাসীদের সামনে তিনি 'বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। জগদীশচন্দ্রও আশ্রমে উদ্ভিদ সম্বন্ধে একদিন বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৯১১-র ১৯ মে জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে নিবেদিতা লিখছেন, 'Yesterday I had to start a talk amongst the monks and novices up at the Ashrama. I spoke of the necessity for the highest learning, amongst the followers of a religion—and some of the youngsters aired their own ideas about Sri Ramakrishna not being learnend. Afterwards the Bairn said he was so angry, he could hardly contain himself. Did they realise what it meant, to sit day after day beside the Ganges changing earth and gold from hand to hand, till He could throw them both away? Did fools not see what an eftort of the mind was there? Did they suppose it made any difference, whether that found expression in Mathematics or Greek or Physics, or Religion? Conldn't they see that it was the essences of learning?'

নিবেদিতার এই চিঠিটি একটি বিশেষ কারণে লক্ষণীয়। নিবেদিতা লিখেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে সঠিক না জেনেই কয়েকজন তরুণ সন্ন্যাসী নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন। এই তরুণ সন্ন্যাসীদের ব্যাখ্যা শুনে জগদীশচন্দ্র এতটাই ক্ষুব্ধ

হয়েছিলেন যে পরে নিবেদিতাকে বলেন—তিনি নিজেকে সংযত রাখতে পারছিলেন না। নিবেদিতার পত্রের এই অংশটি পড়লে কি এমন ধারণা হয় না যে, ব্রাহ্ম জগদীশচন্দ্র, যিনি এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মমতের ঘোর বিরোধী ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন? ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে সত্যিই কি কোনো পরিবর্তন এসেছিল জগদীশচন্দ্রের? ১৯১০ সালে নিবেদিতার সঙ্গে কেদার-বদরি ভ্রমণ এবং সেখানে সনাতন হিন্দু ধর্মের আচার-আচরণ সম্পর্কে ঔৎসুক্য দেখানো আর তার পরে মায়াবতীর এই ঘটনাটি কিন্তু এমন সম্ভাবনাকেই দৃঢ় করে। যদি ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের কোনো পরিবর্তন এসেই থাকে, তাহলে তার কৃতিত্ব কার? সে কি নিবেদিতার? শেষ পর্যন্ত সত্যই কি নিবেদিতা তাঁর 'খোকার' মনোজগতে এই বিশাল পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন? এই নিয়ে অবশ্য কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না। কারণ, নিবেদিতা বা জগদীশচন্দ্র কেউই এ বিষয়ে পরিষ্কার কিছু বলে যাননি। শুধু কিছু ইঙ্গিত নিবেদিতা দিয়ে গিয়েছেন মাত্র।

ক্রিস্টিন বোসপাড়া লেনের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কার্যত ওই বাড়ি একেবারেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। একা, নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিবেদিতাই তখন থাকতেন ওই বাড়িতে। গোপালের মা তাঁর জীবনের শেষ দুটি বছর কাটিয়ে গিয়েছেন এই বাড়িতে। তিনিও আর নেই। মাত্র কিছুদিন আগেই নিবেদিতার দীর্ঘদিনের সঙ্গী স্বামী সদানন্দও প্রয়াত হয়েছেন। পাশের একটি বাড়িতেই সদানন্দ থাকতেন। ফলে, সর্ব অর্থেই নিবেদিতা তখন একা। এই সময় শারীরিকভাবেও নিবেদিতা ক্রমশ আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। দেখতে দেখতে ১৯১১-র পূজাবকাশ এসে গেল। প্রতি বছরের মতো ওই বছরের পূজাবকাশটিও বসু দম্পতির সঙ্গে দার্জিলিংয়ে কাটাবেন স্থির করলেন নিবেদিতা। র‍্যাটক্লিফকে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে জানা যায়, ১৯১১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বসু দম্পতির সঙ্গে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশের রওয়ানা হয়েছিলেন নিবেদিতা। ২১ সেপ্টেম্বর র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'We leave tomorrow for Darjiling. Spiritually—it is exactly one year since the telegr. calling me to America. How much has happened. since then! Six months absent—six months here.

দার্জিলিং যাত্রার আগে নিবেদিতা একদিন গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়ির খুব কাছেই থাকতেন গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র নিবেদিতাকে স্নেহ করতেন। নিবেদিতাও মাঝেমাঝেই গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে যেতেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির মুগ্ধ পাঠক ছিলেন নিবেদিতা। দুজনের

ভিতর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজিকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হত। দার্জিলিং যাত্রার আগে নিবেদিতা যখন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন গিরিশচন্দ্রও অসুস্থ। ওই অসুস্থতার ভিতরই গিরিশচন্দ্র 'তপোবল' নাটকটি রচনা করছিলেন। নিবেদিতা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে আসেন। বলে আসেন, নাটকটি তাড়াতাড়ি শেষ করতে; দার্জিলিং থেকে ফিরেই যাতে তিনি নাটকটি পড়তে পারেন। দার্জিলিং থেকে আর ফেরাই হয়নি নিবেদিতার। এই 'তপোবল' নাটকটি গিরিশচন্দ্র নিবেদিতাকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন,

'পবিত্রা নিবেদিতা,

বৎসে! তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আমোদ করিতে। আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়? দার্জিলিং যাইবার সময়, আমায় পীড়িত দেখিয়া স্নেহবাক্যে বলিয়া গিয়াছিলে, 'আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।' আমি ত' জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে, দেখা করিতে আইস না? শুনিতে পাই, মৃত্যুশয্যায় আমায় স্মরণ করিয়াছিলে, যদি দেবকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ উপহার গ্রহণ কর।

শ্রী গিরিশচন্দ্র ঘোষ'

প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার লেখা থেকে জানতে পারি, দার্জিলিং যাত্রার আগে নিবেদিতা বাগবাজারে সারদা মায়ের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। সারদা দেবী অবশ্য তখন কলকাতায় ছিলেন না। জয়রামবাটিতে ছিলেন। যোগীন মা, গোলাপ মা এবং স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিয়ে আসেন নিবেদিতা। ওই সময়ে যোগীন মাকে প্রণাম করে নিবেদিতা বলেছিলেন, 'যোগীন মা, আমি বোধহয় আর ফিরব না।' উদ্বিগ্ন হয়ে যোগীন মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এ কথা বলছ কেন?' নিবেদিতা বলেছিলেন, 'কী জানি যোগীন মা, আমার মনে হচ্ছে, এই বোধহয় শেষ।' এই ঘটনাটি শুনলে এরকমই ভাবনাই মনে আসে যে, নিবেদিতা কি সত্যি বুঝতে পেরেছিলেন, আর বেশিদিন তাঁর আয়ু নেই! হয়তো তাঁর শরীরের অবস্থা ভিতরে ভিতরে এতটাই খারাপ হয়ে পড়েছিল যে, বাইরে কাউকে কিছু প্রকাশ না করলেও, নিজে বুঝতে পারছিলেন অসুখের গুরুত্বটা। দার্জিলিং যাত্রার আগে নিবেদিতার কয়েকজন বয়স্ক ছাত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এদের মধ্যে ছিল নিবেদিতার প্রিয়ছাত্রী প্রফুল্লকুমারী। প্রফুল্লকুমারী রুগ্ন ছিল বলে নিবেদিতা তাকে ওষুধ কিনে খাওয়াতেন। নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল প্রফুল্লকুমারীকে সঙ্গে করে দার্জিলিং নিয়ে যান। সে প্রস্তাবও তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রফুল্লকুমারী ছিল ব্রাহ্মণ পরিবারের

বিধবা কন্যা। কাজেই একজন বিদেশিনির সঙ্গে বাইরে যাওয়ার ছাড়পত্র প্রফুল্লকুমারী পায়নি।

লিজেল রেমঁ-র লেখায় পাই, নিবেদিতা দীনেশচন্দ্র সেনের বাড়ি থেকে একটি প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি এনে পুজো করেছিলেন। প্রাচীন সংস্কারবশত দীনেশচন্দ্র এই মূর্তিটি দিতে চাননি নিবেদিতাকে। রেমঁ লিখেছেন, 'অগ্নিশিখার ধ্যান করছিলেন নিবেদিতা। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর সামনে আরেকটি মূর্তি জেগে উঠল। তাঁর বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেনের বাড়িতে কষ্টিপাথরের এই মূর্তিটা আছে। দীনেশ সেন মূর্তিটা নিবেদিতাকে দিতে ইতস্তত করেন। প্রচলিত ধারণা, প্রজ্ঞাপারমিতার সাধকদের তাঁর ছাড়া আর-কারও উপাসনা করলে চলবে না। আর শেষ পর্যন্ত সাধনার ফল বিনাশ।

'নিবেদিতা ওসব শুনলেন না। মূর্তিটা তাঁর ঘরে এনে ফুল ধূপধুনা দিয়ে পূজা করতে লাগলেন। এই প্রজ্ঞাপারমিতা তাঁর আশ্চর্য এক অবলম্বন হয়ে উঠল। নিবেদিতার বুক ভরে ওঠে তাঁর উপস্থিতিতে।'

এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন নিজে লিখেছেন, 'এই সময় হঠাৎ যখন মৃত্যুর যাত্রী হইয়া তিনি স্যার জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দারজিলিঙ্গ যাইবেন, তাহার দুই মাস পূর্ব্বে, তিনি আমার নিকট হইতে একটি প্রস্তরময় 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র বিগ্রহ চাহিয়া লইয়াছিলেন — আমি বলিয়াছিলাম, "এ মূর্ত্তি আপনাকে দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি, আপনি এটি না নেন— ইহাই আমার ইচ্ছা।" তিনি বলিলেন "আমি আপনার মত ঐতিহাসিকের মুখে দিদিমার গল্প প্রত্যাশা করি না।" একরূপ জোর করিয়া সেই মূর্ত্তি লইয়া গিয়ে তাহার পশ্চাৎভাগ একটা কুলুঙ্গীর সঙ্গে গাঁথিয়া ফেলিয়া অতি যত্নে পুষ্প ও ধূপ দীপ দিয়া প্রত্যহ তাহার সেবা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভীত কণ্ঠে ক্রিশ্চিয়ানা বলিলেন, "এ মূর্ত্তি আপনি এখনই লইয়া যাউন, এবং আমাকে রক্ষা করুন, যে দিন হইতে এই মূর্ত্তি এই গৃহে আসিয়াছে, সেইদিন হইতে নিবেদিতার যে কত অশান্তি ঘটিয়াছে তাহা আর কি বলিব? মৃত্যু আসিয়া তাহাকে শান্তি দিয়াছে মাত্র।" আমি বলিলাম, "কেন? এ মূর্ত্তি তো তিনি স্যার জগদীশচন্দ্রকে দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম— তাঁহাকে পাঠাইয়া দিন।" ক্রিশ্চিয়ানা বলিলেন, "ব্রাহ্ম হইলে কি হইবে! তাঁহারা কিছুতেই এই মূর্ত্তি নিতে সম্মত নহেন।" ক্রিশ্চিয়ানা এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে এরূপ ভয় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আমি বিগ্রহখানি রাখিবার অন্যত্র ব্যবস্থা করিলাম।"

দীনেশচন্দ্রের স্মৃতিচারণা থেকে বোঝা যাচ্ছে, কাকতালীয় হোক বা অন্য যা-ই কারণ থাকুক, প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তিটি বাড়িতে আনার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার জীবনে অনেক অশান্তি ঘনিয়ে এসেছিল। এবং নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে

এই মূর্তিটি সম্পর্কে একটি ভীতির সৃষ্টি হয়। এমনকী জগদীশচন্দ্রও মূর্তিটি নিতে রাজি হননি।

দার্জিলিং যাত্রার আগে তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার শেষ সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, 'দারজিলিঙ্গ যাওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার ইংরাজীতে লিখিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাস প্রকাশিত হইয়া আসিল, আমি তাহার দুই খানি তাঁহাকে দিলাম। ভূমিকায় তাঁহার নাম না প্রকাশ করার জন্য তিনি আমাকে বাধ্য করিয়াছিলেন,—পুস্তক পাইয়া যে তিনি কতরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আর কি বলিব।

'তাঁহার শেষ কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছে। একটু করুণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"এই বই উপলক্ষে বহুদিন আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি, দুই মন একত্র হইয়া খাটিয়াছি। এখন কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, আর বোধহয় আপনাকে তেমন ঘন ঘন পাইব না। কিন্তু যে সৌহার্দ্দ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আপনি ভাঙ্গিবেন না, আপনি যদি পূর্ব্ববৎ না আসেন, তবে আমি কষ্ট বোধ করিব।"

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বসু দম্পতি এবং নিবেদিতা দার্জিলিংয়ে এসে পৌঁছলেন। দার্জিলিংয়ে তাঁরা পি. কে. রায়ের বাড়ি রায় ভিলায় উঠেছিলেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, '১৯১১ সেপ্টেম্বর—জগদীশচন্দ্র বসু ও তদীয় পত্নী লেডি অবলা বসু, ভগিনী নিবেদিতাকে তাঁহার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য দার্জিলিং যাইবার অনুরোধ করিলেন। নিবেদিতা বলিলেন, আপনারা আগে চলিয়া যান আমি পরে যাইতেছি।' দার্জিলিংয়ে পৌঁছনোর পর প্রথম কয়েকদিন সকলের বেশ আনন্দেই কাটল। জগদীশচন্দ্র আগে দার্জিলিং পৌঁছে সিকিম যওয়ার বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। ঠিক করেছিলেন বারো হাজার ফুট উঁচুতে সান্দাকফু মন্দির দেখতে যাবেন সকলে মিলে। দুর্গম পথে ঘোড়ায় চড়ে এখানে যেতে হয়। দু-তিন দিন লাগে যেতে। নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের এই পরিকল্পনায় অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। যাত্রার সবকিছু যখন ঠিকঠাক; তখন নিবেদিতা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কঠিন অসুখ, রক্ত আমাশয়। নিবেদিতার শরীর আগে থেকেই খারাপ ছিল। হঠাৎ এই অসুখ তাঁকে আরো কাহিল করে তুলল। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন বসু দম্পতি। সৌভাগ্যক্রমে ডা. নীলরতন সরকার তখন দার্জিলিংয়ে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি এসে নিবেদিতাকে দেখলেন। নিয়মিত চিকিৎসা চলতে থাকে নীলরতন সরকারের তত্ত্বাবধানে। কখনো একটু ভালো থাকেন। সবাই মনে করে হয়তো এবার সেরে উঠবেন। আবার দিন কয়েক পরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরকম টানাপোড়েন চলতেই লাগল।

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'বিদেশে শ্রীমতী অবলা বসু যখন অসুস্থ হইয়াছিলেন, তখন আপন ভগিনীর মত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন নিবেদিতা। অবলা বসুর মনে হইল, এবার তাঁহার পালা। দীর্ঘদিন অবিচ্ছিন্ন সাহচর্যের ফলে পরস্পরের প্রতি গভীর ভালোবাসায় তাঁহাদের অন্তর পূর্ণ ছিল। সর্বক্ষণ তিনি নিবেদিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় রত ছিলেন। সুচিকিৎসক বলিয়াও বটে, এবং নিবেদিতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসাবশতঃ ডাঃ নীলরতন সরকার প্রাণপ্রণ চিকিৎসার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ক্রমশঃই সকলে উপলব্ধি করিতেছিলেন, এই কঠিন ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশা ক্ষীণ। তাঁহার প্রিয় বন্ধুবর্গ সকলেরই চিত্ত বিষাদমগ্ন, কিন্তু তাঁহার মুখে বিষাদের ছায়ামাত্র নাই। জীবনেও যেমন, মরণেও তেমন নির্ভীক, তেজস্বিনী। প্রতিদিন সকালে তিনি প্রশান্ত মধুর হাস্যে সকলকে অভ্যর্থনা করিতেন। ভারতবর্ষে যে কার্য তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, যে উদ্দেশ্যে তাঁহার গুরু তাঁহাকে এদেশে আনিয়াছিলেন, সেই 'আমাদের মেয়েদের শিক্ষা'র চিন্তাই এই শেষ মুহূর্তে তাঁহার জাগ্রত চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। উহারই ভবিষ্যৎ পরিচালনা সম্বন্ধে তিনি আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতেন।'

নিবেদিতা বুঝতে পারছিলেন তাঁর জীবনদীপ নিভে আসছে। যে কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না, তাঁর অবর্তমানে সেই কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেই ভাবনায় অধীর তখন তাঁর মন। অসুস্থ অবস্থাতেই ৭ অক্টোবর, ১৯১১ — একটি উইল করলেন নিবেদিতা। ওই উইলে নিবেদিতা ঘোষণা করলেন — বোস্টনে তাঁর উকিল ই জি থর্প তাঁকে যা দেবেন, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে তাঁর যে তিনশো পাউন্ড সঞ্চয় রয়েছে, সারা বুলের সম্পত্তিতে তাঁর যে সাতশো পাউন্ড রয়েছে, তার সঙ্গে তাঁর বইয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং যাবতীয় গ্রন্থস্বত্ব তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের ট্রাস্টিদের দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ওই অর্থ একটি তহবিল করে তাঁরা জমা রাখবেন এবং সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে পরামর্শ সাপেক্ষে জাতীয় শিক্ষা প্রসারের কাজে ব্যয় করবেন। স্বামীজির মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন নিবেদিতা। জীবনের অন্তিম লগ্নে ক্রিস্টিনও নিবেদিতাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশন এবং ক্রিস্টিনের ওপরই দিয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে তাঁর প্রাণের বন্ধন ছিন্ন হয়নি — নিবেদিতার এই উইলটিই তার প্রমাণ।

লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'চোখের সামনে সমস্তটা জীবন ভেসে ওঠে। চেয়ে দেখেন নিবেদিতা। যেন সোনালী বালুচরে নেচে চলেছে সৌর করস্নাতা তটিনী,

উৎসমুখের আনন্দে টলমল, আবর্তে উচ্ছল, প্রপাতগর্জনে সঙ্গীতময়ী। এখানে-ওখানে পল্বলের গভীরে ঝলসে উঠছে আলো, তীরে-তীরে জীবনের সহস্র কলরব। কিন্তু মরণের মোহানায় এসে সম্পদের সমস্ত সঞ্চয় ফেলে দিয়ে অন্তরাত্মা নিরাভরণ হয়। জীবনের কিছু ছায়ার মত মিলিয়ে যায়, কিছু বা গলে যায় চোখের জলে। এবার আধারটা শুধু বাকী, এই দেহটা। কোনো পিছটান না রেখে হেলায় এটাকে ছেড়ে যেতে হবে।

'জীবনের উত্তাপ শীতল হয়ে এসেছে এরই মধ্যে, তুষার-শৈত্য আক্রমণ করছে তাঁকে। আহা, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র তুষার-আস্তরণই না মহেশ্বরের ধ্যানের আসন! এই যে আঁধারে অবগাহন, নবজন্মের সূচনা কি এ? ভাবচক্রের একটা আবর্তন? আত্ম-নিবেদনের আনন্দে হাসি ফুটে ওঠে নিবেদিতার অধরে। অনুভব করেন, ধীরে ধীরে খসে পড়ছে অন্নময় কোশের আবরণ।

'অবশেষে মাটির বাঁধন টুটে সহস্রদল প্রাণ যেন মুক্তির আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল। খাওয়া ঘুচে গেল নিবেদিতার। ভাব-সুষমাময় তনু মনের শুভ্রতা নিয়ে বেঁচে রইলেন শুধু ঋকের ছন্দে, অনাহতের গুঞ্জনে, বসুন্ধরার অশ্রুত কলতানে।'

দার্জিলিং আসার কয়েকদিন আগে নিবেদিতা প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের একটি কল্যাণবাণী ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এটি মুদ্রিত করে তিনি বন্ধুদের ভিতর বিলিও করেছিলেন। এ সবই তাঁর বিদায়ের প্রস্তুতি ছিল কিনা কে জানে। দার্জিলিংয়ে রোগশয্যায় তিনি এটি পাঠ করে শোনাতে অনুরোধ করেন। তা পাঠ করাও হয়। নিবেদিতার অনূদিত এই বৌদ্ধ প্রার্থনাটি এইরকম, 'Let all things that breathe, without enemies, without obstacles, overcoming sorrow, and attaining cheerfulness, move forward freely, each in his own path!

'In the East and in the West, in the North and in the South, let all beings that are without enemies, without obstacles, overcoming sorrow, and attaining cheerfulness, move forward freely, each in his own path.'

লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'শেষ একটি আনন্দ বুঝি তোলা ছিল তাঁর জন্যে। গণেন মহারাজের সঙ্গে জয়পুরে আচার্য বসুর আলাপ হয়, তিনি ঠিক সময়ে এসে হাজির হলেন। মঠের বাগান থেকে একঝুড়ি ফল এনছেন। সাধুরা পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে, নিবেদিতা অসুস্থ এবং যাওয়ার আগে এমনি কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় আছেন। এ ফল যে নিবেদিতার কাছে যাবার বেলায় গুরুর প্রসাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে বলেছিলেন, ছুটি হলে আম দেবেন। সেই কথা নিবেদিতার

মনে পড়ে যায়। সামর্থ্য থাকতে থাকতে বন্ধুদের সবাইকে নিয়ে আর একবার নিবেদিতা আনন্দ করে ফল খেয়ে নিতে চাইলেন।

'তরুণ ছাত্র বশী সেন সেখানে ছিলেন। নিবেদিতা 'খোকা'র হাতে বশীকে সঁপে দিলেন। বিকাল পর্যন্ত সবাইকে উৎসাহ দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে কথা বললেন।'

অসুস্থ নিবেদিতার শয্যাপার্শ্বে বসে জগদীশচন্দ্র রোজ নিবেদিতার পছন্দমতো কিছু পাঠ করে শোনাতেন। নিবেদিতার প্রয়াণের আগের দিন সন্ধ্যাবেলাও জগদীশচন্দ্র পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা আবেগতাড়িত হয়ে পড়বেন ভেবে কিছু অংশ বাদ দিয়ে পাঠ করছিলেন। নিবেদিতা তা বুঝতে পারেন। এবং জগদীশচন্দ্রকে কোনো অংশ বাদ না দিয়ে পড়তে বলেন।

রেমঁ লিখছেন, 'সবাই শান্ত হলে (নিবেদিতা) উচ্চারণ করলেন প্রাণের প্রার্থনাটি :

অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়...

'রাত হয়ে এল। নিবেদিতা তলিয়ে গেলেন, আর কথা কইলেন না। এই যে শিবশঙ্কর। আর দেরি নাই...

'নিবেদিতার বিছানা ঘিরে দাঁড়ান সবাই। একজন নিচু হয়ে শোনেন, নিবেদিতা অস্ফুটে বলছেন,

'তরী ডুবছে...কিন্তু...আবার দেখব, সূর্য উঠছে...'

১৩ অক্টোবর, ১৯১১, ভোরবেলা শান্তভাবে চলে গেলেন নিবেদিতা। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখছেন,'হিমালয়ের শান্ত, নির্জন ক্রোড়ে শেষের দিনগুলি ছিল মেঘ ও কুহেলিকায় ঢাকা। ১৩ অক্টোবর (১৯১১) শুক্রবার, প্রভাতে মেঘ সরিয়া গেল, পর্বত-শিখরের ঊর্ধ্বে উদার, অনন্ত আকাশ যেন প্রসন্ন দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল। নিবেদিতার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা অবলা বসুর মনে পড়িল উমা-হৈমবতীর উপাখ্যান, যাহা নিবেদিতা তাঁহাদের নিকট একসময় জ্বলন্তভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইল, 'এই শরৎ ঋতুতেই উমা পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন, এখানেও আর এক উমা, হিমপ্রধান দেশের দুহিতা, দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন তাঁহার স্বীয় আবাস ভারতবর্ষে। সকাল সাতটার সময় সহসা নিবেদিতার মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অস্ফুট মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, 'The boat is sinking. But I shall see the sunrise' তরণী ডুবছে, আমি কিন্তু সূর্যোদয় দেখব।'

'হিমালয়ের তুষারশিখরে তখন সবে সূর্যের আবির্ভাব হইয়াছে, নবারুণ রশ্মির এক ঝলক আসিয়া পড়িল কক্ষের মধ্যে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার আত্মা বিলীন হইয়া গেল অসীম, অনন্ত সত্ত্বায়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গতপ্রাণা সাধিকার ব্রত সংসিদ্ধ হইল।'

নিবেদিতার শেষ সময়ের একটি বর্ণনা পাওয়া যায় অবলা বসুর চিঠিতে। নিবেদিতার প্রয়াণের পাঁচদিন পর ১৮ অক্টোবর, ১৯১১ এই চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন নিবেদিতার বোন মে উইলসনকে। চিঠিতে অবলা বসু লিখেছেন, 'Peace be to her soul! And God be with us all for otherwise we are helpless. What we dreaded has taken place, and our beloved is at rest. All her sufferings are at an end—that is a consolation.

'Yes. She did suffer, but never a moan did we hear—never did she say anything, only when asked by me repeatedly, she said she was in pain. Never for a moment did I think that such a calamity could overtake us. What! She must get well. There was no Question of her not getting well. What would happen if she left us? What would happen to her work? Surely, God did not mean to be cruel, but there it was. We were helpless, dear Mrs. Wilson. What fools we are. We can not keep our dear ones alive, try as much as we can. The best doctor's skill we had, but what did it do? Nothing. The thing was that her constitution was quite ruined by her last year's suffering, and the disease attacked her in all its strength. She fought hard, but it all come to an end on the morning of the 13th. At 2-30 in the night, I went to her and she told me in a hushed voice as she was getting very weak. She told me that, "the boat was sinking, but she will see the sunrise." Then I understood that the end was near. From that time she refused all nourishments and medicine. I tried to give her oxygen inhalation, but she would have none. "Take it away" she said, as if she knew. From the first she seemed to know, for she talked of death, now and then. As I wrote to you in my last, she had diarrhoea which she tried to supress. Only when it turned to dysentery after four days that she

told us, and at once we were careful, and had her under treatment. Altogether she suffered a fortnight. The first day she took to bed she told me she would die. But I told her that we all feel like that when we are ill. Then again, when she saw she was not improving, she told me it would be much easier to die. Then I told her that when we are weak, we feel we cannot make effort to get well & that she must not give up. Later on, when she was getting weaker, she asked me to tell her frankly— "Let there be no hiding," she said, "and don't try to prolong." This was the last she about death, four days before she left us. We told her, that the only thing we were afraid of, was her weakness.

'She had no strength, dear Mrs. Wilson, her heart was weak from the 7th. As soon as we saw danger, we wanted to take her to Calcutta in an invalid carriage. Everything was ready, but the doctor said, he did not dare, as her heart might fail anytime.

'She talked of her work all the time. How her school is to continue, and she talked of Christine. She hoped that Christine would direct her work. She would have loved to have Christine with us during her illness, but Christine was at Mayavati, and though she had started it was too late. Poor Christine!

'My husband read to her everyday during her illness, things she loved to hear, and she enjoyed it to the last. The last evening, he had omitted something from the passage he was reading, as he felt it deeply. She at once noticed it, and my hasband had to read it over again. The morning before he was reading a letter to her and he was so much overpowered that he was choking, so I tried to restrain him but she said "Don't check him. Let him give in to his feeling." She met us everytime with a smile in her face, and how glad she was to have us with her. Oh! she was so patient and so bright all the time. You do not know how it hurts me to write of her as one who is no more. She is with us in spirit I am

sure, though God has cruelly removed her from our sight. How she loved her little nieces, even during her illness. In the beginning she told me how touched she was to have a welcome from them when she went there, and how good of you to have kept up that love in the children, so that she always knew she had a welcome in your home...'

অবলা বসুর এই চিঠিটি থেকে কতকগুলি বিষয় বেশ পরিষ্কার জানা যায়। প্রথমত, নিবেদিতা তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে প্রথমে কারোকেই কিছু জানাননি। অসুস্থতা গুরুতর আকার ধারণ করার পরই নিবেদিতা তা বসু দম্পতিকে জানান। ৭ অক্টোবর থেকেই নিবেদিতার হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। বিপদ বুঝে বসু দম্পতি তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনাও করেছিলেন। কিন্তু চিকিৎসকরা তাতে আপত্তি করেন। তাঁরা বলেন, সেক্ষেত্রে যাত্রাপথেই নিবেদিতার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ক্রিস্টিন তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেও, ক্রিস্টিনের প্রতি নিবেদিতার ভালোবাসা শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। নিবেদিতা আশা করেছিলেন, ক্রিস্টিন তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করবেন। তৃতীয়ত, মে উইলসনের মতোই অবলা বসুও বিশ্বাস করতেন শেষ একবছরের মানসিক বিপর্যয় (সারা বুলের উইলের মামলাকে কেন্দ্র করে) নিবেদিতার শরীর একেবারে ভেঙে দিয়েছিল।

নিবেদিতার মহাপ্রয়াণের সংবাদ দার্জিলিং শহরে ছড়িয়ে পড়াতে রায় ভিলায় মানুষের ভিড় উপচে পড়ল। ওই সময়ে ছুটি কাটাতে অনেকেই দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলেন। নিবেদিতা তাঁদের সকলের কাছেই ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্রী। তাঁরা সকলেই রায় ভিলায় উপস্থিত হলেন। এঁদের ভিতর ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডা. নীলরতন সরকার, শশিভূষণ দত্ত, সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, ডা. বিপিনবিহারী সরকার, যোগেন্দ্রনাথ বসু, শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ইন্দুভূষণ সেন, পি এডগার, মিস পিগট, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুর, বশীশ্বর সেনগুপ্ত, রাজেন্দ্রনাথ দে এবং আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বেলা দুটোর সময় রায় ভিলা থেকে শেষ যাত্রা শুরু হল শ্মশানের উদ্দেশে। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখছেন, 'শোকযাত্রা যখন কার্ট রোডে পৌঁছিল, তখন জনতা বিপুল আকার ধারণ করিল। শবদেহের অনুগমনে এরূপ বৃহৎ শোভাযাত্রা দার্জিলিং শহরে এই প্রথম। বাজারের মধ্য দিয়া হিন্দু শ্মশানভূমির নিকট যাইবার সময় সকলেই পথের দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া মস্তক নত করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিল। মৃতদেহ বহন করিবার জন্য অনেকের মধ্যেই আগ্রহ দেখা যাইতেছিল। বেলা ৪টার সময় সকলে শ্মশানে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাযথভাবে চিতাশয্যা রচিত হইল। মৃতদেহের মস্তক ও মুখ পবিত্র গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া, সর্বাঙ্গে গঙ্গাবারি সিঞ্চন করিবার পর উচ্চ 'হরিবোল' ধ্বনির সহিত উত্তর-শিয়র করিয়া উহা চিতার উপর স্থাপিত হইল; তখন ৪-১৫ মিঃ। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া শেষ সময়ে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। তিনিই মুখাগ্নি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। চিতা জ্বলিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। চিতাগ্নি নির্বাপিত হইবার পর রাত্রি ৮টার সময় চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া সকলে অশ্রুরুদ্ধ চক্ষে ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নীরবে প্রত্যাবর্তন করিলেন ('বেঙ্গলী' সংবাদপত্র হইতে সংগৃহীত)।

'হিমালয়ের নির্জন ক্রোড়ে, শ্মশান-প্রান্তরে ঐ পবিত্র ভূমির উপর নির্মিত নিবেদিতার স্মৃতি স্তম্ভটি ঘোষণা করিতেছে: এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিত— যিনি ভারতবর্ষকে তাঁহার সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।'

লিজেল রেমঁ লিখছেন, 'বিদেহী নিবেদিতা যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেলেন তা অপ্রত্যাশিত। তাঁর দেহাবশেষ নিয়ে কত স্মৃতি-মন্দির গড়ে উঠল। বেলুড়ে স্বামীজির সমাধি মন্দিরে বেদির নীচে কিছু ভস্ম রক্ষিত হল। কিছু রইল বশী সেনের বাগবাজারের ভজন-মন্দিরে। ১৯১৫ সনে কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরের নীচে কিছু ভস্মাবশেষ রাখা হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানের এই বিরাট প্রতিষ্ঠানে কোনো মর্মরফলকে নিবেদিতার নাম খোদা নাই, কিন্তু আছে পাশে একটি মেষশাবক-সুদ্ধ জপমালাধারিণী এক মহিলার শিলাচিত্র। দেখলেই নিবেদিতার কথা মনে পড়ে।

'গ্রেট টরেন্টনে —যেখানে বালিকা নিবেদিতা খেলে বেড়াতেন— সেইখানে পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে মাধুরীলতার ঝাড়ের মধ্যে আর কিছু চিতাভস্ম আছে। তার উপরে ক্রস্ চিহ্ন।'

নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে জগদীশচন্দ্র বেশ কিছু উদ্যোগ নেন। নিবেদিতার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই মে উইলসনকে জগদীশচন্দ্র একটি চিঠি লেখেন। ১৯১১-র ২ নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের লেখা সেই চিঠিটি এই রকম, 'I have faced and gone through the papers [Which Sister Nivedita] left. There is a mass of material for two books, but very incomplete. Then there are some of which two books could be made up.

'And then the book which she was helping me to write is staring me in the face. I have not at present the strength to do anything with it.

'And lastly there is the Women's School. She left it entirely under the control and guidance of Christine. When I asked N. to leave a proviso, in case Christine could not carry out the work— poor child broke down feeling her helplessness. Then we assured her that everyone of her wishes will be fully carried out, and that they shall.

'Only I don't see the way just now. Chirstine is nervous and is disinclined this moment to return to Calcutta. I don't know whether this is due to temporary 'nerve' or she does not feel herself upto it.

'Only one feels that we are letting time be wasted. If she had survived us she would not have allowed a single hour go by. But then, she had no body, it was all mind. There was no such thing as despondency or despair in her composition.

'Why did you not have another sister? I fear I shall never live to see your children grow up.'

জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, 'যে বইটি সে (নিবেদিতা) লিখতে সাহায্য করেছিল, তা আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।' আর চিঠিটি শেষ করছেন এই ভাবে— 'তোমার আর একটি বোন নেই কেন?' নিবেদিতার প্রয়াণে কতটা শূন্যতাবোধ তাঁর ভিতর সৃষ্টি হয়েছিল— তা এই চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায়। শূন্যতা যে সৃষ্টি হয়েছিল তা জানা যায় ১৯১৩-র ২১ মার্চ জোসেফিন ম্যাকলিয়ডকে লেখা সিস্টার ক্রিস্টিনের একটি চিঠিতেও। ক্রিস্টিন লিখেছিলেন, নিবেদিতার মৃত্যুতে বেশ কিছুদিন ধরেই জগদীশচন্দ্র মানসিক অবসন্নতায় ভুগছেন।

এই মানসিক অবসন্নতা সত্ত্বেও নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার্থে এবং তাঁর আরব্ধ কাজ যাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে জগদীশচন্দ্র পুরোপুরি উদ্যোগী ছিলেন। কেমন উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন তা জানা যায় ১৯১২ সালের ১৪ আগস্ট মে উইলসনকে লেখা একটি চিঠিতে। জগদীশচন্দ্র লিখছেন, 'I gathered from Christine that she would like the valuable collection of books on India, to be undistributed so that girls from the school might afterwards consult it. So I encouraged the idea, and wished Christine to use the room for her school, as a library recitation

room or any other purpose; or Christine might use it to receive her men friends. It was left to her entire disposal. Lest she understood me, I asked her last Sunday, whether the room has been used for the school. She said that as it was in the outer courtyard, she used it for her own reception room. I then enquired whether she would like to have the existing furniture changed and get other things. To this she said, nothing could be so distinguished as the present arrangement.

'You must remember that Christine has another and better sitting room of her own. She has the entire control and management of the school.

'Naturally, the Math and the leading monks have the school under them. But I have arranged matters in such a way that the only thing they do is to find money at the beginning of each month. They have no voice or the policy of the school. Christine can have the school open as long as she likes, or keep it closed. There is no one to whom she has to give any account. We only hear something she wishes to tell us. The matter, as I said is left solely and absolutely under her control.

'She spoke sometime ago about the stifling atmosphere of Bosepara and the heat. So we arranged that she would stay with us and go to school everyday. We have a large house, and there are we two and my sister. There is thus plenty of space. After much pressure, Christine came on a visit, but stayed only two days. She spoke of the rooms being much cooler at no. 17 Bosepara. She had not come since I think she would miss her friends in the lane.'

নিবেদিতার অবর্তমানে তাঁর স্কুলের বিলিবণ্টন কীভাবে করেছিলেন এই চিঠিতে তা-ই জানিয়েছেন জগদীশচন্দ্র। নিবেদিতা যেমন চেয়েছিলেন, তেমনই ক্রিস্টিনের হাতে এই স্কুল পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দেন জগদীশচন্দ্র। এমনকী, রামকৃষ্ণ মিশনও যাতে এই স্কুলের ওপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব ফলাতে না পারে সে ব্যবস্থাও জগদীশচন্দ্র করেছিলেন।

নিবেদিতার প্রয়াণের পরও অনেক বছর বেঁচে ছিলেন জগদীশচন্দ্র। পরিণত বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু নিবেদিতা তাঁর অন্তরে চিরকালই জাগ্রত ছিলেন। নিবেদিতার কথা সম্ভবত এক নিমেষের জন্যেও বিস্মৃত হননি জগদীশচন্দ্র। হননি বলেই বোধকরি নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার্থে নিজের উইলে এক লক্ষ টাকা তিনি রেখে যান। জগদীশচন্দ্রের রেখে যাওয়া এই অর্থ বয়স্কা নারীদের শিক্ষার জন্য খরচ করার সিদ্ধান্ত নেন অবলা বসু। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সনে তৈরি হয় 'সিস্টার নিবেদিতা উইমেনস এডুকেশন ফান্ড'। এই তহবিল থেকেই তৈরি হয় 'অ্যাডাল্টস প্রাইমারি এডুকেশন সেন্টার'। নিবেদিতার প্রয়াণের ছাব্বিশ বছর পর অবলা বসু প্রতিষ্ঠা করেন 'ভগিনী নিবেদিতা বয়ন মন্দির'। বসু দম্পতির এইসব কাজ নিবেদিতার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার নিদর্শন হয়েই থাকবে।

জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে আরো একটি প্রশ্ন ওঠে। তা হল, নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় যে গ্রন্থগুলি তিনি রচনা করেছিলেন, সেখানে কোথাও কৃতজ্ঞতাস্বরূপও নিবেদিতার নামোল্লেখ নেই কেন। এমনকী, তিনি তাঁর কোনো বক্তব্যে বা প্রবন্ধেও এ বিষয়ে নিবেদিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেননি; নামোল্লেখ তো দূরের কথা। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়টি উল্লেখও করেছি। বিজ্ঞানীর পক্ষে এ কাজটি নিশ্চয়ই উচিত হয়নি। তিনি কেন এ কাজ করেছিলেন তার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা নেই। তিনি কি এমনই ধারণা করেছিলেন যে, নিবেদিতার নাম প্রকাশ করলে তাঁর প্রতিভা খাটো হবে, অথবা নাম প্রকাশে নিবেদিতারই কোনো আপত্তি ছিল—তা এখন আর জানা সম্ভব নয়। জগদীশচন্দ্রের এই আচরণটি চিরকাল রহস্যেই ঢাকা থাকবে। তবে, যে কারণেই তিনি এটি করে থাকুন না কেন, নিবেদিতার প্রতি অবিমিশ্র ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধায় যে তাঁর কোনো ঘাটতি ছিল না তার প্রমাণ 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'।

নিবেদিতার মৃত্যুর ছ'বছর পর, ১৯১৭-র ৩১ নভেম্বর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর উদ্বোধন হয়। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র ততদিনে আন্তর্জাতিক মহলে আরো প্রতিষ্ঠিত এবং প্রশংসিত। জগদীশচন্দ্রকে ঘিরে নিবেদিতার যে স্বপ্ন ছিল, বলা যায়, তখন তা সফল হয়েছে। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-ও শুধু জগদীশচন্দ্রের একার নয়, নিবেদিতারও স্বপ্ন ছিল। নিবেদিতার সেই স্বপ্নকে কীভাবে সম্মান জানিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র?

'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর উদ্বোধনের এক বছর আগে, ১৯১৬-র ২৭ অক্টোবর মে উইলসনকে জগদীশচন্দ্র লিখছেন, 'We observed the 13th, but tomorrow is the Birthday. We will think of that day reminding us that her spirit is risen and is among us. Through the strength that is daily coming to me, and the way in which I am able to

carry out more and more of what at one time had been like a dream, through these I realise more and more of the real meaning of immortality. If I am able to carry out that work, which everyone thinks impossible for one man to accomplish—that will be due to the strength which comes form the life and memory of those who are living in us.'

জগদীশচন্দ্র এই চিঠি লিখেছেন নিবেদিতার জন্মদিনের ঠিক আগের দিন। চিঠিতে কোথাও নিবেদিতার নাম জগদীশচন্দ্র উল্লেখ করেননি। তবু, নিবেদিতাই তাঁর স্মৃতিতে ফিরে ফিরে আসছেন। জগদীশচন্দ্র লিখছেন, 'ওই দিনটি স্মরণ করলে আমাদের মনে হবে, সে আমাদের ভিতরই রয়েছে।' এমনকী, জগদীশচন্দ্র এ-ও বলছেন, তিনি যদি তাঁর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করতে পারেন, তাহলে তা সম্ভব হবে কারও স্মৃতি তাঁর ভিতর জাগরূক হয়ে থাকলে। ওই চিঠিতেই 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর স্থাপত্য কীরকম হবে তা-ও লিখেছেন জগদীশচন্দ্র। লিখেছেন, 'The Bose Institute will also be beautiful architecturally. As you enter there is a large stone lotus on the left—that is the basin in which water lilies will grow. Just overlooking that will be a bas-relief of a woman, with prayer leads and a lamp in her hand. The Institute is the embodiment of her prayer. On the 13th, the ashes were laid in a receptacle just by the side of the lotus. There will be two stone seats, and there will be a overhanging shefali tree, which sheds every morning lily white flowers, and makes a white carpet on the ground. The seed she brought from the caves of Ajanta and the plant was one of several which she plantad in the school grounds.'

কী ভীষণভাবে উপস্থিত নিবেদিতা! জগদীশচন্দ্র লিখছেন, 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর প্রবেশ পথে থাকবে পাথরের একটি বিরাট পদ্ম। এটি আসলে জলাধার। সেখানে সত্যিকার পদ্ম ফুটবে। তার উপর এক নারীর রিলিফ মূর্তি, যার একহাতে জপমালা, অন্য হাতে প্রদীপ। এই বিজ্ঞান মন্দির তাঁরই প্রার্থনামূর্তি। জগদীশচন্দ্র মে উইলসনকে জানাচ্ছেন, ৩১ তারিখে চিতাভস্ম (নিবেদিতার) একটি পাত্রে করে পাথরের পদ্মের পাশে স্থাপন করা হয়েছে। এখানে দুটো পাথরের বেদি থাকবে। সেখানে লাগানো হবে শেফালি গাছ। সেই গাছ থেকে রোজ সকালে সাদা ফুল ঝরে পড়বে। এই শেফালি গাছের বীজ নিবেদিতা এনেছিলেন অজন্তা থেকে। সেই

বীজ তাঁর স্কুলে লাগিয়ে কয়েকটি চারা বানিয়েছিলেন। তার ভিতর থেকেই একটি চারা এনে লাগানো হবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু জগদীশচন্দ্র তাঁর স্বপ্নের 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' নিবেদিতাকেই উৎসর্গ করে যাচ্ছেন। এর থেকে বড় স্বীকৃতি বোধহয় আর কিছুই হত না।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবেশপথে এখনও রয়েছে জপমালা হাতে এক নারীর রিলিফ মূর্তি। কিছু বলতে হয় না, কিন্তু বুঝতেও অসুবিধা হয় না — ইনি আসলে নিবেদিতাই। নন্দলাল বসু এসম্পর্কে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় 'শিল্পসরিক জগদীশচন্দ্র' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন, 'সিস্টারের রিলিফের এক মূর্তি আছে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। সে ডিজাইন আমার করা। বোম্বের কার্‌মাকার করেন ঐ রিলিফের কাজ আমার ডিজাইন থেকে।' জগদীশচন্দ্রের জীবনীকার প্যাট্রিক গেডিস লিখেছেন, 'Her fervid faith in the long-dreamed of Research Institute, its possibilities for science and its promise for India, was no small impulse, and encouragement towards its realisation; and thus is explained the memorial fountain with its bas-relief of 'Woman Carrying Light to The Temple' which adorns the entrance of his Institute.'

'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর শীর্ষে রয়েছে বজ্র চিহ্ন। ১৯০৪ সালে বুদ্ধগয়া ভ্রমণের সময় এই বজ্র চিহ্ন নিবেদিতাকে আলোড়িত এবং প্রভাবিত করেছিল। সেবার বুদ্ধগয়া সফরে নিবেদিতার সঙ্গে ছিলেন জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। নিবেদিতা এই বজ্র চিহ্নকে ভারতের জাতীয় প্রতীক রূপে কল্পনা করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় পতাকায় বজ্র চিহ্নকে স্থান দিয়েছিলেন তিনি। ওই ১৯০৪ সালের, ৩০ নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের জন্মদিন পালন করতে বিজ্ঞানীর বাড়িতে গিয়েছিলেন নিবেদিতা। ঘোষণা করেছিলেন, জগদীশচন্দ্রের জন্মদিনটি 'বজ্রদিবস' হিসাবে পালন করা হবে। আর জগদীশচন্দ্রের জন্য উপহার হিসাবে এনেছিলেন বজ্র চিহ্ন আঁকা পতাকা। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এর শীর্ষে বজ্র চিহ্নকে স্থান দিয়ে সেই দিনটিকেই হয়তো চিরকালীন করে রাখতে চেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এ কোথাও নিবেদিতার নাম খোদিত নেই; তবু তাঁর উপস্থিতি সর্বত্রই। আর এভাবেই 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' এক চিরকালীন যোগসূত্র হয়ে রয়েছে জগদীশচন্দ্র এবং নিবেদিতার ভিতর।

১৯১৬-র ২৭ অক্টোবর মে উইসনকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্রে আরো একটি তথ্য পাওয়া যায়। জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, 'You will be astonished to hear that our present Governor Lord Carmichael is a great admirer of

Nivedita. He has bought all her works, and wanted very much to have her good portrait.'

গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, লিজেল রের্মঁ এবং জিম হারবার্ট যখন নিবেদিতার জীবনী লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন জগদীশচন্দ্র তাঁদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। এ প্রসঙ্গে লিজেল রের্মঁকে লেখা মে উইলসনের একটি চিঠি উল্লেখ করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ। ওই চিঠিতে মে উইলসন জগদীশচন্দ্রের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেছেন, 'শ্রীযুক্ত জিম হারবার্ট এবং শ্রীমতী রের্মঁ কলকাতায় এসে সাক্ষাৎ করলে অবশ্যই সুখী হব। আমার বৈজ্ঞানিক জীবনের দুর্গম বন্ধুর পথে পূর্ণ সাফল্যলাভ না করা পর্যন্ত সর্ব পর্যায়ে নিবেদিতা যে সাহায্য করেছেন—সেই কথাই শুধু তাঁদের বলতে পারব। তৎকালীন যথার্থ পরিস্থিতির বিষয়ে অবহিত নয়, এমন কারো পক্ষে ভারতের জাতীয়তার উদ্বোধনে নিবেদিতার নিঃস্বার্থ ভক্তি এবং সুদীর্ঘ সহনের মূল্য বোঝা সম্ভব নয়।'

১৯৩৭ সালের ৭ অক্টোবর জিম হারবার্টকে লেখা জগদীশচন্দ্রের একটি চিঠিরও উল্লেখ করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ। চিঠিটি এরকম, 'ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নিবেদিতার গভীর বিশ্বাসই আমাকে রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠায় প্রণোদিত করেছে।'

নিবেদিতাকে কত উচ্চে স্থান দিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র, তা বোঝা যায় কুমুদবন্ধু সেনের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায়। ওই স্মৃতিচারণায় জগদীশচন্দ্র বলেছেন, 'নিবেদিতা প্রতিভাশালিনী নারীদের মধ্যেও অনেক উঁচুতে। তাঁর ত্যাগ অতুলনীয়—কি ত্যাগ তিনি করেছেন তা এদেশের লোক বুঝবে না। সাহিত্যে, বর্তমান যুগের সমস্যা সমাধানে, নানা বিষয়িনী বিদ্যায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়া। যদি তিনি পাশ্চাত্য দেশে থেকে কাজ করতেন—যশ-মান-প্রতিষ্ঠা-ঐশ্বর্য তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ত; আজ তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ শোক প্রকাশ করত। কিন্তু তিনি সে প্রলোভন ত্যাগ করে এই দেশকে এমন আপন করে নিয়েছিলেন যা এদেশে বড় বড় নেতার মধ্যেও দেখতে পাবে না। তাঁর সঙ্গে গঙ্গার তীরে যেতে যেতে দেখতুম, তিনি একটুকরো পাথর, একটা পুতুল, একটা জীর্ণ ভাঙা মন্দির দেখে আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। এমনি ভালবাসতেন, তিনি এই দেশকে। তাঁর মতো দৃষ্টি, তাঁর মতো সৌন্দর্যবোধ, তাঁর মতো গভীর স্বদেশপ্রেম, তাঁর মতো শিল্পীমন, আমাদের দেশে কারো নেই। সময়ে সময়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গী দেখে অবাক হয়েছি—মনে মনে শ্রদ্ধা করেছি তাঁর শ্রেষ্ঠতাকে। বোসপাড়ায় একটা ভাঙ্গা জীর্ণ বাড়ীতে অর্ধাহারে-প্রায় অনাহারে এই দেশের সেবায়

তিনি তিলে তিলে আত্মদান করেছেন। কত অনুরোধ করা হয়েছে ভাল বাড়ীতে নিয়ে আসবার জন্য—তাঁর পুষ্টিকর আহারের জন্য। তিনি হাসিমুখে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। দধীচির মতো আত্মবলিদান, উমার মতো তপস্যা, পুরাণে বা কাব্যে যা বর্ণনা শুনেছি—তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। ঈশ্বরের পাদপদ্মে কল্যাণের জন্য তিনি সর্বতোভাবে নিজেকে নিবেদন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নাম ঠিক রেখেছিলেন—নিবেদিতা।'

জগদীশচন্দ্রের অনুরোধেই রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার প্রয়াণের পর একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লেখেন। নিবন্ধটি শেষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এইভাবে, 'শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল। এই জন্য তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাঁহার রূপের অভাব দেখিয়া রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে চলিয়া যায় তিনি তাঁহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

'আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর করিয়া দেয়—যেন এই কথাটিকে নিঃসংশয় সত্যরূপ জানিতে পারি যে, মানুষের মধ্যে শিব আছেন, দরিদ্রের জীর্ণকুটীরে এবং হীণবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যেও তাঁহার দেবলোক প্রসারিত—এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য বিরূপতা ও কদাকারের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া এই পরমৈশ্বর্যময় পরমসুন্দরকে ভাবের দিব্য দৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন তিনি মানুষের এই অন্তরতম আত্মাকে পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং যাহা কিছু আছে সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লন। তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন, আরামকে তুচ্ছ করেন, সংস্কারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্তকালের জন্য দৃক্‌পাতমাত্র করেন না।'

বিবেকানন্দের আকর্ষণে ভারতে এসেছিলেন নিবেদিতা। বিবেকানন্দের ভিতর দিয়েই তিনি ভারতকে চিনেছেন। বিবেকানন্দের ভারতকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। উমার মতো তাঁর আমৃত্যু কঠোর তপস্যা ছিল এই ভারতের জন্যই। তিনি ভয়কে অতিক্রম করেছিলেন, স্বার্থকে জয় করেছিলেন, আরামকে তুচ্ছ করেছিলেন এবং নিজের দিকে মুহূর্তের জন্যও দৃক্‌পাত করেননি। ভারতাত্মাকে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ নিবেদন ছিলেন তিনিই—মার্গারেট নোব্‌ল—ভগিনী নিবেদিতা।

তথ্যসূত্র

১। নিবেদিতা ঃ লিজেল রেমঁ (অনুবাদ নারায়ণী দেবী)
২। ভগিনী নিবেদিতা ঃ প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা
৩। Long Journey Home : Barbara Fox
৪। Letters of Sister Nivedita : Edited by Sankari Prasad Basu
৫। নিবেদিতা লোকমাতা ঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু
৬। Sister Nivedita : Pravrajika Atmaprana
৭। The Complete Works of Sister Nivedita
৮। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা
৯। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
১০। পত্রাবলী ঃ স্বামী বিবেকানন্দ
১১। Reminiscences of Swami Vivekananda : His Eastern and Western Admirers
১২। The Life and Work of Jagadis C. Bose : Patrick Geddes
১৩। জগদীশচন্দ্র পত্রাবলী
১৪। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু
১৫। রবীন্দ্র রচনাবলী
১৬। পিতৃস্মৃতি ঃ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৭। রবিজীবনী ঃ প্রশান্তকুমার পাল
১৮। চিঠিপত্র ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯। The Life of Josephine Macleod : Pravrajika Prabudhdhaprana
২০। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ঃ রাণী চন্দ
২১। জীবনের ঝরাপাতা ঃ সরলা দেবী চৌধুরাণী

২২। বিবেকানন্দ চরিত ঃ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
২৩। The Compassionate Mother : Brahmachari Akshaychaitanya
২৪। লন্ডনে বিবেকানন্দ ঃ মহেন্দ্রনাথ দত্ত
২৫। ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ ঃ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
২৬। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব ঃ অমলেশ ত্রিপাঠী
২৭। শ্রীঅরবিন্দ অন হিমসেলফ
২৮। দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম ঃ সিস্টার নিবেদিতা
২৯। বাংলার বিপ্লবপ্রচেষ্টা ঃ হেমচন্দ্র কানুনগো
৩০। নিবেদিতা ঃ মণি বাগচি
৩১। অনন্যা সুধীরা ঃ প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণা

এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বহু নিবন্ধ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।